এম. এ. হাশেম খান

আলোর পরশ

আলোর পরশ

এম. এ. হাশেম খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আলোর পরশ

এম. এ. হাশেম খান

ই. ফা. বা. প্রকাশনাঃ ৮৩২/২

ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার ঃ ৮৯১·৪৪৩

আই. এস. বি. এন. : 984—06—0004—4

সপ্তম সংস্করণ (ই· ফা· বা· তৃতীয় সংস্করণ)

জুন ১৯৯১

আষাঢ় ১৩৯৮

জিলহজ্জ ১৪১১

প্রকাশনায়ঃ

প্রকাশনা পরিচালক

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–২

প্রচ্ছদ অংকনেঃ আজিজুর রহমান

মুদ্রণেঃ

আদর্শ ছাপাখানা

প্যারিদাস রোড, ঢাকা

বাঁধাইয়েঃ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

মূল্য ঃ পঁচাশি টাকা

ALOR PARASH (And From Darkness to Light, a novel based on the advent of Islam) written by M. A. Hashem Khan in Bengali And published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. June 1991

Price: Tk. 85·00; Dollar: 5·00 (U. S)

প্রকাশকের কথা

বাংলা সাহিত্যে 'আলোর পরশ' উপন্যাসটির নতুন করে পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। উপন্যাসটি ঐতিহাসিক। আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগে আরবে মানবেতর যে নিদারুণ অবস্থা বিরাজমান ছিল, তারই প্রেক্ষিতে উপন্যাসটি লেখা। ঘটনার প্রবাহ বয়ে গেছে ইসলাম প্রচারের সূচনা থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামোত্তর আরবের ক্রম পরিবর্তনশীল সামাজিক ও ধর্মীয় বৈপ্লবিক রূপান্তরের অন্যতম জীবন্ত ছবি উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে।

বিধর্মীদের হাতে নও-মুসলিমদের অমানুষিক নির্যাতন, নব দীক্ষিত মুসলিমদের অপূর্ব ধর্মবিশ্বাস, অভাবনীয় কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সুদূর আবিসিনিয়ায় নির্বাসন, তদানীন্তন সমাজে নারীর অকথিত মানবেতর দুর্দশার কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসটি শুধু ইতিহাস-নির্ভর নীরস ঘটনার সমাবেশ নয়, মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রেম-প্রীতি, জীঘাংসা, উদারতা, দয়া-নির্দয়তা ইত্যাদি গুণাগুণের সমন্বয় ঘটেছে এবং যথার্থই রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস–ইতিহাসও হতে হবে, উপন্যাসও হতে হবে–এই নীতি ও কঠোর দায়িত্ববোধ থেকে লেখক কোথাও বিচ্যুত হন নি, বরং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ঐতিহ্য–প্রীতি, মানব প্রেমের শাশ্বত মূল্যবোধ, মানবতা ও মহত্ত্ব, সর্বোপরি, ফল্গুধারার মতো অন্তর্নিহিত প্রবহমান ইসলামের অপ্রতিহত দুর্বার গতিশক্তি লেখকের বুদ্ধিমত্তাকে যেমন উদ্দিষ্ট শিল্প সৃষ্টিতে উজ্জীবিত রেখেছে, তেমনি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসও তার যথাযথ শৈল্পিক সার্থকতায় পৌঁছেছে নিঃসন্দেহে। 'আলোর পরশ' তাই শুধু আলোর নয়– হৃদয়ের পরশেও তা আপ্লুত হয়ে উঠেছে।

বইটির কাহিনী বিন্যাস যথোচিত ও ভাষা সংযত, সাবলীল ওবাস্তবানুগ।

এই মূল্যবান পুস্তকখানির ইতিপূর্বে ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে সর্বশেষ দুইটি সংস্করণ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে। প্রকাশের অল্পদিন পর পরই বইখানির সমস্ত কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। এত দিনে এর সপ্তম (ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প০ক্ষ থেকে তৃতীয়) সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা রহমানুর রহীমের দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

প্রথম সংস্করণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'আলোর পরশ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রাচীন আরবে মুসলিম-নির্যাতন, নও-মুসলমানদের অপূর্ব ধর্মবিশ্বাস, অশেষ কষ্টবরণ ও নির্বাসন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসীদের সমাজে নারীর দুর্দশা ইত্যাদি কাহিনী এই গ্রন্থের পটভূমি।—

সহিষ্ণুতা, আল্লাহ্‌র দয়ায় নির্ভরশীলতা ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য, বিপদে ধৈর্যহারা হইলে চলে না, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিশ্বাস রাখিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হয়-কোন বিপদই মুসলমানকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবাইতে পারে না-এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ঘটনাবলী সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

উল্লিখিত আদর্শবাদ প্রচার করিতে, মানুষের অন্তরে আশার আলো ফুটাইয়া দিতে, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণার সঞ্জীবনী-সুধায় মন-প্রাণ মাতাইয়া তুলিতে লেখকের শ্রম সার্থক হউক-ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

গ্রন্থকার ১৯৬০ সালে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে (১৯৪৭–৬০ সালের জন্য) বাংলা একাডেমীর প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।

আলোর পরশ

এক

সেকালে পবিত্র মক্কা নগরীর উপকণ্ঠে আল-জবিল নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। কালপ্রবাহে সেই গ্রাম বিলুপ্ত হইয়াছে বহুদিন। গ্রাম্য কুটিরগুলি এখন আর নাই, কঙ্কর-বালিপূর্ণ গ্রাম্য পথঘাট আর নাই, সে জনবিরল গ্রামের নীরবতাও নাই, এক্ষণে সেই স্থান শহরের কোলাহলে পূর্ণ। ধর্মকর্মে ও বাণিজ্যোপলক্ষে সেই স্থানে এখন প্রতিদিন বহু দেশের বহু লোক আসিয়া ভিড় জমায়। সে দিন নাই, সে গ্রাম নাই, সে মানুষ নাই বটে; কিন্তু সে গ্রামের এক বিচিত্র কাহিনী এখনও মানুষের স্মৃতিরাজ্যে স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছে, কিংবদন্তীর ন্যায় লোকমুখে তাহা বাঁচিয়া রহিয়াছে। সেই অমর উপাখ্যানই এ-কাহিনীর মর্মবাণী।

প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এক কুরাইশ নওজোয়ান, অপরাহ্নে সেই গ্রামের অদূরে এক কাঁটা-গুল্মময় প্রান্তরে মেষ চরাইতেছিলেন। যুবক সৈনিক পুরুষ- বয়স পঞ্চবিংশতির অনধিক, দীর্ঘায়ত দেহ, বলিষ্ঠ গড়ন-সুন্দর সুপুরুষ। মেষগুলিকে পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নদেশে শ্যামল প্রান্তরের একাংশে তাড়াইয়া আনিয়া তিনি এক পাথরের উপরে বিশ্রাম করিতে বসিলেন; বসিয়া হস্তস্থিত খর্জুর স্তবক হইতে এক-একটি সুপক্ক খর্জুর বাছিয়া বাছিয়া খাইতে লাগিলেন। যুবক অন্যমনস্ক, কি যেন চিন্তায় বিভোর। ঠিক সেই সময় পার্শ্বস্থিত খর্জুর বীথিকায় বৃক্ষের আড়ালে দণ্ডায়মান এক অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী যুবকের খর্জুর-ভক্ষণ-দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন। উপরে শাখা-প্রশাখার পত্রাবরণ ভেদ করিয়া এক ঝলক প্রখর রৌদ্র তরুণীর কুসুম-দলবৎ গণ্ডদ্বয়ে বিচিত্র রঙীন আভা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যুবকের মন অন্যদিকে, কাজেই তরুণীর আগমন তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

যুবকের নাম আবু রায়হান। শুধু আশপাশ কয় গ্রামেই নয়, তাঁহার ন্যায় বীর যোদ্ধা সেই অঞ্চলেই বড় একটা দেখা যায় না। হোদায়বার যুদ্ধশেষে অবকাশ পাইয়া আজ পাহাড়ের কোলে তিনি মেষ চরাইতে আসিয়াছেন, এমন প্রায়ই আসিয়া থাকেন। যুবতীর নাম উম্মে সায়ফুন, সায়ফুন বলিয়াই লোকে ডাকে।

সেই আল–জবিলেই তাঁহাদের বাস। দুইজনই আভিজাত্য–গর্বিত কুরাইশ বংশীয়। শৈশবাবধিই উভয়ের পরিচয়। দিনে দিনে সেই পরিচয়, সেই ঘনিষ্ঠতা, নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। তরুণীর বয়স চতুর্দশ হইতে ষোড়শ বর্ষ। ষোড়শ বর্ষই হইবার কথা। কেননা, সুন্দরীর দেহ–রত্ন অপরূপ যৌবন গরিমায় লাবণ্যমণ্ডিত, প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভিত সুষমায় তনু দেহ অপার্থিব মহিমায় যেন গৌরবান্বিত। যুবতীর আঁখিযুগল প্রেমাস্পদের হৃদয়তলে মায়া–বাণ নিক্ষেপ করিতে শিখিয়াছে; কোকিল কণ্ঠ–বিনিন্দিত সুধাময় সুর প্রেমিকের প্রাণে মোহের আবেশ জাগাইয়া তুলে; ললিতাঙ্গের লীলায়িত গতিছন্দ প্রিয়জনের হৃদয়তন্ত্রীতে সুমধুর ঝঙ্কার তুলিতে থাকে। তরুণী স্থূলাঙ্গী নহে, কৃশাঙ্গীও নহে–তাহার উজ্জ্বল গৌর কান্তি ও অনুপম গঠন–সৌষ্ঠব প্রেমিকের নয়ন–মন হরণ করিয়া বিরহী প্রাণে প্রেমের মূর্ছনা জাগায়। যুবতী বন্য হরিণীর এক জোড়া চঞ্চল আঁখি যেন কাড়িয়া লইয়াছে। কোন সুদক্ষ শিল্পী সযত্নে কাটিয়া কুঁদিয়া তাহার নাসিকাখানি বুঝি উন্নত করিয়া গড়িয়াছে। দীর্ঘ বাহুযুগল কী সুডৌল। কবিরা এই রূপসীকে দেখিলে মৃগ–নয়না, মৃণালভুজা, কোকিলকণ্ঠী বলিতেন; সুন্দরীর প্রশংসায় এক মহাকাব্যই বা রচনা করিয়া ফেলিতেন।

যুবতী হস্তস্থিত পুঁটুলিটা অতি সন্তর্পণে মাটিতে রাখিয়া একখণ্ড নুড়ি কুড়াইয়া লইল, তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া ওষ্ঠযুগলে দুষ্টামির হাসি টানিয়া সেই উপলখণ্ড যুবকের প্রতি নিক্ষেপ করিল।

নুড়ি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পার্শ্বে পতিত হইলে রায়হান চমকিত হইয়া এদিক ওদিক চাহিলেন, কিন্তু কোন কিছুই দেখিতে না পাইয়া পুনরায় খর্জুর ভক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। যুবতী কোনক্রমে হাসি চাপিয়া আবার আর একখণ্ড লোষ্ট্র কুড়াইয়া আনিয়া সেই দিকে নিক্ষেপ করিল। উপলখণ্ড এইবার ঠন্ করিয়া রায়হানের মস্তকে আঘাত করিতেই তিনি উহ্ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তরুণী হাসিয়া উঠিল খিল্‌খিল্ করিয়া। যুবক এইবার সায়ফুনকে আবিষ্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে ছুটিলেন। যুবতী নীচে বালুকাময় প্রান্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কন্টকিত লতাগুল্মের আড়ালে আবডালে ছুটাছুটি করিয়া মিছামিছি পলাইবার ভান করিল মাত্র।

যুবক সায়ফুনকে ধরিয়া আনিয়া আবার টিলার উপরে বসিলেন। যুবতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আজ কি কাণ্ড হয়েছে জান?"

নিমেষে রায়হানের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। চমকিত হইয়া উৎকণ্ঠার সুরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে সায়ফুন?"

সায়ফুন ফণিনীর ন্যায় গ্রীবা নাড়িয়া বিননি দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "আম্মা আমাকে কিছুতেই মাঠে আসতে দেবেন না; বলে কিনা শুনছ?—আমি নাকি বড় হয়ে গেছি, আমার নাকি মাঠে আসা শোভা পায় না।" এই বলিয়া সায়ফুন হাসিয়া কুটপাট। তারপর যুবকের কাছে বসিয়া আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "সত্যিই নাকি রায়হান ভাই! আমি কি ঐ উটের মতই হয়ে গেছি নাকি মস্তবড়?"

"না, না–এই সেইটুকুইত আছ, বাজে কথা সব! তারপর?"

"আম্মা দেবেন না কিছুতেই আসতে; তিনি নিজেই পুঁটুলিটা বেঁধে বাঁদীর হাতে তুলে দিয়ে বলিলেন—যা ত ছফুরা, পাহাড়ের ধারে ওৎবার খাবার দিয়ে আয়।– শুন কথা!"

"তারপর?"

"তারপর কি কাণ্ড করলাম বলতে পার?"

রায়হান স্মিতহাস্যে বলিলেন, "আমি তা' বলব কি করে? মানুষের মনের কথা জানি বুঝি!"

যুবতী গম্ভীরভাবে বলিল, "বটেই ত! সিপাই মানুষ কিনা, অতশত জানবে কি করে! তুমি জান শুধু মানুষের গলা কাটতে। না সাহেব? শুন মজাটা। বাঁদী বাড়ী থেকে বের হয়ে আসতেই আমি গাঁটরিটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চটাস্ চটাস্ দুই গালে কয়েকটা চপেটাঘাত করে ছুটে পালালুম। এই দেখ না– হাতের তালু কেমন লাল হয়ে আছে এখনও।" এই বলিয়া যুবতী সম্মুখে হস্তদ্বয় প্রসারণপূর্বক আবার খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রায়হান দেখিবার ছলে যুবতীর চম্পক–কলি–সদৃশ আঙ্গুলগুলি চাপিয়া ধরিলেন। রূপসীর মখমল–কোমল উষ্ণ করতল–স্পর্শে যুবকের দেহ মনে তখন এক অপূর্ব পূলক শিহরণ। তৎক্ষণাৎ সায়ফুন মুচকি হাসিয়া হাত ছাড়াইয়া বৃক্ষতল হইতে পুঁটুলিটা আনিতে ছুটিল।

বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা গাঁটরিটা আনিয়া সায়ফুন রায়হানের পার্শ্বদেশে বসিয়া খুলিতে লাগিল। রায়হান যুবতীর পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত কেশগুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "বেচারীকে প্রহার করা কি ঠিক হয়েছে সুন্দরী। বাঁদীর কি অপরাধ বলত?

অসহায়া নারী অমনি দুর্ভাগ্যের পীড়নে মর্মাহতা, তুমি আবার তার দুঃখের বোঝাটা বাড়ালে?"

সায়ফুন আহার্য দ্রব্যগুলি মাটিতে নামাইতে নামাইতে বলিল, "তুমি ওসব বুঝবে না কিচ্ছু বুদ্ধু মিয়া! দু'ঘা না কশলে ছুঁড়ী পালাতো নাকি? ঘোড়ায় চড়ে কাল বিকেলে অনেক খুঁজেছিলাম তোমায়, হারামজাদী আব্বাকে তা' বলে দিয়ে যা মারটাই না খাওয়ালে! সুযোগ খুঁজছিলাম সেই বিকেল থেকেই। এই নাও, ভাল ছেলের মত খেয়ে ফেল সবটুকু; আমি ভাইজানকে দিয়ে আসি ঐগুলো।"

রায়হান বলিলেন, "না সায়ফুন, খাব না; খিদে নেই তেমন। কেন তুমি রোজ রোজ আমার জন্য এত সব বয়ে আন বল ত?"

সায়ফুন আড়চোখে চাহিয়া বলিল, "খিদে নেই কেমন! সেই সকালে খেয়ে এসেছ তা' আমি জানিনে বুঝি? বাঁদীকে প্রহার করায় রাগ করেছ নাকি? নাও, খাও! ঘাট হয়েছে, আর আমি মারবো না। কেন হারামজাদী কাল আমাকে এমন করে মার খাওয়ালে বল ত? এক-আধবার তোমাকে না দেখলে, পাহাড়ে-প্রান্তরে এক আধটুকু ছুটোছুটি না করলে, আমার যে ভাল লাগে না রায়হান ভাই!"

যুবক স্মিতমুখে আহার্যগুলি হাত বাড়াইয়া লইলেন। যুবতী ভ্রাতার খাবারটুকু আবার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া কিয়দ্দূরে ওৎবার সন্ধানে যাত্রা করিল, যাইতে যাইতে কয়েকবার ঘাড় ফিরাইয়া, যুবকের প্রতি তাকাইয়া মুচকি হাসিল, আবার চলিল।

ওৎবা সায়ফুনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কয়েকটা পাথুরে টিলার ওপার সে-ও একা একা মেষ চরাইতেছিল ছোট ছোট কাঁটা-গুল্মময় এক বিশাল বালুকাময়। প্রন্তরে।

সায়ফুন চক্ষুর আড়াল হইতেই রায়হান খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া আহার্যগুলি পাথরের ফাঁকে লুকাইয়া রাখিলেন। দল-ছাড়া কয়েকটা মেষ পূর্বদিকে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। অবিলম্বে সেইগুলিকে ফিরাইয়া আনিতে তিনি নীচে নামিয়া নুড়ি ও বালুকাময় প্রান্তরে ত্রস্তপদে ছুটিলেন।

কতক্ষণ পরে রায়হান ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই টিলার উপরে বসিলেন। পশ্চিমের পাহাড়ের ছায়া পূর্বদিকে বহু দূরাবধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে; দূরের সেই খর্জুর বৃক্ষগুলির লম্বমান ছায়া ধীরে ধীরে আরও লম্বা হইয়া তাহার পায়ের কাছে

প্রায় আসিয়া পড়িবার উপক্রম। রৌদ্র-দগ্ধ দেশের উষ্ণ বায়ূ-প্রবাহও যেন অনেকটা মন্দীভূত। বেলা আর বেশী নাই, একটু পরেই তাঁহাকে বাড়ী ফিরিবার আয়োজন করিতে হইবে; নতুবা সায়াহ্নে পশুর পালের হায়ানেরা আক্রমণ করিতে পারে।

অল্প পরেই সায়ফুন হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিল। রায়হানের নিকটে আসিয়া কোমরে দুই হস্ত স্থাপনপূর্বক বিস্ময়ের সুরে সে বলিল, "তোমার আজ হলো কি বলত?"

তদধিক বিস্ময়ে চক্ষুদ্বয় বিস্ফরিত করিয়া রায়হান বলিলেন, "কই, না। কিছুইত হয় নি! কেন সায়ফুন?"

"শুকনো রুটি তোমার গলায় আটকায় নি?—এক ফোঁটা পানিও যে খাও নি?"

"ওহ্, সেই কথা। ভুলেই গেছিলাম।" এই বলিয়া রায়হান ঢক্ ঢক্ করিয়া পানিটুকু গিলিয়া ফেলিলেন।

সায়ফুন রায়হানের পার্শ্বে উপবেশন করিল। দুই হস্ত গণ্ডদ্বয়ে স্থাপন করিয়া দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞসা করিল, "তোমাকে বড় উন্মনা দেখ্ছি, ব্যাপার কি বলত? কিছু শুনেছ নাকি?"

"না না, উন্মনা কোথায়! কি আবার শুনবো! হাঁ হাঁ, শুনেছি বটে—ও পাড়ার নতুন ভাবীর ছেলে হয়েছে, বাঁচা গেছে, মেয়ে হ'লেই মুশকিল হতো আর কি! কি বল? আর শুনেছি-বান্নু নাকি তার মেয়েটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাহাড়ে নিয়ে মেরে ফেলেছে। কি নিষ্ঠুর! আর শুনেছি, হালিমের একটা নতুন উট-"

সায়ফুন ভ্রুকুটি করিয়া বাধা দিয়া বলিল, "ছাই শুনেছ, ভাবীর ছেলে হয়েছে ত তোমার কি সাহেব? বান্নু মিয়া তার মেয়েকে মেরে ফেলেছে-এ আবার কিছূ নতুন কথা নাকি? এ-ত নিত্যকার ঘটনা। আর হালিমের উট হারিয়েছে-এ বুঝি একটা মোটা খ বর?"

রায়হান ফ্যালফ্যাল নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "কই আর ত কিছুই শুনি নি! কী খবর সায়ফুন?"

"না, তুমি দেখ্‌ছি একেবারেই দুধের খোকা, দুনিয়ার কোন খবরই রাখ না; জান শুধু লড়াই করতে। আবার কোথায় হয়ত যুদ্ধের মহড়া হবে, সেই কথাই তোমার মাথায় গিজগিজ করছেঃ ছোট–খাট কথা কানে আসবে কি করে? হুঁ।" সায়ফুন মুখ ভার করিয়া ফিরিয়া বসিল। পরক্ষণেই আবার রায়হানের মুখোমুখি ঘুরিয়া তাহার স্কন্ধে একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, "কিছুই শুন নি?"

রায়হান মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, "ওহ বুঝেছি মুসার সঙ্গে তোমার শাদীর কথা! না?"

সায়ফুন কৃত্রিম বিরক্তিভরে ওষ্ঠদ্বয় বক্র করিয়া দুই আঙ্গুলে রায়হানের শ্মশ্রুবিহীন গণ্ডদেশ এপাশ–ওপাশ টানিতে টানিতে বলিল —"তোমার মুণ্ডু! মুণ্ডু!! মুসা নয় মিয়া সাহেব —রাহেল!রাহেল!!"

রায়হানের বিস্ময়ের অবধি নাই! ব্যথিত–চিত্তের বুক–ফাটা ভাষা জড়িত চাপা–কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল, "রাহেল! একি কথা বল্‌ছো? রাহেলের সঙ্গে তোমার শাদী! কেন? তার না আরো তিন বিবি বর্তমান?

"হ'লে কি হবে! তা'তেও ত মিয়ার মন উঠে না, আরও চাই গণ্ডা কয়েক সেনাপতি! বলতে পার আজ বাড়ী গিয়ে প্রথমে কি করবো।"

রায়হান মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি করে বলি প্রিয়ে! আমি কি নজজুম নাকি, তোমার মনের কথা যে বলবো?"

"দেখই না চেষ্টা করে! বলতে পার ত ইনাম পাবে।"

"কি ইনাম?"

যা চাইবে তা'ই।"

"যদি বলি, সুন্দরী সায়ফুনকে চাই?"

'যাও, তুমি বড় দুষ্টু! শুন বাহাদুর! আজ সন্ধ্যায় রাহেলের ঘরে ঢুকে পাষণ্ডের মাথায় এক মনি করে এক ঘা বসিয়ে দেব।" সঙ্গে সঙ্গে সায়ফুন দুই হস্ত যুক্ত করিয়া, প্রহারের ভঙ্গীতে রায়হানের মাথার উপর তুলিল।

রায়হান চমকিত হইয়া, নিমেষে যেন আঘাত প্রতিরোধ করিবার মানসে হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলিলেন। এইবার সায়ফুনের কলহাস্যে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "বড় আঁতকে উঠলে যে বীর পুরুষ? তুমি

আবার সেনাপতি! এই হিম্মত নিয়েই বুঝি লড়াই করা হয়? আমি কি আর সত্যি সত্যিই তোমার মাথায় ডাণ্ডা মারলাম?"

এই বলিয়া সায়ফুন হাসিয়া কুটপাট। তারপর পার্শ্বদেশ হইতে উঠিয়া রায়হানের সম্মুখে বসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "শুন সেনাপতি, একটা কাজ করবো ঠিক করেছি।"

"কি করবে?"

"শাদী করবো।"

"শাদী করবে! কাকে?" রায়হানের দুই চোখে অগাধ বিস্ময়।

"তুমি হাবা নাকি? কিচ্ছু বুঝ না? অত বলতে পারি না।"

"চুপি চুপিই বল না প্রিয়ে!"

"না, বলতে পারি না, বড়জোর দেখাতে পারি।"

"তবে তা-ই দেখাও?"

"এই গর্দভটাকে।"এই বলিয়া সায়ফুন রায়হানকে হঠাৎ এক ধাক্কায় বালির উপর ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইল।

রায়হানও হাসিতে হাসিতে সায়ফুনের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ছুটিতে ছুটিতে ডাকিলেন, "সায়ফুন! শুন, একটা কথা! কাজের কথা, একটু শুন প্রিয়ে!"

সায়ফুন ফিরিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুঝেছি গো বুঝেছি, তোমার পেটে পেটে দুষ্টুমি!" এই বলিয়া বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থালা-বাটিগুলি দোলাইতে দোলাইতে আস্তে আস্তে সে গৃহাভিমুখে চলিল।

রায়হান পুনরায় ডাকিলেন, "যেও না, সায়ফুন! সত্যিই কাজের কথা-বড় জরুরী। একটিবার শুন মণি!"

সায়ফুন দাঁড়াইল। পুঁটুলিটা দুই হাতে হাঁটুর কাছে ঝুলানো অবস্থায় ধরিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "বল কি কথা!"

রায়হান। আরও কাছে এস!

সায়ফুন। না, ওখান থেকেই বল। তুমি আবার পা বাড়ালেই কিন্তু ছুটে পালাব! কি বলবে বল?

রায়হান। আমার ভেড়াগুলো একটু তাড়িয়ে নিয়ে যাও ভাই! আমি একবার ওদিকে যাব। বড় জরুরী কাজ! বাড়ীর কাছে গিয়ে ভাবীকে ডেকে দিও। তিনি ও-গুলোকে খোঁয়াড়ে তুলে দেবেন।

সায়ফুন। এই অবেলায় আবার যাবে কোথায়?

রায়হান। ঐ, ঐদিকে একটু যাব।

সায়ফুন। গোপন করছো? বলবে না আমাকে? বেশ, রইল তোমার মেষপাল আমি তাড়াতে পারবো না

সায়ফুন মুখ ভার করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

রায়হান অনুনয় করিয়া বলিলেন, "একটু নাও ভাই! বলছি তোমাকে সব কথা। ঐ পাহাড়ে যাব।"

সায়ফুন। এই সন্ধ্যাবেলায় যাবে পাহাড়ে? মাথাটা খারাপ হয়েছে?

রায়হান। যাব আর আসবো। খুব দরকার কিনা।

সায়ফুন। শুনিই না, কি এত দরকার?

রায়হান চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা মিথ্যা বলিয়া সায়ফুনকে বুঝাইবেন ভাবিলেন, কিন্তু পারিলেন কই, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। অধোবদনে তিনি নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সায়ফুন মুখ ভার করিয়া রায়হানের হাত হইতে একটানে লাঠিটা ছিনাইয়া লইল, তারপর গম্ভীরভাবে তাঁহার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মেষ তাড়াইতে চলিল।

ভেড়ার পাল লইয়া সায়ফুন দৃষ্টির আড় হইতেই রায়হান এক দৌড়ে পাথরের আড়ালে লুক্কায়িত খাদ্যদ্রব্য গুলি আনিয়া দূরে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিলেন

সূর্য তখন পাহাড়ের তলায় নামিয়া গিয়াছে। ফিরিতে রাত্রি হইলে ভয়ের আশঙ্কা আছে। এদিক-ওদিক তাকাইয়া তিনি দ্রুত পদক্ষেপে ডানদিকের প্রান্তর বরাবর ছুটিতে লাগিলেন। বালিতে পায়ের পাতা গোড়ালি অবধি ডুবিয়া যায়, অগ্রসর হওয়াই দায়, তথাপি যথাশক্তি তিনি পাহাড়ের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন।

দুই

রাত্রিটা সায়ফুনের বড় অস্বস্তিতে কাটিল। ভাল ঘুম হইল না, প্রায় সারারাত্রি শয্যোপরি জাগিয়া কত কথাই সে ভাবিল—রায়হানের কথা, রাহেলের কথা, তাহার বিবাহের কথা। ভাবিয়া ভাবিয়া সে সারা হইল। কেবলই মনে হইতে লাগিল— রায়হান তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া একাকী সন্ধ্যাকালে কোথায় চলিয়া গেল! এমন ত কোনদিন হয় নাই! কোনদিন কোন কথা রায়হান তাহার নিকট গোপন করে নাই। উভয়ের জীবনের সুখ-দুঃখের কত কথা, কত গোপন কাহিনী, কত তুচ্ছ ঘটনা উভয়ে জানে; তবে আজ কেন এমন উপেক্ষাভরে চলিয়া গেল! তাহার মাতা-পিতা, তাহার ভ্রাতা, রায়হানের সঙ্গে তাহাকে বিবাহ দিতে সম্প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—ইহাই কি রায়হানের উপেক্ষার কারণ? কেনই বা মাতা-পিতা, আর ভ্রাতা হঠাৎ বিবাহে অমত করিয়া বসিলেন? তাঁহারা ত কোন কালেই এ-বিবাহে অনিচ্ছুক ছিলেন না! তবে কেন তাহার ভাগ্যাকাশে অকস্মাৎ কাল মেঘ এমন নিবিড়ভাবে ঘনাইয়া আসিল! অভাগিনীর চিন্তার অবধি নাই।

সকাল হইতেই সায়ফুন রায়হানকে চুপি চুপি কত খুঁজিয়া বেড়াইল; মিছামিছি পথে-প্রান্তরে খানিকটা ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু কোথাও রায়হানের সন্ধান পাইল না। ক্রমে বেলা বাড়িল—দ্বিপ্রহর হইল, দ্বিপ্রহর অতীত হইল—রায়হান তবু আসিলেন না। ঝর্ণা হইতে পানি আনিবার ছলে সায়ফুন আর একবার টিলার ধারে মেষচারণ ভূমিটা ঘুরিয়া আসিল; কিন্তু সেখানেও তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। ততক্ষণে দিনমান প্রায় শেষ। অধীর আগ্রহে সায়ফুন বড় ব্যাকুল হইল। কৈশোরাবধি রায়হান কোন-না-কোন ছলে, সায়ফুনের সঙ্গে দিবসে অন্ততঃ একটিবার দেখা করে নাই- এমন দিন সে চিন্তা করিয়া খুঁজিয়া পাইল না।

উদ্‌বেগভরে সায়ফুন বিমাতাকে বলিল, "আম্মা, আরফান ভাইদের বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি? শুনেছি ভাবীর নাকি অসুখ। আমার সব কাজ শেষ

হয়েছে আম্মা! পানি তুলেছি, শামাদান মুছে রেখেছি, রান্নার আয়োজনও করেছি। ফিরে এসে রুটি সেঁকবো। যাই আম্মি?"

আরফান রায়হানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দু ভাই ছাড়া বংশে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেহই নাই।

বিমাতা ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "এই সন্ধ্যাকালে আরফানের বাড়ী যাওয়ার এত গরজ কেন শুনি? সায়ফুন! ভুলে যাস্‌নে, তুই আর সেই খুকিটি নস্–আগের মত ঘুরে বেড়াবি যেখানে সেখানে। যা ভেবেছিস তা' হবে না। স্পষ্টই বলছি–রায়হানের সঙ্গে তোর বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ছোকরা নাকি আজকাল মুসলমানদের সঙ্গে বড় মেলামেশা শুরু করেছে। তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে আমাদের মান–ইজ্জত আর জাত কুল ত খোয়াতে পারিনে।"

সায়ফুনের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নৈরাশ্যের উদ্বেলিত হাহাকার যথাসম্ভব বুকে চাপিয়া, বাহুবেষ্টনে বিমাতার গলদেশ জড়াইয়া সে বাহানা ধরিল, "আম্মা! ভাবীর সঙ্গে দু'টো কথা বলেই চলে আসবো, নতুন শালোয়ার কিনেছে কিনা, তাই শুধু দেখে আসবো একবার; যাব আর আসবো। দেখো, ফিরে এসে ঠিক সন্ধ্যা–প্রদীপ জ্বালবো। যাই আম্মি?"

বিমাতা কন্যার হাত ছাড়াইয়া বলিল, "না, যেতে হবে না। তোর আব্বা ওসব পছন্দ করে না। দেখলে পরে রক্ষে থাকবে না।"

সায়ফুন বিমাতার ওড়নাখানির প্রান্তদেশ নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "ও আম্মা, আব্বা যে চলে গেছেন বহু দূর! –সেই আল–আদিবের হাট। ফিরবেন তো রাত দুপুরে! বড় ভুলে যাও আম্মা! শুননি যাবার কালে বলে গেলেন তিনি, একটা নতুন কামিজ কিনে আনবেন হাট থেকে তোমার জন্যে! ভুলে গেছ বুঝি? কি যে হচ্ছে আম্মা দিন দিন! আম্মি, কামিজটা কিন্তু নতুন নতুন গায়ে দেবো আমি। তারপর তুমি দিওখন, কেমন?"

বিমাতার মুখে এবার হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "কামিজের কথা আবার বললে কখন? শুনিনি তো!"

সায়ফুন স্মিতহাস্যে বলিল, "তুমি আবার কাজের কথা শুন কখন! যাই আম্মি? ছি।" এই বলিয়া ঘাড় কাত করিয়া হাসিতে হাসিতে সে রায়হানের

বাড়ীর পথে ছুটিল। পিঠের উপর লম্বমান বিননিটা তখন নর্তন–কুর্দন শুরু করিয়া দিয়াছে এপাশ–ওপাশ।

বিমাতা পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, "ভালয় ভালয় সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসো যেন, নইলে কিন্তু ঠ্যাং ভাঙবো।"

সায়ফুন হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া আরো জোরে ছুটিল।

জন্মের পর হইতেই সায়ফুন মাতৃহারা। সংসারে তাহার অবাঞ্ছিত আবির্ভাব শুধু আত্মীয় পুরুষ–মহলেই নয়, তাহার পিতার চোখেও ছিল বিষবৎ; কিন্তু এই বিমাতাই তাহাকে কৌশলে পিতার কোপ–দৃষ্টি হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়া, শত লান্ছনা–গঞ্জনা সহ্য করিয়া অপরিসীম স্নেহে লালন–পালন করিয়াছিল। তাই মাতার অভাব কোনদিন সে বুঝিতে পারে নাই।

কয়েকখানি বাড়ী ছাড়িয়াই রায়হানদের ঘর। প্রস্তর–সমাকুল পথিপার্শ্বে আজ যেন এই প্রথম সায়ফুনের নজরে পড়িল–বালুকাময় প্রান্তরে বাবলা জাতীয় গাছগুলিতে নবজাত শ্যামল কিশলয় কত সুন্দর! কী অপরূপ শোভা! খর্জুর বাগানের গাছে গাছে সুপক্ক খর্জুর স্তবকগুলি চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়াছে মধুর গন্ধে; এখানে– ওখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে লতানো তরমুজ গাছগুলির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে হলদে রঙের ফুলগুলি কত মনোহর! মধুলোভী মৌমাছিরা সেই সব ফুলের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের একটা অনুগ্র মধুর গন্ধ বায়ুভরে ভাসিয়া তাহার মনপ্রাণ মোহিত করিল।

সায়ফুন রায়হানের বাড়ীতে ঢুকিয়াই অনাবশ্যক জোরে "ভাবী! ভাবী!" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। উদ্দেশ্য–ডাক শুনিয়া হয়ত রায়হান বাড়ীর বাহির হইয়া আসিবে, কিন্তু চারিদিকে বারবার তাকাইয়াও তাঁহারে কোন সন্ধান করিতে পারিল না।

আরফানের স্ত্রী হালিমা ঘরে রান্নার যোগাড় দেখিতেছিল। ডাকাডাকিতে সে দুয়ারে আসিয়া বলিল, "কে গা! সায়ফুন না? কি মনে করে বহিন, এই অসময়ে?"

সায়ফুন বলিল, "তোমায় একবার দেখতে এলাম, ভাবী!"

হালিমা হাসিয়া বলিল, "আমাকে দেখতে এসেছিস্ এই অবেলায়–এই বুঝি তোর মনের কথা? আমাকে দেখ্‌বি ত এদিক–ওদিক কি খুঁজছিলি, হতভাগি? আমি বুঝি বাড়ীর বাইরে বাইরে আনাচে–কানাচেই থাকি?"

"তোমার পাঁঠীটা কোথায় দেখ্‌ছিলাম ভাবী। হাঁ ভাবী, ছাগীটা কি বাচ্চা দিয়েছে?"

"ছাগী আবার কিনলাম কবে যে বাচ্চা দেবে? পাঁঠী ত খুঁজিস নি, খুঁজছিলি সেই পাঁঠাটাকে?"

"কি বলছ ভাবী? পাঁঠাও কিনেছ নাকি?"

"যা! পাঁঠা আবার মানুষে পোষে! বিটকেল গন্ধ। তার চেয়ে পাখী পোষা ভাল।"

"কি পাখী কিনেছ ভাবী? দেখাও না?"

"আমার কি আর পাখী পোষার বয়েস আছে বোন?" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "পুষেছিলাম বটে একটা বাচ্চা থেকে। তা-ও তা খাঁচা ভেঙ্গে পালিয়েছে। কোন আশা নেই বহিন! চিড়িয়া উড় গিয়া!" হালিমা একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে তুড়ি মারিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

সায়ফুন হালিমার হাত ধরিয়া বলিল, "কি বলছো ভাবী? কিছুই ত বুঝতে পারছিনে! কী উড়েছে?"

"খুব বুঝেছিস্-কচি খুকি আর কি! তোর সেই পরাণ-পাখী! আহা! হতভাগ্য রায়হান! বেচারীকে তার ভাই যা *ঠেঙ্গানি ঠেঙ্গিয়েছে*! সারাদিন ত না খেয়েই আছে, বের হয়েছে সেই সকালে।" এক অব্যক্ত বেদনায় হালিমার হৃদয়তল যেন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ সায়ফুনের প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখাইয়া দিল। হালিমার হাত ধরিয়া সে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবী! কেন তাকে মেরেছে? কী অপরাধে?"

হালিমা গম্ভীরভাবে বলিল "সে ডুবেছে, তুইও যেন সঙ্গে সঙ্গে ডুবিস নে, সায়ফুন! সে পাগল হয়েছে, তুইও যেন সঙ্গে সঙ্গে পাগল হস্‌নে! পাগল না হলে কেউ কখনও আপন ধর্ম ত্যাগ করতে পারে? শুনেছি স্বধর্ম ত্যাগ করে সে নাকি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে; আপন বংশগৌরবে, আপন কুলমর্যাদায় কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিয়েছে। তাকে শাসন করবে না ত কি করবে? কোলে করে নাচবে?"

সায়ফুন। ভাবী! সে যদি সত্যকে চিনে থাকে, ইসলামকে সত্য বলে জেনে থাকে, তাতে তোমার আমার ক্রুদ্ধ হবার কি আছে? ধর্ম মানুষের প্রাণের জিনিস।

জোর করে কেউ কখনো কোন ধর্মে কি বিশ্বাস জন্মাতে পারে? তোমার ধর্মে তার কোন আস্থা যদি না-ই থাকে, তবে শাসন করে সে-আস্থা কি জন্মাতে পার? অন্তরের ভক্তি দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, ধর্মকে যদি বিশ্বাস করতে না পারি, তবে সে-ধর্ম আমার ধর্মই নয়।

হালিমা। সায়ফুন! জানি রায়হানকে তুই ভালবাসিস। নারীর প্রাণ নিয়ে সে ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে পারিনে; কিন্তু এত অন্ধ হস্‌নে। শুধু রায়হান ও গুটিকতক মুসলমান সত্যের সন্ধান পেয়েছে আর আরবের লক্ষ লক্ষ নর-নারী মিথ্যার আশ্রয়ে রয়েছে তা'কি কখনো হয় নাকি? স্বধর্মকে এমনিভাবে ভ্রূকুটি করা ভাল নয় জানিস! আগুন নিয়ে খেলা করা সাজে না।

"ভাবী! আমি রায়হানের মুখে ইসলাম ধর্মের অনেক কথাই শুনেছি। তুমি যদি আলোককে অন্ধকার বল, অন্ধকারকেই আলোক বলে মেনে নাও; দিনকে রাত্রি বল, আর রাত্রিকে দিন বল-তবে ত বুঝাতে পারবো না। চোখ থাকতেও যদি দেখতে না চাও, তবে কি দেখাতে পারবো? বলতে পার, কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মাতার দুঃখের কেন অবধি থাকে না? বলতে পার, পরস্ত্রী অপহরণ করলে, নারীর সতীত্ব নষ্ট করলে, পরকে উৎপীড়ন আর বিশ্বাস ভঙ্গ করলে, অনাথ-অসহায়ের সর্বনাশ ঘটালে, মদ্যপান করে হিংস্র হয়ে উঠলে, কোন দেবতা সন্তুষ্ট হন? যে দেবতা এবংবিধ গর্হিত কর্মের পৃষ্ঠপোষক, সে-দেবতা দেবতা নয়-দানব! সে-দেবতার প্রস্তর-মূর্তিকে পুতুল সাজিয়ে খেলা করা চলে, ভক্তি করা যায় না।" এই বলিয়া সায়ফুন ত্রস্তপদে বাটীর বাহির হইয়া আসিল।

হালিমা বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিল, "মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছিস্‌, তবু মুখে বিষ-ভাণ্ড। কপালে দুঃখ আছে।"

খুঁজিতে খুঁজিতে সায়ফুন রায়হানকে পরে আবিষ্কার করিল কিয়দ্দূরে এক খর্জুর বাগানে। দেখিল-অদূরে এক কৃষ্ণ পাহাড়ের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কি যেন তিনি একমনে ভাবিতেছেন। চারিদিকে নিশার অন্ধকার যেন ঘনাইয়া আসিতেছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

সায়ফুন ধীর-পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে রায়হানের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবোন্মত্ত রায়হান তাহার আগমন বার্তা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। যুবতী আস্তে আস্তে পুষ্প-দলসদৃশ কোমল করতল দ্বারা রায়হানের চক্ষুদ্বয় চাপিয়া

ধরিলে, রায়হান চমকিত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, পশ্চাতে তাকাইয়া দেখেন—সায়ফুন। সায়ফুনকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন—তাঁহার চোখে-মুখে অগাধ বিস্ময়! সায়ফুন চাহিয়া দেখিল, রায়হানের মুখে হাসি, চোখে পানি-যেন আকাশে বৃষ্টিধারার মাঝে প্রখর সূর্য অকস্মাৎ ঝলমল করিয়া উঁকি মারিয়াছে।

সায়ফুন রায়হানের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল, "কি ভাবৃছ অত? সারাদিন নাকি খাওয়া হয়নি কিছুই?"

"তুমি জানলে কি করে প্রিয়তমে?"

"ভাবীর মুখে। তোমারই খোঁজে গিয়েছিলাম যে!"

"তবে ত শুনেছ সবই সায়ফুন!"

"হাঁ, শুনেছি বই কি! এ দুঃখ ত তোমার একার নয়-যারা সত্যের সন্ধানী, তাদের সবারই। অন্যায়-অবিচারের দেশে মিথ্যাই সত্য হয়ে উঠে, আর সত্যের জ্যোতি ম্লান করে দেয়। সারাদিন ত তোমার প্রতীক্ষায়ই ছিলাম; কিন্তু একটিবারও ত স্মরণ করলে না? কী অপরাধ করেছি বল ত? রাগ করেছ?"

"সায়ফুন! তোমাকে যে প্রাণাধিক ভালবাসি—সে কথা কি জান না? তোমার সঙ্গে কি রাগ করা চলে, না তোমাকে ভোলা যায়? তুমি যে আমার সারা অন্তর জুড়ে রয়েছ সায়ফুন!"

"দেখেছি তোমার ভালবাসা, চোখের আড় হ'লে কিছুই মনে থাকে না। আমাকে ত বিশ্বাসই কর না। কাল সন্ধ্যায় সেই পাহাড়ে কেন গিয়েছিলে—সে কথা কি বলেছিলে?"

"ওহ সেই কথা! আজ বলছি শোন! সায়ফুন! যে কাহিনী শোনার জন্য মোটেই তুমি প্রস্তুত নও, সে কথাই বলবো। কিন্তু ভয় হয়-হয়ত ঘৃণার হাসি, বিদ্রূপের চাহনি, তোমার চোখে-মুখেও ফুটে উঠবে।"

"রায়হান! তুমি কি জান না, আমি কোনদিন তোমাকে অবিশ্বাস করিনে। তুমি কিছু অন্যায় করবে-তা' ত আমি ভাবতেও পারিনে!"

"জানি সবই! তবু ভয় হয় কেবলই। বেশ শোন! সেই পাহাড়ে এক ধর্মপ্রাণ নও-মুসলমান বাস করেন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, বেচারা

গৃহত্যাগ করে, পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। আমি প্রায়ই তাঁহার কাছে বসে ধর্মোপদেশ শুনি। বড় ভাল মানুষ তিনি। মাঝে মাঝে তাঁকে দিয়ে আসি কিছু খাবার আর পানি, গোপনে তাঁর পরিবারবর্গের খবরও পৌছিয়ে দেই। তুমি যে-খাদ্য কাল আমাকে দিয়েছিলেন সেগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁরই জন্যে। কাল তাঁরই উপদেশে পবিত্র দীন-ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছি।"

সায়ফুন আনন্দে লাফাইয়া বলিল, "তুমি এ-সংবাদ আমার নিকট গোপন করেছ! আমাকে কি অবিশ্বাস কর?"

"না সায়ফুন, তোমাকে অবিশ্বাস করলে জগতে আর বিশ্বাস করবো কাকে? ভয় ছিল-এ সংবাদ না-জানি তুমি কিভাবে গ্রহণ করবে, না-জানি তোমার অন্তর নৈরাশ্যেই বা ভরে উঠে।"

"যে-ধর্ম তুমি সত্য বলে জেনেছ, সত্য বলে গ্রহণ করেছ, তা' আমার অন্তরে সাড়া দেবে না ভেবেছ? মিছেই কি তোমার নিকট এত সব ধর্ম-কথা শুনেছি? কে সেই ধার্মিক পুরুষ?"

"ঐ যে সম্মুখে বাড়ীখানি দেখছ না, তারই মালিক-আবূ আক্কাস। সায়ফুন! সত্যি কি তুমি ইসলামে বিশ্বাস কর?"

"যা সত্য, যা চিরন্তন, তা' বিশ্বাস করি না বললে সত্যের অপলাপ হয়। যে ধর্ম মানুষকে আদর্শ চরিত্রবান করে গড়ে, পাপের পথ থেকে দূরে রাখে, পুণ্যাশ্রিত করে, সে-ধর্ম নিশ্চয়ই সত্য ধর্ম। আমিও সেই পূণ্যাত্মার খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করবো। আমাকে কি নিয়ে যাবে তাঁর কাছে?"

অনাবিল আনন্দে রায়হানের অন্তর ভরিয়া উঠিল। অধীর কণ্ঠে তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন-মারহাবা! মারহাবা!!" পরক্ষণেই তিনি চারিদিকে চাহিয়া সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু সেই স্থানে তোমার যাওয়া ত সম্ভব নয়, সায়ফুন! সে হিংস্র পশুর আবাসভূমিতে, প্রস্তরময় পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করা মোটেই নিরাপদ নয়। সংসারে যাদের অবলম্বন নেই, আশ্রয় নেই, স্নেহ-মমতার কোন দাবী নেই, তারাই সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে, অন্ধকার গুহায় আত্মগোপন করে, আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে; আপন ধর্ম-বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে শত্রুর শ্যেন দৃষ্টির বাইরে কোনক্রমে দিন কাটায়। সেই স্থান পুরুষের পক্ষেই সুগম নয়, আর তুমি ত স্ত্রীলোক! কুরাইশেরা সেদিকে কাউকে চলাফেরা করতে দেখলে সন্দেহের চোখে দেখে, অনুসরণ করে। আমাকে যেতে হয় খুব সাবধানে!"

"তবে উপায়! আমার কানে কি তাঁর ধর্মের বাণী পৌছবে না?"

রায়হান কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, "এক কাজ করা যায়! আজ রাত্রেই সেই সাধক পুরুষ নিজ গৃহে ফিরে আসবেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্রাদি তাঁর অদর্শনে বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। সে-সময় দেখা করা সম্ভব। কিন্তু নিশাকালে তুমি কি বাড়ীর বার হয়ে আসতে পারবে?"

"বোধ হয় পারবো। যত ভয় ভাবী যোহরাকে। সর্বক্ষণ সে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে। তার ভ্রাতা রাহেলের সঙ্গে এই অভাগিনীর বিয়ে দিতে সে উঠে পড়ে লেগেছে। নারী হয়ে নারীর এমন সর্বনাশ যে কিভাবে করতে চায়, বুঝতে পারিনে। তোমার সঙ্গে আমার হৃদ্যতার কাহিনী ভাবীর অজানা নেই, কিন্তু সব কিছু জেনে শুনেও রাহেলের কথায় সে ভুলেছে; ভাই ওৎবাকেও দলে ভিড়িয়েছে। ওগো! চল, আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই কোথাও-যেখানে অবিচার নেই, নিষ্ঠুরতা নেই, বিরহ নেই, প্রণয়-পথে কোন কন্টক নেই।"

"সায়ফুন! সে-দেশ এখনও জন্মায়নি। যেখানেই যাই না কেন, সেখানেই আমাদের আত্মীয়-স্বজন আমাদের শান্তির পথে বিঘ্ন ঘটাবে। বেশ আজ রাত্রেই আবু আক্কাসের সঙ্গে পরামর্শ করে যথাকর্তব্য স্থির করবো। তুমি আসবে?"

"যেতে হবে কোথায়? বল, আমি প্রস্তুত থাকবো।"

"তোমাদের বাড়ীর বাইরে উত্তর দিকের সেই খর্জুর বৃক্ষমূলে মধ্যরাতে তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবো। বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পাখীগুলি যখন আর্তনাদ করে ছপাৎ ছপাৎ পাখা মেলে উড়তে থাকবে, তখন যেন বের হয়ে এসো। এখন ঘরে যাও। আমাকে একটু যেতে হবে সেই পাহাড়ে।" এই বলিয়া রায়হান গাত্রোত্থান করিলেন।

সায়ফুন রায়হানের হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, "সারাদিন ত কিছুই খাওনি, কিঞ্চিত অপেক্ষা কর; আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্য কিছু আহার্য নিয়ে আসি।"

রায়হান অনুরাগভরে সায়ফুনের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সায়ফুন! এখনও আমি ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইনি। বিলম্ব করলে পাহাড় থেকে ফিরতে রাত হবে অনেক। বুঝতেই পারছো শ্বাপদসঙ্কুল পাহাড়ে রাত্রে কত ভয়! আমাকে এখনই যেতে হবে।"

"কিন্তু এই রাত্তিরে একাকী যাবে কি করে সে পাথরের রাজ্যে? যদি একান্তই যেতে হয়, আমাকেও নিয়ে চল সঙ্গে।"

"ভয় কি, সায়ফুন! আল্লাহ্র অনুগ্রহে নিরাপদেই ফিরে আসবো। তুমি বাড়ী যাও। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমার খোজাখুঁজি পড়ে গেছে। রাত্তিরে দেখা হবে যথাস্থানে।" এই বলিয়া রায়হান সোজা উত্তর দিকে দ্রুতপদে যাত্রা করিলেন।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়া সায়ফুন কিয়ৎক্ষণ সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল চিত্রাপিতের মত। তারপর ধীর পদক্ষেপে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে এই একটু আগে। গ্রামে ফেরার পথে আবছা অন্ধকার ঘনায়মান। দূরে সেই পাহাড়ের বুকে দণ্ডায়মান অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট আবড়া-থাবড়া উচ্চ প্রস্তরগুলি একটু পরেই ঘনান্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। রাস্তায় লোক চলাচল আর নাই। সায়ফুনের ভয় হইল-তাহার পিতা হয়তো হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন! আজ কপালে কি যে ঘটিবে! পিতার ভয়ে, মাতার ভয়ে, সে প্রতিবেশীদের দৃষ্টির আড়ালে, পল্লীর আনাচ-কানাচ ঘুরিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পথ চলিতে লাগিল।

তিন

বহির্বাটির নিকটে আসিতেই সায়ফুন অবাক হয়ে দেখিল রাহেল তাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র সায়ফুনের সর্বাঙ্গে এক তড়িৎপ্রবাহ যেন ছুটিয়া গেল। হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িলেও বোধ হয় ভয়ে সে এতটা আড়ষ্ট হইত না। ঘৃণায়, ক্ষোভে, দুঃখে তাহার আপাদমস্তক যেন জ্বলিতে লাগিল।

রাহেলের বাড়ী একই গ্রামে।

বাড়ীতে ঢুকিবার আর অন্য পথ নাই। অগত্যা সায়ফুন রাহেলের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য পথিপার্শ্বে এক বৃক্ষের আড়ালে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু তথাপি তাহার শ্যেন দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না রাহেল। তাহার সন্ধানই করিতেছিল; ভগ্নী যোহরার সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা সারিয়া বাড়ী ফিরিবার কালে এক নজর সায়ফুনকে দেখিবার আশায় চারিদিকে সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল; কিন্তু বড় হতাশ হইয়াছিল কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া। এমন সময় ভাগ্যচক্রে বাড়ীর বাহিরে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

রাহেল চুপি চুপি লুক্কায়িত সায়ফুনের নিকট আসিয়া স্মিত মুখে বলিল, "খুব যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান হচ্ছে সুন্দরী! রায়হানের বাড়ী থেকে আসা হয়েছে বুঝি? হুঁঃ হুঁঃ!"—পরক্ষণেই তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। দৃঢ়স্বরে বলিল, "কেন, সে ছোক্রা আমার চেয়ে কিসে উত্তম বলতে পার? বাগে পেলে একবার দেখে নেব না! ছোকরার নিকাহ্‌র সাধ চিরতরে যদি মেটাতে না পারি তবে আমি রাহেলই নই! শুনেছি, হতভাগা ইসলাম গ্রহণ করেছে! আস্পর্ধা দেখ না! স্বধর্ম ত্যাগ করে আবার আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা! হঠকারিতার একটা সীমা আছে!"

পুনরায় হাসিমুখে সে বলিল, "আচ্ছা প্রিয়তমে! তুমি আমার প্রতি এত বিরূপ কেন বল ত? কি আমার অপরাধ শুনি? হাঁ, বলতে পার বটে আমার আরও স্ত্রী

বর্তমান; কিন্তু দেখাতে পার কোন মরদের ঘরে একাধিক বিবি বর্তমান নেই। আমি যে তোমায় প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসি সায়ফুন।"–এই বলিয়া রাহেল হাসিতে হাসিতে সায়ফুনের দিকে অগ্রসর হইত লাগিল।

ভয়ে, ক্রোধে ও ঘৃণায় সায়ফুনের মুখমণ্ডল পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আস্তে আস্তে পশ্চাতে সরিতে সরিতে সে বলিল, "পাষণ্ড! তিন–তিনটা স্ত্রী ঘরে থাকতেও শাদীর সাধ মিটলো না! লজ্জা করে না! মরণ হয় না! মাথায় কেন বাজ পড়ে না! —এই বলিয়া সে এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

রাহেল একেবারে হতভম্ব। সায়ফুনের অভিসম্পাতগুলি তাহার অন্তরে শেলের ন্যায় বিধিয়াছিল। এক নগণ্য নারী মুখের উপর এতসব দুর্বাক্য উচ্চারণ করিবে– ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। আহত ভুজঙ্গের ন্যায় রাগে ফুলিতে ফুলিতে সায়ফুনের পিছনে পিছনে সে পুনরায় অন্দরবাটীতে প্রবেশ করিল; তারপর ভগ্নী যোহরার নিকটে সায়ফুনের উপেক্ষা ও রূঢ় ব্যবহারের কথা বর্ণনা করিয়া আবার বিবাহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত ভ্রাতা–ভগিনীতে কথাবার্তা চলিল; অনেক আলাপ, অনেক আলোচনাই হইল। সে আলোচনার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রথমে রাহেলের কথা কিছু বলা প্রয়োজনঃ

রাহেল দুশ্চরিত্র যুবক–বয়স ত্রিশের কোঠা ছাড়াইয়াছে বহুদিন। তিন বিবি বর্তমান থাকিতেও তাহার রূপ–পিপাসা অদম্য। স্ত্রী ছাড়া অবৈধ প্রণয়ের সঙ্গিনীও সে জুটাইয়াছে গোটা কতক; কিন্তু তবুও রূপ–লিপ্সার যে নিবৃত্তি নাই। ইদানীং সায়ফুনকে দেখিয়া সে মজিয়াছে, সায়ফুনের ইন্দুবিনিন্দিত রূপশিখা তাহার অন্তরের লালসাগ্নি তীব্রভাবে জ্বালাইয়া দিয়াছে।

যোহরা ভ্রাতা রাহেলকে বলিল, "কিচ্ছু ভেবো না ভাইজান! নারীকে বাগ মানাতে কতক্ষণ। পিঞ্জরে আবদ্ধ জঙ্গলের বাঘিনীও পোষ মানে– আর এ–ত মানুষ! শুধু একটু আদর–সোহাগ করো, দু'দিনেই দেখো রায়হানকে ভুলে তোমার বশ হবে।

উত্তেজিত রাহেল চিৎকার করিয়া উঠিল, "রায়হান আমার পথের কাঁটা। দুনিয়ার বুক থেকে তার নাম মুছে ফেলে আমাদের মিলনের পথ সুগম করবো! এত বড় দুঃসাহস! আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ!"

যোহরা আঁতকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি সব বকছো ভাইজান! অত অস্থির হয়ো না, ধৈর্য ধর, নিশ্চয়ই তোমার আশা পূরণ হবে। আমার শওহরকে বলে-কয়ে রাজী আমি করাবই। এখন তাকে ডেকে আনছি।" –এই বলিয়া যোহরা ওৎবাকে ডাকিতে গৃহান্তরে ছুটিল।

ভগ্নীর সঙ্গে ওৎবা গৃহে ঢুকিতেই ক্ষিপ্তপ্রায় রাহেল চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওৎবা! শুনছ, সেই রায়হানের কীর্তি? শুনছ সে দ্বীন-ই-ইসলাম কবুল করেছে? ধর্মদ্রোহীর নিকট ভগিনীকে নিকাহ্ দিবার ইচ্ছা এখনও কি হৃদয়ে পোষণ কর? বিদ্রোহের আগুনে সব কিছু জ্বলে-পুড়ে ছারখার হবে, রক্তস্রোতে দেশের মাটি ভেসে যাবে-এত সব কি ভেবে দেখেছ?"

ওৎবা রাহেলের পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ শুনেছি রায়হান ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু চাক্ষুস তার কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করি নি, তার মুখ থেকে কোন কিছু শুনিও নি। আহা! বড় ভাল ছেলে ছিল! সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম, সায়ফুনকে তার হাতেই সমর্পণ করবো; কিন্তু কেন যে তার দুর্মতি হল কিছুই বুঝা গেল না। বিদ্রোহীর শাস্তি অনিবার্য। সমাজের কঠোর শাসন-ব্যবস্থার আওতা ভেঙে, কে তাকে রক্ষা করবে?

যে গৃহে কথোপকথন চলিতেছিল, তাহারই পশ্চাতে অন্ধকারে দণ্ডায়মান সায়ফুনের সর্বাঙ্গে তখন পবন-সঞ্চালিত বেতসীর ন্যায় কাঁপিতেছিল। রায়হানের বিপজ্জনক ভবিষ্যৎ ও নিজের দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া তাহার ভয়াতুর দেহ প্রায় যেন অবশ হইয়া ভূপাতিত হইবার উপক্রম। এমন সময় সেই বৃক্ষচূড়ায় অনেকগুলি পাখী একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উড়িতে লাগিল। সায়ফুনের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে শুরু করিয়াছে। সে বুঝিল-রায়হান আসিয়াছে, আসিয়াই বৃক্ষশাখায় ঢিল ছুড়িয়াছে। অবিলম্বে সে সেইদিকে ছুটিল।

অন্তরের চাঞ্চল্য ও ত্রস্ততাবশত সায়ফুন গৃহের পশ্চাতে একটা কর্তিত খর্জুর বৃক্ষের গোড়ায় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্তস্থিত কি একটা পুঁটুলি অদূরে ছিটকাইয়া পড়িল ভূমিতলে। সায়ফুন গাঁটরিটা হাতড়াইয়া লইয়া আবার দ্রুতপদে দৌড়াইতে লাগিল। অন্ধকারে তাহার দুই চক্ষু যেন ভরিয়া গিয়াছে, পথ চলাই দুষ্কর।

নিকটে ঘরের বাহিরে কি একটা জিনিসের পতনধ্বনি শুনিয়া যোহরা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, একটা ধাবমান কাল ছায়া প্রান্তরে ঘনান্ধকারে কোথায় যেন দ্রুত মিলাইয়া যাইতেছে। কৌতূহল পরবশা নারী কিছুটা দূরে দূরে থাকিয়া সেই ছায়া-মূর্তির অনুসরণ করিতে লাগিল।

সায়ফুন বৃক্ষতলে আসিয়া দেখিল, রায়হান দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভয়ার্তা অভিসারিকা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া রায়হানকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার অন্তরের স্পন্দন ক্রমেই যেন দ্রুততর হইয়া বক্ষপিঞ্জর বিদীর্ণ করিবার উপক্রম। কিয়ৎক্ষণ তাহার বাক্যনিঃসরণ হইল না।

প্রিয়তমার স্পর্শ-শিহরণ রায়হানের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এক অনির্বচনীয় পুলকাবেগ তাঁহার বিমুগ্ধ অন্তরে উদ্দাম তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইল।

রায়হান সায়ফুনের দেহ-বল্লরি সযত্নে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "সায়ফুন, ভয় পেয়েছ?"

সায়ফুন কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "নিশীথে কোন অভিসারিকা ভয় না পায় বল? কিন্তু আমার সে ভয় নয়; আমি যে কি ভয় পেয়েছি তা' বলার ভাষা আমার নেই। হায়! নিজ কানে আজ কি কথাই না শুনেছি! আচ্ছা আগে কিছু আহার কর। সারাদিন তো খাও নি কিছুই! পরে বলবোখন সব কথাই।" —এই বলিয়া সায়ফুন বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পুঁটুলিটা বাহির করিয়া রায়হানের হাতে তুলিয়া দিল।

সায়ফুনের অন্তরের দরদ রায়হানকে অভিভূত করিল। অবাক হইয়া তিনি ভাবিলেন –নারী সত্যই বিধাতার এক শ্রেষ্ঠ দান। নারীর অন্তর স্বর্গীয় সুষমায় মহিমময়! বলিলেন, "সায়ফুন! তোমার প্রশংসা গেয়ে শেষ করতে পারবো না। শুধু এই ভেবে অন্তরে গর্ব অনুভব করছি-তোমার ন্যায় নারীরত্নের ভালবাসা লাভ করে জীবন ধন্য হয়েছে। আমি ক্ষুধার্ত বটে, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় এখনও কাতর হই নি। ক্ষুৎ-পিপাসার এক কাতরতার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবে চল। দেখবে চল– অভিজাত বংশীয় কুরাইশদের নির্মমতার চূড়ান্ত। আবূ আক্কাস মুসলমান হয়েছেন-শুধূ এই অপরাধে কুরাইশগণ দলপতি আবু সুফিয়ানের আদেশে, তাঁর সন্তানদেরও এক মুঠা আহার্য বিক্রয় করে না। এই সেদিন আবূ আক্কাসের স্ত্রী ঝর্ণায় পানি আনতে গিয়েছিল, কুরাইশ মহিলারা সকলে মিলে তার মশক কেড়ে

নিয়ে তাকে নানাভাবে অপমান করে তাড়িয়েছিল। তুমি আমার জন্য আহার্য এনেছ? বড় ভাল হয়েছে। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন! ছেলে-মেয়েগুলির আপাতত প্রাণরক্ষা হবে। চল সায়ফুন-তাড়াতাড়ি চল। এই রাত্রেই আবূ আক্কাসকে আবার যে ফিরে যেতে হবে সেই পাহাড়ে, নতুবা প্রভাতে শত্রু হস্তে তাঁর প্রাণ সংশয় হতে পারে।"

রায়হান সায়ফুনকে লইয়া আবূ আক্কাসের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সায়ফুনের অন্তর বিষাদে ভরিয়া উঠিয়াছে, মুখে ভাষা নাই। তাহার মনে মনে ইহাই শুধু ব্যঞ্জনা-কেন এমন হয়? কেন মানুষ মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে? কেন স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চায় মানুষ মানুষকে বাধা দেয়? আর যারা ধর্মবিশ্বাস আঁকড়ে ধরে নীরবে সকল অত্যাচার, সকল উৎপীড়ন সহ্য করে দিন কাটায়, নির্বিকারচিত্তে স্ত্রী-পুত্রাদির অনাহার-ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি, কাতর চাহনি নীরবে সহ্য করে তারা মানুষ না ফেরেশতা! রাজ্যের দুশ্চিন্তা সায়ফুনের মস্তকে আসিয়া ভিড় করিল।

পশ্চাতে বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া যোহরা সায়ফুন ও রায়হানের মিলন-দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছিল; উভয়ের কথোপকথন, উভয়ের অনুরাগ, ক্ষণিকের জন্য তাহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিল। প্রেমিক-প্রেমিকার পুণ্য-মিলনের যে অনাবিল ছবি বৃক্ষতলে তাহার নয়নগোচর হইল সে মধুর দৃশ্য জীবনে আর কখনও সে দেখে নাই। নিজের জীবনের অতীত ঘটনাবলী ক্ষণে ক্ষণে তাহার মানসপটে জাগিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও এহেন মনোরম দৃশ্যের সন্ধান সে পাইল না। বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া যোহরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু সে অধিকক্ষণ নহে, পর মুহূর্তেই তাহার অন্তরের পৈশাচিক বৃত্তিগুলি আবার প্রবল হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্রপদে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

যোহরা গৃহে ঢুকিতেই রাহেল উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "সব ঠিক হয়ে গেছে, যোহরা! ভাই ওৎবাও সম্মত হয়েছেন।"

যোহরা জিজ্ঞাসু নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল।

ওৎবা বলিল, "হ্যাঁ, সায়ফুনের বিয়ে রাহেলের সঙ্গেই দেব ঠিক করেছি। হোক না রায়হান বীর যোদ্ধা, হোক সে চরিত্রবান; কিন্তু সে যে ধর্মদ্রোহী! ধর্মত্যাগীর সঙ্গে বিয়ের কোন কথাই উঠতে পারে না। পরন্তু বিদ্রোহের সমুচিত শাস্তি তাকে যে পেতেই হবে।"

যোহরা ক্রোধভরে গম্ভীর স্বরে বলিল, "আগে ত বোনকে রায়হানের হাত থেকে উদ্ধার কর সাহেব, নইলে বিয়ে দেবে কাকে শুনি? সায়ফুন এখনো তোমার বাড়ীতে কনে সেজে বসে রয়েছে কিনা! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি- রায়হান সায়ফুনকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল আক্কাসের বাড়ীর দিকে। যাও, পুরুষ হও ত আগে তাকে নিয়ে এস উদ্ধার করে! রাহেল ভাই! শিকার বুঝি হাত-ছাড়াই হয়ে গেল! বুঝলে না, কি চিজ যে হারালে!"

তপ্ত কটাহে যেন তৈলের ছিটা পড়িল। ওৎবা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিল, "কী, এত বড় আস্পর্ধা! কুরাইশ-বংশীয় শোহেলী কন্যাকে অপহরণ। এত বড় দুঃসাহস।" এই ঔদ্ধত্যের ফল এখনই সে পাবে। আমি স্বহস্তে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে সমুচিত শাস্তি দেব! প্রস্তুত হও রাহেল।"

অবিলম্বে উভয়ে তরবারি হস্তে আক্কাসের গৃহাভিমুখে ছুটিল। যোহরা খবরটা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে বাড়ীতে বেশ ফলাও করিয়া ছড়াইয়া দিয়া পাড়ার যুবকদের খবর দিতে ছুটিল।

০ ০ ০

অল্পকাল মধ্যেই ওৎবা রাহেলকে লইয়া নিঃশব্দে আক্কাসের বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। জীর্ণ কুটিরদ্বারে দাঁড়াইয়া উভয়ে দেখে-ভিতরে গুটিকতক ছেলেমেয়ে কতকগুলি রুটি কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছে, নিকটে আবূ আক্কাস উপবিষ্ট। সম্মুখে রায়হান ও সায়ফুন বসিয়া আবূ আক্কাসের কথাগুলি নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতেছে। উভয়ে মনঃসংযোগ করিয়া শুনিল-আবূ আক্কাস মহোৎসাহে একমনে আল্লাহ্ ও রসূলের মহিমা কীর্তন করিতেছেন। ব্যাপার দেখিয়া নিদারুণ ক্রোধে ওৎবা ও রাহেলের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া, আবূ আক্কাসই প্রথমে চমকিত হইয়া চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ শত্রু দেখিয়া এক লম্ফে তিনি খর্জুরপত্র রচিত ঘরের দেওয়ালে লম্বমান একটা তরবারি হাতে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পর মুহূর্তেই ওৎবা গর্জন করিয়া উঠিল, "নিমকহারাম রায়হান!! একে ধর্মত্যাগ, তার উপর আমার ভগ্নীকে অপহরণ। শোহেলী বংশে কলঙ্ক। এত বড় আস্পর্ধা! বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরার দুরাশা! তোর দুরাকাঙ্ক্ষা আজ মেটাব। অপমানের প্রতিশোধ হাতে হাতে নেব। আবূ আক্কাস! তোরও আজ নিস্তার নেই। নিজে ডুবেছিস্,

অপরকে ডুবাতে চাস্। পূর্বপুরুষের প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করার পুরষ্কার আজ হাতে হাতে পাবি।"

রাহেলও তরবারি উদ্যত করিয়া হাঁকিল, "কুলত্যাগী শয়তান! আজ কুরাইশ-কন্যা অপহরণের মজা বুঝাব।!"

সায়ফুন এক লম্ফে ঘরের বাহির হইয়া ভ্রাতার পদতলে লুটাইয়া বলিল "ভাইজান! রায়হান নির্দোষ! আমিই তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় এসেছি, শাস্তি দিতে হয় আমাকেই দাও।"

ওৎবার চক্ষুদ্বয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন নির্গত হইতে লাগিল। পদাঘাতে সায়ফুনকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া সে গর্জন করিয়া উঠিল, "ব্যভিচারিণী কূলকলঙ্কিনী! শাস্তি তোর কপালেও আছে! বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীর সঙ্গে প্রণয়! নিশাকালে পলায়ন!"

রায়হান আবূ আক্কাসের হাত হইতে তরবারি টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ভাই আবূ আককাস! আপনি অনাহারে ও কৃচ্ছ্র সাধনায় দুর্বল, বিশেষত আপনার স্ত্রী-পুত্রাদি বিদ্যমান, আপনি শীঘ্র পলায়ন করুন।" এই বলিয়া রায়হান অগ্রসর হইয়া আবূ আক্কাসকে পশ্চাতে ঠেলিলেন। আবূ আক্কাসের স্ত্রী আছিয়া স্বামীকে তখন টানিয়া আনিয়া পশ্চাদভাগের কক্ষদ্বার পথে বাহির করিয়া দিলেন।

আবূ আক্কাসকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ওৎবা মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। তৎক্ষণাৎ রায়হান আবূ আক্কাসের সাহায্যার্থে ছুটিলে রাহেল তরবারি হস্তে রায়হানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রায়হান সে আঘাত প্রতিহত করিয়া ক্ষীপ্রবেগে আক্রমণ করিতেই রাহেল দুই পা হাঁটিয়া মিথ্যা চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওৎবা! পালাচ্ছে! রায়হান পালাচ্ছে!!"

ওৎবা রাহেলের চিৎকার শোনামাত্র আবূ আক্কাসকে ছাড়িয়া এক লম্ফে রায়হানের সম্মুখীন হইল, তারপর বিকট হুঙ্কার সহকারে আঘাত করিয়া বলিল, "বিশ্বাসঘাতক! তুইও পালাবি ভেবেছিস?" রায়হান তরবারি দ্বারা সে আঘাত প্রতিহত করিয়া বলিলেন, "রে অবিশ্বাসী পৌত্তলিক! মুসলমান কি কখনও মৃত্যুকে ভয় করে? কাপুরুষের ন্যায় মৃত্যুকে বরণ করে? ধর্মের জন্য শহীদ হওয়া তার গৌরব। আর তুমি? নির্লজ্জ কাপুরুষ! নিরস্ত্র দুর্বলকে আক্রমণ করতে ছুটে গিয়েছিলে? এই না তোমার বীরত্ব। হুঁশিয়ার ওৎবা!" এই বলিয়া রায়হান বীর হুঙ্কারে ওৎবাকে আক্রমণ করিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাহেল ওৎবার সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিয়া রায়হানকে আঘাত করিল। রায়হান তৎক্ষণাৎ এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া বিদ্যুদ্বেগে তরবারি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

ওৎবা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিল, "রে দুরাচার নিমকহারাম! ধীরত্বের মহিমা শুনবো তোর মত এক বিদ্রোহীর মুখে? এই সে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার! ধর্মত্যাগের পুরস্কার!" এই বলিয়া ওৎবা অমিতবেগে পুনর্বার আক্রমণ করিল। রায়হান আঘাতে আঘাত প্রতিরোধ করিলেন। বিপদহন্তা আল্লাহকে স্মরণ করিতে করিতে বিপুল বিক্রমে তরবারি সঞ্চালন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ঘাত-প্রতিঘাতজনিত অস্ত্রের চকমকি নৈশ গগন যেন বিদ্যুৎপ্রভায় ভরিয়া তুলিল।

অন্ধকার নিশীথিনির বুকে অসহায় রায়হানকে হত্যা করিতে রাহেল ও ওৎবা যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ-মান ক্ষিপ্ত বীরত্রয়ের শক্ত পদাঘাতে ভূমিতল কম্পমান। দেখিতে দেখিতে যোদ্ধাদের চিৎকার ও সায়ফুনের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া, চারিদিক হইতে বহু লোক ডাকাডাকি হাকাহাকি করিয়া মশাল হস্তে ছুটিয়া আসিল। এদিকে যোহরার সঙ্গেও পল্লীর কয়েকজন ক্রোধোন্মত্ত যুবক চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে।

এতক্ষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল অন্ধকারেই। এইবার মশালের উজ্জ্বল আলোকে পরিষ্কার দেখিতে পাইয়া রাহেল, পশ্চাদ্দেশ হইতে উদ্যত অসিহস্তে হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়িল রায়হানের উপর। রায়হান এক মুহূর্তে ঘুরিয়া সেই আঘাত আসিতে প্রতিহত করিতেই রাহেলের তরবারি দ্বিখণ্ডিত হইল।

ওৎবা সমাগত যুবকদের লক্ষ্য করিয়া হাঁকিল, "কে আছ? কে ও?- আবূ জান্দাল! হারমুজ! আমজাদ! এখনই এই ধর্মদ্রোহীকে বন্দী কর। ধর্মত্যাগ করে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। শীঘ্র তাকে ফাঁস ফেলে বাঁধ! পাপিষ্ঠ রায়হান! দেখবো, কে তোর রক্ষা করে এবার!" -এই বলিয়া ওৎবা পুনরায় তাঁহাকে আক্রমণ করিল বীর বিক্রমে দ্বিগুণ উৎসাহে।

রায়হান গর্জন করিয়া উঠিলেন, "অবিশ্বাসী মুনাফিক। আল্লাহ্‌র মহিমা তুই কি বুঝবি? আল্লাহ্‌ই আমাকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ দয়াময়।"- এই বলিয়া রায়হান ক্ষিপ্রগতিতে অসি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অসিতে অসিতে আঘাত লাগিয়া বিদ্যুৎতরঙ্গ যেন চমকাইতে লাগিল। অসি সংঘর্ষের ঝন্‌ঝননি, সকলের কর্ণপটাহ বুঝি বিদীর্ণ করিবে। উভয়ের চক্ষুতারকায় অগ্নিশিখা যেন

জাজ্বল্যমান। অস্ত্রের ঘাত প্রতিঘাতে যোদ্ধাদের ক্রোধাগ্নি দোযখ বিভীষিকায় যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সীমাহীন নৈরাশ্যে সায়ফুনের অন্তর বুঝি ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম। অনুশোচনা ও আত্মগ্লানির তুষানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া সে চিৎকার করিত লাগিল, "হায়! হায়! একি করলাম! কেন এলাম! কেন তার হত্যার কারণ হলাম! ভাইজান! ওগো রাহেল ভাই! রায়হান নিরপরাধ। আমিই অপরাধিনী। আমিই স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে এসেছি।"

কিন্তু দুঃখিনীর আর্তনাদ কে শুনিবে। দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে বহু লোক রুদ্র-রোষে গর্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে মর্মান্তিক দৃশ্য সায়ফুন সহ্য করিতে পারিল না। গভীর নৈরাশ্যে চিৎকার করিয়া সে ভূতলে গড়াইয়া পড়িল।

ততক্ষণে রাহেলের প্ররোচনায় পল্লী-যুবকেরা কয়েকটা ফাঁস হাতে লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে; কিন্তু রায়হানকে সকলেই ভালবাসে, তাঁহার তেজ-বীর্যও সকলেরই জানা; সেইজন্য কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না। কিন্তু রাহেল ও ওৎবা তাহাদিগকে ধর্মের নামে পুনঃ পুনঃ ক্ষেপাইয়া তুলিল, সকলকে জানাইয়া দিল-রায়হান ধর্মদ্রোহী, রায়হান মুসলমান।

চারিদিকের জনতা তখন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

ওৎবা বীরদর্পে পুনরায় আক্রমণ করিল। রায়হান এক লম্ফে পার্শ্বে হটিয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিল। সঙ্গে সঙ্গে ওৎবার অসির অগ্রভাগ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া নীচে বালিতে বিদ্ধ হইল। রায়হান আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিয়া আর একবার আঘাত করিলেন দ্বিগুণ উৎসাহে। ওৎবা সে আঘাত প্রতিহত করিতে চাহিল, পারিল না, তরবারি স্খলিত হইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। ওৎবা আহত হইল। রায়হান ইচ্ছা করিলে সেই সুযোগে ওৎবার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিতেন, কিন্তু নিরস্ত্রের দেহে আঘাত করা বীর পুরুষের ধর্ম নয় ভাবিয়া অসি সংযত করিলেন; সেই মুহূর্তে তিনি সায়ফুনকে একবার দেখিবার জন্য, চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই রাহেলের ইঙ্গিতে তিন -চারিজন উন্মত্ত যুবক একসঙ্গে ফাঁস

নিক্ষেপ করিল তাঁহার মাথার উপর। রায়হান অসি দ্বারা তাহা কাটিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই আরও কয়েকজন উত্তেজিত যুবক পশ্চাদ্দেশ হইতে আবার ফাঁস নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আটকাইয়া ফেলিল। রায়হান নিরুপায়। বিপুল পরিশ্রমে তাঁহার ঘর্মাক্ত কলেবর অবশ হইয়া উঠিতেছে, দ্রুত-স্পন্দিত অন্তর যেন ফাটিবার উপক্রম, শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তিও বুঝি অবশিষ্ট নাই। বিজয়দৃপ্ত যুবকগণ মহোল্লাসে ছুটিয়া আসিয়া রায়হানকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলিল।

এ-দৃশ্য সায়ফুনের অসহ্য, -অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ। সহস্র মণ পাথর কাহারা যেন জোরে চাপাইয়া দিয়াছে তাহার বুকের উপর। হতভাগিনীর চেতনা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম।

সকলে রায়হানকে বাঁধিয়া লইয়া বিজয়োল্লাসে হল্লা করিতে করিতে ওৎবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। তিন-চারিজন মশালধারী উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে সর্বাগ্রে চলিয়াছে। রায়হান চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন- কাল যাহারা পরম মিত্র ছিল, আজ তাহারাই পরম শত্রু; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের হাতেই নিজে আজ বন্দী। পশ্চাতে যোহরা ক্রন্দনরতা সায়ফুনকে হাত ধরিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছিল। রায়হান ঘাড় ফিরাইয়া এবার সে দৃশ্য দেখিলেন। দৃষ্টি আর ফিরিতে চাহে না। চারি চক্ষুর মিলন ঘটিল। অশ্রুধারায় উভয়ের নয়ন আপ্লুত। কাতর চাহনিতে, নয়নের নীরব ভাষায়, তাহারা বুঝি শেষ বিদায়ই গ্রহণ করিল চিরজীবনের মত।

রায়হানের পা আর চলে না। মৃত্যুভয়ে দলিত-মথিত অন্তর, বিরহ-ব্যথায় আরও যেন ভারাক্রান্ত। পুঞ্জীভূত নৈরাশ্য, তাঁহার শিথিল-অবশ দেহে, ওপারের তুহীন-হাওয়ায় মরণের বিষানো ডাক যেন শুনাইয়া গেল। দাঁড়াইয়া আর একবার তিনি সায়ফুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অশ্রুবিগলিত নয়নে আবার বিদায় মাগিলেন।

এমন সময় রাহেল পশ্চাদ্দেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া রায়হানের মস্তকে মুষ্টাঘাত করিয়া বলল, "কি দেখছিস পামর! দেখ! দেখ! নয়নভরে দেখ। একটু

পরেই তোর চোখের পাতায় যে নেমে আসবে সীমাহীন গভীর অন্ধকার; সে চোখ আর খুলবে না। চল, নিমকহারাম শয়তান।" রাহেল রায়হানকে সম্মুখের দিকে একটা ধাক্কা মারিয়া সঙ্গীদিগকে দ্রুত অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিল।

এ-দৃশ্য দেখিবামাত্র বিরহবিধুরা সায়ফুনের অন্তরে কে যেন অগ্নিময় লৌহ শলাকা এপার-ওপার বিদ্ধ করিয়া দিল। দুঃখিনীর বর্ষণশ্রান্ত নয়নপথে অকস্মাৎ নামিয়া আসিল তমিস্রা রজনীর গভীর অন্ধকার। চেতনা হারাইয়া বাত্যাহত ছিন্ন মল্লিকার ন্যায় ভূমিতলে সে লুটাইয়া পড়িল।

চার

সেই নিশীথে সমগ্র আল-জবিল মুসলিম দলনের বিজয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বন্দী রায়হানকে দেখিতে মশালহস্তে ছুটিয়া আসিয়াছে। সকলের মুখেই এক কথা- "ধর্মত্যাগীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতেই হবে। এতবড় আস্পর্ধা! পিতৃপুরুষের দেবতা লাৎ, মানাৎ, আসফ, হোবালকে উপেক্ষা। লক্ষ লক্ষ আরববাসীর প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ!" রায়হানের অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। অচিরে ধর্মত্যাগীর প্রাণ সংহার করিয়া অন্তরের জ্বালা মিটাইতে , আভিজাত্যাভিমানী ক্ষুব্ধ জনতা নানাবিধ অশ্রাব্য বিষবাক্য উদ্‌গীরণ করিতে করিতে রাহেল ও উৎবাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

সংবাদ পাইয়া রায়হানের ভ্রাতা আরফান সেখানে ছুটিয়া আসিলেন ক্রোধে গর্জন করিতে করিতে। আরফান দেখিলেন—শোহেলীর বহির্বাটীতে বন্দী রায়হানের চারিদিকে দণ্ডায়মান অসংখ্য নরনারী নানাবিধ ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছে। আরফান এক নিমেষে লোকারণ্যের বেষ্টনী ভেদ করিয়া, হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা বন্ধনাবদ্ধ রায়হানকে প্রহার করিতে করিতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'নিমকহারাম! কুলাঙ্গার! চিরদিনের জন্য ওকায়া বংশে কলঙ্ককালিমা ঢেলে দিয়ে বেঁচে আছিস এখনো। তোর ঘৃণ্য মুখ আবার আমাকে দেখতে হলো! এতবড় দুঃসাহস! আমার কুলদেবতার অপমান।"

রায়হানের মর্মভেদী আর্তনাদ মর্তের মাটি ছাড়িয়া আল্লাহ্‌র আরশ বুঝি কাঁপাইয়া তুলিল। কিন্তু হায়! পাষাণ-হৃদয় কুরাইশদের প্রাণে বিন্দুমাত্র করুণারও সঞ্চার করিল না।

রোষকষায়িত লোচনে ওৎবা জনতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া উঠিল, "এখনই পাপিষ্ঠকে হত্যা করে দেবতার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।"

হত্যাযজ্ঞে ওৎবার উত্তেজনাময় আমন্ত্রণবাণী শোনামাত্র দুই বলিষ্ঠ যুবক তরবারি হস্তে ছুটিয়া আসিল। রায়হানের অন্তরাত্মা এইবার পিঞ্জর ছাড়িয়া বাহিরে

উড়িবার উপক্রম।! উচ্চ স্বরে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি দুই নয়ন বন্ধ করিলেন।

ওৎবার পিতা পল্লী-সরদার শোহেলী যুবকদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "ক্ষান্ত হও! এত সহজে হত্যা করলে, শাস্তি বড় ক্ষণস্থায়ী হবে। শোন! শয়তানকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে নীচে নিক্ষেপ কর! নিমকহারাম হাত-পা ভেঙ্গে, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তিলে তিলে মরুক! না না, এক এক করে ছেদন কর এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; জিহ্বা কেটে খান খান কর, যেন এর আল্লাহ্র নাম আর উচ্চারণ করতে না পারে। না-না থাম থাম! কোথায় রাহেল! ওৎবা! শিবিল! আরফান! আগে বেত্রাঘাতে দূরাচারের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত কর, তারপর গর্দভ-চর্মে সেলাই করে নিক্ষেপ কর বিদ্রোহীকে অন্ধকার কারাকক্ষে! প্রভাতে প্রাচীন ধর্মে আবার সে ফিরে আসে ভাল, নতুবা নিমকহারামের দেহ তপ্ত লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করে প্রান্তরের উত্তপ্ত বালুকায় ফেলে রাখ! হতভাগ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিলে তিলে পলে পলে শুকিয়ে মরুক।"

আদেশ পাইবামাত্র একদল যুবক রায়হানকে প্রহার করিতে করিতে আধমরা করিয়া ফেলিল। আরফান সে দৃশ্য দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার রোষানল স্তিমিত হইয়া আসিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, নিজে রায়হানকে শাসন করিলে, শোহেলী খুশী হইয়া হয়তো তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন; কিন্তু তাঁহার সে আশা সফল হইল না। অগত্যা আরফান হতাশ-হৃদয়ে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যুকবগণ রায়হানের অর্ধমৃত দেহ পূতিগন্ধময় গর্দভচর্মে সেলাই করিয়া এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। হতভাগ্যের মস্তক বাহিরে, অবশিষ্ট অঙ্গ চর্মাচ্ছাদনে কুণ্ডলীকৃত। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রায়হান উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিতে লাগিলেন। সে চিৎকার-ধ্বনি অন্তঃপুরবাসিনী দুঃখিনী সায়ফুনের হৃদয়ে শেলের ন্যায় প্রবেশ করিয়া অন্তঃস্থল ফাটাইয়া চিরিয়া শতধা খণ্ডিত করিল।

সায়ফুনের বিমাতা ছাহেরা সায়ফুনকে বুকে জড়াইয়া, আদর করিয়া বলিল, "বেটি জানি, তোর মনের কথা জানি; কিন্তু তা'ত আর হবার নয়, রায়হানকে আর পাবি নে তুই; সে স্বধর্ম ত্যাগ করে তোকে যে চিরতরে হারিয়েছে! মিছেমিছি

তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি বল। সায়ফুন জানিনে কোন পাপের ফলে মেয়ে হয়ে জন্মেছিলি; মেয়ে হয়ে এমন জেদ ধরা ভাল নয় বেটি। তোর আব্বার কথার অবাধ্য হসনে, ভাইয়ের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিস নে। আমরা অবলা—আমাদের এত গুমর করা সাজে না। মেয়েদের মতামতের কোন দাম আছে নাকি? তারা পিতা-পুত্রে ঠিক করেছে—তুই কুলত্যাগিনী, তোকে আর ঘরে রাখা যায় না; রাহেলের সঙ্গেই তোকে বিয়ে দেবে, কালই দেবে। তবে মিছেমিছি তাদের রোষানল বাড়িয়ে লাভটা কি? বল্ তবে, বল্ আম্মি, তোর কোন অমত নেই তাতে?"

বিমাতার কথায় সায়ফুনের হৃদয়াবেগ শতধারে উথলিয়া উঠিল, অন্তর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইল; মুখে আর একটি কথাও বাহির হইল না; শুধু অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করিয়া অভাগিনী নিরবে বক্ষস্থল ভাসাইয়া তুলিল। বিমাতার ক্রোড়েই আশৈশব সে লালিত-পালিত, তাহাকেই আপন মাতা বলিয়া মনে করিত; কিন্তু আজ সে বুঝিল, বিমাতা বিমাতাই বটে—আজ তাহার আম্মা বাঁচিয়া থাকিলে এমন কথা কখনও মুখে আনিতে পারিতেন না।

সায়ফুনের মৌনভাব সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া ছাহেরা বহির্বাটীতে রাহেল ও পুত্র ওৎবার নিকট সংবাদ পাঠাইল—সায়ফুন অমত নয়, তোমরা শাদীর ইন্‌তেজাম কর।

* * *

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত। শোহেলীর বহির্বাটীতে রাহেল ও ওৎবা ছাড়া আর কেহই নাই। সমবেত পুরুষগণ বহুক্ষণ বন্দী রায়হানের দুর্দশা দৃশ্য উপভোগ করিয়া, কেহ পদাঘাতে, কেহ বিদ্রূপ-বাক্যে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়া, মুসলিম-নির্যাতনের নানাবিধ পরিকল্পনা ফাদিয়া, অবশেষে মহানন্দে হল্লা করিতে করিতে অদূরে পল্লী-প্রান্তে মদ্যশালায় আসিয়া সমবেত হইল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই শরাবখানায় যুবকবৃদ্ধ সকলে পুনঃ পুনঃ মদ্যপান করিয়া আনন্দোল্লাসে মত্ত হইল। নিস্তব্ধ রজনী পুনরায় মুখর হইয়া উঠিল চিৎকারে আর কোলাহলে। দেখিতে দেখিতে মদ্যশালার সম্মুখে রূপসী নর্তকীরা সুমধুর নুপুর নিক্‌কনে, নৃত্যগীতে, ছন্দ-বৈচিত্র্যে সকলকে মাতাইয়া তুলিল। রঙ্গ-রসে,

হাস্যে-লাস্যে, সুন্দরী তরুণীদের চটুল চাহনীতে, অপূর্ব নৃত্য-ভঙ্গীমায় শরাবখানায় যেন উদ্দাম আনন্দের বন্যা বহিয়াছে।

এদিকে শুধু রাহেল ও ওৎবা বন্দী রায়হানের প্রহরায় বসিয়া নানাবিধ জল্পনা-কল্পনায় মত্ত। মদ্যশালার আনন্দোল্লাস এক-একবার তাহাদের প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে। এমন সময় বাঁদী রাযিয়া আসিয়া সালাম করিয়া ওৎবাকে বলিল, "খুশ্ খবর বড় মিয়া! ছোট বিবি রাজী হয়েছেন; শাদীর ইন্তিজাম করিতে আম্মা বলে পাঠিয়েছেন।" বাঁদী মুচকি হাসিয়া রাহেলকে বলিল, "বিবি আবার অমত কখন? দুলাহ্ মিয়ার নামে ত দেখি একেবারে দেওয়ানা! হাঁ দুলাহ্ মিয়া, বাঁদীর বখ্শিশ্ দিতে যেন ভুল না হয়!"

রাহেল আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বললে রাযিয়া? সায়ফুন রাজী হয়েছে?"

ওৎবা রাহেলকে প্রায় ধমক দিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকের আবার রাজী-অরাজী কি হে? তুমি দেখছি বড় অবাক করলে! রায়হানের এত সব দুর্দশা স্বচক্ষে দেখেও কি সে বিয়েতে অমত করতে পারে?"

আনন্দাতিশয্যে রাহেল ওৎবাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ভাই ওৎবা! কি আনন্দ! চল একটু স্ফূর্তি করে আসি। ঐদিকে শরাবখানায় মদ্যভাণ্ডগুলি যে লুট হয়ে গেল! ঐ শোন! নর্তকী তারানী বুঝি গান ধরেছে। আহা! সুরের কী বাহার! কী মিষ্টি! রাযিয়া! পাওনা রইল তোর পুরস্কার। বিয়ের পর মূল্যবান ইনাম তোকে অবশ্যই দেব।" বাঁদী অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

রাহেলের কথায় ওৎবা এক একবার বন্দীশালার দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। রাহেল তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ভাবছো কি হে? বন্দী পালাবে? কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে তাকে মুক্ত করতে আসবে? একটু দাঁড়াও, বন্দীশালার দ্বারপথ বেঁধে আসি শক্ত করে। এ তল্লাটে মানুষ দূরে থাক স্বয়ং লাৎ-মানাৎও ঘেঁষবে না! তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

রাহেল দ্বারদেশের বহির্ভাগ উত্তমরূপে বাঁধিতে লাগিল। ভিতরে রায়হানের আর্তনাদ-ধ্বনি তখনও অস্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। নিদারুণ পিপাসায় হতভাগ্যের দেহাভ্যন্তর শুকাইয়া বুঝি কাঠ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পাষাণ-হৃদয় রাহেলের

বন্দীর আর্তনাদ শুনিবার অবকাশ কোথায়? সুন্দরী সায়ফুনের প্রেম-পিয়াসী রাহেল তাড়াতাড়ি দ্বার রুদ্ধ করতঃ ওৎবার হাত ধরিয়া মদ্যশালার আনন্দোৎসবে যাত্রা করিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাহেল ব্যস্তভাবে বলিল, "ভাই ওৎবা! তুমি শরাবখানায় যাও, আমি এক দৌড়ে ঘুরে আসি বাড়ী থেকে; শাদীর ইন্‌তেজাম সব ঠিক করতে বলে আসি। আর কালই শাদীর আয়োজন করি! কি বল?"

ওৎবা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেই রাহেল গৃহাভিমুখে ছুটিল।

কয়েকখানা বসতবাটী ছাড়িয়া পল্লীর পূর্বপ্রান্তে রাহেলের বাড়ী। বাড়ীতে তাহার তিন স্ত্রী, দশটি ছেলে মেয়ে, দুইটি বাঁদী ও একটি ক্রীতদাস বর্তমান; পিতামাতা বাঁচিয়া নাই। তাহার আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল নয়।

রাহেল বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখিল, চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। সকল গৃহেই আলো জ্বলিতেছে-অথচ কারো সাড়া-শব্দ নাই, বড় চুপচাপ। ছেলেমেয়েগুলি হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বহুক্ষণ; বুঝা গেল, বিবিরা ঘুমায় নাই, নহিলে আলো জ্বলিত না, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, রাহেলের সাড়া পাইয়াও কেহ বাহির হইল না।

এমন ঘটনা পূর্বে আর বড় একটা ঘটে নাই। কর্মক্লান্ত রাহেল বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, বিবিরা স্বামীর খেদমতে কে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিবে, ইহা লইয়া যেন শুরু হইত প্রতিযোগিতা; নানাভাবে, নানা উপায়ে স্বামীর মন পাইবার জন্য সর্বদা তাহারা ব্যস্ত থাকিত; কিন্তু আজ উঠানে দাঁড়াইয়া, ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি করিয়াও রাহেল কোন সাড়া পাইল না। বুঝিল, তাহার বিবাহের সংবাদ শুনিয়াই হয়তো ভার্যারা মৌন-বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। ইহা অসহ্য! ক্রোধোন্মত্ত রাহেলের মস্তকে জোরে উনপঞ্চাশ বায়ু যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ডাক শুনিয়া ছুটিয়া আসিল বাঁদী ছহিমন, বাঁদী ইরা; বহির্বাটীতে শায়িত জায়েদও নিদ্রালস চক্ষুদ্বয় মুছিতে মুছিতে দৌড়াইয়া আসিল। ক্রুদ্ধ রাহেল গম্ভীরভাবে আদেশ দিল, "শোন জায়েদ। শোন ইরা! শোন ছহিমন! কাল ফজরেই আমার শাদী। সব ঠিকঠাক। দুল্‌হিন নিজেও সম্মত হয়েছে, আর কোন বাধা নেই। খুব সকালেই খবর দেবে পাড়াপড়শী ও আত্মীয়-স্বজনদের। রাত্রি আর বেশী বাকী নেই, এখনই তোরা কাজকর্মে লেগে যা। বাড়ী-ঘর পরিষ্কার কর,

খানাপিনার আয়োজন দেখ। জায়েদ! তুই মেহ্‌মানদের বসার জন্য ওসমান ভাইয়ের দহ্‌লিজ থেকে ভাল ভাল কয়েকটা খেজুর পাতার বড় চাটাই নিয়ে আয়।" এই বলিয়া রাহেল জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গৃহাভিমুখে পা বাড়াইল।

জায়েদ চলিয়া গেল, বাঁদীরাও ফিরিল যে-যার ঘরে। রাহেল নিঃসাড়ে স্ত্রীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্রপেথে তাকাইয়া দেখে-ভিতরে ভূতলে উপবিষ্টা জ্যেষ্ঠা স্ত্রী একটা খুঁটিতে ঠেস দেওয়া অবস্থায় গালে হাত দিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।

রাহেল বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত করতঃ কয়েক পা পিছাইয়া আসিল, তারপর মধ্যমার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বার রুদ্ধ। গৃহ প্রাকারের ফাঁকে উঁকি মারিয়া দেখে-হতভাগিনী হাজেরা ভূমিতলে লুটাইয়া কাঁদিতেছে আলুথালূ বেশে, অদূরে ক্ষুদ্র প্রদীপ-শিখা তৈলাভাবে নিষ্প্রভ। রাহেল বিরক্ত হইয়া কনিষ্ঠা স্ত্রী কুলছুমের দ্বারস্থ হইল। বাহিরে ক্ষীণ লম্বমান একটা আলোক রেখা দেখিয়া সে বুঝিল-গৃহদ্বার রুদ্ধ বটে, কিন্তু অর্গলাবদ্ধ নহে। দরজা কিঞ্চিৎ ফাঁক করিয়া সে দেখে-কুলছুম আলোর সম্মুখে বসিয়া একখানা বৃহৎ ছুরিকা প্রস্তরখণ্ডে ঘষিয়া শান দিতেছে আর এক-একবার ধবল দন্তপাটি বাহির করিয়া অধরোষ্ঠ পীড়ন করিতেছে। যুবতীর কপাল ও ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে কুঞ্চন রেখার সৃষ্টি হইয়াছে, চোখে-মুখে একটা কঠোর নিষ্ঠুর ভাব পরিস্ফুট। রাহেল দ্বার ঠেলিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র কুলছুম চকিতা হরিণীর ন্যায় চোখ তুলিয়া চাহিল।

কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া রাহিল বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি হচ্ছে কুলছুম? এত রাত্রে ছুরি শান দিবার কি প্রয়োজন হলো?"

কুলছুম দৃঢ়স্বরে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "এই না বললে কাল তোমার শাদী মোবারক? দশ গোত্রের দশজনকে দাওয়াত করে খাওয়াবে না? তারই ত আয়োজন কর্‌ছি। তোমার পালের সব কয়টা উট, ভেড়া, আর দুম্বা জবাই করে মহোৎসবের আয়োজন করবো। লজ্জা করে না সাহেব? তিন তিনটা বিবি বর্তমান থাকতেও বিয়ের সাধ মিটলো না! আবার এক নিরীহা বালিকার সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছ। তাকেও তোমার পরিবারের কারাগারে বন্দিনী করার ষড়যন্ত্রে মেতেছ!"

রাহেল সরোষে গর্জন করিয়া উঠিল, "কী! ষড়যন্ত্রে মেতেছি! সায়ফুন নিজে রাজী হয়েছে, আর আমি বুঝি তার সর্বনাশ করছি! কুলছুম, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয় বলছি! শাদী আমি করবই, আর তোকেই তার ইন্‌তেজাম নিজ হাতে করতে হবে! এদিক-ওদিক হলে কিন্তু রক্ষে থাকবে না।"

কুলছুম ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ইস্, রক্ষে থাকবে না! কী আমার বীর পুরুষ রে! তোমার বীরত্ব ত শুধু আমাদেরই উপর! অহরহ নির্যাতন করে লাভ কি বল ত? তার চেয়ে এক.কাজ কর না! ঐ তরবারি নিয়ে এক আঘাতে শেষ করে ফেল।"

"কুলছুম! আমার অবাধ্য হ'লে কপালে হয়তো তা-ই ঘটবে। ভাল চাস্ ত আমার আদেশ মত কাজ কর্। কাল ফজরেই যেন শাদীর আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।"

"কালই শাদী? কালই? বেশ তা'ই হবে। সেইজন্যই ত ছুরিটা শান দিচ্ছি! দেখো তোমার বউ কেমন টুক্‌কুকে শালোয়ার, টুক্‌টুকে কামিজ, টুক্‌টুকে ওড়না পরে সেজেগুঁজে আসে; সর্বাঙ্গ লালে লাল হয়ে উঠবে।" এই বলিয়া কুলছুম ছুরিকাহস্তে দণ্ডায়মান হইল।

রাহেল স্ত্রীর প্রতি আর একবার রোষকষায়িত লোচনের বিষবাণ নিক্ষেপ করিয়া শরাবখানায় যাত্রা করিল। সঙ্গে সঙ্গে কুলছুমও অন্য পথে বাহির হইয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

সপত্নী-অধ্যুষিত গৃহে এ দৃশ্য নূতন নহে। যুগ-যুগান্তর পরে আজও দেখা যায়, ফুল্ল-কুসুম-সদৃশ নারীও সপত্নী-বিদ্বেষে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া কখনো কখনো পিশাচীর রূপ ধারণ করে।

ক্রোধানল কতকটা প্রশমিত হইলে আরফানের অন্তরে ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। কিন্তু অপরিণামদর্শী ভ্রাতাকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া তিনি চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

স্ত্রী হালিমা স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া ব্যথাতুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি রায়হানকে বাঁচাবার কোন আশাই নেই?"

আরফান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। কোথাও যে আশার আলোর সন্ধান পাচ্ছিনে। হালিমা! যে বাতুল স্বহস্তে নিজের মৃত্যুর

পরোয়ানা স্বাক্ষর করিয়ে নেয়, স্বেচ্ছায় ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করে, কে তাকে বাঁচাবে চল?”

হালিমা সজলনয়নে অভিযোগ করিল, “আপন সহোদরের মৃত্যুশয্যা তুমিই ত আপন হাতে রচনা করেছ। ভাই বিপথগামী হয়েছে বলে তাকে ধরার বুক থেকে সরাতে চেয়েছ। অস্বীকার করতে পার–তুমি শত্রুদের উত্তেজিত কর নি? ভাই হয়ে এত বড় নিষ্ঠুর কাজও করতে পারলে? দয়ামায়ার লেশটুকুও অন্তর থেকে মুছে ফেললে? তুমি ত জান, জন্মের পর থেকেই রায়হান মাতৃহারা। মৃত্যুকালে আম্মা নবজাত রায়হানকে আমার কোলে রেখে অশ্রুপূর্ণ কাতর নয়নের নীরব ভাষায় তার পালনের ভার আমার উপর অর্পণ করেছিলেন। সে করুণ দৃশ্য আজও আমি ভুলতে পারি নি, আমরণ ভুলবোও না। সেই অবধি পুত্রাধিক স্নেহে তাকে পালন করেছি। আর আজ কিনা ভাই হয়ে ভাইকে তুমি আজরাইলের হাতে তুলে দিলে? তুমি নির্বিকার বসে থাকতে পার বটে, আমি পারবো না। প্রাণ যায় যা'ক রায়হানকে মুক্ত আমি করবোই, জালেমের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে আনবোই। এই চললাম আমি। নিঝুম নিশীথে শঙ্কাহীন হৃদয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায়, পাষণ্ড শোহেলীর পিশাচ–পুরীর পশ্চাদ্দেশে লুকিয়ে থাকবো। সুযোগ বুঝে প্রতি গৃহ খুঁজে রায়হানের সন্ধান করবো।” এই বলিয়া হালিমা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আরফান কিয়ৎক্ষণ অন্ধকার পথে স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর কি মনে হইতেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুতপদে হালিমার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

পাঁচ

আপন অভিশপ্ত জীবনের প্রতি ঘৃণায়, ধিক্কারে সায়ফুনের অন্তর বুঝি ভরিয়া উঠিয়াছে এক দুর্বিষহ যন্ত্রণায়। ভ্রাতৃবধূ যোহরা তখনও বাক্যহারা সায়ফুনের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নানা প্রবোধবাক্যে , নানা প্রলোভনে এবং নানা কথাচ্ছলে রাহেলের গুণ–গরিমা গাহিয়া, সায়ফুনের অন্তর জয় করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত। সায়ফুন এই নারীরূপী পিশাচীর মুখের দিকে হতাশভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। আপন দুরদৃষ্টের মর্মভেদী রূপ কল্পনা করিয়া সে বারংবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; যোহরার প্রলোভন–প্রলাপগুলি তাহার কর্ণকুহরে সম্যক প্রবেশও করে না। যে দুই–একটি আপাতমধুর বাক্যাংশ কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহাই তাহার অন্তরে যেন বিষভাণ্ড উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল।

সায়ফুনের নিস্তব্ধতায় কি যেন আশার আলোর একটা ক্ষীণ রশ্মির সন্ধান পাইয়া যোহরা শ্বশ্রূমাতার সন্ধানে ত্বরিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। শোকাকুলা সায়ফুন একাকিনী সেই গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া অনাগত ভবিষ্যতের বিকট–বীভৎস মূর্তি কল্পনা করিতে করিতে কাঁদিয়া আকুল। গৃহের ক্ষুদ্র দীপশিখার নিষ্প্রভ জ্যোতি বিরহিণীর মর্মবেদনায় জানাইতে যেন ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় শানিত ছুরিকাহস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এক আলুলায়িত কুন্তলা যুবতী। তাহার হস্তস্থিত ছুরিকাফলক আলোক–রশ্মিতে চক্‌মক্ করিতেছে। যুবতী রাহেলের কনিষ্ঠা স্ত্রী কুলছুম।

অন্য সময়ে এই মৃত্যুদূতের উপস্থিতি সায়ফুনের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিত, প্রাণাশঙ্কায় সে চিৎকার করিয়া উঠিত, কিন্তু এইক্ষণ সে ভাবিল, চিরশান্তির সুমধুর ক্রোড়ে তাহাকে আশ্রয় দিতেই বুঝি বা মৃত্যুদূতীর বেশে, ত্রাণকর্ত্রীরূপে কুলছুমের আবির্ভাব–প্রাণরক্ষার চেয়ে প্রাণনাশই যে তাহার অধিকতর কাম্য! রাত্রিশেষে যে–ধরণী তাহার প্রিয়তম রায়হানকে চিরতরে নির্বাসন দিবে, সেখানে বাঁচিয়া থাকার আর সার্থকতা কোথায়!

সায়ফুন দণ্ডায়মান হইয়া হস্তদ্বয় সম্মুখে প্রসারণপূর্বক ডাকিল, "কে? কুলছুম! কুলছুম এসেছ? এস বোন, এস! আমার সকল দুঃখের অবসান কর! বড় ঠিক সময়েই এসেছ বহিন; বাঁচাও আমাকে!"

কুলছুম সায়ফুনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোষ-প্রদীপ্ত লোচনে ওষ্ঠাধর দাঁতে চাপিয়া বলিল, "ভেবেছ বুঝি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি।! ভুল বুঝেছ! নব-যৌবনের গরিমায় আমার শওহরকে ছিনিয়ে নিয়ে যে স্বপ্নসৌধে বাস করবে ভেবেছো, তা' ভেঙে চুরমার করতে এসেছি। এখনই তোমার বক্ষদেশে এই ছুরিকা আমুল বিদ্ধ করে সে সুখের সাধ চিরতরে মেটাব। যে পুরুষের তিন স্ত্রী বর্তমান, লজ্জার মাথা খেয়ে তাকেই স্বেচ্ছায় শাদী করতে চেয়েছ? তোমার সে-সাধ চিরতরে মেটাব। প্রস্তুত হও সায়ফুন।" এই বলিয়া সে তীক্ষ্ণধার ছোরাখানা ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিল।

সায়ফুন বক্ষ পাতিয়া কুলছুমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি প্রস্তুত! অচিরে আমার সকল জ্বালার, সকল ব্যথার অবসান কর বহিন! তুমি আমাকে মুক্তি দিতেই এসেছ! দোযখের জ্বালাময়ী পাপশিখার গ্রাস থেকে উদ্ধার করে, শান্তির সন্ধান দিতে এসেছ! কুলছুম! এ দুঃখময় জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! মুক্তির সন্ধান দাও বোন! সত্বর তোমার কাজ শেষ কর, শিগগির আমাকে হত্যা কর। বিলম্বে বাধা পাবে অনেক। ভাবী যোহরা এখনই যে ফিরে আসবে! কেন অযথা বিলম্ব করছো? কী ভাবছো?"

মৃত্যুর জন্য সায়ফুনের অধীর আগ্রহ দেখিয়া কুলছুমের উত্তোলিত হস্ত আপনিই নামিয়া গেল, হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। বিপুল বিস্ময়ে চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, "কি বললে! মৃত্যুই তোমার কাম্য! তবে কি আমার শওহরকে নিকাহ্ করার ইচ্ছা তোমার নেই? তার মুখেই যে শুনেছি, তুমি নাকি স্বেচ্ছায় তাকে শাদী করতে রাজী হয়েছ? সে কি তবে ভুল?"

"ভুল শুনেছ কুলছুম! ভুল! রায়হানকে কত ভালবাসি তা' কি তুমি জান না? তোমার স্বামী আর আমার ভ্রাতা আজ তাঁকে নিয়ে এসেছে বন্দী করে! কাল প্রত্যূষেই নাকি হত্যা করবে। রায়হান মরলে আমি বাঁচবো কিরূপে বোন? কুলছুম! তুমি নির্দয় হয়ো না, নিষ্ঠুর হয়ো না, পশ্চাদপদ হয়ো না! আমার প্রাণ

হরণ করে আমাকে মুক্তি দাও বোন!” সায়ফুন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিতে লাগিল। তাহার দুই নয়নের অশ্রুধারা গণ্ডদ্বয় ভিজাইয়া বক্ষ ভাসাইবার উপক্রম।

অকস্মাৎ কুলছুমের নয়নপথে এক নূতন জগৎ ভাসিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে তাহার হস্তস্থিত ছুরিকা কখন যে স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে, সে খেয়ালই নাই। সজলনয়নে সায়ফুনকে সে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, “আমায় ক্ষমা কর বোন! ভুল শুনেছিলাম, ভুল বুঝেছিলাম, সপত্নীবিদ্বেষে আমাকে বড় বিভ্রান্ত করেছিল।”

সায়ফুন হতাশ কণ্ঠে বলিল, “একি বলছো কুলছুম? তবে কি আমাকে হত্যা করবে না? মুক্তি দেবে না?”

কুলছুম গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, “সায়ফুন! এতো অধীর হয়ো না, পাগল হয়ো না! কেন মরবে? তুমি মরলেই রায়হান কি বেঁচে যাবে?”

ঠিক সেই সময় সায়ফুনের ঘরে কথোপকথন শুনিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহ হইতে যোহরা ডাকিল, “কে ও ঘরে? কে গা?”

যোহরার স্বভাব কুলছুমের জানা ছিল। ধরা পড়িলে একটা মহা অনর্থের সৃষ্টি হইবে–এই ভাবিয়া ডাক শোনামাত্র ত্বরায় সায়ফুনের ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারে সে অদৃশ্য হইল।

কুলছুমের শেষ কথাগুলি তখনও সায়ফুনের কানে যেন ধ্বনিত হইতেছিল, “কেন মরবে? তুমি মরলেই কি রায়হান বেঁচে যাবে?”

সেই মুহূর্তে ভূতলে পতিত কুলছুমের ছুরিকাখানা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহা কুড়াইয়া লইতেই দিবসের সদ্য মেঘ-মুক্ত আকাশের ন্যায় তাহার মুখমণ্ডল সহসা অপরূপ আনন্দলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কুড়ানো ছুরিকাখানি শয্যার নিম্নে লুকাইয়া রাখিয়া সায়ফুন কি ভাবিতে ভাবিতে গৃহমধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল; তারপর দ্বারদেশে আসিয়া বাহিরে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল– নিশীথিনীর নিথর বক্ষে সূচীভেদ্য অন্ধকার! অদূরে মদ্যশালায় হৈ-হল্লা ছাড়া চারিপার্শ্বে আর কোথাও কোন শব্দ নাই। আলোর লেশমাত্রও দেখা যায় না। নিরঞ্জন প্রভু আকাশের চাঁদোয়া ছিঁড়িয়া রাশি রাশি মসিভাণ্ড জগন্ময় বুঝি ঢালিয়া দিয়াছে।

শাশুড়ীর সঙ্গে বিবাহের পরামর্শ সারিয়া যোহরা সেই ঘরেই ফিরিতেছিল, গৃহদ্বারে হঠাৎ সায়ফুনের সঙ্গে দেখা। যোহরা অনুরাগভরে তাহার হস্তদ্বয় আকর্ষণপূর্বক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "যাচ্ছ নাকি কোথাও? কিসের শব্দ শুনলাম যেন?"

সায়ফুন স্বাভাবিক স্বরেই উত্তর দিল, "ঘুমের ঘোরে হয়ত চেঁচামিচি করে থাকবো। একটা খা'ব দেখেছিলাম।"

"কি খা'ব দেখলে সায়ফুন?"

"বড় অপূর্ব! দেখলাম–শাদী মোবারক! তুমি যেন আমাকে অপরূপ বসন-ভূষণে সাজিয়ে, রাজরাণীর অনুপম ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত করে, সুখের সায়রে ভাসিয়ে দিয়েছ।"

যোহরা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাল খা'বই দেখেছ সায়ফুন। সত্যিই তুমি সুখী হবে–রাজরাণী হবে! তোমার সুখ দেখে প্রতিবাসিনী সুন্দরীদের চোখ টাটাবে! তা' হলে আর কোন অমত নেই বল?"

"আর জ্বালিও না ভাবী" যেন কচি খুকি আর কি, কিচ্ছু বুঝ না। এইবার একটু ঘুমুতে দাও দিকিন, চোখের পাতা যে জুড়ে আস্ছে।"

অনাবিল হাসিতে যোহরার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সোহাগভরে সায়ফুনের চিবুক নাড়িয়া সে বলিল, "বেশ ত ঘুমাও না, আমার ভাবী হ'লে তোমার সুখ-স্বপ্ন পুরোপুরিই সফল হবে দেখো। কাল থেকে কিন্তু ভাবী বলেই ডাকব, কেমন?" এই বলিয়া যোহরা হাসিতে হাসিতে আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

সায়ফুন শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালিবার সরঞ্জাম সব গুছাইয়া রাখিয়া আলো নিবাইয়া ফেলিল। তারপর একা অন্ধকার গৃহে শয্যোপরি বসিয়া নীরবে প্রহর গণিত লাগিল, কেবল সুযোগের প্রতীক্ষায়।

ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিল, প্রহরের পর প্রহর; ক্রমে রাত্রি তৃতীয় যাম অতিক্রান্ত হইল। একে একে সমস্ত জীব-জগৎ সুষুপ্তির ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িল। মদ্যশালার কোলাহলও বহুক্ষণ শোনা যায় না। সায়ফুন লক্ষ্য করিল–অপর গৃহে যোহরারও কোন সাড়াশব্দ নাই, বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ততক্ষণে।

সায়ফুন ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার নিম্নদেশ হইতে ছোরাখানি টানিয়া বাহির করিল, অন্ধকারে গৃহকোণ হইতে কি একটা জিনিসও হাতড়াইয়া আনিল বহুক্ষণে। তারপর সেগুলি ও প্রদীপ জ্বালিবার সরঞ্জাম হাতে লইয়া অতি সন্তর্পণে সে যাত্রা করিল রায়হানের সন্ধানে।

বহির্বাটীতে আসিয়া সায়ফুন চারিদিকে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বন্দীশালার প্রাচীর ঘেঁষিয়া সে শুনিল, রায়হান ক্ষীণকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছে বড় আকুল সুরে–"ইয়া রাব্বেল আ'লামীন! ইয়া গাফুরুর রাহীম! সকল যন্ত্রণা, সকল লাঞ্ছনা উপেক্ষা করার ক্ষমতা দাও। শত্রুর তলোয়ার আমার নশ্বর দেহ যখন দ্বিখণ্ডিত করে, তখনও যেন ধর্মবিশ্বাস শিথিল না হয়। হে দয়াময় বিশ্বপ্রভো, ক্ষমা কর! যে আলোকে আমার প্রিয় হযরত (সঃ) মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন, তুমি যেন আমাকে সে–আলোক থেকে বঞ্চিত না কর! উহ্ কি পিয়াস! বুক বুঝি ফেটেই যায়! ইয়া আল্লাহ্!"

বন্দীর কাতর প্রার্থনা সায়ফুনের দুই চক্ষে অশ্রুধারার বন্যা বহাইল। তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত দ্রব্যাদি নিকটে এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে সে আপন শয়নকক্ষের দিকে ত্রস্তপদে ছুটিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একভাণ্ড পানিসহ ফিরিয়া আসিয়া সায়ফুন ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে বন্দীশালার দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। পানির পাত্র গৃহতলে রাখিয়া প্রদীপ জ্বালিতেই যে হৃদয় বিদারক দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হইল, তাহাতে তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ক্ষীণ দীপালোকে সে দেখিল, রায়হানের চর্মাবৃত ও কুণ্ডলীকৃত দেহ ভূমিতলে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে–মস্তক নিম্নদিকে, মুখমণ্ডল গৃহতল–সংলগ্ন। সায়ফুনের বুকের ভিতরটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অকস্মাৎ দ্বার খোলার শব্দ ও সম্মুখে আলোকরশ্মি দেখিতে পাইয়া রায়হান ভাবিলেন–মৃত্যুদূত সন্নিকট! প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া তিনি চিৎকার করিতে লাগিলেন, "কে তুমি? কে? আমাকে হত্যা করতে এসেছ? এখনই– এখনই হত্যা করবে? ইয়া আল্লাহ্! ক্ষমা কর! ইয়া রহমান! মাফ কর আমায়!" বন্ধনাবদ্ধ রায়হান আগন্তুককে দেখিবার জন্য ঘাড় ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না।

সায়ফুন অগ্রসর হইয়া পূর্ণ পানির ভাণ্ড বন্দীর মুখে তুলিয়া ধরিল। নিদারুণ পিপাসায় রায়হানের প্রাণ বুঝি বাহির হইয়া যায়; সুতরাং পানি বহনকারিণীর পরিচয় জানিবার তাঁহার অবকাশ কই। তিনি এক নিশ্বাসে সবটুকু পানি পান করিয়া অর্ধচেতন দেহে যেন নূতন প্রাণ লাভ করিলেন। এইবার সায়ফুনের হস্তদ্বয় তাঁহার দৃষ্টিপথে উদয় হইতেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "এ্যা! নারী! কে তুমি ফেরেশ্‌তার বেশে আবে-হায়াত নিয়ে এসেছ? হত্যা করতে আসনি?"

সায়ফুন আস্তে উত্তর দিল, "চুপ, চুপ! আমি সায়ফুন! তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। এই মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ করে দ্রুত পলায়ন কর!" এই বলিয়া সায়ফুন ক্ষিপ্রহস্তে ছুরিকাঘাতে চর্মাবরণ ছেদন করিয়া, বাঁধন কাটিয়া, রায়হানকে মুক্ত করিল।

রায়হান সম্মুখে সায়ফুনকে দেখিবামাত্র অগাধ বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "এ্যা! সায়ফুন! সায়ফুন এসেছ! আমাকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছ, এই আজরাইলের দুয়ারে?"

সায়ফুন দুই হাতে রায়হানকে উঠাইয়া বলিল, "চিৎকার করে আবার খামাখা বিপদ ডেকে এনো না। শিগ্‌গির পালাও!" এই বলিয়া নিজেই তাঁহার খিল-ধরা হাত-পাগুলি টানিয়া সোজা করিয়া মালিশ করিতে লাগিল।

রায়হান দুই হস্ত উর্ধ্বে উঠাইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে আকুল কণ্ঠে জানাইলেন কত কৃতজ্ঞতা! তারপর সায়ফুনকে বলিলেন, "এ কি করলে সায়ফুন! নিজের প্রাণ বিপন্ন করে মুক্তি দিলে আমাকে। এ কথা কি অজানা থাকবে? না, তোমার জীবনের বিনিময়ে আমার প্রাণ ক্রয় করতে পারবো না। তোমাকে বিপদে ফেলে পালাতে পারবো না কাপুরুষের মত। শিগ্‌গির এই স্থান ত্যাগ কর, এখনই যে লোকজন ছুটে আসবে খবর পেয়ে। তুমি কি জান না, ধরা পড়লে কত কঠোর শাস্তি যে পেতে হবে তোমাকে? পালাও সায়ফুন!"

সায়ফুন দৃঢ়স্বরে বলিল, "অনর্থক বাক্যব্যয় করে সুযোগ নষ্ট করো না। আমি তোমার প্রাণ বাঁচাতে এসেছি, নিজের প্রাণ নয়! যদি এই মুহূর্তে না পালাও, তবে তোমারই সম্মুখে এই শানিত ছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করবো। চাও কি তুমি নারীহত্যার কারণ হ'তে? যাও! আমার জন্য ভেবো না, আমার কথা কেউ জানবেও না; জেগে নেই কেউ। দরিয়ার কিনারে ঈসের জঙ্গলে পলায়ন কর।

শুনেছি অনেক নবদীক্ষিত মুসলমান আশ্রয় নিয়েছে সেখানে। তুমি সেই দিকে যাও।" এই বলিয়া সায়ফুন তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া বন্দীশালার দ্বারদেশে লইয়া আসিল।

রায়হান সায়ফুনের দিকে কাতর নয়নে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমার দশা কি হবে সায়ফুন? দুশমনেরা যদি মেরে ফেলে তোমাকে?" এই বলিয়া সায়ফুনের হস্ত ধারণ করিয়া রায়হান কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সায়ফুনও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। কাতরকণ্ঠে সে বলিল, "আমার কি হবে জানিনে। জানিনে অদৃষ্টে কি যে ঘটবে! রাহেল আমাকে বিয়ে করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু আমার জীবন্ত দেহ সে পাপিষ্ঠ স্পর্শ করতেও পারবে না। রায়হান! আমি মনেপ্রাণে তোমাকেই যে ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া বাঁচবো কি করে! এ-জীবনে আর হয়ত দেখাও হবে না! যদি আবার ফিরে আস দেশে, আমার কবরের পাশে এসে দাঁড়িও। আল্লাহ্র দরগায় আমার আত্মার শান্তি ভিক্ষা করো! যাও বিলম্ব করো না। এই নাও পাথেয়।" এই বলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে মুদ্রাপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র থলিয়া তাঁহার হাতে সে গুঁজিয়া দিল।

রায়হান কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না সায়ফুন, তোমাকে ছেড়ে পালাতে পারবো না। তোমার জীবন বিপন্ন হ'লে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ? তুমিও সঙ্গে চল।"

"সে কি কখনো সম্ভব রায়হান? ভাবী যোহরা এখনই হয়ত আমাকে খুঁজতে আসবে ঘরে। না পেলে চারদিকে এখনই লোকজন পাঠিয়ে এখনই খোঁজাখুঁজি শুরু করবে-এখনই দলে দলে লোক তোমাকে খুঁজতে বেরুবে; শতের বিরুদ্ধে, সহস্রের বিরুদ্ধে, একা তুমি যুঝতে পারবে? দুরন্ত রাহেল আমার ভাইকে নিয়ে, সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে, পাহাড়ে জঙ্গলে আমাদের খুঁজে বের করবেই করবে। তুমি নিজে মরবে-আমার মৃত্যুও ডেকে আনবে; কিন্তু আমি ঘরে থাকলে প্রভাতের পূর্বে কেউ তোমার খোঁজ-খবর করবে না। যাও, বৃথা কালক্ষয় করো না! আল্লাহ্র রহমত ভরসা করে পালাও। মহান আল্লাহ্ তোমার সহায় হউন।" এই বলিয়া সায়ফুন রায়হানকে হাত ধরিয়া টানিয়া দ্বারদেশের বাহিরে লইয়া আসিল।

রায়হান সাশ্রুনয়নে সায়ফুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বড় করুণ সুরে ডাকিলেন "সায়ফুন!"

সায়ফুন তাঁহাকে জোর করিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "রায়হান! তোমার কষ্ট আমি বুঝি, কিন্তু উপায় নেই; যাও, এখনই যে কুক্‌কুট ডেকে উঠবে। রাত আর বাকী নেই অধিক, যথাসম্ভব দ্রুতপদে পথ চলে ছুটে যাও বহুদূরে। দিবাভাগে কিন্তু লুকিয়ে থেকো যেন। যাও, আল্লাহ্ হাফেয! যাও বলছি!"

রায়হান দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া আবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রাণদাত্রী সায়ফুন অশ্রুপ্রবাহে স্নাত হইয়া অদূরে প্রদীপহস্তে নিশ্চল দণ্ডায়মান-সদ্যস্নাত স্বর্ণ প্রতিমার বিমল জ্যোতি যেন দীপশিখায় আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। রায়হানকে থামিতে দেখিয়া সায়ফুন তাঁহাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। রায়হান আবার পা বাড়াইলেন। এই সময় সায়ফুন ত্রস্তপদে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অশ্রুবিগলিত- লোচনে কাতর স্বরে ডাকিল, "রায়হান! দাঁড়াও! বিদায় বেলায় আমার একটি মিনতি রাখ!"

রায়হানের শোকাবেগ দ্বিগুণ উথলিয়া উঠিল, পদদ্বয় যেন ভূতলে প্রোথিত হইবার উপক্রম! পাষাণের ন্যায় নিশ্চল রায়হান রোরুদ্যমানা সায়ফুনের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত করিলেন। সায়ফুন রায়হানের অঙ্গুরীয় স্পর্শ করিয়া বলিল, "এইটি আমায় দাও, হৃদয়মধ্যে লুকিয়ে রাখবো! আমাদের এই মিলন-স্মৃতি, এই বিদায়-স্মৃতি, আমরণ জিইয়ে রাখবে এইটি। দেবে রায়হান?"

এইবার রায়হানের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরমার। হস্ততালুতে চক্ষুদ্বয় মুছিয়া নীরবে আংটিটি তিনি খুলিয়া দিলেন, উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে কোন কিছুই বলিতে পারিলেন না।

সায়ফুন অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিল। দেখিল, আংটিটির উপরে ক্ষুদিত রহিয়াছে-"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পরম দয়াময়।" চোখের পানি মুছিয়া সে বলিল, "যাও এইবার, রহমানুর রহীম তোমার মঙ্গল করুন।"

কিন্তু রায়হান আর এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিলেন না, অশ্রুধারা বারণ মানে না। সায়ফুন ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "রায়হান, পালাও! তুমি পালালে হয়তো বেঁচে যাব উভয়েই, নইলে মরণ দু'জনেরই। মনকে কঠোর শাসনে সংযত কর! ধৈর্য ধর! আল্লাহ্ হাফেয।"

রায়হান হাত ধরিয়া সায়ফুনকে উঠাইয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ, তোমাকে দয়াময় আল্লাহ্‌র হেফাজতে সমর্পণ করে চললুম। সায়ফুন! তুমি শুধু আমাকে প্রেমের নিগড়েই বাধনি, আজ প্রাণদান করে কৃতজ্ঞতার নাগপাশেও আবদ্ধ করলে। তোমাকে কি বলে যে বিদায় নেব জানি নে! আমার ছিন্ন-হৃদয় বুঝি বা ফেটেই যায়! তবু যেতে হবে। আহা! কত কথাইত বলার ছিল, বলা হ'ল না; জানিনে বলার অবকাশ এ-জীবনে আর মিলবে কিনা। সায়ফুন! যদি দুর্ভাগ্যের ভ্রূকুটিতে, দুশমনের নিষ্ঠুর পীড়নে, জীবন কখনো অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, তখনও যেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিশ্বাস হারিও না। মনে রেখো-আমার মুক্তি তার রহমতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। যাব কোন্ পথে, সায়ফুন? কোথায়ই বা যাই!-ঈসের জঙ্গল! সে যে বহুদূর পথ! বহুদূর!"

সায়ফুন আর কিছুই বলিতে পারিল না। নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তাহাকে টানিয়া রাস্তায় নামাইয়া দিল, পৃষ্ঠদেশে মৃদু স্পর্শ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। রায়হান চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

সায়ফুন ভূতল হইতে প্রদীপ উঠাইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল মৃন্ময় পুত্তলিকার মত; যতক্ষণ অন্ধকারে রায়হানের আবৃছা মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল, ততক্ষণ সজলনয়নের দৃষ্টি আর সে ফিরাইতে পারিল না।

চলিতে চলিতে রায়হান বারংবার ঘাড় ফিরাইয়া সায়ফুনকে না দেখিয়া পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তিনি দৃষ্টির আড়াল হইলেন। সহসা একটা দমকা বাতাস সায়ফুনের হস্তস্থিত ক্ষীণ প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া সোঁ সোঁ শব্দে বহিয়া গেল।

স্নিগ্ধ সমীরণের হিম স্পর্শে সায়ফুনের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল হইয়া উঠিল, অন্তরের জ্বালাও বুঝি ধীরে ধীরে জুড়াইয়া আসিতেছে। ভাবিল, রায়হানকে যে বাঁচাইতে পারিয়াছে, মুক্তি দিয়াছে, তাহার চেয়ে ভাগ্যবতী আর কে আছে? তাহার ক্রূর আত্মীয়-স্বজন নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিবে। সে মরিবে বটে, কিন্তু তাহার প্রাণপ্রতিম রায়হান বাঁচিয়া থাকিবে। এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, এক মুহূর্তে সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ ধুইয়া মুছিয়া কোথাও যেন উবিয়া গেল।

সায়ফুন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পা বাড়াইবে, এমন সময় পশ্চাতে যে গৃহে রায়হান বন্দী ছিল, সেই গৃহদ্বারে মানুষের পদশব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খোলার আওয়াজ শুনিয়া সে চমকিত হইয়া উঠিল। ভাবিল–এ নিশ্চয়ই যোহরা, আমারই সন্ধান নিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। সর্বনাশ! এখনই সে রায়হানের পলায়ন টের পাইবে! ইয়া আল্লাহ্! তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, নিদারুণ ভয়ে পদদ্বয়ের গ্রন্থিগুলি যেন খুলিয়া গেল, আর বুঝি দেহ–ভার বহন করিতেই পারে না। সায়ফুন মুহুর্মুহু দয়াময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিতে করিতে কোনক্রমে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া বাটীর পশ্চাদ্দিকস্থ কদাচিৎ–ব্যবহার্য অপরিচ্ছন্ন পথে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল! কি একটা নিশাচর পাখী পক্ষ–তাড়নায় বিকট শব্দ করিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল।

স্তব্ধ নিশীথিনীর অন্ধকার বক্ষে আর কোন শব্দ নাই। সেই বিরাট নীরবতার আবেষ্টনে ইতস্ততঃ–বিক্ষিপ্ত দুই–একটা পদদলিত শুষ্ক খর্জুরপত্রের মর্মরধ্বনি ভীতা–চকিতা সায়ফুনের কম্পিত অন্তর সীমাহীন আতঙ্কে ভরিয়া তুলিল।

ছয়

আবূ আক্‌কাস অধিক রাত্রি পর্যন্ত লুক্‌কায়িত ছিলেন কিয়দ্দূরে এক খর্জুর বাগানে। বন্দী রায়হানের দুর্দশা স্মরণ করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা তখনো কাঁপিতেছিল; হৃদয়ে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল —এতক্ষণে তাহারা রায়হানকে নিশ্চয়ই মারিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার অন্তর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল পূঞ্জীভূত বেদনায়; আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে রায়হান যদি এখনও বাঁচিয়া থাকে,তবে যে-কোন উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবূ আক্‌কাস অন্ধকারে চুপি চুপি বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন–প্রাঙ্গণ জনমানবহীন, গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের পার্শ্বে বসাইয়া ভয়ে জড়সড়। আবূ আক্‌কাস দ্বার ঠেলিয়া গৃহে ঢুকিতেই তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ যেন পুনর্জীবন লাভ করিল। তিনি স্ত্রীর হাত ধরিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আছিয়া! শিগগির চল! আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নিরাপদ নয়। দুর্বৃত্তেরা রায়হানকে হয়তো মেরেই ফেলেছে, আমাকেও কতল করতে পারে।"

আছিয়া স্বামীর মুখের প্রতি কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মেরে ফেলেছে! আহা! রায়হানকে তারা মেরেই ফেলেছে? ওগো, কোথায় যাব আমরা? কোথায় পালাব?"

"আল্লাহ্ যেদিকে পথ দেখান। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপিসারে পথ চলতে হবে। রাত আর অধিক বাকী নেই, কাজেই বেশী দূর আজ যাওয়া সম্ভব হবে না। চল, কোন পাহাড়ের গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেই। দিবসে সেখানে লুকিয়ে থেকে, কাল সুর্যাস্তের পর আমরা ঈসের জঙ্গলের দিকে যাত্রা করবে।"

"কেন, মদিনায় গেলে হয় না?"

"না হোদায়বিয়ার সন্ধি–শর্ত সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ওঠ, প্রস্তুত হও আছিয়া! আমি ততক্ষণ রায়হানের সঠিক খবরটা নিয়ে আসি।" এই বলিয়া আবূ আক্‌কাস দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অন্ধকারে অতি সাবধানে আবূ আক্কাস কতক্ষণ পরে শোহেলীর বাটীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। বাড়ীর চারিদিকে ঘোরাফেরা করিয়া রায়হানের কোন সন্ধান তিনি পাইলেন না। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ প্রতি গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া রহিলেন, কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। হতাশ–হৃদয়ে আবূ আক্কাস বহির্বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। এমন সময় দেখেন, বাহিরের এক ক্ষুদ্র গৃহের দ্বার ঠেলিয়া কে বুঝি বাহির হইতেছে– দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ যেন! আবূ আক্কাস নিমিষে গৃহ প্রাচীরের অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি দেখিলেন– উপরোক্ত পুরুষ তাঁহার নিকটেই এক খর্জুর বৃক্ষের তলায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অল্পক্ষণ পরে এক যুবতীকেও সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। শুনিলেন যুবকের পার্শ্বে সেই যুবতীটি আসিয়া ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠার সুরে বলিতেছে, "কই, দেখছি না যে কোথাও? তবে কি তারা মেরেই ফেলেছে রায়হানকে?"

যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হয়ত বা মেরেই ফেলেছে।" পরক্ষণেই তাহার অন্তরের হিংসা–বৃত্তি যেন প্রবল হইয়া উঠিল। হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রোষে ওষ্ঠাধর দ্রংষ্ট্রাহত করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই, রক্ত দিয়ে রক্তের প্রতিহিংসা মেটাব। এখনই সব আত্মীয়–স্বজন নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসবো। শোহেলী আর শোহেলী–পুত্র ওৎবাকে বুঝিয়ে দেব– আরফান কাপুরুষ নয়। ঘরে ফিরে যাও হালিমা! আমি চললুম যুদ্ধের আয়োজন করতে। হাঁ, চেন কি সেই হতভাগাকে?"

"কার কথা বলছো?"

"আরে সেই মরদুদ আবূ আক্কাস! সে–ই ত রায়হানের পতনের মূল। ইসলাম ধর্মে সে–ই ত তাকে দীক্ষা দিয়েছে। রায়হান নিহত হলে সেই ধর্মদ্রোহী আক্কাসও আজ পরিত্রাণ পাবে না। আমি স্বহস্তে তার মস্তক ছেদন করবো।"

হালিমা স্বামীর হস্তদ্বয় আকর্ষণ করিয়া বলিল, "এত অধীর হয়ো না। চল বাকী ঘরগুলিও খুঁজে দেখি।"

আরফান হাত ছাড়াইয়া বলিলেন, "না, চোরের ন্যায় শোহেলীর ঘরে আর প্রবেশ করবো না। রায়হান যদি বেঁচে থাকে, তবে কাল প্রত্যূষে তাকে ছিনিয়ে

নেব। তুমি ঘরে ফিরে যাও!” এই বলিয়া আরফান কালবিলম্ব না করিয়া অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইলেন।

হালিমা বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত কি ভাবিল। অকালে রায়হানের জীবনাকাশে ঘনঘটা ঘনাইয়া উঠিবে, চিরতরে তাহাকে হারাইতে হইবে–ইহা কল্পনা করিতেই তাহার অন্তর যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। এদিক–ওদিক চাহিয়া পুনরায় রায়হানের সন্ধানে শোহেলীর অন্তঃপুরে সে প্রবেশ করিল।

গৃহান্তরালে দাঁড়াইয়া আবূ আক্‌কাস সবই দেখিলেন। যুবক–যুবতীর কথোপকথন শুনিয়া তিনি বুঝিলেন ইহারা রায়হানের ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ; তাহারাও রায়হানকে খুঁজিতে আসিয়াছিল—পায় নাই। রোষোন্মত্ত আরফানের হিংসাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আবূ আক্‌কাস শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, অবিশ্বাসী আরফান তাঁহাকেই আসল অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছে, তাঁহাকেই দায়ী করিয়াছে রায়হানের দুর্ভাগ্যের জন্য। কি জানি, যদি সে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে এখনই ছুটিয়া যায়, না পাইয়া তাঁহার নিরীহ স্ত্রী–পুত্রদিগকে হত্যা করে! এইখানে রায়হানের সন্ধান লইয়া আর লাভ কি! হয়তো সে বাঁচিয়া নাই। অবিলম্বে আপন স্ত্রী–পুত্রাদি লইয়া নিরাপদ স্থানে প্রস্থান করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া আবূ আক্‌কাস তন্মুহূর্তে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

গৃহে পৌঁছিয়া আবূ আক্‌কাস স্ত্রী আছিয়ার হাত ধরিয়া অতি ব্যস্তভাবে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “চল। চল আছিয়া! আর বিলম্ব নয়। জালেমরা যে এসে পড়বে এখনই!”

আছিয়া বিমূঢ় নয়নে স্বামীর মুখের প্রতি শুধু তাকাইয়া রহিল, ভয়ে বিস্ময়ে কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। দ্রুত হৃদস্পন্দন তাহার শক্তি–সাহস আড়ষ্ট করিয়া সর্বাঙ্গ যে অথর্ব করিয়া তুলিয়াছে।

আবূ আক্‌কাস কালবিলম্ব না করিয়া দুই পুত্র–কন্যাকে দুই কাঁধে উঠাইয়া লইলেন। তারপর দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে স্ত্রীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, “চল আছিয়া! শিগ্‌গির চল!”

বাস্তুভিটা ত্যাগ করিতে আছিয়ার অন্তর বুঝি চূর্ণ–বিচূর্ণ হইবে। ঘাড় ফিরাইয়া বারংবার সে পরিত্যক্ত গৃহের দিকে না তাকাইয়া পারিল না। সঙ্গে কিছুই লইবার

অবকাশ নাই। বহুদিনের আয়াস-সঞ্চিত তৈজসপত্র, গৃহপালিত পশুগুলি ও দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষের মত সুখ-দুঃখের স্মৃতি-বিজড়িত এই গৃহখানি ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার পথে পা বাড়াইতে সে যে কিছুতেই পারিতেছে না। বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবনের ন্যায় তাহার দুই চক্ষু অশ্রুধারায় ভাসিয়া উঠিল।

আবূ আক্কাসের দৃষ্টি ইহা এড়ায় নাই। পত্নীর দিকে চাহিয়া স্নেহভরে তিনি বলিলেন, "আছিয়া! বুঝি তোমার মনের ব্যথা। কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্তও যে নিরাপদ নয়। সম্মুখে অগ্রসর হও, পশ্চাতে তাকিয়ে আর লাভ কি! পথ দীর্ঘ, বড় বিপদসঙ্কুল । বন্ধুর গিরি, দুর্গম মরুকান্তার পার হয়ে যেতে হবে বহুদূর! জানি, তোমার কষ্ট হবে আছিয়া, কিন্তু উপায় নেই। নির্ভয়ে পথ চল। মহান আল্লাহ্ আমাদের রাহ্বর।"

আবূ আক্কাসের বাড়ীর সম্মুখে বিরাট বালুকাময় প্রান্তর। সেখানে পথের কোন নামনিশানা নাই। তদুপরি স্থানে স্থানে কন্টকাকীর্ণ লতাগুল্মের পাতলা ঝোপ-ঝাড়। মাঝে মাঝে প্রস্তরসমাকুল উচ্চ পার্বত্যভূমিতে ছাড়াছাড়া খর্জুর বৃক্ষগুলি অন্ধকারে উলঙ্গ দানব শিশুর ন্যায় দণ্ডায়মান। মৃদু বায়ু প্রবাহে সেই সব দানবের দল কি যেন বলাবলি করিতেছে, ফিস্ ফিস্ করিয়া মাথার কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিতেছে। ততক্ষণে প্রান্তরের অন্ধকার কিছুটা হাল্কা হওয়ায় দূরের পাহাড়গুলি ক্রমেই যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

আবূ আক্কাস স্ত্রী-পুত্রাদিসহ তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া শোহেলীর বাড়ীর বরাবর প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিলেন। রায়হানের কথা মনে হইতেই তাঁহার অন্তর ফাঁটিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অনিমেষ নয়নে তিনি শোহেলীর বাড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। এমন সময় দেখিলেন, আলুথালু বেশে এক নারী-মূর্তি শোহেলীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাহারই কাছাকাছি একটা ঝোপের গা বাহিয়া প্রান্তরে দৌড়াইয়া যাইতেছে। আবূ আক্কাস নারীকে চিনিতে পারিলেন না। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন-কে এই নারী! কেনই বা সে এমনভাবে দৌড়াইয়া পালাইতেছে। হালিমাকে তিনি শোহেলীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সে কেন এমনভাবে পাগলিনীর ন্যায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিবে? তবে কি সায়ফুন রায়হানের খোঁজাখুঁজি করিতে ছুটিয়া মরিতেছে? চিন্তামগ্ন আবূ আক্কাস অন্যমনস্ক হইলেন। এমন সময় স্ত্রী আছিয়া তাঁহার হস্ত আকর্ষণপূর্বক ক্ষীণ কণ্ঠে

আর্তনাদ করিয়া উঠিল, "সর্বনাশ হয়েছে! বাড়ীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ইয়া আল্লাহ্! কি হবে মা'বুদ!" তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিল।

আবূ আক্কাস চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার বাসগৃহে কাহারা যেন অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। আগুনের লেলিহান শিখায় বাড়ীর চারিদিক আলোকিত। সে আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কয়েকজন পুরুষ প্রজ্বলিত গৃহের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করিতেছে। এতদূর হইতে কাহাকেও তিনি চিনিতে পারিলেন না।

আবূ আক্কাসের বুকের ভিতরেও যেন আগুন। স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া তিনি বলিলেন "চল, আছিয়া! আল্লাহ্‌র রহমতে বেঁচে গেছি খুব। আর একটু বিলম্ব হলে দশাটা কি হত, একবার ভেবে দেখ! তাড়াতাড়ি চল! দুরাত্মারা এদিকেও ছুটে আসতে পারে আমাদের খোঁজে।"

আছিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া তারপর ঘুমন্ত শিশুটিকে ডান কাঁধ হইতে বাম কাঁধে লইয়া যথাসাধ্য দ্রুত স্বামীর অনুগমন করিল।

প্রভাত সমীরণ একটু পরেই বহিতে লাগিল। দূরে বনের পাখীরা ইতিমধ্যে একে একে জাগিয়া উঠিয়া উষার আবাহনী শুরু করিয়াছে।

সাত

হালিমা শোহেলীর অন্তঃপুরে অতি সন্তর্পণে চারিদিক একবার ঘুরিয়া আসিল। দেখিল, সব কয়টি গৃহদ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। প্রতি গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া সে কিয়ৎক্ষণ কান পাতিয়া রহিল রায়হানের খোঁজ পাওয়ার আশায়; কিন্তু কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। ভিতরে জনপ্রাণী একটি যেন জাগিয়া নাই। একে একে সব কয়টি দুয়ার খুলিতে বিফল হইয়া অবশেষে সে সায়ফুনের দরজায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

দ্বার উন্মুক্ত, গৃহে আলো নাই। সায়ফুন জাগিয়াই ছিল। অন্ধকারে শয্যোপরি বসিয়া তদ্গতচিত্তে রায়হানের কথাই সে ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল–এতক্ষণে হয়তো রায়হান আল–জবিলের সীমানা ছাড়াইয়া লা–ছবিলির মরু–কান্তার পার হইয়া, পাহাড় কুহ্–মাতমের ওপারে, অনেক দূরে নহর তাবুইর প্রায় কাছাকাছি পৌছিয়াছে। কিন্তু যা দুর্বল! সে কি এতটা তাড়াতাড়ি হাঁটিতে পারিবে? সায়ফুন মোনাজাত করিল–"ইয়া আল্লাহ্! ইয়া সাত্তার! ইয়া রহীম! তুমি তাকে রক্ষা কর, তুমি তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছিয়ে দাও!"

এমন সময় দরজায় মানুষের পদশব্দ শ্রুত হইল। সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই সায়ফুন অবাক হইয়া দেখে, এক ছায়ামুর্তি যেন তাহার অন্ধকার গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। সায়ফুনের বুকের ভিতরটায় থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তবু সাহসে ভর করিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "কে? কে তুমি?"

তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইল সে ছায়াদূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে সায়ফুনও ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, অন্ধকারে কে যেন সত্যই ছুটিয়া পালাইতেছে। অবাক হইয়া সে ভাবিতে লাগিল–কে ও! পলায়মান ব্যক্তি স্ত্রী কি পুরুষ, অন্ধকারে ততটা সে ঠাহর করিতে পারিল না। ভাবিল, তবে কি রায়হান আবার ফিরিয়া আসিল! সায়ফুনের দুশ্চিন্তার আর অবধি নাই। কাহাকে ডাকিতেও সে ভরসা পায় না;' কি জানি, সত্যই যদি রায়হান আসিয়া থাকে।

সায়ফুন সেই ধাবমান ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া বাটীর বাহিরে কিছুটা দূরে চলিয়া আসিল। দেখিল—লোকটা প্রান্তরের ভিতরে অনেক দূরে ছুটিয়া গিয়াছে, আর পশ্চাদ্ধাবণ্য করা বৃথা!

ততক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদ উঁকি মারিয়া উঠিয়াছে। অস্পষ্ট আলোকে সায়ফুন দেখিল, সমগ্র বিশ্বচরাচর স্বপ্নের আবেশে যেন নির্জীব নিঃসাড়। ধরণীবক্ষে জনপ্রাণী একটিও বুঝি জাগিয়া নাই। বিস্ময়াবিষ্ট সায়ফুন প্রান্তরের একান্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোথা হইতে কে আসিয়া এমনভাবে চোরের ন্যায় চুপি চুপি ঢুকিয়াছিল, আবার কেনই বা পলায়ন করিল, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। ভাবিল—না, রায়হান নয়, এইভাবে সে আসিত না, আর আসিলে এমনভাবে পালাইত না। তবে কি রাহেল! সে পাষণ্ড চোরের ন্যায় আসিতে পারে বটে, কিন্তু এ -বাড়ীতে ধরা পড়িবার ভয় ত তাহার নাই। সে দোলাহ্‌র বেশে শাদীর মজলিসে জাঁকিয়া বসিবার মধুর স্বপ্ন দেখিতেছে। সে কেন পালাইবে? তবে?—

এমন সময় স্কন্ধদেশে কাহার করস্পর্শে তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, পদদ্বয় কাঁপিত লাগিল। সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখে—পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কুলছুম।

সায়ফুন ভয়-বিহবল-কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওহ্ কুলছুম! আবার তুমি এসেছ।! এই অসময়ে!"

কুলছুম হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই! তোমার ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট আর করবো না। কিন্তু তুমিই বা এখানে কেন এই গভীর রাতে? অভিসারে যাচ্ছিলে বুঝি?"

একটু পূর্বে কুলছুম তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, সায়ফুন তাহা ভুলে নাই। তাহার রসিকতা সায়ফুনের ভাল লাগিল না। গম্ভীরভাব সে উত্তর করিল, "গরমে শয্যায় ছটফট করছিলাম, ঘুম আসে নাই, তাই পায়চারি করছি। তা তুমিই বা এখানে কেন?"

কুলছুম উত্তর করিল, "আমার দুরদৃষ্টের কথা আর বল কেন? প্রায় মাসাধিককাল শওহরজী বাইরে বাইরেই রাত কাটান। শুনলুম, আজ তারা রায়হানকে ধরে এনেছে, আর তারই নিধন পর্বের আয়োজনে তিনি নাকি মেতে উঠেছেন। তাঁরই খোঁজে বের হয়েছি। চল না, ঘুরে আসি খানিকটা! যাবে বোন?"

সায়ফুন বিরক্তিভরে উত্তর করিল, "তোমার স্বামীর খোঁজ তুমিই কর। আমাকে আবার যেতে বলছো কেন? নিরপরাধ ধর্মভীরু মানুষকে যারা জুলুম করে হত্যা করে, সে–উৎসব আমাকে যেন দেখতে না হয়। বলতে পার, মানুষ মানুষকে তার ধর্মবিশ্বাসের জন্য এমনভাবে নিপীড়ন করে কেন? কেন, কী অপরাধে? তার ধর্ম তাকে শিক্ষা দিয়েছে পাপাচার থেকে দূরে থাকতে, নীচতা, শঠতা, ব্যভিচার, উৎপীড়ন, প্রলোভন হতে মুক্ত থাকতে, এই কি তার অপরাধ? আহা! কি মহৎ তার চরিত্র! কত মহান তার আত্মা! কী অপূর্ব তার ধর্মবিশ্বাস! শত অত্যাচার, শত উৎপীড়ন সে বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে নি। ঘটা করে তোমরা তার নিধন–পর্বে মেতে উঠেছ। সে পাপানুষ্ঠান আমাকে আবার দেখতে বলছো? যাও তুমি! আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা আর দিও না।" এই বলিয়া সায়ফুন দুই চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহাভিমুখে পা বাড়াইল।

কুলছুম তৎক্ষণাৎ তাহার বাম হস্ত আকর্ষণ করিয়া বলিল, "শোন সায়ফুন! রায়হানকে তুমি ভালবাস, সে আমি জানি। তাই বলছি, চল যাই তাঁর মুক্তির প্রচেষ্টায়। বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের মিলনপ্রয়াসী।"

বিপুল বিস্ময়ে সায়ফুনের অন্তর এইবার ভরিয়া উঠিল, সহসা মুখে কোন বাক্যনিঃসরণ হইল না। কতক্ষণ পরে আবেগভরা কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে বলছো কুলছুম?"

কুলছুম উত্তর করিল, "আমার স্বামী একটা পাষণ্ড, তার বিশ্বাস–তাকে শাদী করতে তোমার কোন অমত নেই। তার সে ভুল ধারণা ভাঙতে হবে। সর্বাগ্রে চল রায়হানের মুক্তির কোন উপায় স্থির করি; এস আমার সঙ্গে।"

সায়ফুনের একবার ইচ্ছা হইল, কুলছুমকে রায়হানের মুক্তির কথা সব খুলিয়া বলে, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবিল, ইহাতে মিছামিছি একটা অনর্থের সৃষ্টি হইবে মাত্র। রাহেল শুনিলে এখনই তার সন্ধানে ছুটিবে। রায়হানের পলাইবার সুযোগ যত দীর্ঘ হয় ততই মঙ্গল।

সায়ফুন কুলছুমকে বলিল, "কোথায় যেতে হবে বল। মদ্যপায়ীদের উৎসবে আমি কিন্তু যেতে পারবো না, তোমার মাতাল স্বামী কি কাণ্ড করে বসে কে জানে।"

'পাগল হয়েছ? উৎসব কি আর আছে এখনো? দেখছো না আলোগুলি সব নিবে গেছে! তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে আমার স্বামীর আশার আলো জ্বলে উঠবে। তখন কৌশলে তার সাহায্যে রায়হানকে মুক্ত করতে পারবো। তুমি আমার কথামত খানিকটা শুধু মিথ্যা অভিনয় করবে, তারপর কার্যোদ্ধার হলে শুনিয়ে দেবে তোমার মনের কথা। আমার স্বামীর ভুল ভাঙবে, তার এত সাধের শূন্য-সৌধ ভেঙে চুরমার হবে; কিন্তু রায়হান পরিত্রাণ পাবে।"

"এ খেলার পরিণাম কি জান?"

"জানি! আমার খসম আমার উপর ক্ষেপে উঠবে, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিপদ যদি আসে আসুক। চল সায়ফুন! এই ত মাত্র কয়েকটা বাড়ী পার হলেই শরাবখানা; ওখানেই তার সন্ধান মিলবে।"

সায়ফুন প্রকৃতিস্থ ছিল না। দুশ্চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক ছিল তপ্ত কটাহের ন্যায় উত্তপ্ত; অভাগীর মানসনেত্রে তখন মুর্ত হইয়া উঠিয়াছিল-দূরে বহুদূরে, পাহাড়ের উপরে প্রাণভয়ে দ্রুত ধাবমান রায়হানের বেদনাহত পরিক্লিষ্ট ছবিটি। নিঃশব্দে সে কুলছুমের অনুগমন করিল।

০ ০ ০

উৎসবস্থানে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। রাত্রি প্রায় শেষ। ততক্ষণে এক ফালি চাঁদ জগত জোড়া অন্ধকার কতকটা যেন পাতলা করিয়া তুলিয়াছে। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে উভয়ে দেখিল-শরাবখানার বালুকাময় প্রাঙ্গণে খাটানো রহিয়াছে বিশাল এক চন্দ্রাতপ। উহারই চতুর্দিকে চর্মনির্মিত কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি তাঁবুর অভ্যন্তরে তখনও মিট মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে।

চাঁদোয়ার নীচে চারিদিক খোলা। বুঝা গেল ইহাতেই নৃত্যগীতের আসর বসিয়াছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শূন্য মদ্যপাত্র, কয়েকটি শূন্য ভান্ড ও উচ্ছিষ্টময় ভোজনপাত্র চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এখানে ওখানে ভূতলে বালি-শয্যায় কয়েকজন যুবক ও পৌঢ় নেশার ঘোরে বিভোর।

কুলছুম ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সব পুরুষদের দেখিয়া আসিল। অবশেষে সায়ফুনকে লইয়া ধীরে ধীরে চলিল ক্ষুদ্র তাঁবুগুলির দিকে। মন্দগতি বায়ুপ্রবাহে তাঁবুর দ্বারদেশে ঝুলানো পর্দাগুলি এক-একবার কিঞ্চিৎ ফাঁক হইয়া উড়িতেছে।

কুলছুম কয়েকটি তাঁবুর অভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিল–প্রতিটি তাঁবুতে খর্জুরপত্র নির্মিত দড়ির খাটিয়ায় ঘুমন্ত অর্ধোলঙ্গ নর-নারী অচেতন পড়িয়া রহিয়াছে মৃতবৎ, অনড়, অসাড়। খুঁজিতে খুঁজিতে পশ্চিমদিকের এক তাঁবুতে রাহেলের সন্ধান পাইয়া সে লক্ষ্য করিল–তাহার স্বামী এক সুন্দরী যুবতীর বাহু বন্ধনে শায়িত, উভয়েই নিদ্রায় অচেতন, শয্যাপার্শ্বে মৃন্ময় মদিরাপাত্র শূন্য। মর্মাহতা কুলছুম লজ্জায় মরিয়া সায়ফুনকে সেই দৃশ্য দেখাইল। তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে নিঃসাড়ে বাহির হইয়া আসিল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস।

লজ্জায়, ঘৃণায় সায়ফুনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিলমাত্র সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে তাহার আর ইচ্ছা রহিল না। কুলছুমকে টানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে সে দ্রুত পলায়ন করিল।

কিয়দ্দূরে আসিয়া কুলছুমকে সে তিরস্কার করিয়া বলিল, "এত বড় একটা নির্লজ্জ ব্যভিচার-দৃশ্য দেখাতে তুমি আমাকে নিয়ে এলে এখানে?"

কুলছুম বিষণ্ন বদনে উত্তর দিল, "দেখলে ত আমাদের দুর্ভাগ্যের আলেখ্য? এইবার ভেবে দেখ, আমরা তিন সতীন কী সুখে দিনপাত করছি। এ-সুখের হিস্‌সে তোমাকেও গ্রহণ করতে হবে ভেবে অন্তর আমার ফেটে যাচ্ছে দুঃখে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম তা'ও বুঝি পণ্ড হল। স্বামী নেশার ঘোরে ঘোর অচেতন, কানের কাছে ঢাক পিটালেও জেগে উঠবে না। রায়হানের মুক্তির কী উপায় করা যায় সায়ফুন?"

সায়ফুন শান্তভাবে বলিল, "অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে?" মরণ তার ঘনিয়ে এলে কেউ তা রোধ করতে পারবে না। চল ফিরে যাই ঘরে। কাল যা হউক করা যাবে। এখন একটু না ঘুমুলেই নয়।" এই বলিয়া সায়ফুন বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

কুলছুম অবাক হইয়া ভাবিল–তবে কি ওটা প্রেমের বাহানা মাত্র। সব কিছুই ঝুটা! সবই মেকী! বিরক্ত হইয়া সে অন্য পথ ধরিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সায়ফুন গৃহে ফিরিয়া শয্যা গ্রহণ করিল, কিন্তু ঘুম আসে কই! সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না–এই লম্পট রাহেল তাহার পাণিপ্রার্থী; অথচ তাহার ভ্রাতা, তাহার পিতা, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে। কপালে কি যে আছে, কে জানে! অদৃষ্টকে ধিক্‌কার দিতে দিতে সে জীবনের প্রতি

বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল—হায়রে কপাল! যে দেশের পুরুষ নারীকে মনে করে কেনা—বেচার সামগ্রী, খেলার জিনিস, বিলাসের উপকরণ; সে দেশে নারীর কোন মর্যাদাই নাই; সতীত্বের কানাকড়ি মূল্যও নাই। যে দেশে নারীর জন্মগ্রহণ বিধাতার অভিশাপ বলিয়াই গণ্য হয়—সে দেশে আল্লাহ্ তা'আলা কি সুখেই না নারী জাতির সৃষ্টি করিলেন! সায়ফুনের নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা পুনরায় গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু পরক্ষণে রায়হানের মুক্তির কথা মনে হইতেই তাহার অন্তর আবার বিমল আনন্দে ভরিয়া উঠিল, মানসপটে তখন ভাসিয়া উঠিয়াছে—রায়হানের সৌম্য—শান্ত অবয়ব। ভাবিল, এতক্ষণে হয়তো সে চলিয়া গিয়াছে বহুদূর। আহা, এ রজনী যদি আর প্রভাত না হইত! হে মঙ্গলময় রহমান! তোমার অনন্ত করুণা সিন্ধুর এক বিন্দু রায়হান যেন লাভ করে। তুমি যেন তাকে রক্ষা করো!

রায়হানের যাত্রাপথের কাল্পনিক দৃশ্যাবলী সায়ফুনের মানসনেত্রে চিত্রপটের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। তাহার বন্ধন মুক্ত কল্পনার স্রোত পথে—প্রান্তরে, গিরি-শিখরে, উষর ভূমিতে কেবলই ছুটিয়া বেড়াইতেছে রায়হানের সন্ধানে। অবিরাম চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল, তখন রাত্রি আর নাই; প্রত্যূষের ক্ষীণ রশ্মি কাষ্ঠনির্মিত গৃহ—প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ শুরু করিয়াছে।

আট

ব্যথা-ভারাক্রান্ত দুর্বল দেহ লইয়া রায়হান দ্রুত চলিতে পারিলেন না; অনাহার ও পীড়নজনিত ক্লান্তি তাঁহার সর্বাঙ্গ অবশ করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি উপায় নাই। পশ্চাতে শত্রুর শাণিত তরবারি তাঁহার জীবনাঙ্কের যবনিকা টানিতে উদ্যত। প্রভাতের আলোকরশ্মি তাঁহার পলায়ন কাহিনী যখন প্রচার করিয়া দিবে, তখনই উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে শত্রুদল তাঁহার সন্ধানে চারিদিকে ছুটিবে। রায়হান মরিয়া হইয়া ছুটিতে লাগিলেন।

বালুকাময় দেশ। মাঝে মাঝে বৃক্ষলতাবিহীন ছোট ছোট পাহাড় পার্বত্য-পথ ও প্রস্তর সমাকীর্ণ প্রান্তর। এখানে ওখানে দুই একটা পাতলা ঝোপ-জঙ্গল, লতাগুল্ম ও কাঁটাবন তাঁহার গতিবেগ ব্যাহত করিতে লাগিল। পদতল ক্ষতবিক্ষত। অস্পষ্ট আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন-অদূরে মূর্তিমান আজরাইলের বেশে এক কৃষ্ণ পাহাড় তাঁহারই দিকে চাহিয়া যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। রায়হানের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল-কী সর্বনাশ। ঐ দুর্গম গিরি-শিখর লংঘন করিয়া ওপারে পৌঁছিতে হইবে। আচম্বিতে বাঁচিবার সকল আশা যেন নির্মূল হইয়া গেল। তাঁহার বক্ষস্থলের দ্রুত স্পন্দনধ্বনি ঠক ঠক করিয়া কানে বাজে, কম্পিত পদদ্বয় দেহভার বুঝি বহন করিতে অক্ষম।

রজনীর তৃতীয় যাম অতীত প্রায়। রায়হান বুঝিতে পারিলেন, পশ্চাদ্ধাবমান মৃত্যুদূত তাঁহার পৃষ্ঠদেশে যেন নিশ্বাস ফেলিতেছে। এখনই বুঝি হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু কোথায় পালাইবে সে? কি ভাবেই বা যাইবে? আর যে চলিতেই পারে না। পরক্ষণেই সম্মুখস্থ এক প্রস্তরখণ্ডে হোঁচট খাইয়া ভূমিতলে তিনি ছিটকাইয়া পড়িলেন।

কিন্তু বাঁচিবার উদগ্র আকাঙ্খা রায়হানের ব্যথাতুর দেহ-মন আবার চাঙ্গা করিয়া তুলিল। তাঁহার অন্তরে স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে দয়াময় রহমানুর রহীম তাঁহাকে শত্রুর তীক্ষ্ণধার অসিতল হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে

অবিশ্বাসীদের কোপানল হইতে রক্ষা করিবেন। তাঁহার অবসাদ-পঙ্গু দেহ আবার যেন সজীব হইয়া উঠিল। কোনক্রমে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া তিনি চলিতে লাগিলেন।

অরণ্যের প্রাচীর ঠেলিয়া উঁকি মারিয়া উঠিল এক ফালি রূপালী চাঁদ। কোন অদৃশ্য হস্ত অন্ধকারে রায়হানকে পথ দেখাইতে যেন অন্তহীন সুনীল গগনে এক দ্যুতিময় রজতবর্তিকা ঝুলাইয়া দিল।

সম্মুখে দণ্ডায়মান খর্জুর বীথিকার দুর্লংঘ প্রাচীরও নতি স্বীকার করিল তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির নিকট। চলার পথ তবুও কত দুর্গম! বনানীর ওপারেই প্রস্তরাকীর্ণ বন্ধুর গিরিপথ। ত্রস্ততা নিবন্ধন মাঝে মাঝে যথাস্থানে পা ফেলিতে ভুল করিয়া কেবলই তিনি হোঁচট খাইয়া পড়িতে লাগিলেন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে পথিকের পদতল হইতে দুই এক খণ্ড স্খলিত প্রস্তর আর্তনাদ করিয়া নিম্নে গড়াইয়া পড়িতেছে। রায়হান প্রাণভয়ে পাগলের ন্যায় ছুটিতে লাগিলেন। মানসনেত্রে দেখিতে পাইলেন-পশ্চাতে আজরাইলের প্রসারিত হস্তদ্বয় কেবলই বুঝি আগাইয়া আসিতেছে তাঁহাকে ধরিবার জন্যে; আবার সম্মুখের ঐ পাহাড়ের দিকে বিপুলভাবে যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে আশার মোহিনী শক্তি।

ঐ ত শোনা যায় সম্মুখে কৃষ্ণগিরির পাদমূলে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদীর কল্‌কল্ ধ্বনি। নদী পার হইয়া ওপারের পাহাড় লংঘন করিতে পারিলেই বহু দুরে সমুদ্রসৈকতে নিবিড় বনানীর অগ্রভাগ অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইবে। সেই বনভূমিই ঈসের জঙ্গল নামে খ্যাত।

নদী অপরিসর। তৃষাতুর রায়হান প্রাণ ভরিয়া পানি পান করিতে নদীতে ঝাঁপাইযা পড়িলেন। স্রোতের বেগ তীব্র নহে, তথাপি তাঁহার অবসাদগ্রস্ত হস্তপদ ক্লান্ত দেহখানি কোনমতেই ভাসাইয়া রাখিতে পারিতেছে না; আস্তে আস্তে তাঁহার সন্তরণ শক্তি রহিত হইয়া আসিল। রায়হান এক-একবার ডুবিয়া যাইতেছেন, আবার ভাসিতেছেন; তবুও সর্বশক্তি সঞ্চয় করিয়া বহু কষ্টে স্রোতের উপরে ভাসিয়া রহিলেন। তরঙ্গাঘাতে ডুবিয়া-ভাসিয়া, আবার ডুবিয়া আবার ভাসিয়া কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ক্রমে তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইবার উপক্রম; শিথিল-অবশ হস্তপদ তরঙ্গোপরি মৃদু সঞ্চালন করিবার ক্ষমতাও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। ধীরে ধীরে পদদ্বয় কেবলই তলাইতে লাগিল।

অকস্মাৎ পদতলে কঠিন বস্তুর সংঘাতে রায়হানের লুপ্তপ্রায় চেতনা ফিরিয়া আসিল। ভয়ে ভয়ে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই তিন বুঝিলেন, পদতলে মৃত্তিকা–ভাসিতে ভাসিতে নদীর কিনারে আসিয়া পৌছিয়াছেন। সেইস্থানে পানি মাত্র এক বুক। শ্লথ–মন্থর পদদ্বয় ধীরে ধীরে টানিয়া তিনি তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

যখনই উপরে উঠিলেন তখন রাত্রি প্রায় ভোর; এদিক–ওদিক দুই একটি পাখির কল–কাকলি মৌনী রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিতে শুরু করিয়াছে। সুষুপ্ত ধরণীবক্ষে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে প্রাণ–চাঞ্চল্য, কর্ম প্রেরণা ও সজীবতা।

শ্রান্ত দেহখানি কোনক্রমে নদীতটে টানিয়া লইয়া রায়হান পানির ধারেই একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন– সম্মুখে বিরাট পাহাড় সগর্বে পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। সহসা অদূরে অশ্ব–পদশব্দ যেন শ্রুত হইল। রায়হান ভাবিলেন–নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, নতুবা অসময়ে এইখানে অশ্বপৃষ্ঠে কে ছুটিয়া আসিবে! অবিলম্বে এক ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। দেখিলেন, কোন অশ্বারোহী বা উষ্ট্রারোহী নহে, এক যূথভ্রষ্ট অশ্বশাবক হিংস্র পশুর তাড়া খাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে।

এই অঞ্চলের নেকড়ে বাঘগুলি বড় দুর্দান্ত। এখনও যে বাঁচিয়া রহিয়াছেন, ইহাতে রায়হান নিজেই আশ্চর্যবোধ করিলেন। আল্লাহ্‌র শোকর–গুজারী করার ভাষা তিনি খুঁজিয়া পান না। কিন্তু যথাসত্বর এই স্থান পরিত্যাগ করা প্রয়োজন, কেননা বন্য পশু ও শত্রু ভয় দুইই এখানে বিদ্যমান। ভাবিলেন, সম্মুখের গিরিশিখর লংঘন করিতে পারিলেই শত্রু সীমানার বাহিরে আসিয়া পড়িবেন। অনতিবিলম্বে রায়হান পাহাড়ের বন্ধুর গা বাহিয়া অতিকষ্টে উপরে উঠিতে লাগিলেন।

পাথরের পর পাথর অতিক্রম করিয়া এই দুর্বল অবসন্ন দেহে গিরিশিখরে আরোহণ করা–সেও কি সম্ভব! দুঃসহ যন্ত্রণায় এক–একবার তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠেন, কিন্তু তবুও যেন পাহাড়ের উপর হইতে কাহার অদৃশ্য হস্ত দোযখের পুঞ্জীভূত অন্ধকার হইতে তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া বেহেশতের আলোর

সন্ধানে লইয়া যাইতেছে; কে যেন মুক্তির মধুর আহ্বান কর্ণকুহরে ঢুকাইয়া, পলে পলে, ক্ষণে ক্ষণে, তাঁহার অন্তর সঞ্জীবনী সুধায় ভরিয়া দিতেছে।

পাথরগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে রায়হান অনেকটা উপরে উঠিলেন। চাঁদ ওদিকে পাহাড়ের আড়ালে তলাইয়া গিয়াছে, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে সেই পাহাড়ের উপরিভাগ অনেকটা ফরসা বটে, কিন্তু নীচে অন্ধকার যেন জমাট বাধা। পাথর ঠেলিয়া আরো কিছুটা উপরে উঠিতে পারিলেই তিনি আজরাইলের আওতার বাহিরে আসিয়া পড়িবেন, কিন্তু সর্বাঙ্গ তখন প্রায় অবশ-অনড়; তদুপরি বারংবার পদস্খলন হইতেছে। জোরে পাথরগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রায়হান ক্লান্ত দেহখানি কোনক্রমে টানিয়া তুলিতে লাগিলেন উপরে।

বহুক্ষণে, বহু ক্লেশে রায়হান পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। দুই হাত উপরে তুলিয়া আর একবার তিনি শুকরিয়া আদায় করিলেন মহান বিশ্বস্রষ্টার দরবারে।

ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে বারবার তাকাইয়া রায়হান সমুদ্রতটে সেই বনানীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ-কি! কোথায় সেই বনভূমি! কোথায়ই বা সেই সম্রাতট! দেখিলেন, নিম্নে মালভূমির পাদদেশে শ্যামল প্রান্তরে এক বেদুঈন পল্লী; ডানদিকে ঝোপ-জঙ্গল-পরিবৃত ছোট ছোট টিলাগুলির ওপারে দূরে বহু দূরে কাল অরণ্যরেখা। পশ্চাতে গিরিপাদমূলে সেই পার্বত্য নহর আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন মিশিয়া গিয়াছে দূরে বালুকাময় প্রান্তরে।

রায়হানের বুঝিতে বাকী রহিল না-জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনেকটা বা দিকে তিনি সরিয়া আসিয়াছিলেন, ভাগ্যাকাশে আশার আলো ফুটিতে না ফুটিতেই আবার এমনভাবে দুর্যোগের কাল মেঘ যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে কে জানিত! হতাশায় নির্মম আঘাতে রায়হানের পদদ্বয় যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার। আর পরিত্রাণ নাই। অন্ধকারে ভুলপথে চলিয়া তিনি হিংস্র বেদুঈনদের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছেন। সেই চিরশত্রু অসভ্য বেদুঈন! -দয়ামায়ার লেশমাত্রও যাহাদের অন্তরে নাই। সর্বস্ব লুণ্ঠন মানসে পথিকের বুকে ছোরা বসাইয়া, নির্বিকার চিত্তে উহারা তামাশা দেখে। রক্তরঞ্জিত খঞ্জরই যে ইহাদের জীবিকার প্রধান সহায়!

পা আর চলে না, তবু বাঁচিবার শেষ চেষ্টা করিতেই হইবে। কালবিলম্ব না করিয়া রায়হান লতাগুল্মবিহীন মালভূমির খাড়া উৎরাই বাহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিতে লাগিলেন।

দুই-তিন পা যাইতে না যাইতেই রায়হানের যেন শ্রুতিগোচর হইল-কোন মানুষের কঠোর কণ্ঠস্বর। গা শিহরিয়া উঠিল। শুনিলেন, নিকটেই কে একজন বিকট অট্টহাস্য সহকারে চিৎকার করিতেছে "কে রে মুসাফির! পালাবি ভেবেছিস্? পালাবি? হাঁঃ! হাঁঃ! হাঁঃ! সে বিকট চিৎকারধ্বনি চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল পাহাড়ে প্রান্তরে; পরক্ষণেই আবার সে চেঁচাইয়া উঠিল, "পালাবি কোথায়? ভেবেছিস হাবিলের হাত থেকে মুক্তি পাবি!" সঙ্গে সঙ্গে এক বিক্ষিপ্ত তীর শন্‌শন্‌ শব্দে রায়হানের মাথার উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। রায়হান পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিলেন, এক বেদুঈন-দস্যু তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া পুনরায় শর যোজনা করিতেছে। দিশাহারা হইয়া যেই তিনি ডানদিকে ঘুরিয়া নিম্নে ঝোপের আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিলেন,অমনি ত্রস্ততা ও অসাবধানতাবশত তাঁহার পদস্খলন হইল। রায়হানের দেহ পাহাড়ের বন্ধুর গা বাহিয়া, পাথরে পাথরে ঘা খাইয়া, নিম্নে গড়াইতে লাগিল। দুই হাতে পাথরগুলি তিনি আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিলেন-পারিলেন না; কঠিন প্রস্তর-স্তরে আঘাতের পর আঘাতে তাঁহার অবসন্ন দেহ ক্ষতবিক্ষত হইল।

রায়হান চেতনা হারাইলেন। হতভাগ্যের স্পন্দনহীন দেহ নীচে গড়াইতে গড়াইতে পাহাড়ের পাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইল।

নয়

বহির্বাটীতে তুমুল কোলাহল শুনিয়া সায়ফুনের নিদ্রা ভাঙ্গিল। উঠিয়া দেখে-বেলা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ কাহার যেন আর্তনাদ-ধ্বনি সায়ফুনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেই তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, তবে কি তাহারা রায়হানকে আবার ধরিয়া আনিয়াছে! তাঁহাকে বাঁচাইবার সকল চেষ্টাই কি শেষ পর্যন্ত বিফল হইল!

সায়ফুন দুই নয়ন মুছিতে মুছিতে পাগলিনীর ন্যায় বাড়ীর বাহিরে যেস্থানে চিৎকার ও কোলাহল শোনা যাইতেছিল সে স্থানে ছুটিল। যে দৃশ্য নয়নগোচর হইল তাহাতে তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; দুশ্চিন্তা-ভারাক্রান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্কের প্রতি শিরা-উপশিরা অনল-শিখা যেন উদ্দাম চঞ্চল হইয়া ছুটিতে লাগিল। দেখিল, যে গৃহে রায়হান গত রাত্রে বন্দী ছিলেন তাহারই নিকটে এক উন্মত্ত জনতা রায়হানের ভ্রাতা আরফানকে ধরিয়া নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে। চারিদিকে তামাশাধীন স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকার এক বিরাট সমাবেশ। মজা দেখিবার জন্য, অনেকেই ঠেলাঠেলি, ধাক্কা-ধাক্কি করিয়া, আগাইয়া আসিতেছে গলা বাড়াইয়া; অনেকেই আরফানকে গালাগালি দিতেছে অকথ্য অশ্লীল ভাষায়। সায়ফুন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল-জাহেদ, ওকায়া, সা'আদ, শোহেলী প্রভৃতি গ্রামের সর্দারগণ সকলেই উপস্থিত; সকলেই নানাভাবে বন্দীর শাস্তি বিধান করিতে রূঢ়বাক্যে হুকুম করিতেছে। কেহ চিৎকার করিয়া বলিতেছে-হারামীকে পুড়িয়ে মার; কেহ বলিতেছে-ধর্মদ্রোহীকে পুঁতে ফেল জ্যান্ত; কেহ আদেশ দিতেছে-শয়তানকে শূলে বিদ্ধ করে ফেলে রাখ প্রখর রৌদ্রে তপ্ত বালির উপরে, এমন সময় সেখানে কোথা হইতে রাহেল ছুটিয়া আসিয়া ভূমিতলে বন্ধনাবদ্ধ আরফানকে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, "বিশ্বাসঘাতক! ধর্মদ্রোহী ভ্রাতাকে মুক্তি দেবার ফল ভোগ কর!"

শোহেলী রোষে গর্জন করিয়া উঠিলেন, "এত বড় আস্পর্ধা! শোহেলীর শিকার ছিনিয়ে নেবার দুঃসাহস! মুনাফিক! তুই না কাল সেই বাচ্চা শয়তানকে নিজে

শাস্তি দিতে এসেছিলি? ভণ্ডামির আর জায়গা মিলে নি! নিমকহারাম! ভেবেছিস তুই নিস্তার পাবি! এখনই তোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে পশুপক্ষীর উদরে পাঠাবো। কে আছ? হতভাগার দুই পা দুই অশ্বপৃষ্ঠে বেঁধে, উহাদের জোরে কষাঘাত করে, দু'দিকে ছুটাও।"

আদেশ পাইবা মাত্র তিন–চারজন যুবক সর্দারের হুকুম পালন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল।

ব্যাপারটা সায়ফুন পরিষ্কার বুঝিতে পারিল না। চাহিয়া দেখিল, অদূরে তাহারই ভ্রাতৃবধূ যোহরা পাড়ার সমবয়স্কা কয়েকটি যুবতীর সঙ্গে এক বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান। আরফানের নির্যাতন দৃশ্য দেখিয়া তাহারা পরম কৌতুক বোধ করিতেছে, হাসিতে হাসিতে একে অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে; নিকটে উন্মত্তের ন্যায় ক্রন্দনরতা আরফানের স্ত্রী হালিমা। কয়েকজন যুবতী তাহাকে সজোরে ধরিয়া রাখিয়াছে। হালিমা তবুও নিরস্ত হয় নাই, পাগলিনীর ন্যায় চিৎকার করিতে করিতে সকলকে ঠেলিয়া, হাত–পা ছুড়িয়া কামড়াইয়া, বসন ছিঁড়িয়া, স্বামীর নিকটে সে ছুটিয়া আসিবার নিষ্ফল চেষ্টার পণ্ডশ্রম রত। এ দৃশ্য সায়ফুনের অন্তর সীমাহীন বেদনায় ভরিয়া তুলিল।

সায়ফুন দৌড়াইয়া গিয়া যোহরার হাত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "ভাবী, কি হয়েছে? কী করেছেন আরফান ভাই?"

যোহরা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি দেখছি এ দুনিয়ায় বাস কর না। কোন খবরই রাখ না। এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো নাকি? বিয়ের নেশায় মশগুল ছিলে বুঝি?"

সায়ফুন যোহরার হাত দুইটিতে ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, "কী হয়েছে বল না ভাবী, কেন তারা মারছে ওঁকে অমন করে?"

যোহরা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "এই হতভাগা আরফান রাত্রে চুপিসারে এসে ছেড়ে দিয়েছে রায়হানকে। এখন মজা বুঝুক।"

সায়ফুন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনিই যে রায়হানকে ছেড়ে দিয়েছেন, এ কথা তোমরা জানলে কি করে?"

যোহরা হাত–পা নাড়িয়া অপূর্ব মুখভঙ্গী সহকারে বলিল "যোহরা সঠিক না জেনে কোন কথাই বলে না। তোমার ভাই সকালে ছবিরকে সঙ্গে নিয়ে জলসা

থেকে ফিরছিল। বাড়ীর বাইরে এসে দেখে, আরফান দুয়ারে বসে হাউ-মাউ করে কাঁদছে। সে কী মায়াকান্না! তোমার ভাইকে দেখে কেঁদে কেঁদে বলে, 'ওৎবা, রায়হানকে তোমরা সত্যি সত্যিই মেরে ফেললে?" ন্যাকামি আর বলে কাকে! তোমার ভাই কি এতই বোকা! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখে রায়হান নেই। অমনি ছুটে এসে তাকে বন্দী করে ফেললে। আরফান ভেবেছিল, তার মায়াকান্না দেখে লোকে ভুলবে, তার উপর কোন সন্দেহ করবে না; কিন্তু আমার খসমকে ধোঁকা দেওয়া কি সহজ না কি!" স্বামীর পৌরুষ-গর্বে যোহরার বুকখানি বুঝি ফুলিয়া উঠিল।

সায়ফুনের আর অধিক শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। তন্মুহূর্তে সে স্থান ত্যাগ করিয়া তাহার পিতার নিকটে সে ছুটিল।

শোহেলী তখনো ক্ষোভে, রোষে অধীর হইয়া আরফানকে গালি বর্ষণ করিতেছিলেন, নিকটেই কয়েকজন বলিষ্ঠ পুরুষ অশ্বপৃষ্ঠে আরফানের দুই পা শক্ত করিয়া বাঁধিতেছিল। তাহার করুণ আর্তনাদ পাষাণ-প্রাণ কুরাইশদের অন্তরে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চারও করিল না।

সায়ফুন পিতার পদতলে লুটাইয়া বলিল, "আব্বা! ইনি নিরপরাধ, ছেড়ে দিন এঁকে! আপনাদের বন্দীকে যে মুক্ত করেছে সে তো ইনি নন। আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি। আমার কথা বিশ্বাস করুন আব্বা! ভুল করে নির্দোষকে শাস্তি দেবেন না।" এই বলিয়া সায়ফুন পিতার পায়ের উপর হাত রাখিয়া কাতরনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুহূর্তের জন্য চারিদিকের কৌতূহলী নরনারী বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীর কথাগুলি শুনিয়া তাহারা পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিল।

শোহেলী বজ্র গম্ভীর স্বরে সায়ফুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই জানিস? বল তবে, কে সেই দুঃসাহসী! তুই তাকে দেখেছিস?"

সায়ফুন অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর করিল, "হাঁ আব্বা দেখেছি, সব জানি, সর্বাগ্রে এই নিরপরাধকে ছেড়ে দিন।"

শোহেলীর আদেশে ওৎবা তৎক্ষণাৎ আরফানকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। শোহেলী উচ্চঃস্বরে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল তবে শিগ্‌গির, কে সেই পাপিষ্ঠ! কোথায় সে? এখনই তাকে হত্যা করে অন্তরের জ্বালা জুড়াব।"

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে কুরাইশ সর্দারগণ চিৎকার করিয়া উঠিল, "কে সেই দুরাত্মা? কার এত দুঃসাহস! আমরা এখনই তাকে শাস্তি দেব! কে সেই বিশ্বাসঘাতক?"

সায়ফুন অবনত মস্তকে পিতার পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর স্বরে নিবেদন করিল, "আব্বা! আমিই সেই অপরাধিনী, বন্দীকে আমিই মুক্তি দিয়েছি। এক নিরপরাধ মুসলমানকে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের জন্য হত্যা করবেন, এ অবিচার আমি সইতে পারিনি।"

এ সংবাদ কেহ কল্পনাও করে নাই। অকস্মাৎ সে স্থানে বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত ঘটিল। স্তব্ধ জনতার প্রতিটি অন্তর নিদারুণ নৈরাশ্য ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। বিস্ময়-বিহবল শোহেলী ক্রোধে দন্তপাটি ঘর্ষণ করিতে করিতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "পাপিষ্ঠা, এমন কথাও শুনতে হলো আমাকে! বিদ্রোহীকে মুক্তি দিলে তুই নিজে! এত বড় দুঃসাহস! এত বড় স্পর্ধা!" তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনলশিখা যেন অবিরাম বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

যোহরা অগ্রসর হইয়া বলিল, "মিথ্যা কথা! সম্পূর্ণ মিথ্যা! রায়হানের প্রেমে নিরাশ হয়ে, সে চায় আত্মঘাতিনী হ'তে। প্রায় সারা রাত আমি তো তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। কখন আবার মুক্ত করলো সে রায়হানকে!"

কুলছুমও সেস্থানে উপস্থিত ছিল। সায়ফুনকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে সেও নানা অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিল। গ্রামবাসীদের কেহ কেহ এ ঘটনা বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। চারিদিকে শুরু হইল গুঞ্জরণ।

বনি ইক্‌রাম দলের সর্দার ইব্‌নে হারিব ইশারায় সা'দকে নিকটে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "ভারি তো মজার ব্যাপার হে! মেয়েটা কেন মুক্তি দেবে ওকে? দেখা যাক সর্দার শাস্তিটা কি দেয়!"

সা'দ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "বেচারা আরফান বেঁচে গেল খুব। কিন্তু রহস্যটা বল তো? এশ্‌ক্ না দেওয়ানা!"

অপর পার্শ্বে জায়েদ ওকায়ার গা টিপিয়া মন্তব্য করিল, "অসহায় দরিদ্রের উপরই শাস্তির বহর যত অধিক হয়। আপন কন্যার বেলায় ততটা কি আর হবে না কি! আমরা কিন্তু ইনসাফ চাইবো! কে জানে মেয়েটা কুলটা কিনা! নতুবা ধর্মদ্রোহী রায়হানকে মুক্তি দেবার এত সাধ কেন বল তো?"

কানাঘুষার কতকটা শোহেলীর কানেও পৌছিল। রোষান্ধ লোচনে জনতার প্রতি তাকাইয়া তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভেবেছ কি বিচারভার গ্রহণ করে অন্যায় কিছু করবো? নিশ্চয়ই জেনো, শোহেলী আপন কর্তব্যে সচেতন।" তারপর কন্যার দিকে ফিরিয়া সরোষে গর্জন করিয়া উঠিলেন, "পাপীয়ীস! মিথ্যাচারণ করছিস? জানিস এর পরিণাম? তোর শাদী রাহেলের সঙ্গে ঠিক হয়েছে শুনেছিস, তবে কেন রায়হানকে তুই মুক্ত করতে যাবি?"

সায়ফুন শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে নিবেদন করিল, "আব্বা! মিথ্যা আমি বলিনি। যে ধর্মমত রায়হানকে অন্যায়-উৎপীড়ন, ব্যভিচার-অনাচার, অখাদ্য-কুখাদ্য আর প্রস্তর পূজা থেকে দূরে থাকতে শিখিয়েছে, সেই ধর্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি তাঁকে মুক্তি দিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, এই দেখুন তাঁর হাতের আংটি। স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এটি আমি গ্রহণ করেছিলাম মুক্তিকালে তাঁর হাত থেকে।"

রোষোন্মত্ত শোহেলী আংটি হাতে লইয়া দেখিলেন, উপরে খোদিত রহিয়াছে- 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পরম দয়াময়।' দ্বিগুণ রোষে তিনি আংটিটি ভূতলে উপবিষ্ট আরফানের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এ কার আংটি, আরফান?"

বন্ধনমুক্ত আরফান অবনতমস্তকে বসিয়া তাঁর মুক্তির কথাই ভাবিতেছিলেন। অঙ্গুরীয়ক উঠাইয়া তিনি উহা দেখামাত্র বলিলেন, "হ্যাঁ, এ আংটি রায়হানেরই বটে; আংটির উপরে ওসব লেখায় আমি একদিন তাকে খুব প্রহার করেছিলাম।"

সর্দারগণ একে একে আংটিটি পরীক্ষা করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

শোহেলীর ধৈর্যের বাঁধন বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়। পরিষ্কার বুঝিতে আর বাকী নাই- এই মুহূর্তে তাঁহার মান-সম্ভ্রম,আভিজাত্য সবই যেন ধুলিসাৎ। এতদিন তো জোর গলায় তিনি প্রাচীন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিলেন, সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া ইসলাম প্রচার ব্যাহত করিয়াছিলেন। আর আজ কিনা আপন দুহিতা দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা তাঁহারই মাথায় ঢালিয়া দিয়াছে। দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় তিনি মাটিতে মিশিতে পারিলে বাঁচেন। পল্লী-সর্দারদের তাচ্ছিল্যপূর্ণ বক্রোক্তিতে তাঁহার সর্বাঙ্গ বিছুটির আঘাতে যেন জর্জরিত।

ক্ষিপ্তপ্রায় শোহেলী পায়চারী করিতে করিতে বকিতে লাগিলেন, "সমাজদ্রোহিনী পাপিষ্ঠা, কুল-কলঙ্কিনী! শৈশবেই তোকে হত্যা করতে চেয়েছিলুম, পারিনি। তোর মাতাকে এই চুক্তিতে নিকাহ করেছিলুম—তার গর্ভে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মুখে স্বহস্তে তাকে জিয়ন্ত প্রোথিত করবে; কিন্তু হতভাগিনী তোর জন্মের পরক্ষণেই বিষাক্ত তীর বুকে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেছিল। সেই সময় তোর ফুলের মত মুখখানা দেখে মমতায় বাঁধা পড়েছিলাম। আহা! যদি জানতাম সেই সুন্দর কুসুম-কোরকে বিষধর সাপ লুকিয়েছিল! সেদিন তোকে রক্ষা করে যে মহাপাপ করেছিলাম, আজ ভুগছি তার বিষময় ফল।" শোহেলীর আবেগ ভরা কণ্ঠে আর কথা ফুটে না। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া তিনি ওষ্ঠাধর কামড়াইতে লাগিলেন।

জনতার ভিতর হইতে ইবন হারিব নামক এক যুবক চেঁচাইয়া উঠিল, "সর্দার-কন্যা বন্দী মুসলমানকে মুক্তি দিয়েছে, নিজেও যেন ইসলামে বিশ্বাসী। বিদ্রোহিনীর সমুচিত শাস্তি আমরা দাবী করি। মমতার বশবর্তী হয়ে বিচারে পক্ষপাতিত্ব দেখালে গৃহযুদ্ধের কিন্তু সূচনা হবে সর্দার।"

শোহেলী গর্জিয়া উঠিলেন, "কুরাইশ দলপতি স্নেহ-মমতার দাস নয়। শৈশবে যে শাস্তি তাকে দেওয়া হয়নি, আজ যৌবনে তা দিতেই হবে! কে আছিস্? যোহরা, খালেদা, ছমিনা! পাপিষ্ঠাকে এই মুহূর্তে আমার দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যা, অন্তঃপুরে কড়া পাহারায় বন্দী করে রাখ। যাও ওৎবা, ঘোষণা করে দাও- কাল প্রভাতেই পবিত্র ভূমির বাইরে ঐ পর্বতের সানুদেশে তাকে জিয়ন্ত প্রোথিত করা হবে। ঘটা করে কিন্তু এ কাজ সমাধা করা চাই। শোন রাহেল! তোমার সঙ্গে তার শাদীর ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল, পাপিষ্ঠার নিধনকার্যের ভার তোমাকেই নিতে হবে। কই সেই আংটি? ফিরিয়ে দাও ওটা শয়তানীকে! হতভাগিনী পরীক্ষা করে দেখুক,মুক্ত বন্দীর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কত দয়াময়! ওৎবা! অবিলম্বে চারদিকে যোদ্ধাদের পাঠিয়ে দাও-লোকালয়ে, পাহাড়ে-জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি করে বন্দীর সন্ধান করুক। আর আরফান! যাও, তুমি মুক্ত।"

বিচারসভা নিস্তব্ধ। কারও মুখে কোন কথা নাই। নিমেষের সেই স্তব্ধতার ভিতর সায়ফুন দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া করুণ আর্তনাদ সহকারে ভূমিতলে লুটাইয়া

পড়িল। অভাগিনীর অসাড় দেহে চেতনা নাই। যোহরা, কুলছুম ও বাঁদী ছালেহা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া সংজ্ঞাহীনা সায়ফুনের দেহপল্লব উঠাইয়া অন্তঃপুরে যাত্রা করিল।

সভা শেষ। একে একে সকলে হৃষ্টমনে আপন গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে। পুরনারিগণ হালিমাকে ছাড়িয়া দিতেই সে পাগলিনীর ন্যায় স্বামীর নিকটে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কেন এসেছিলে এখানে? শিগ্‌গির উঠ। বাড়ী চল।"

আরফান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন। স্ত্রীর স্কন্ধদেশে ভর দিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে বলিলেন, "বড় বেঁচে গেছি হালিমা! আজ্‌রাইলের হাত থেকে মেয়েটা জানের বদলে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে।"

হালিমা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "একাকী কেন এসেছিলে? তুমি না বলেছিলে, লোকজন নিয়ে আসবে?"

"চেষ্টার ত্রুটি করিনি হালিমা! দরিদ্রের বন্ধু এ জগতে কেউ যে নেই। যেখানেই আমাদের দুঃখের কথা বলেছি, সেখানেই শুধু অবজ্ঞা, অবহেলা আর তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত পেয়েছি। তালহা, মূসা, ইব্‌নে আমীন, ইব্‌নে মাসুম প্রমুখ আত্মীয়-বন্ধুগণ আমাকে কী উত্তর দিলে জান?"

"কি বললে তারা?"

"সকলেই একবাক্যে জানালে-রায়হান ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে ধর্মত্যাগী। ধর্মত্যাগের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে! বিদ্রোহীর উদ্ধারকার্যে সাহায্য করতে তা'রা পারবে না।"

"তোমার মুখের উপরই এত সব বললে?"

"হ্যাঁ।"

"তবে তুমি একাকী কোন্ সাহসে এসেছিলে এখানে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আরফান বলিলেন, "যখন বুঝলাম বল প্রয়োগের কোন আশা নেই, তখন চেয়েছিলাম অনুনয়-বিনয় করে কার্যোদ্ধার করতে; কিন্তু

কোথাও খুঁজে পেলাম না তাঁকে। হতাশ হৃদয়ে বসে বসে ভাবছিলাম–হয়তো তারা মেরেই ফেলেছে রায়হানকে। আচ্ছা হালিমা, কী মনে হয় তোমার? বেঁচে আছে রায়হান?"

"এখনও তোমার অবিশ্বাস হয়?"

"হালিমা! জান, কে তাকে বাঁচালে' কে আমাকে রক্ষা করলে?"

"কেন, শুন নি সব কথা? কী মনে হয় তোমার?"

"কি মনে হয়, জান? বিশ্বভুবন যাঁর সৃষ্টি এ যেন তাঁরই কীর্তি! মনে হয়, রায়হান আর সায়ফুন ঠিকই বুঝেছে। আমরাই শুধূ ভুল পথে চলেছি। আমার অন্ধকার অন্তরে তারা আলোর সন্ধান যেন দিয়ে গেল। মেয়েটার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারবো না। একবার যাবো হালিমা?"

"কোথায় যাবে?"

"সেই পুণ্যবান পুরুষের খেদমতে।"

"কার কথা বলছো?"

"কেন শোন নি? সেই দয়ার অবতার মহানবী মুহম্মদ (সঃ)। সেই আল-আমীন! তাঁরই কদম মোবারক চুম্বন করে দু'টি ধর্মের কথা শুনবো, পরকালের মুক্তির পথ খুঁজবো। আজ তাঁকে রসূল বলে আমি বিশ্বাস করি মনেপ্রাণে।"

"দেখেছ তাঁকে? কেমন তিনি?"

"তুলনা হয় না; পবিত্রতা ও করুণার উৎস–সমগ্র সৃষ্টি জগতের মূর্তিমান কল্যাণ! রায়হান, ছায়াহীন ও গন্ধহীন আলো-হাওয়া যেমন সমস্ত রঙ্গরস ও মাধুরীর উৎস, ঠিক তেমনই। যাবে হালিমা? যাবে সেখানে?"

"পাপীর ভাগ্যে তাঁর দর্শনলাভ কি সম্ভব হবে?"

"কি যে বল! পাপীর মুক্তির জন্যই তো জগতে তাঁর আবির্ভাব! সারা জাহানের মুক্তির বাণী তিনিই তো মানুষকে শুনিয়েছেন! তিনিই তো রহমাতুল-লিল-

আ'লামীন! তাঁর নিকটে কি ভেদাভেদ আছে? এইবার ছেড়ে দাও, হালিমা। হাঁটতে পারবো।"

"সাবধানে চল, বড় কষ্ট পেয়েছ।"

"কষ্ট! ভুল বুঝেছ। শোহেলীর দান এ জীবনে ভুলবো না। আমি যা পেয়েছি, জালিমেরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। আলোর সন্ধান মিলেছে হালিমা! পরশ মানিক বুঝি কুড়িয়ে পেয়েছি। আমার অন্তর আলোয়-আলোয় আজ ভরে উঠেছে। মুক্তির আভাস যেন দেখেছি! জোরে চল।"

শোহেলীর বাড়ী পশ্চাতে ফেলিয়া উভয়ে আগাইয়া চলিলেন। আজ সমগ্র বিশ্বসংসার হঠাৎ এক নূতন মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আরফানের দুই নয়ন যেন ধন্য করিয়াছে।

দশ

বিশাল মরুভূমির প্রান্তদেশে জঙ্গল পাহাড় প্রাচীন আরবদের অতি সুপরিচিত পীঠস্থান। স্মরণাতীত কাল হইতে এই পাহাড়ের শিখরদেশে এক জীর্ণ মন্দিরে বেদুঈনদের প্রেম-দেবতা মানজলীর প্রস্তরমূর্তি অধিষ্ঠিত। ছোট-বড় আরও কয়েকটি দেবী বহুকাল যাবত প্রস্তরদশা প্রাপ্ত হইয়া মানজলীর চারিপাশে দণ্ডায়মান। মুর্তিগুলি অক্ষত নহে। কালপ্রবাহে কেহ নাক-চোখ হারাইয়াছে; কাহারও বা হাত-পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও দেহে ফাটল ধরিয়াছে, কোন কোনটার দেহ ফাটিয়া ঝুলিয়া কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে। দেব-দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহ-স্খলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু হারায় নাই। মন্দির-কোণে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত। ভক্তেরা সেই সব প্রস্তরখণ্ডও পরম পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে।

গৃহতল বড় অসমতল। মাঝে মাঝে কতকগুলি ছোট-বড় প্রস্তর-ধসা গর্ত। গৃহকোণ ধূলিবালি ও নানাবিধ জঞ্জালে পরিপূর্ণ। দেয়ালের প্রস্তরগুলিও এখানে ওখানে খসিয়া পড়ায় সেই সব গর্ত যেন দানবের ন্যায় হাঁ করিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষলতায় চারিপার্শ্ব সমাচ্ছন্ন। মন্দির-পাত্রে কয়েকটি উচ্চ বৃক্ষ শিকার-বক্ষে ঈগলের চঙ্গলের ন্যায় দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া সগর্বে দণ্ডায়মান। ভাঙ্গা দেয়াল ও ফাটলের ভিতর দিয়া কতকগুলি বন্য লতার অগ্রভাগ মন্দিরাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে অনেকটা জায়গা বেশ পরিষ্কার-লতাগুল্মবিহীন; কেবল মাঝে মাঝে দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের গাত্রদেশে দুই-একটি খর্জুর বৃক্ষ অদূরের উষর মরুর আগুন-হাওয়ার দাপটে পাতাগুলি এলাইয়া দিয়া জড়সড়ভাবে নির্জীব বিরাজমান। মানজলীর উপাসকগণ সেই উন্মুক্ত স্থানে বা বৃক্ষতলে পানাহারের আয়োজন করে, নৃত্য গীতেরও আসর জমায়।

মন্দিরে পাণিপ্রার্থী যুবক-যুবতী ও তাদের বন্ধুবান্ধবদের ভিড়ই অত্যধিক। নৃত্যগীতের ছন্দ-মাধুর্যে বেদুঈন প্রেমিক-প্রেমিকার দল বাঞ্ছিত জনের প্রেম

কামনা করিয়া এই স্থানে উপাসনা করে। প্রার্থনান্তে অভপ্সিত প্রিয়জনকে নানাবিধ উপহার প্রদানের রেওয়াজও প্রচলিত রহিয়াছে।

সেই দিন একটা বাগ্‌দান উৎসব উপলক্ষে মানজলীর মন্দির লোকে লোকারণ্য। অপরাহ্নেই সেখানে বিচিত্র বসন-ভূষণ পরিহিত নর-নারী দলে দলে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছিল। উৎসাহের অন্ত নাই, উল্লাসের শেষ নাই। সেই রাত্রে সেই স্থানে যে আনন্দোৎসব সংঘটিত হইয়াছিল, বেদুঈনগণ তাহা ভুলে নাই বহুদিন।

প্রদোষকালেই দেখা গিয়াছিল সারি সারি আলোকমালায় জহুলের শিখরপ্রদেশ সমুজ্জ্বল। তরুণীরা অপরাহ্নেই মন্দিরতলে ধূলির জঞ্জাল এককোণে ঠেলিয়া রাখিয়া লতা-পাতায় জীর্ণ মন্দির সাজাইয়া তুলিয়াছিল। পুরুষেরা দিবাভাগে চারিপার্শ্বের ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যে সব তাঁবু খাটাইয়াছিল, এক্ষণে উজ্জ্বল আলোকে সেগুলি ঝলমল। যুবকদের কেহ কেহ পানাহারের আয়োজনে ব্যস্ত। অনেকেই দলে দলে চত্বরে বসিয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও রসালাপে মত্ত। যুবতীরা ঝরনায় গোসল সারিয়া উত্তম বসন-ভূষণে সাজিতেছে। একে অপরের চুল বাঁধিয়া, সাজ-সজ্জায় পরিপাটি করিয়া, গন্ধদ্রব্যে দেহ চর্চিত করিতেছে। কেহ বসিয়া নাই, সকলেই কর্মব্যস্ত। সকলের মুখেই হাসি। বিচিত্র আলোর শোভায় যুবতীদের বসন-ভূষণ ও রূপের ছটায়, চটুল চাহনি ও হাসির গরিমায় চারিদিক শোভাময়।

বেদুঈন কন্যা সুফিয়া মন্দিরে স্বহস্তে দেবতা মানজলীকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিবে। জহুল পাহাড়ের অদূরে যে বেদুঈন পল্লী অবস্থিত সুফিয়া সেই পল্লী-সর্দার আন্‌সারের কনিষ্ঠা কন্যা। যুবতী পরমা সুন্দরী । যৌবন-প্লাবনে রূপলাবণ্য-গর্বিতা সুফিয়ার দেহমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তাই বুঝি আনন্দ আর ধরে না। বেদুঈন যুবক হাবিল তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। সেও হাবিলকে প্রাণাধিক ভালবাসে। আজ উপাসনান্তে উভয়ে মানজলীর সম্মুখে আজীবন বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করিবে; দেবতার আশীর্বাদস্বরূপ দেব-মূর্তির গলদেশ হইতে পুষ্পমাল্য লইয়া একে অপরকে পরাইয়া দিবে, এক অপরের প্রেমাসক্ত হইবে। তাই আজ এই আনন্দোৎসব। ছয়মাস পরে ইহাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার কথা। কিন্তু

এই ছয় মাসকাল উভয়কেই এক অপরের বিশ্বাসভাজন হইয়া চলিতে হইবে নতুবা বিবাহ–বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে–ইহাই তদঞ্চলের বেদুঈনদের সমাজবিধি।

অপরাহ্নে যুবকের দল হল্লা করিতে করিতে মন্দিরের সম্মুখস্থ চত্বরে একটি মেষ জবেহ্ করিয়াভুরি ভোজনের আয়োজনে মনোনিবেশ করিল। যুবতীদের কয়েকজন দল বাঁধিয়া নিকটবর্তী কূপ হইতে পানি আনিতে, কেহ কেহ গান গাহিতে গাহিতে গানের তালে তালে রুটি তৈয়ার করিতে ব্যস্ত। দুইটি অল্পবয়স্কা তরুণী রুটি সেঁকিতে বাহিরে উনুনে আগুন জ্বালিবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হয় নাই– নাকে–মুখে কেবল কালির ছাপ লাগাইয়া চারিপার্শ্বের যুবতীদের মুখে হাসির বন্যা বহাইয়া দিতেছে। উভয়ের রক্তাক্ত কপোলদেশে, প্রশস্ত ললাটে ও উন্নত নাসিকাগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্মবিন্দু এক–একবার ফুৎকারে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় মুক্তার ন্যায় ঝলমল করিতেছে। নিকটে এক বর্ষীয়সী মহিলা পা ছড়াইয়া খর্জুর–বীচি বাছিতেছিলেন, বেচারীদের অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার মুখেও হাসি ধরে না। অগত্যা তাহাদের সাহায্যার্থে তিনি আগাইয়া আসিলেন।

রান্নার শেষে ভোজনের ব্যবস্থা। সুফিয়া সমবয়স্কাদের লইয়া হাবিল ও তাহার বন্ধু–বান্ধবদের খাওয়াইতে আসিল। চারিদিকে তখন ঠারাঠারি ও মৃদু গুঞ্জরণ। ঠাট্টা–বিদ্রুপ ও কলহাস্যের আর অন্ত নাই। হাবিল সুফিয়াকেও টানিয়া দস্তরখানে বসাইল। বান্ধবীরা কিন্তু সুফিয়ার সঙ্গ ছাড়ে না। তাহারা সুফিয়া ও হাবিলের সঙ্গে কতক্ষণ হুড়োহুড়ি হুটোপাটি করিয়া অবশেষে আহারে বসিল।

আহারের পর মন্দিরে গান–বাজনার ব্যবস্থা। সেখানে আমোদ–প্রমোদের শেষ নাই, সুরাপানের বিরাম নাই। আলোকমালায় চারিদিক সমুজ্জ্বল, নৃত্যগীতে সমুচ্ছল।

সুন্দরী যুবতীদের রূপের ছটায় চারিদিক যেন উদ্ভাসিত। তদুপরি নর্তকীদের সাবলীল নৃত্য–ভঙ্গিমায়, সুরের মূর্ছনায়, যুবকদের প্রাণে অপূর্ব প্রেরণা, অসীম উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছে। গান–বাজনার বিরাম নাই, হৈ–হল্লা আর ছুটাছুটিরও অন্ত নাই। মন্দিরের ভিতরে, প্রাঙ্গণে ও চত্বরে যুবক–যুবতীদের কেহ কেহ দল বাঁধিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে, ছুটাছুটি শুরু করিয়াছে; একে অপরকে বালিতে লেপটাইতেছে। ইহাদের উল্লাস ধ্বনি গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ মুখরিত করিয়া তুলিল।

মন্দিরাভ্যন্তরে সুফিয়ার হাত ধরিয়া নৃত্যরত হাবিল আনন্দে আত্মহারা। দেখাদেখি আরও কয়েকজন যুবক-যুবতী তাদের সঙ্গে নাচিতে জুটিয়াছে। মত্ত যুবকদের দল সেই মহোৎসবে সুরা ভাণ্ডগুলি একে একে নিঃশেষ করিয়া মহানন্দে মশগুল। অতিরিক্ত সুরাপানে চেতনা হারাইয়া কেহ কেহ চত্বরে এলাইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি প্রেমিক-প্রেমিকা রসালাপে মত্ত। সেই রাত্রে মানজলীর মন্দিরে যে আনন্দের বন্যা বহিল, যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল, তাহা শুধু অতুলনীয় নহে, অবর্ণনীয়ও।

নৃত্যগীতে রজনী সমাপ্ত প্রায়। ক্রমে আসর ভাঙিল। যুবকেরা তখন পল্লীতে ফিরিবার আয়োজনে ব্যস্ত। যুবতীরা এইবার হাবিল ও সুফিয়াকে ঘিরিয়া মন্দিরে উপাসনায় বসিল। উৎসবের ইহাই শেষানুষ্ঠান। ভৃত্যেরা বাড়ী ফিরিবার জন্য উটের পিঠে মোটা গাঁটগুলি বোঝাই করিবার কালে, মন্দিরের দ্বারদেশে এক-একবার দাঁড়াইয়া ব্রতাচার-দৃশ্য দেখিতেছে।

উপাসনান্তে হাবিল ও সুফিয়া দেবতার সম্মুখে বিবাহ-বন্ধনের শপথ গ্রহণ করিয়া নতশিরে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিল। তারপর সুফিয়া মানজলীর গলদেশ হইতে পুষ্পমাল্য উঠাইয়া হাবিলের কণ্ঠে তাহা পরাইয়া দিল। হাবিলেল উদ্বেলিত অন্তরে আনন্দ আর ধরে না। হাসিতে হাসিতে সেই আশীর্বাদমালা পুনরায় সুফিয়ার গলায় যেই সে পরাইয়া দিবে অমনি ত্রস্ততা-নিবন্ধন ঝাঁকুনিতে ও কুসুমভারে উহা ছিঁড়িয়া গেল।

শুভকার্যে অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটিল দেখিয়া কাহারও মুখে ভাষা নাই। যুবতীরা প্রমাদ গণিল। সুফিয়ার অন্তর দুরু দুরু কম্পমান। অদৃশ্য লোক হইতে কে যেন এক সুতীক্ষ্ণ বাণ তাহার বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিয়াছে। কম্পিত হস্তে তাড়াতাড়ি ছিন্নমাল্য গাঁথিয়া সুফিয়া আপন গলায় তাহা পরিধান করিল। এই বিবাহ-বন্ধন হয়তো দেবতার অভীপ্সিত নহে, একম্বিধ ভাবনা মনোমধ্যে উদয় হইতেই এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় সকলেল মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। হঠাৎ সম্মুখে ভীষণাকার দানব কিংবা হিংস্র পশুরাজকে দেখিলেও মানুষ বুঝি ভয়ে এতটা ম্রিয়মাণ হয় না। কিন্তু দৈবের এই ভ্রূকুটি হাবিল গ্রাহ্য করিল না। সুফিয়ার জন্য কিছু উপহার আনিতে সে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল।

ততক্ষণে অন্ধকার অনেকটা পাতলা হইয়া উঠিয়াছে, ঊষার আলো ফোট-ফোট ভাব। এখানে–ওখানে কূজনধ্বনিও ক্বচিৎ শোনা যায়।

সঙ্গিনী তরুণীরা সুফিয়াকে নানাবিধ রঙ্গরসে, ঠাট্টা–বিদ্রূপে অস্থির কারিয়া তুলিল। কিন্তু সুফিয়ার যে ভাল লাগে না কিছুই। মন্দিরের দুর্ঘটনা তাহার অন্তরের আনন্দ বুঝি নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে, এইবার পালাইতে পারিলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। কিন্তু অনেকক্ষণ তো কাটিয়া গেল, তবুও হাবিলের ফিরিবার নাম নাই কেন! আর যে বিলম্ব করাও চলে না। সুফিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কতক্ষণ পরেই হাবিল ফিরিয়া আসিল–হাতে একটি পুঁটুলি। পুঁটুলিটা খুলিয়া কয়েকখানি মূল্যবান বস্ত্র ও একটি টাকার থলি সুফিয়ার হাতে তুলিয়া দিয়া হাবিল হাসিতে হাসিতে বলিল, "সুফিয়া, তুমি বড় ভাগ্যবতী। আজ তোমার সঙ্গে বিবাহ–বন্ধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েই এত অর্থ উপার্জন করেছি। এ টাকা তুমি গ্রহণ কর, সুন্দরী।

সুফিয়া টাকার থলিটি হাতে লইয়া বিস্ময়–বিস্ফারিত নেত্রে হাবিলের দিকে তাকাইয়া রহিল; ভাবিয়া পাইল না এত অল্প সময়ে কোথা হতে এত টাকা সে সংগ্রহ করিয়া আনিল। ভর্ৎসনার সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "হাবিল! আজকের দিনটাতেও দস্যুবৃত্তির লোভ ছাড়তে পারলে না? কেন, আমি তো চাইনি কিছুই! যদি কিছু দিতেই চাইলে, তবে কাঠ কেটে, না হয় মরুভূমির যাত্রীদের কাছে পানি বিক্রি করেও তো টাকা উপার্জন করতে পারতে! ছিঃ, ছিঃ, তুমি এত গতরখেকো!"

হাবিল অবাক হইয়া সুফিয়ার প্রতি তাকাইয়া রহিল। সুফিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বল এত টাকা কোথায় পেয়েছ? নিশ্চয়ই খুন–খারাবি কিছু একটা করেছ!"

"না না, ও সব কিছুই করিনি! তোমার জন্য এই উপহারগুলি নিয়ে ফেরার পথে এক মৃত ব্যক্তির কাছে টাকাগুলি কুড়িয়ে পেয়েছি। চল বাড়ী যাওয়র পথে তাকে দেখিয়ে দেব।" লজ্জিত ও কুণ্ঠিত কণ্ঠে হাবিল কথাগুলি বলিল।

সুফিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, অর্থের লোভে দস্যুরা তাকে হত্যা করে টাকাগুলি ফেলে গেছে আর কি! নিশ্চয়ই তুমি এই টাকা অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে

এনেছ অথবা কাউকে হত্যা করে এনেছ। হাবিল! তুমি কি জান না, নরহত্যা মহাপাপ? পরের ধন অপহরণ করা ঘৃণিত কাজ?"

হাবিল উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "বিশ্বাস না হয়, এসই না আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া সে সুফিয়াকে প্রায় টানিয়া লইয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইল।

কালবিলম্ব না করিয়া অন্যান্য সকলে উট ও ঘোড়ার পিঠে তাহাদের অনুসরণ করিল। হাবিল ও সুফিয়ার কথোপকথন শুনিয়া যাত্রীরা নির্বাক নিস্তব্ধ। উৎসবের আনন্দ নিমেষে যেন স্তিমিত হইয়া উঠিল। সঙ্গিনী যুবতীদের মুখে শুধু এক কথা—'এদের মিলন =গ্থি কি শিথিল হয়ে যাবে! বড় কুলক্ষণ যে দেখা যায়, আশীর্বাদমালা ছিঁড়ে গেল! কে জানে, মন্দিরে এরা কি লাভ করেছে— মানজলীর আশীর্বাদ না অভিশাপ!'

কয়েকটি ছোট-খাট পাহাড়ের ওপারে কুহ্ লাবৃবির নিকটে পৌছিয়া তাহারা দেখিল-পাহাড়ে পাদদেশে সত্য সত্যই পড়িয়া রহিয়াছে এক মনুষ্যদেহ! হাবিল অঙ্গুলি নির্দেশে বলিল, "ঐ দেখ সেই মৃতদেহ! তারই কোমরে টাকাগুলি পেয়েছি।"

সুফিয়া হাবিলের সঙ্গে নামিয়া নিকটে আসিয়া দেখে, এক বলিষ্ঠ যুবক মৃতবৎ অচেতন। তাহার মলিন বেশভূষা আর্দ্র ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, সর্বাঙ্গে ক্লেশ ও ক্লান্তির ছায়া পরিস্ফুট। দেহতাপ অনুভব করিয়া সে বুঝিল-যুবকের প্রাণ-পাখী তখনও দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করে নাই। রোষ-কষায়িত লোচনে সে হাবিলের প্রতি তাকাইয়া বলিল, "তুমি তাকে প্রহার করে, টাকাগুলি ছিনিয়ে নিয়েছ!"

হাবিল ডান হস্তে উর্ধ্বদিকে নির্দেশ করিয়া লজ্জিতভাবে বলিল, "ঐ পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ছিল, আমি ত মারিনি।"

সুফিয়া বলিল, "চল ত নিকটে কোথাও পানি পাওয়া যায় কিনা দেখি! লোকটা মরেনি এখনো, হয়তো বা বাঁচতেও পারে। রোকেয়া! রফিকা! এই স্থানে তোরা অপেক্ষা কর!" এই বলিয়া সে হাবিলকে লইয়া ত্রস্তপদে পানির সন্ধানে বাহির হইল।

কতক্ষণ পরেই সুফিয়া ফিরিয়া আসিল পানি লইয়া। পানি চোখে-মুখে কতক্ষণ ছিটাইতে মৃতপ্রায় যুবক চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। সুফিয়ার প্রাণে তখন আনন্দ আর ধরে না।

যুবক চাহিয়া দেখিলেন, তিনি এক পাহাড়ের কোলে প্রস্তর-শয্যায় শায়িত-উভয় পার্শ্বে ও শিয়রে একদল বেদুঈন-যুবতী উপবিষ্ট। সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত এক অপরূপ রূপসী তাঁহারই শুশ্রূষায় রত। চতুর্দিকে পাহাড় ও মালভূমির উপরিভাগ তখন প্রভাত-রবির রক্তিম আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। সেই বিচিত্র পার্বত্য ভূমিতে সুন্দরী তরুণীদের অরুণরাগ রঞ্জিত মুখমণ্ডল যেন শ্যামল বনানীর কোলে ফুল্ল-কুসুমবৎ ফুটিয়া রহিয়াছে। যুবক প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে গতরাত্রির ঘটনা ধীরে ধীরে তাঁহার মানসপটে উদিত হইল। কিন্তু তিনি ভাবিয়া পাইলেন না-এই পার্বত্য যুবতীর দল এত সাজগোজ করিয়া কোথা হইতে আসিল! কেনই বা আসিল!

বিস্ময়াবিষ্ট যুবক ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? কে তোমরা আমায় বাঁচালে? কোথা থেকে এলে?"

সুফিয়া উত্তর করিল, 'আমরা বেদুঈন কন্যা। ঐ পাহাড়ে গিয়েছিলাম উৎসব করতে; কে তুমি যুবক? এ দশা কেন হ'ল তোমার?"

যুবক ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমি? আমি রায়হান—আল-জবিলগ্রামের ওকায়া-ইব্‌ন-তামান্নার পুত্র। দুর্ভাগ্যবশত শত্রুহস্তে বন্দী হয়েছিলাম, কিন্তু মুক্তি পেয়েছিলাম গত নিশীথে এক রমণীর কৃপায়। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আজ আবার তোমরা আমায় উদ্ধার করেছ, কিন্তু ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রাণ যে ওষ্ঠাগত।"

সুফিয়া পাহাড়ের নীচে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কয়েকজন মেষ পালক মেষ চড়াইতে ব্যস্ত। তৎক্ষণাৎ সে হাবিলকে লইয়া সেইদিকে ছুটিল।

অল্পক্ষণ পরেই উভয়ে কয়েকটি মেষ দোহন করিয়া বেশ কিছু দুধ লইয়া ফিরিল।

এতক্ষণ হাবিল দূরে দূরে ছিল বলিয়া রায়হান তাহাকে ততটা লক্ষ্য করেন নাই। এইবারও সেই বেদুঈন যুবককে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তিনি অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। সুফিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়া রায়হানের সন্দেহ দূর করিতে বলিলেন, "ভয় নাই-এ আমার সঙ্গী হাবিল, তোমার জন্য দুধ নিয়ে এসেছে। উঠ, পান কর এইটুকু।"

রায়হান উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। হাবিল ও সুফিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইল। যুবক এক নিশ্বাসে দুধটুক পান করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন।

সুফিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মুসাফির! মনে হয় তুমি যেন মজলুম। উঠ, আমাদের তাঁবুতে চল: আহারদি করে বিশ্রাম নিলেই অনেকটা সুস্থ বোধ করবে। দেবতার কৃপায় বলকারক ঔষধও আমাদের জানা আছে।"

রায়হান যাইবেন কি, উঠিতেই যে পারেন না। অপলক নেত্রে তিনি যুবতীদের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। বেদুঈনদের আশ্রয়ে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না; কিন্তু প্রাণ রক্ষার অন্য কোন উপায়ও যে নাই। অগত্যা বেদুঈনদের আতিথ্য স্বীকার করাই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

সুফিয়া অবিলম্বে হাবিল ও তাহার সঙ্গিনীদের সাহায্যে রায়হানকে উঠাইয়া, ধরাধরি করিয়া উটের পিঠে তুলিয়া পল্লীর দিকে যাত্রা করিল। কিছুক্ষণ পূর্বে মন্দিরাভ্যন্তরে সংঘটিত ছিন্নমাল্যের দুর্ঘটনায়, এতক্ষণ তাহার অন্তরে যে দুর্ভাবনার কালমেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে মরণোন্মুখ লোকটাকে বাঁচাইবার আনন্দে সে মেঘমালা তাহার হৃদয়–গগন হইতে অকস্মাৎ যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এগার

কুহ্ লাব্বির নিকটেই শ্যামল প্রান্তরের একাংশে সুফিয়াদের বেদুঈন-পল্লী। সেস্থান হইতে দূরে বিরাট মরুভূমির একাংশ শান্ত সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। বেলা অধিক হইতে না হইতেই প্রখর সূর্যালোকে বালির উজ্জ্বল চাকচিক্য মরুভূমির বুকে মরীচিকার সৃষ্টি করে, উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ পথিকের চোখে-মুখে ঢুকিয়া জানাইয়া দেয়-বিস্তীর্ণ বালি-সমুদ্রে শুরু হইয়া গিয়াছে আগুনের খেলা আর লু হাওয়ার মাতামাতি।

সুফিয়ার তাঁবুতেই রায়হানের শয্যার ব্যবস্থা। আঘাত যদিও মারাত্মক নহে, তথাপি হতভাগ্যের সর্বাঙ্গে নিদারুণ ব্যথা। সুফিয়া ও হাবিলের চেষ্টায় তাঁহার শুশ্রূষার কোন ক্রুটি হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা উত্তম খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইয়া, ব্যথাস্থানে প্রলেপ লাগাইয়া এবং শক্তিবর্ধক ঔষধ সেবন করাইয়া, তাঁহাকে অনেকটা সুস্থ করিয়া তুলিল।

রায়হান অভিজাত-বংশীয়া সায়ফুনের গুণের কথা ভালভাবেই জানিতেন, সেজন্যই তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ এখানে এই বেদুঈন কন্যার দয়ার্দ্রচিত্তের পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন।

বেদুঈনদিগকে তিনি অসভ্য ও হিংস্র বলিয়াই জানিতেন; কিন্তু এইবার বুঝিতে পারিলেন, সত্যই সুরভি কুসুম গভীর অরণ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালেও ফুটিয়া থাকে, অতল বারিধিতলেও মহামূল্য মুক্তা বিমল প্রভা বিকিরণ করে। শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর এই অসভ্য রমণীর পদতলে যেন লুটাইয়া পড়িল। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য, অসীম রহমত ও অপার কুদরত ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অন্তর ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

এই অজ্ঞাত-পরিচয় যুবককে দেখিবার জন্য বেদুঈন-পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকার দল প্রায়ই চারিদিকে ভিড় জমায়। অভিজাত বংশীয় যুবককে কুড়াইয়া আনিবার জন্য অনেকেই সুফিয়া ও হাবিলকে বহু দোষারোপ করে।

নানাজনে নানাভাবে মন্তব্য করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়া দেয়–কুরাইশগণ বন্ধু ত নহেই বরং বৈরীভাবাপন্ন; ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যই তাহারা কুরাইশদের নিকটে সর্বদা পাইয়া থাকে। তবে কেন আতিথ্যের এই বাড়াবাড়ি? কেন এত ঘটা?

সুফিয়া মিষ্টবাক্যে সকলকে আতিথ্য–ধর্মের মহিমা বুঝাইয়া শান্ত করে।

একদা রায়হানের উদাস–দৃষ্টি উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহিরে নিবদ্ধ। দেখিলেন–চর্ম নির্মিত তাঁবুগুলির ছায়ায় ও বৃক্ষতলে বসিয়া স্ত্রী–পুরুষ সকলেই আপন আপন কার্যে ব্যস্ত। কিশোর–কিশোরীর দল প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বালুকাময় প্রান্তরে ছুটাছুটি করিতেছে; তরুণদের কেহ ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করে, কেহ কেহ মল্লযুদ্ধে রত, কেহ বা অসি চালনা শিক্ষা করিতেছে; বৃদ্ধেরা খর্জুর–পত্রের চাটাই বুনিতেছে, দুই–একজন যুবক তাঁবুর খুঁটি তৈরির কাজে মশগুল। বয়স্কা রমণীরা গল্প করিতে করিতে কেহ রুটি তৈয়ার করে, কেহ বা খেজুরের আঁটি ছাড়ায়। তরুণীরা দলবদ্ধ হইয়া দুলিতে দুলিতে ঝরনার পানি আনিতে চলিয়াছে।

রায়হান বহুক্ষণ এ দৃশ্য দেখিলেন। ক্রমে তাঁহার অবসাদগ্রস্ত দেহ তন্দ্রাবেশে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, চোখের পাতা বুঁজিয়া আসিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

রায়হানের নিদ্রা যখন ভাঙিল তখন বেলা প্রায় শেষ। চক্ষু মেলিতেই তিনি দেখিলেন, সুফিয়া তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট, সম্মুখে একটি কাল পাথর রাখিয়া সে যেন উপাসনায় রত। অবাক হইয়া তিনি শুনিলেন,সেই অপরিচিতা বেদুঈন–নারী তাঁহারই আরোগ্য কামনা করিয়া দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে। সে কী মধুর দৃশ্য! কী মর্মস্পর্শী! স্বার্থলেশহীন অতিথিসেবার এমন অপরূপ দৃশ্য জীবনে আর কখনও তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই। এমন সরলপ্রাণ নারী চিরজীবন মিথ্যার আশ্রয়ে কাটাইয়া দিবে, অন্ধ–বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া জড়–পাথরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিবেন কিরূপে!

সেইদিন রায়হান অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া তিনি সুফিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অচেতন পাথর পূজায় লাভ কি বল তো? যিনি এই পাথরের স্রষ্টা, দুনিয়ার স্রষ্টা–পাহাড়–পর্বত, নদী–নালা, গাছপালা, চন্দ্র–

সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র, সাগর–মহাসাগর ও সমগ্র জীবজগৎ যাঁর সৃষ্টি–সেই মহান আল্লাহ্‌র উপাসনা কর না কেন?”

সুফিয়া অবাক নয়নে চাহিয়া রহিল। দেবতার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ জীবনে আর কখনও তো শুনে নাই! সবিস্ময়ে সে জিজ্ঞাসা করিল, “মুসাফির, তুমি মুসলমান?”

রায়হান মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “কেন,মুসলমান জানলে আমার প্রাণরক্ষা বুঝি করতে না?”

সুফিয়া কতক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, “না তা নয়–তুমি মেহমান, মেহমানের জাতবিচার আমরা করি না। আচ্ছা, মুসলমানেরা নাকি দেবতার উপাসনা করে না, মূর্তিপূজাও করে না? সত্যিই কি?”

“হাঁ, মুসলমান মাটির দেবতা, পাথরের পুতুল কিংবা কোন সৃষ্টির পূজা করে না। যে মহান আল্লাহ্ দো–জাহানের মালিক, পাপ–পুণ্যের বিচারক, বেহেশ্‌ত্‌–দোযখের সৃষ্টিকর্তা, জীবের হায়াত–মওত ও রিযিক দৌলত নিয়ন্ত্রণকারী — মুসলমান সেই এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করে। তিনি অনাদি ও অনন্ত, রূপহীন, মূর্তিহীন, সর্বত্র তিনি বিরাজমান; তিনি সর্বজ্ঞ। তোমার এই পাথরের দেবতা কারো মঙ্গলামঙ্গল দূরে থাক, নিজেকেই তো রক্ষা করতে পারে না; ভূতলে নিক্ষেপ করলে ভেঙ্গে চুরমার হয়। কিন্তু রাহ্‌মানুর রহীম আল্লাহ্ অবিনশ্বর।”

কথাগুলি সুফিয়ার মন্দ লাগিল না। সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া ইসলামের পরিচয় জানিতে শুরু করিল। শ্রোতার একাগ্রতা লক্ষ্য করিয়া রায়হান পরম উৎসাহে আল্লাহ্ ও রসূলের মহিমা–কীর্তন করিতে লাগিলেন।

রফিকা ঝরনায় যাইবার জন্য সুফিয়াকে ডাকিতে আসিয়া দেখে, সুফিয়া অতিথির একান্ত নিকটে বসিয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে কি যেন শুনিতেছে। এ দৃশ্য তাহার মনঃপূত হইল না।

রফিকা সুফিয়ারই সমবয়সী এক পল্লী–যুবতী। হাবিলকে সে–ও ভালবাসিত, কিন্তু সর্দার–কন্যা সুফিয়ার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া সম্প্রতি হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু হাবিল যে সুপুরুষ। এত সহজেই কি ভোলা যায় তাহাকে? বাহিরে নিস্পৃহ ভাব দেখাইলেও সুফিয়ার সৌভাগ্য দেখিয়া অন্তরে সে ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত।

সহসা এক দুষ্টবুদ্ধি রফিকার মাথায় চাড়া দিয়া উঠিল। হাবিলকে সুফিয়ার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার একটা ছুঁতা আবিষ্কার করিয়া তাড়াতাড়ি সে হাবিলের সন্ধানে ছুটিল।

হাবিল তখন তাঁবুতে বসিয়া তীরের ফলাগুলি পাথরে ঘষিয়া ধারাল করিতেছিল। রফিকা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বলিল, "হাবিল! আমি না তোমার দুই চোখের বিষ! মজা দেখবে তো এস আমার সঙ্গে! সুফিয়া বানজলীর মন্দিরে তোমাকে শাদী করার যে ওয়াদা করেছিল, আজ তা ভেঙে ফেলেছে। সুফিয়া বিশ্বাসঘাতিনী! সে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে মিয়া সাহেব, তোমাকে ভুলে সেই কুরাইশ যুবক অতিথিটাকে ভালবেসে ফেলেছে। বিশ্বাস না হয়, একবার দেখেই যাও স্বচক্ষে। তুমি তো বেদুঈন, আর সে যে কুরাইশ! তফাতটা একবার নিজেই কেন ভেবে দেখ না! আমি কিন্তু কুরাইশদের মোটেই বরদাশ্ত করতে পারিনে। আমি বেদুঈন—বেদুঈনকেই ভালবাস। তোমাকে যে আমি প্রাণের অধিক পিয়ার করি হাবিল!"

হাবিল ক্রোধে চিৎকার করিয়া উঠিল, "কি বললে?–সুফিয়া বিশ্বাসঘাতিনী! সুফিয়া বেঈমান!" মুহূর্তে তাহার দুই চক্ষু রক্তজবার ন্যায় লাল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে তীর–ধনুক হাতে লইয়া মহারোষে গজগজ করিতে করিতে সুফিয়ার তাঁবুর দিকে সে ছুটিল। রফিকার আনন্দ তখন দেখে কে! মশকটা কাঁধে ফেলিয়া গুনগুন সুরে গান গাহিতে গাহিতে সে হাবিলের অনুসরণ করিল।

তাঁবুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হাবিল পর্দার ফাঁকে দেখিতে পাইল, সত্যই সুফিয়া অতিথির পদপ্রান্তে বসিয়া আলাপ–আলোচনায় মত্ত। তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ধনুকে শরসন্ধান করিয়া রোষান্ধ বেদুঈন তীর নিক্ষেপ করিবে, এমন সময় তাঁবুর ভিতর হইতে নিম্নোক্ত রূপ কথোপকথন তাহার শ্রুতিগোচর হইলঃ

রায়হানঃ বহিন! তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ, একথা জীবনে ভুলতে পারবো না। দো'য়া করি, শাদীর পরে হাবিল ও তুমি সুখে দিনপাত কর! আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন!

সুফিয়াঃ তুমি কি আমাকে ভগিনী বলে সম্বোধন করলে! ভুলে গেছ তুমি কুরাইশ আর আমি বেদুঈন?

রায়হানঃ ইসলামে তো উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই, বোন! মানুষ মাত্রই ভাই ভাই-এক আল্লাহ্‌র বান্দা। দেখনি-প্রভু-ভৃত্য,ধনী-দরিদ্র ফরক না করে মুসলমান একত্রে উপবেশন করে, এক সঙ্গে আহারে বসে, এক আসনে আল্লাহ্‌র উপাসনায় দণ্ডায়মান হয়? মুসলমান ভুলে না-জীবন দীর্ঘস্থায়ী নয়, মৃত্যুর পর ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকলকেই এক ভাবে কবরের অন্ধকারে অনন্তকাল বাস করতে হবে। বহিন! এ নশ্বর জগতে কীর্তি ছাড়া আর কিছুই অবিনশ্বর নয়। সুকৃতি মানুষকে সেই অক্ষয় কীর্তির অধিকারী করে, অশেষ পুণ্যের অধীশ্বর করে। পূণ্যবান লোক এ দুনিয়ায় যশ লাভ করে, আখেরাতেও অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। পূণ্য সঞ্চয় কর; তোমার ভাবী শওহর-ভাই হাবিলকেও সৎকর্ম করতে উৎসাহ দাও; অন্যায়ের পথ হ'তে, বিনাশের পথ থেকে তাকে সরিয়ে এনে ন্যায়ের পথে চালিত কর।

সুফিয়াঃ আমি তাকে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করতে বলেছি। হয়তো শুনবে আমার কথা। ভাল মানুষ সে। তুমি তাকে ক্ষমা কর ভাইজান! নাদান তোমার উপর বড় রূঢ় ব্যবহার করেছে।

রায়হানঃ প্রভাতে তা'কে পাহাড়ের তলায় দেখে ভেবেছিলাম, সে বড় নিষ্ঠুর-আমাকে হত্যা করতে তীর ছুঁড়েছিল, কিন্তু পরে তার আতিথেয়তা আমার হৃদয়-মন জয় করে ফেলেছে। আমি তার অন্তরের ভাল মানুষটি দেখেছি। তাকে ক্ষমাও করেছি।

সুফিয়া সেই টাকার থলিটি রায়হানের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল, ভাইজান! তোমার এই অর্থ সে অপহরণ করেছিল। তবু বলেছ—তুমি তাকে ক্ষমা করেছ। কত ভাল তুমি! তোমার অর্থ তুমি গ্রহণ কর।"

স্মিতমুখে রায়হান থলিটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলঃ অর্থ আমার প্রয়োজন নেই সুফিয়া! এ টাকা তোমার। বিবাহের যৌতুক হিসেবে ভ্রাতার এ দান গ্রহণ কর, ভগিনী! আশীর্বাদ করি, হাবিলকে শাদী করে সুখী হও, উভয়ে সুখে থাক!"

কথাগুলি শুনামাত্র উদ্‌গত তীর হাবিলের হাত হইতে ভূমিতলে খসিয়া পড়িল। পুনরায় সে শুনিল, সুফিয়া বলিতেছে, "তুমি এত মহান! এত মহৎ

তোমার ধর্ম! আমি এখনই ডেকে আনবো হাবিলকে! তোমার কাছে বসে দু'জনেই ধর্মকথা শুনবো।" এই বলিয়া সুফিয়া ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিল।

তন্মুহূর্তে ধনুক দূরে নিক্ষেপ করিয়া হাবিল তাঁবুর ভিতরে প্রবেশপূর্বক বলিল, "সুফিয়া! আমি এসেছি। ভাইজান তোমার একার নয়, আমারও। আমিও শুনবো তাঁর দু'টি কথা।"

অনাবিল হাসিতে সুফিয়ার মুখমণ্ডল তখন সমুজ্জ্বল। হাত বাড়াইয়া হাবিলকে ধরিয়া রায়হানের নিকটে সে বসাইল।

রফিকা হাবিলের এবম্বিধ আচরণ আশা করে নাই। এ-দৃশ্য তাহার অসহ্য। বিকট মুখভঙ্গী সহকারে বিড়বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে সে চামড়ার মশকটি আছড়াইয়া পিঠে ফেলিল। তারপর মুখ ভার করতঃ রাগে ফুলিয়া হাবিল ও সুফিয়ার মুণ্ডপাত করিতে করিতে ত্রস্তপদে ঝরনার দিকে যাত্রা করিল।

পথিমধ্যে রসিকা যুবতী হাসিনার দেখা। ঝরনা হইতে পানি লইয়া সমবয়স্কা মায়মুনা ও সামছির সঙ্গে সে পল্লীতে ফিরিতেছিল। রফিকার সঙ্গে তাহার গলায় গলায় ভাব।

হাসিনা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো সখি, এত দেরী যে! মজে গেছিলে বুঝি প্রেমালাপে মাশুকের সঙ্গে?"

রফিকার মুখে কিন্তু হাসি নাই। বিরক্তিভরে সে উত্তর দিল, "মাশুক দেখলে কোথায় যে প্রেমালাপ করবো? যার তার সঙ্গেই বুঝি প্রেমালাপ করে বেড়াই মাঠে-ঘাটে!"

হাসিনা হাসিতে হাসিতে রফিকার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল "কেন মণি, আসার কালে দেখে এলাম যে হাবিলের কানের কাছে বসে বড় কুটুস কুটুস কাটছিলে তার দিল ফানাহ্ ফানাহ্ করে?"

হাসিনার হাত ঠেলিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী সহকারে সে বলিল, "জিজ্ঞেস করছিলাম তার মরণ হবে কবে! কবে যোগাড় করবো তার কাফনের কাপড়!" এই বলিয়া গজগজ করিতে করিতে সে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঝরনার দিকে যাত্রা করিল।

রফিকার কাণ্ড দেখিয়া তিন যুবতীই হাসিয়া কুটপাট। বুঝিতে তাহাদের বাকী রহিল না-প্রেমের হাটের বেচাকেনায় বিশেষ সুবিধা করতে পারে নাই রফিকা। হাসিতে হাসিতে তাহারা পল্লীর পথ ধরিল।

বার

পবিত্র মক্কা নগরীর মুসলমানদের দুরবস্থা যখন চরমে উঠিয়াছিল তখনও ইসলামের সৌন্দর্যে অনেক অবিশ্বাসীর অন্তরই যে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতেছিল—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নির্মম অত্যাচার উৎপীড়ন–ভয়ে অনেকেই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহী হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের নিভৃত কোণে ইসলামের বীজাঙ্কুর দিনে দিনে মাথা তুলিয়া আলো–হাওয়ার সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। কুলছুম তাহাদেরই অন্যতম। সায়ফুন ও রায়হানের অপূর্ব ধর্মবিশ্বাস কখনও সে ভুলিতে পারে নাই। ইসলামের বিমল জ্যোতি তাহার উদ্ভাসিত অন্তরে এক নূতন অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল, এক নূতন জগতের সন্ধান দিয়াছিল।

কিন্তু সায়ফুনের দুঃখে কুলছুমের অন্তর আজ সীমাহীন ব্যথায় ভরপুর। সেই নিরপরাধী যুবতীর কুসুম–কোমল দেহখানি তাহারই নিষ্ঠুর স্বামী আপন হস্তে পাহাড়ের গর্তে জীবন্ত প্রোথিত করিবে—এই কথা শুনিবামাত্র তাহার অন্তর বেদনায় চূর্ণ–বিচূর্ণ হইবার উপক্রম। সায়ফুনকে আর একটিবার দেখিয়া আসিবার জন্য–জীবনের শেষ দেখা দেখিবার জন্য–সারাদিন সে ছটফট করিয়া মরিল। সেদিকে যাইবার জন্য কত যে সুযোগ খুঁজিল, কিন্তু পাইল কই! রাহেল আজ বড় কর্মব্যস্ত, বন্ধুবান্ধব লইয়া রায়হানকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে–এই আসে এই যায়। কখন কোন্ মুহূর্তে আবার গৃহে ফিরিয়া সে কুলছুমকে না দেখিতে পাইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিবে–এই ভয়ে দিবসে সে বাড়ীর বাহির হইতেও পারিল না।

সায়াহ্নে রাহেল গৃহে ফিরিল বটে, কিন্তু রাত্রিতে আহারাদির পরই আবার বাটীর বাহির হইল। যাইবার কালে ভার্যাদের সে জানাইয়া গেল–তাহার বাড়ী ফিরিতে রাত্রি অধিক হইবে।

কুলছুম এমন একটা সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে সায়ফুনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

*　　　　*　　　　*

প্রায় অর্ধ অচেতন অবস্থায় সায়ফুনের সারাটি দিন কাটিয়াছে। মাঝে মাঝে শুধু সে বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় "রায়হান, রায়হান" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। মৃত্যুভয়ে তাহার অন্তর দলিত-মথিত। এতক্ষণে তাহার প্রাণবায়ু হয়তো বাহির হইয়া যাইত কিন্তু আপন প্রাণের বিনিময়ে সে রায়হানকে বাঁচাইতে পারিয়াছে- এই আত্মপ্রসাদ এখনও তাহাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। তাহার আশা হইল-নিজে মরিবে বটে, কিন্তু প্রাণপ্রতিম রায়হান বাঁচিয়া থাকিবে।

যোহরার আদেশে সায়ফুন সারাদিনই কাটাইল এক নির্জন গৃহে বন্দিনীরূপে। হতভাগী পাগলিনীর ন্যায় গৃহমধ্যে কেবল ছুটাছুটি করিয়া গৃহের তৈজসপত্র ভাঙিল, নিজের বসন-ভূষণ ছিঁড়িল; অবশেষে আপন কেশগুচ্ছ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিপাসায় তাহার অন্তর শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কে তাহাকে পানি দিবে? যোহরার কড়া শাসনে দাস-দাসীরা তো এদিকে ঘেঁষিতেই পারে না।

বন্দিনীর করুণ আর্তনাদ যোহরার প্রাণে এতটুকুও দয়ার সঞ্চার করিল না। কেহ যাহাতে বন্দীশালায় ঢুকিতেই না পারে সেইদিকে তাহার শেণ্যদৃষ্টি। কিন্তু স্নেহপরায়ণী বিমাতার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। অন্ধকারে চুপি চুপি তিনি এক বাটি পানি লইয়া সায়ফুনের গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, কিন্তু যোহরার দৃষ্টি ইহা এড়াইল না। তাড়াতাড়ি প্রদীপ হস্তে বন্দীশালায় প্রবেশ করিয়া সে শাশুড়ীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "যাকে প্রভাতে হত্যা করা হবে, তার জন্য কেন এত দরদ শুনি? আপনার কি জানা নেই, বন্দিনীকে খাদ্য ও পানীয় দিতে ভাইজান পই পই বারণ করেছেন? তবে কেন এত মহব্বত? কেন এত দয়া? পাপিষ্ঠা রায়হানকে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু কই, সেই হতভাগা আজ তো আসে না প্রেমিকাকে উদ্ধার করতে! ইস্, কি প্রেম!" শেষের কথাগুলি যোহরা ঠোঁট উল্টাইয়া, চক্ষু কপালে তুলিয়া, বিকট মুখভঙ্গী সহকারে বলিল।

সায়ফুন পানির ভাণ্ড যোহরার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "ঠিকই বলেছ ভাবী, যা'দের হাত থেকে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছি, তাদের দান গ্রহণ করে জীবনকে ক্ষণকাল বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি! এই নাও পানি!" তাহার অনিমেষ নয়নের অচঞ্চল দৃষ্টি যোহরার প্রতি নিবদ্ধ, নয়নধারা কপোলদ্বয়ে প্রবহমান। পরক্ষণেই হস্ত-তালুতে দুই চক্ষু ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

পুত্রবধূর এই আচরণ সায়ফুনের বিমাতার প্রাণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। ওড়নাঞ্চলে চক্ষুদ্বয় মুছিতে মুছিতে তিনি নীরবে বন্দীশালা ত্যাগ করিলেন।

সায়ফুন গৃহকোণে বসিয়া আর একবার বিশ্বপ্রভুর দরবারে কাতরভাবে প্রার্থনা করিল, "হে দীন–দুনিয়ার মালিক! রায়হানকে বাঁচিয়ে আমার মরণ সার্থক কর। হে রোজ হাশরের প্রভো! আলোক থেকে অন্ধকারে যেন আর ফিরে না আসি! সকল অত্যাচার, সকল নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা যেন না হারাই। দয়াময় বিশ্বপতি! মুক্তি দাও! পাপময় দুনিয়ার বন্ধন থেকে মুক্তি দাও!"

সহসা পশ্চাতে কাহার বিকট হাস্যধ্বনিতে সায়ফুনের ধ্যান ভাঙিল। "হাঁ–হাঁ–হাঁ! মুক্তি চাও সুন্দরী! আমি তোমায় দিতে পারি মুক্তি!"

সায়ফুন চমকিত হইয়া দেখিল–পশ্চাতে দণ্ডায়মান রাহেল! তাহার বিজয়দৃপ্তমুখে হাসির ছটা! লজ্জায়, ঘৃণায় ও ভয়ে সায়ফুনের সর্বাঙ্গ কম্পমান। ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় সায়ফুন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিৎকার করিল, "আমি শোহেলী–কন্যা, সে কথা কি ভুলে গেছিস্ পাপিষ্ঠ। এই গভীর রাত্রে এখানে এসেছিস্ কোন সাহসে পাষণ্ড? এই মুহূর্তে এই স্থান যদি পরিত্যাগ না করিস, তবে চিৎকার করে সকলকে জানাব–তুই আমাকে বেইজ্জত করতে এসেছিস। জানি তোরা আমাকে হত্যা করবি, কিন্তু প্রাণ থাকতে আমার দেহ কেউ স্পর্শ করতে পারবিনে। পাপাচারী নীচাশয়! চোরের ন্যায় অসহায়া নারীর গৃহে প্রবেশ করতে লজ্জা করে নি!" সায়ফুন কাঁদিয়া ফেলিল। পুঞ্জীভূত বেদনায় তাহার অন্তর ভারাক্রান্ত, অশ্রুধারা আর বাঁধন মানে না।

রাহেল দুই পা অগ্রসর হইয়া বলিল "সায়ফুন! তোমাকে অপমান করতে আসিনি, এসেছি রক্ষা করতে। তোমাকে যে নিকাহ্ করার ইচ্ছে আমার ছিল–একথাও তো জান। তোমার পিতা, তোমার ভ্রাতা তাতে অমতও ছিলেন না; কিন্তু, সেই ছোকরা–শয়তান রায়হানই না যত সব অনর্থের মুল! নিজে ডুবেছে, তোমাকেও ডুবিয়েছে। এখনও সময় আছে সায়ফুন! বল, তোমার এতে কোন আপত্তি নেই। তোমাকে না পেলে আমি যে পাগল হয়ে যাব। ঐ দীপশিখা যেমন পতঙ্গগুলোকে আনন্দে মাতিয়েছে, তোমার রূপ–শিখাও আমাকে সেই–রূপ বেচইন করেছে। তোমাকে মুক্ত করতে, তোমাকে বাঁচাতে আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি। একবার শুধু বল সায়ফুন, তুমি আমার হবে।"

সায়ফুন ফণিনীর ন্যায় রাগে ফুলিতে ফুলিতে গ্রীবা দোলাইয়া বলিল, "দুরাচার পাষণ্ড! এখনও তোর হুঁশ হ'ল না। আমি কি তোর করুণার ভিখারী? তুই পৌত্তলিক, জড়-পাথর-পূজারী, দুশ্চরিত্র দুরাশয়! তোকে শাদী করব আমি! নারীর দেহ নিয়ে তুই ছিনিমিনি খেলিস? নারীর অন্তরের বেদনা তোর মর্ম কখনও কি স্পর্শ করে পাপিষ্ঠ? মাতাল! কুলাঙ্গার! এই মুহূর্তে এই স্থান পরিত্যাগ কর, নচেৎ তোর মস্তক পদাঘাত করে বিয়ের সাধ চিরতরে মেটাবো।"

রাহেল ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া চিৎকার করিল, "কী-ঈ! আমাকে অপমান! রাহেল-ইব্‌ন-জাহেদকে অপমান! আমার সব দেবতার অপমান! তবে যা' শুনেছি তা'-ই ঠিক! কুল-কলঙ্কিনী! তুইও তবে ইসলাম গ্রহণ করেছিস? না, প্রভাতের অপেক্ষায় আর থাকবো না। এখনই তোকে দ্বিখণ্ডিত করে অন্তরের জ্বালা জুড়াবো।"- এই বলিয়া সে অসি নিষ্কোষণপূর্বক সায়ফুনকে আঘাত করিতে উদ্যত হইতেই পশ্চাদ্দেশ হইতে কে তাহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। ঘাড় ফিরাইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রাহেল চাহিয়া দেখিল-কুলছুম!

কুলছুম ভর্ৎনার সুরে বলিতে লাগিল, "নিরস্ত্রী, অসহায়া, নারীদেহে অস্ত্রাঘাত করতে লজ্জা করে নি বীর পুরুষ? সায়ফুনকে এ-ভাবে হত্যা করলে শোহেলী পরিবার তা' কখনো সহ্য করবে ভেবেছ? এতে একটা বিরোধের আগুন পুরুষানুক্রমে জ্বলতে থাকবে না?"

অপর গৃহ হইতে যোহরা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "না ভাইজান! এখন ওকে হত্যা করে লাভ নেই। কাল লাব্বি পাহাড়ে মৃত রায়হানের সঙ্গে এর বিয়ে দিয়ে অন্ধকার গর্তে বাসর শয্যা রচনা করে দেব। খবর শুননি-রায়হান ধরা পড়েছে? নির্লজ্জ কুলটা নারী! রায়হানের সঙ্গে তোর শাদীর সাধ চিরতরে মেটাব। কলঙ্কিনী। তোর চোখের সামনে রায়হানের হাত-পা ফালি ফালি কেটে তোকে উপহার দেব। তারপর জানিস কি করব?"

সায়ফুনের আর কিছুই জানিবার অবকাশ ঘটিল না। পবন-সঞ্চালিত বেতসীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "এ্যা! কি বললে? রায়হান ধরা পড়েছে? আহ্! ধরা পড়েছে? জীবন দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না-উহ্!" সায়ফুন কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতলে পড়িয়া জ্ঞান হারাইল। তাহার দেহের

পতনজনিত বায়ু সঞ্চালনে গৃহের ক্ষুদ্র দীপখানি প্রায় নিভু নিভু। ঠিক সেই মুহূর্তে কুলছুম ছুটিয়া গিয়া সায়ফুনের অচেতন দেহ জড়াইয়া ধরিল।

যাহারা পরপীড়ক তাহারা অকারণে মানুষের অন্তরে আঘাত হানে। ইহাতেই তাহাদের আনন্দ; নতুবা রায়হানের সম্বন্ধে যোহরার এতগুলি মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। যাহারা পরোপকারী, পরের দুঃখে যাহাদের অন্তর বেদনাহত হয়, এমন করিয়াই বুঝি তাহারা কুলছুমের ন্যায় অপরের বিপদে ছুটিয়া যায়। হাজার হাজার বছরের প্রাচীনা যোহরা আজও দেখি লোকের ঘরে ঘরে বাঁচিয়া রহিয়াছে,এতটুকু ভীমরতিও ধরে নাই। তাই বলিয়া দুই-চারিজন কুলছুমকেও যে কৃচিৎ দেখিতে না পাওয়া যায়, এমন নহে। তবে সংসারে কাঁদাইবার লোকই অধিক। দুর্জনেরাই এখানে আসর জমাইয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে।

তের

'নবাগত অতিথি একজন পলাতক নও—মুসলমান'–এই খবর অত্যল্পকাল মধ্যেই লোকের মুখে মুখে সমগ্র বেদুঈন–পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু এইভাবে বিধর্মী লোকটার আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারটা অতিথিপরায়ণ বেদুঈনদেরও মনঃপূত হইল না। কেহ কেহ আসিয়া সর্দারকে রূঢ় বাক্যে আপত্তি জানাইল–'মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া কেন? একে কুরাইশদের হাতে ফিরিয়ে দাও।' কেহ অভিযোগ করিল–'মুসলমানেরা আমাদের দেবতার কত নিন্দা করে, মুসলমান জাত দুশমন, মেরে ফেল একে!' কে একজন প্রৌঢ়া নারী পশ্চাদ্দেশ হইতে শান্ত সুরে বলিল, "মেরে কি লাভ? যুবককে সিরিয়ার কোন বণিকের নিকটে বিক্রি করে ফেললেই হয়–বেশ দু'পয়সা ঘরে আসবে।" ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যভরে তাহারা রায়হানের প্রতি নানাবিধ বিদ্রূপ–বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

পল্লী–সর্দার আনসার সকলকে শান্ত করিয়া বলিল, তোমরা কি ক্ষেপে উঠলে সব? হাজার হোক, ও–যে আমাদের মেহমান, আমাদের আশ্রিত–সে কথা কি ভুলে গেলে? সাবধান! মেহমানের অনিষ্ট চিন্তা যেন করো না, ধর্মে সইবে না।"

সর্দারের কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বেদুঈনগণ আপন আপন কাজে চলিয়া গেল। রায়হানও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

নিশাগমে বেদুঈন পল্লীতে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা। তরুণ–তরুণীরা প্রচুর মদ্যপান করতঃ দলে দলে নাচিয়া–গাহিয়া, আমোদ–প্রমোদে মত্ত। প্রারম্ভে কিছুক্ষণ তাহারা পূর্বপুরুষদের কীর্তিকথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সুললিত কণ্ঠে গাহিয়া, অবশেষে অবৈধ প্রেমের নানাবিধ ছন্দগাঁথা, প্রেমিক–প্রেমিকার কত আবেদন–নিবেদন ও অশ্লীল প্রেম সঙ্গীত নৃত্যের তালে তালে শুরু করিয়াছে। আসরে উপস্থিত সুন্দরী তরুণীদের সৌন্দর্য মহিমাও বাদ্যের তালে তালে গাহিতে যুবকদের উল্লাসের অন্ত নেই। যুবতীরাও গানের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া, কখনও বিদ্রূপ–বচনে, কখনও বা স্তুতিবাক্যে সমুচিত উত্তর দিতে লাগিল।

কুৎসিত আকৃতি-প্রকৃতির উল্লেখ করিয়াও একে অপরকে বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করিতে ছাড়ে না। শ্রোতৃমণ্ডলী এক অনির্বচনীয় আনন্দে মশগুল। সমগ্র গীতিমণ্ডপ ঘন ঘন বাহবা-ধ্বনিতে, যুবক-যুবতীদের নৃত্যগীতে, কলহাস্যে ও উগ্র মদিরা-গন্ধে ভরপুর।

আসর বেশ জমজমাট। এক এক করিয়া সুরাভাণ্ডগুলি নিঃশেষ হইতেছে। এখানে-ওখানে কেবলই শোনা যায়, মত্ত যুবকদের মাতলামি, অশ্রাব্য গালাগালি, চেঁচামেচি, হুড়াহুড়ি। কেহ বা ঢুলিতেছে, কেহ হাসিতেছে। সুফিয়া এই উৎসবে যোগদান করে নাই। পাড়ার রফিকা, হামিদা, মায়মুনা, সামিনা প্রমুখ যুবতী আসিয়াছে, নাচিয়াছে, গাহিয়াছে, অথচ সুফিয়া কেন আসিল না—হাবিল কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার আনন্দের অনেকখানিই যে আজ মাটি হইয়া গেল। এমন তো কোনদিন আর হয় নাই! ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে খুঁজিতে খুঁজিতে রায়হানের তাঁবুতে গিয়া দেখে-সুফিয়া রায়হানের সঙ্গে একান্তে বসিয়া গভীর আলাপ-আলোচনায় মত্ত।

হাবিল হাঁকিয়া উঠিল, "সুফিয়া! হ'ল কি তোমার? কেন যাও নি আসরে, বলতো? কিসের এত গালগল্প?"

সুফিয়া উত্তর করিল, "কুৎসিত রঙ্গরস আমার ভাল লাগে না হাবিল! তুমিও যেও না ও-দিকে; তার চেয়ে বরং এখানে বস, অনেক নতুন কথা শুনতে পাবে, শিখতে পারবে। এস, আমি রফিকা, মায়মুনা, শামা ও সামছিকেও ডেকে আনি। কই, এস না!"

"হুঃ এমন মজার নাচগান ফেলে তোমার নীরস গল্প শুনি আর কি!" এই বলিয়া হাবিল আড়চোখে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

সুফিয়া রায়হানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখলে মুসাফির ভাই! চলে গেল রাগ করে। যারা পাপ-পঙ্কিলে দিনের পর দিন ক্রমাগত ডুবতে থাকে, পাপের মোহেই তারা অধিকতর আকৃষ্ট হয়; ধর্মের ডাক তাদের কানে পৌছে না অশ্লীল নাচগান, মদ্যপান, ব্যভিচার, আমাদের বড় প্রিয় কাজ, আমরা আবার মানুষ!"

রায়হান উত্তর করিলেন, "সমগ্র আরবে তো একই অবস্থা সুফিয়া! এই সব অনাচার, ব্যভিচার দূর করতে, পাপের অন্ধকার থেকে মানুষকে পূণ্যের আলোকে

টেনে আনতেই তো জগতে ইসলামের আবির্ভাব। নারীর কোমল হৃদয়ে যে অনুপ্রেরণা, যে ধর্মভাব স্বাভাবিকভাবে স্থান লাভ করে, পুরুষের কঠিন হৃদয়ে তত সহজে তা ঠাঁই পায় না ইসলামের প্রথম আহবানে নারীই যে প্রথম সাড়া দিয়েছিল বহিন! বিবি খাদিজা (রাঃ)-ই তো পৃথিবীর আদি মুসলমান।"

"তোমার কথাগুলো বড় ভাল লাগে মুসাফির, শুনতে যে ইচ্ছে হয় কেবলই, আমার মনের গহনে যে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দিয়েছ! বল, থাকব কি করে তুমি চলে গেলে? শান্তি কিসে পাব? যেতে তোমায় দেব না মুসাফির! কেন তুমি ঘুরে বেড়াবে দেশে দেশে? থাক এখানেই আমাদের সঙ্গে!"

"না, এখানে বেশী দিন থাকা মোটেই নিরাপদ নয় সুফিয়া! শোহেলী পরিবার পুনরায় আমাকে বন্দী করতে, নিশ্চয়ই চারদিকে লোকলস্কর পাঠিয়েছে। সত্বরই আমাকে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।"

"চলে যাবে? কোথায় যাবে? আবার কখন আসবে?"

"সুদূর হাবসী রাজ্যে যাত্রা করবো ভেবেছি। সে রাজ্যে অবিচার নেই, অন্যায় নেই বহু স্বদেশ-বিতাড়িত মুসলমান সেখানে নজ্জাসী রাজ্যে আশ্রয় লাভ করেছেন। কবে আসবো?- যেদিন আরববাসী তাদের ভুল বুঝতে পারবে, অনুতপ্ত হৃদয়ে আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে, সেদিন হয়তো ফিরে আসবো স্বদেশে। তোমার ঋণ এ জীবনে ভুলবো না, সুফিয়া। বেঁচে থাকলে আবার হয়তো দেখা হবে। হয়তো তখন দেখতে পাব পুরাতন জগৎ নতুন রূপ ধারণ করেছে, অসংখ্য পুরনো মানুষ নব জীবন লাভ করে ধন্য হয়েছে। না জানি সে সব দিন কত মধুময় হবে। সেই অনাগত দিনে মানুষ অত্যাচার-অনাচার ত্যাগ করবে, পাপাচার ভুলে যাবে; কুসংস্কার, ব্যভিচার আর অন্ধ-বিশ্বাসের মায়াজাল কেটে মুক্ত হবে। সেই শুভ দিনেরই কামনা করি।"

"সেই নবযুগে থাকবে কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি! কী আশায় পথ চেয়ে বসে থাকবো বল! কার কাছেই বা অনুপ্রেরণা লাভ করবো। ওগো নিষ্ঠুর, সেদিন কে আমার আত্মচেতনা জাগিয়ে তুলবে? আশা-ভরসায় কে আমর অন্তর

সঞ্জীবনী সুধায় ভরে দেবে? এই অসভ্য বেদুঈন কুলে, আমিকি করবো থেকে? বল, কিভাবে দিন কাটাবো?"

"সেই নবযুগের সূচনায় তুমি নারীর অন্তরে আত্মচেতনা, আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলবে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার আদায় করবে; নারীর কর্তব্যবোধ, নারীর সতীত্ব জ্ঞান জাগ্রত করবে, নারী পুরুষের বিলাস–সামগ্রী নয়–পুরুষের সুখ–দুখের ভাগিনী, জীবনের যাত্রাপথে একত্রে চলার সঙ্গিনী–সেই চেতনা এই মরুবাসিনী নির্যাতিতা নারীদের অন্তরে জাগিয়ে তুলবে। সে দিন আগত প্রায়।"

কিন্তু কে আমায় তখন পথ দেখাবে? বন্ধুর পথে চলতে চলতে যখন পদস্খলন হবে, কে আমাকে হাত ধরে উঠাবে? তুমি আমার অন্তরে রঙের ঝলক লাগিয়ে চলে যাবে দূরে? এত নিষ্ঠুর তুমি! কি বলে যে বুঝাব তোমায়!"

"সুফিয়া" তোমার এই চিত্ত–চাঞ্চল্য বড় বেদনাদায়ক। ভুলে গেছ–মানজলীর মন্দিরে হাবিলকে বিয়ে করার শপথ করেছ? মানজলী মিথ্যা বটে, কিন্তু তোমার শপথ সত্য। হাবিলই তোমার জীবন যাত্রার দুর্গম পথে একমাত্র সঙ্গী, তাকে তুমি মহান আদর্শে গড়ে তোল।"

"ওগো আমি পাষাণ দেবতায় বিশ্বাস হারিয়েছি, নিজের মনটাকেও যে ভুল বুঝেছি। বনের পশুকে পোষ মানাব কিরূপে? আমার অন্তরে আগুন জ্বালাতে কেন তুমি উড়ে এলে এখানে? কেন তুমি উল্কার ন্যায় দেখা দিলে? আমি যে তোমায় ভালবাসি রায়হান!"

"সুফিয়া! তুমি কি পাগল হয়েছ? তোমাকে যে ভগ্নীর মর্যাদা দিয়েছি, সে কথা কি ভুলে গেছ?"

"তবে তুমি নিশ্চয় আর কাউকে ভালবাস?"

"হাঁ, আমার অন্তর জুড়ে একজনই স্থায়ী আসন পেতে বসেছে, সুফিয়া! সেখানে স্থান নেই আর কারো।"

"কে সেই ভাগ্যবতী?"

"তোমাকে তো বলেছি! আপন প্রাণ তুচ্ছ করে সে আমায় বাঁচিয়েছিল। জানিনে এতক্ষণে তার অদৃষ্টে কি যে ঘটেছে! তুমি যেমন হাবিলকে ভালবাস, আমরাও সেরূপ একে অপরকে ভালবাসি।"

"হাবিল! হাঁ, হাবিলকে ভালবাসি বটে–বাল্যাবধিই আমি তার অনুরাগিণী। কিন্তু কোথা থেকে উড়ে এসে আমার অন্তর জুড়ে বসেছ পথিক? কেন তুমি এলে? কেন আমার অন্তরে আগুন জ্বেলে দিলে?"

"সুফিয়া! কালই তোমার চোখের আড় হব। আল্লাহর অনুগ্রহে অনেকটা তো সুস্থ হয়ে উঠেছি, এখন হাঁটতে পারব। এই স্থানে থেকে আর তোমার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নে।"

"হাঁ, চলেই যাও, আর দগ্ধে মেরো না। জানিনে, আমার অন্তরে তুষের আগুন জ্বালিয়ে দিতে কোথা থেকে ছুটে এলে মুসাফির? কেন এলে? শীতল পানীয় সম্মুখে রেখে পিপাসায় মরব–এ যে অসহ্য! আমি হাবিলকে নিয়ে সুখেই বাস করতাম কিন্তু তুমিই আমার সে সুখের নীড় ভেঙে দিয়েছ!" সুফিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে তড়িৎবেগে তাঁবুর বাহিরে ছুটিয়া গেল।

রায়হানও বুকের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁবুর দ্বারদেশে আসিয়া তিনি দেখিলেন, বাহিরে পিচঢালা অন্ধকারে জগৎ নিমজ্জিত। চারিদিকের ঐ এলোপাতাড়ি পাহাড়গুলিতে এবড়ো–খেবড়ো পাথরগুলি মসীকৃষ্ণ দানবের ন্যায় দণ্ডায়মান। আলোর আভা কোথাও নাই, কেবল বেদুঈনদের সারিবদ্ধ তাঁবুগুলিতে ক্বচিৎ দুই–একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। উৎসব স্থানেও আলোর শিখা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। জল্সা হয়তো বহুক্ষণ শেষ হইয়াছে, তাইতেই প্রমোদমত্ত নরনারীর কলরব আর শোনা যায় না। গভীর রজনী নিস্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে পাহাড়ের দিকে বন্য পশুর চিৎকার–ধ্বনিতে সেই একটানা নিস্তব্ধতায় এক–একবার ছেদ পড়িতেছে। হায়েনা, নেকড়ে ও বন্য বরাহগুলি বোধ হয় এতক্ষণে শিকারের প্রতীক্ষমান। দিবসে মরুভূমির অগ্নিপ্রবাহ হইতে নিস্তার পাইতে কত অসংখ্য পথিক জীবন বিপন্ন করিয়া এই রাত্রিতেই হয় তো পথ চলিয়াছে। চলিতে চলিতে কত হতভাগ্য সেই সব বন্য পশু ও ততোধিক বন্য বেদুঈন দস্যুদের কবলে প্রাণ হারাইবে, কে জানে!

বাহিরে এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে রায়হান আপন ভাগ্য খুঁজিয়া লইতে প্রস্তুত। মনে মনে ভাবিলেন–'না, আর নয়, এখানে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা আর সমীচীন হবে না; এখনই যেতে হবে। সুফিয়ার দয়ায় দ্বিতীয়বার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, যাত্রাকালে একবার তার নিকটে শেষ বিদায় নিতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু কোথায় সে, কে জানে!"

সঙ্গে লইবার মত রায়হানের কিছুই নাই। যাহা কিছু ছিল তাহার ব্যবস্থা তো ইতিপূর্বেই হইয়া গিয়াছে। এইবার বাহির হইলেই হয়। কিন্তু দুঃসময়ের আশ্রয়স্থল এই তাঁবুটিতে কেমন যেন জড়াইয়া আছে একটা মায়ার বাঁধন, যাহা অন্তরে খোঁচা খোঁচা অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। এই স্থানেই যে তিনি মরিতে মরিতে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার বুকের ভিতরটায় যেন সম্যক মন্থন করিয়া দুমড়াইয়া নিংড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। ঘাড় ফিরাইয়া পরিত্যক্ত শয্যার দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বাহিরে পা বাড়াইলেন।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একটা তাঁবুর মোড় ঘুরিতেই রায়হান থমকিয়া দাঁড়াইলেন একেবারে সুফিয়ার মুখোমুখি। বেদুঈন–যুবতীর বাম হস্তে একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ, ডান হাতে কিছু খাদ্য ও পানীয়। তাহার অক্ষিপল্লব সিক্ত, বুঝা যায় এই একটু আগেই ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বুঝি গণ্ডদ্বয় বাহিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে। উভয়ে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ একে অপরের মুখের প্রতি অপলক নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন।

সুফিয়া বিস্ময়াবেগে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল,"বাঃ রে! এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলেছ কোথায়? পালাচ্ছ নাকি? রাগ করেছ বুঝি?" এই বলিয়া যুবতী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে সে পুনরায় বলিল, "চল, ভাইজান! তাঁবুতে চল! মনটা বড় বেয়াড়া হয়েছিল, বেশ করে তাকে শায়েস্তা করে এনেছি! চল, চল, তাঁবুতে চল। বিকেলে যে খাওয়া হয়নি কিছুই–ভুলে গেছ?"

অগাধ বিস্ময়ে রায়হান থ হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়া পাইলেন না–এই কি সেই সুফিয়া যে ক্ষণকাল পূর্বে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল? বর্ষণের

পর সৌরকরোজ্জ্বল ধরণীর ন্যায় এই রহস্যময়ী নারীর মুখমণ্ডল কোন যাদুমন্ত্র-প্রভাবে যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও গ্লানির লেশমাত্রও নাই। রায়হান নিরুত্তর দাঁড়াইয়া শুধু অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সুফিয়া কাতর স্বরে আবার বলিল, "ভুল করেছিলাম রায়হান ভাই! মার্জনা কর অবোধ ভগিনীকে! তাঁবুতে চল! এস! বাঃ রে! দাঁড়িয়ে যে?" এই বলিয়া সে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁবুর দিকে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় রায়হান মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সুফিয়ার অনুসরণ করিলেন, প্রতিবাদে একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। এই একটু আগে যে ঝড়ের দাপটে তাঁহার অন্তরাত্মা দলিত-মথিত হইয়া উঠিয়াছিল কোন্ মায়াবলে,তাহা যেন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

রায়হান চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন-জগজ্জোড়া অন্ধকারে পাহাড়-পর্বত, বালুকাময় প্রান্তর বাস্তু-চরাচর সব ডুবিয়া একাকার। উষ্ণ বায়ু প্রবাহ বন্ধ হইয়াছে একটু আগে। ততক্ষণে উত্তপ্ত ধরণীবক্ষের অর্ধদগ্ধ জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির গায়ে কতকটা শীতলতার আমেজ সোহাগভরে বুলাইয়া দিতে যেন মৃদুমন্দ অনিল-হিল্লোল ধীরে ধীরে প্রবহমান। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া সুফিয়ার তাঁবুর দ্বারদেশের পর্দাগুলি পত্‌পত্ শব্দে উড়াইতে উড়াইতে ভিতরের ক্ষুদ্র দীপশিখাটি নিবাইবার উপক্রম। বাহিরের সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে তাঁবুগুলির সম্মুখস্থ চত্বরে বালির উপরে স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকার দল মোটা বস্ত্র, পুরাতন তাঁবুর ছিন্ন আচ্ছাদন বা শতরঞ্জি পাতিয়া গা এলাইয়া দিয়াছে। কিন্তু বালির তাপ তখনো ঠাণ্ডা না হওয়ায় পিঠ বাঁচাইতে তাঁহারা ঘন ঘন এপাশ-ওপাশ করিতেছে। সেই উন্মুক্ত গগনতলে যে কয়জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা খর্জুরপত্র-রচিত খাটিয়ায় শয়ন করিয়াছিল, তাহারা শেষ রাত্রের ঠাণ্ডায় আপাদমস্তক আবৃত করিবার জন্য এক একখণ্ড চাদর রাখিয়া দিয়াছে বালিশের তলায়। তাহাদের কাহারো কাহারো সদ্য নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায়, পার্শ্বে রক্ষিত মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা ধাতুনির্মিত আলবলার দীর্ঘ নল হস্তস্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িবার উপক্রম; কাহারো কাহারো মুখে পাতলা গুড় গুড় আওয়াজ মাঝে মাঝে তখনো শ্রুতিগোচর হয়।

তাঁবুর ভিতরে রায়হানকে একটা দড়ির খাটিয়ায় বসাইয়া সুফিয়া বলিল, "বস ভাইজান! আমার হাবিলকেও ডেকে আনি। বড় সাধ হয়েছে, আজ দু'জনকেই এক সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াব। তোমার যাওয়া এখন হবে না। হাবিলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে চলে যেও যেদিকে খুশী। তোমাকে আর ঘাঁটাবো না।" সুফিয়া হাবিলকে ডাকিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

রায়হান গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সংসারে নারীচরিত্র বুঝা সত্যই দুষ্কর, নারীর অন্তর বড় দুর্জ্ঞেয়! অন্তরে আগ্নেয়গিরির অনলপ্রবাহ চাপিয়া রাখিয়া ইহারা স্বচ্ছন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, কেহ টেরও পায় না। কে জানে, এই বেদুঈন-বালার গোপন অন্তরেও কি আগুনই বা লুক্কায়িত রহিয়াছে।

চৌদ্দ

পরদিবস প্রভাতে বেদুঈন-মেয়েরা ঝরনা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই পল্লীতে ছুটাছুটি করিয়া খবর দিল- একদল কুরাইশ গীত-বাদ্যসহকারে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহ অনুমান করিল বরযাত্রা; কেহ বলিল-না, তা নয় যাত্রীদল তাহাদেরই চিরশত্রু বনি-হাবিল পরিবার-হয়তো জহুল পাহাড়ে পূজা দিতে আসিতেছে; হয়তো-বা এই বেদুঈন পল্লীই আক্রমণ করিবে। তখনই মুখে মুখে খবরটা অতিরঞ্জিত হইয়া এক তাঁবু হইতে অন্য তাঁবুতে বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া পড়িল।

চারিদিকে তখন সাজ সাজ রব। দেখিতে দেখিতে লুণ্ঠন ব্যবসায়ী বেদুঈন দল নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে দলপতির পার্শ্বে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। স্ত্রীলোকরাও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। যুবতী ও প্রৌঢ়ারা যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলিয়া দেয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আপন আপন ঘর-সংসার ও শিশু-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত।

যাত্রীদল ততক্ষণে প্রায় জহুলের পাদদেশে সমাগত। পাহাড় অতিক্রম করিলেই বেদুঈন-পল্লী। অশ্ব ও উষ্ট্রের পদশব্দ বাদ্য ধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া গগনভেদী কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছে। সে তুমুল তূর্য নিনাদ বেদুঈন পল্লীর প্রতিটি নর-নারীর অন্তর বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

বর্শা-হস্তে সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেদুঈন-সর্দার আন্‌সার চিৎকার করিয়া উঠিল, "যাত্রী হউক, যোদ্ধা হউক, আক্রমণ কর, লুণ্ঠন কর। শুন্‌ছ না রণ-দামামা, দ্রুত ধাবমান অশ্বের খুরধ্বনি? কোথায় অলিদ,তালহা,আবু ওমর? নিজ নিজ দল নিয়ে এই মুহূর্তে আক্রমণ কর। সওদাগরী কাফেলা হোক, কুরাইশ বনি হাবিস হোক, কেহ যেন আজ নিস্তার না পায়! যাও সম্মুখে, ডাইনে, বামে, তীব্রবেগে হামলা চালাও, এক্ষণ আমার অনুসরণ কর!" এই বলিয়া সর্দার

পাহাড়ের দিকে দ্রুত অশ্ব ছুটাইতেই বেদুঈন অশ্বারোহী দলও ক্ষিপ্রগতিতে দলপতির পশ্চাদনুসরণ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই দস্যুগণ পাহাড়ের পাদদেশে আনন্দ-বিহ্বল যাত্রীদের উপর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কুরাইশগণ মৃতপ্রায় সায়ফুনকে অশ্বপৃষ্ঠে বাঁধিয়া, পাহাড়ের পাদদেশে লইয়া যাইতেছিল ভূগর্ভে জীবন্ত প্রোথিত করিবার জন্য। এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য তাহারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সকলেই আমোদ-প্রমোদে মত্ত, কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ সুরা পান করিতে করিতে বিলাসিনী নর্তকীদের সঙ্গে রসালাপে মশগুল। আবার কেহ কেহ চলিতে চলিতে কি উপায়ে সায়ফুনকে জীবন্ত সমাধিস্থ করিবে তাহারই আলোচনায় মগ্ন! নর্তকীরা উষ্ট্রপৃষ্ঠে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে বাদ্যস হকারে শোহেলীদের কীর্তিগাথা গাহিয়া সকলকে উত্তেজিত করিতেছে। সর্বাগ্রে রাহেলের নেতৃত্বে কয়েকজন বলিষ্ঠ অশ্বারোহী আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীতা অর্ধমূর্ছিতা সায়ফুনকে কড়া প্রহরায় বহনে রত। পশ্চাতে আলুথালু বেশে কুলছুম ও অপর কয়েকজন পুরনারী অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে পাষাণ-হৃদয় রাহেলও সর্দারদের নিকটে কাতরভাবে সায়ফুনের প্রাণভিক্ষা মাগিতেছে। এমন সময় যাত্রীদলের পশ্চাদ্দেশে বেদুঈনদের এই অতর্কিত আক্রমণ!

বেদুঈন-দস্যুদের এই দলবদ্ধ আক্রমণ কুরাইশগণ কল্পনাও করে নাই। পূর্বে এই স্থানে কোন পল্লী ছিল না। বেদুঈনগণ শ্যামল ভূমি খুঁজিতে খুঁজিতে বিরাট পশুপাল লইয়া কবে এই স্থানে আসিয়া তাঁবু গাড়িয়াছে, কুরাইশগণ তাহা জানিত না। আগে এই পথে কোন বিপদের আশঙ্কাও ছিল না। সেইজন্যই তাহারা উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসে নাই।

নিমেষমধ্যে গীত-বাদ্য সব থামিয়া গেল। এই আকস্মিক আক্রমণে সকলের শক্তি-সাহস যেন বিলুপ্তপ্রায়, কাহারও মুখে ভাষা নাই। মৃত্যু-ভয়ে ভীতা ও বিবর্ণা নারীদের কণ্ঠে শুধু কাতর আর্তনাদ। মুহূর্ত পূর্বে যাহারা রঙ্গরসে মত্ত ছিল, আনন্দে বিভোর ছিল, অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তাহাদের মুখমণ্ডল এখন বিষাদ-কালিমায় লিপ্ত। অল্পকাল মধ্যেই অসহায় নরনারীর দল দিশাহারা হইয়া গৃহাভিমুখে পালাইতে লাগিল।

রাহেল কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়িল না। মুষ্টিমেয় লোকজন লইয়াই সে বিপুল বিক্রমে বেদুঈনদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যস্ত। চারিদিকে তখন নিদারুণ বিশৃঙ্খলা। পরাজিত কুরাইশ দল প্রাণভয়ে নিজ নিজ অশ্ব ও উষ্ট্রগুলিকে বারংবার কশাঘাত করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছে; কেহ কাহার দিকে তাকাইয়াও দেখে না। কোন্ হতভাগ্য আহত হইয়া চিৎকার করিতেছে, কোথায় কে ছিটকাইয়া পড়িতেছে, অস্ত্রাঘাতে কে কখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, কে তাহার সন্ধান করিবে? সকলেই আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে ব্যস্ত।

কিন্তু কুরাইশগণ তাহাতেও পরিত্রাণ পাইল না। হিংস্র বেদুঈনদল শুধু লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইল না; পরন্তু কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করিল।

কুলছুম মনে করিল, এই দৈব সুযোগ আল্লাহ্ তা'আলার এক অপার অনুগ্রহ! দেখিল কিয়দ্দূরে রাহেল অনুচরবৃন্দসহ বেদুঈদেনর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত। এইদিকে দৃষ্টি ফিরাইবার তাহার অবকাশ কই!

সায়ফুনকে লইয়া পালাইবার এই সুবর্ণ সুযোগ কুলছুম হারাইতে চাহিল না। এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে হইতে অবতরণ করিয়া কটিদেশ বিলম্বিত ছুরিকাখানির সাহায্যে নিমেষে ক্ষিপ্রহস্তে সায়ফুনকে সে বন্ধনমুক্ত করিল। তারপর তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ভগ্নী সায়ফুন! ওঠ। অবিলম্বে আমার এই অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন কর।–যাও! পালাও বল্‌ছি!"

সায়ফুনের নির্বাণোন্মুখ জীবন–দীপ আবার যেন দপ্ করিয়া প্রজ্বলিত হইল। কিন্তু বহুক্ষণ দুঃসহ বন্ধনাবস্থায় থাকাতে এবং অনাহারে ও মৃত্যুভয়ে সে বড় শক্তিহীনা। পিপাসায় বক্ষদেশ বুঝি শুকাইয়া কাঠ। কুলছুমকে সে কি বলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না, বাক্যস্ফুরণই হয় না। তাহার এই দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া কুলছুম অবিলম্বে কাফেলার নিকটস্থ এক উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে কিছু পানি আনিয়া তাহাকে পান করাইল।

সায়ফুন সজলনয়নে কুলছুমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "ভগ্নী কুলছুম! তুমি আমাকে বাঁচালে? কিন্তু তোমার স্বামী একথা যখন জানবে?"

কুলছুম বাধা দিয়া বলিল, "সে দেখা যাবে! আল্লাহ্ তোমাকে যে বাঁচবার সুযোগ দিয়েছেন, সে যেন হেলায় ঠেলো না! যাও, পালাও এখনি!"

"কিন্তু যাব কোথায় কুলছুম? যাবার ঠাঁই কোথায়?"

"মরণ আমার! যাবে কই তাও কি বলে দিত হবে? কেন, রায়হান গেছে কোথায়, তা কি তুমি জান না? উঠ, তাড়াতাড়ি কর! বিলম্বে ফল কি হবে বুঝতেই পারছ! আমার শওহর এখনই যে ছুটে আসবে!" এই বলিয়া কুলছুম সায়ফুনকে হাত ধরিয়া আপন অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিল।

সীমাহীন ভয়-ভাবনায় সায়ফুনের বুকের স্পন্দনধ্বনি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। হতভাগিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ়া। যুদ্ধক্ষেত্রের চিৎকার কোলাহল, কুলছুমের উপদেশ, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যত, সম্মুখে মৃত্যুভয়-সবকিছু মিলিয়া-মিশিয়া তাহাকে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে; দেহে বিন্দুমাত্র শক্তিও যেন অবশিষ্ট নাই; অশ্বপৃষ্ঠে স্থিরভাবে সে বসিতেই পারিল না। কুলছুম ঘোটককে কশাঘাত করিবা মাত্র যেই পা বাড়াইয়াছে অমনি সায়ফুন ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

কুলছুম সায়ফুনের অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ব্যথায় বাঁচে না। বুঝিল দূর্বল দেহে অশ্ব চালানো দূরে থাক, সোজা হইয়া সে বসিতেই পারিবে না। অবিলম্বে কুলছুম সায়ফুনকে ভূতল হইতে তুলিয়া পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া দিল। তারপর নিজে এক লম্ফে সায়ফুনের পশ্চাতে আরোহণ করিয়া অশ্ববল্গা দুই হাতে ধারণ করিল।

সায়ফুন কুলছুমের দুই বাহুর মধ্যস্থলে উপবিষ্টা। কুলছুমের কোমল বাহুদ্বয় তাহার দুই পার্শ্বদেশ চাপিয়া রাখিয়াছে। অশ্ব-কেশর আঁকড়াইয়া ধরিয়া কোনক্রমে সে সোজা বসিয়া রহিল। মৃতপ্রায় যুবতীর দেহে যেন সদ্য প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। রায়হানকে পাইবার আশায় তাহার অন্তর সজীব হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু ভয় দূরীভূত হইল না। ঘাড় ফিরাইয়া সে বারংবার পশ্চাদ্দিকে তাকাইতে লাগিল। মাথার উপরে কুলছুমের ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস ও তাহার পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন কুলছুমের কোমল বক্ষের হাতুড়ীপেটার ন্যায় ঠক্‌ঠকানি,সায়ফুনকে জানাইয়া দিল-অনিশ্চিত আশঙ্কায় কুলছুমও সন্ত্রস্তা। হয়তো সে বুঝিতে পারিয়াছে-তপ্ত কটাহ

হইতে অগ্নিকুণ্ডেই বুঝি বা ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি তৃণখণ্ড দেখিয়াও যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, মুক্তির সন্ধান পাইয়া সায়ফুনের অন্তরও আশা-ভরসায় সেইরূপ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

মুহূর্তমধ্যে কুলছুম সোজা দক্ষিণাভিমুখে সমুদ্রের দিকে অশ্বে কশাঘাত করিতেই ঘোটক ধূলিবালি উড়াইয়া বালুকাময় প্রান্তরে তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। সীমাহীন ভাবনায় সে বড় ব্যাকুলা। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, হয়তো নিষ্ঠুর স্বামী দলবলসহ এখনই ছুটিয়া আসিবে, এখনই তাহাদের আক্রমণ করিবে। পরক্ষণেই ভাবিল স্বামী হয়তো বেদুঈনদের হস্তে বন্দী হইয়াছে, কিন্তু বেদুঈনরাও তো তাহাদের ধরিবার জন্য ছুটিযা আসিতে পারে। সম্মুখেই পাহাড়। কোনক্রমে সেই পাহাড়ের আড়ালে যাইতে পারিলেই সে স্বামীর কিংবা বেদুঈনদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইতে পারিবে। আরো জোরে ছুটিবার জন্য, ধাবমান অশ্বকে পুনঃপুনঃ কশাঘাতে সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

কিন্তু ঘোটকের ক্ষিপ্রগতি সায়ফুন সহ্য করিতে পারিতেছে না। অশ্বপৃষ্ঠে ঝুঁকিয়া সজোরে কেশরগুচ্ছ সে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। সহসা হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়ক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রায়হানের সেই আংটি-সেই বিদায়স্মৃতি। আংটির উপরে খোদিত লিপি-'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পরম দয়াময়'- তাহার দুই চোখে আশার আলো যেন ফুটাইয়া তুলিল; মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর ভরপুর। যুবতীর ভক্তি-রসাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল-"ইয়া রব! ইয়া হাফেয! ইয়া রহমান!"

অশ্ব বিদ্যুৎবেগে ছুটিতে লাগিল। কুলছুম ঘাড় ফিরাইয়া দেখে-উত্তরদিকে ছত্রভঙ্গ শোহেলীর দল প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। কিন্তু পরিত্রাণ পাইবার আশা নাই, বেদুঈনগণ ক্ষিপ্রগতিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। অশ্ব -পদাঘাত -বিক্ষিপ্ত ধূলিবালিতে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। সেই ধূলিবালির পর্দার অন্তরালে রাহেল ও তাহার সঙ্গীদের আর দৃষ্টিগোচর হয় না। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! অল্পক্ষণ পূর্বের সেই আনন্দমুখর কুরাইশ দলে এখন কী করুণ আর্তনাদ!

কুলছুম ও সায়ফুন বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তবু শুনা যায় কুরাইশদের আর্তনাদ। কে জানে, কত অসহায় নরনারী দস্যু হস্তে বন্দী হইল, কত নিহত,

কত আহত হইল! কে জানে, কত পর্যন্ত কুরাইশ–বীর হৃদয়ভেদী আর্তনাদ করিয়া অকালে প্রস্তরশয্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। কুলছুম সেই বধ্যভূমির দৃশ্য আর একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া পুনরায় অশ্বে কশাঘাত করিল।

ধূলিবালির পর্দার আড়ালে দুই অশ্বারূঢ়া নারী যুদ্ধরত বেদুঈন ও কুরাইশদের দৃষ্টিপথ হইতে যে পলায়ন করিল, অনেকেই হয়তো তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইল না; দেখিলেও পশ্চাদ্ধাবন করিবার সুযোগ মিলিল না।

অনুচ্চ পাহাড়ের পর পাহাড়, টিলার পর টিলা! বালুকা ও প্রস্তরসমাকীর্ণ প্রান্তরে ছাড়াছাড়া বাবলা জাতীয় কন্টক বৃক্ষ, লতাগুল্ম এবং ক্বচিৎ দুই একটা খর্জুর বন ছাড়া আর বৃক্ষলতার নাম নিশানাও নাই। রৌদ্র এখনই কত ঝাঁজালো!

আর একটা পাহাড়ের মোড়ে ঘুরিয়া কুলছুম আবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখে– দূরে, বহুদূরে একজন অশ্বারোহী যেন তীরবেগে তাহাদেরই অনুসরণ করিতেছে। ধূলিবালির আবরণে আরোহীকে ভালো দেখা যায় না। ভয়ে কুলছুমের দেহ প্রায় আড়ষ্ট হইবার উপক্রম। প্রাণভয়ে সে বারংবার অশ্বপৃষ্ঠে সজোরে কশাঘাত করিতে লাগিল।

কুলছুম শুষ্ক কণ্ঠে এইবার সঙ্গিনীকে বলিল, "বোন সায়ফুন! আর বুঝি তোমাকে বাঁচাতে পারবো না! নিজেও বাঁচবো না। এক বেদুঈন দস্যু ছুটে আসছে যেন আমাদের হত্যা করতে। ইয়া রহীম! ইয়া রাহমান!" এই বলিয়া পুনরায় কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বের গতিবেগ বাড়িয়া উঠিল।

আসন্ন মৃত্যু–বিভীষিকায় কুলছুম ও সায়ফুনের মুখমণ্ডল বিবর্ণ; নিদারুণ নৈরাশ্যে ও শ্রমাধিক্যে উভয়ের দেহমন অবসন্ন; ধমনীর চঞ্চল রুধিরধারা আরও চঞ্চল, উদ্দাম হইয়া হৃদপিণ্ড শতধাবিদীর্ণ করিবার উপক্রম। প্রখর রৌদ্রে উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ যেন অনলশিখার ন্যায় তাহাদের সর্বাঙ্গে সেঁকা দিতেছে। স্বেদ–সিক্ত বসন আগুন–হাওয়ায় মুহূর্তমধ্যে শুকাইয়া যায়, আবার ঘর্মধারায় সিক্ত হয়, আবার শুকায়। লবণাক্ত স্বেদবিন্দু চোখে–মুখে গড়াইয়া কেবলই পীড়া দেয়, এক–একবার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করিয়া তুলে; মুছিবার অবকাশও নাই। বালুকাময় প্রান্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের সংঘাতে অশ্বের পদচতুষ্টয় ক্ষতবিক্ষত; সেইজন্য উহার গতিবেগ মন্দীভূত। কুলছুম আবার সভয়ে তাকাইয়া দেখে–

পশ্চাদ্ধাবমান সেই অশ্বারোহী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে বাঁচিবার আর আশা নাই। নিরস্ত্রা অসহায়া নারীদ্বয়ের প্রাণ মৃত্যুভয়ে একেবারে কণ্ঠাগত। মরিয়া হইয়া কুলছুম আহত ঘোটকের পৃষ্ঠদেশ পুনঃপুনঃ কশাঘাতে জর্জরিত করিয়া তুলিল। অর্ধমৃতা সায়ফুনের বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়।

ছুটিতে ছুটিতে সহসা পাহাড়ের নিচে এক বৃহৎ প্রস্তর সংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। দ্রুত ধাবমান অশ্ব ভূতলে লুটাইয়া পড়িতেই কুলছুম ও সায়ফুন অদূরে ছিটকাইয়া পড়িল। প্রস্তর সংঘর্ষে অশ্বের স্খলিত পদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শ্রমক্লান্ত ও আহত ঘোটক মুখগহবর ও নাসারন্ধ্রে প্রচুর ফেনপুঞ্জ নিঃসরণ করিতে করিতে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে ভূপতিতা নারীযুগল আহত হয় নাই। অবিলম্বে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া কুককুর-তাড়ির শশক-শাবকের ন্যায় পাহাড়ের গায়ে কোন ঝোঁপ-জঙ্গলে লুকাইবার চেষ্টা করিল। পশ্চাতে দ্রুত ধাবমান অশ্বের পদশব্দ ক্রমেই যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। একটু পরেই হয়তো ক্রোধোদ্দীপ্ত দস্যুর তরবারির আঘাতে উভয়ের ভবলীলা সাঙ্গ হইবে।

প্রান্তরময় পাহাড়ের গায়ে কোন ঝোঁপ-জঙ্গল নাই। মরিয়া হইয়া কুলছুম ও সায়ফুন বড় বড় পাথরের আড়ালে পালাইবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে লাগিল। উভয়ের ঘর্মাপ্লুত দেহের উর্ধ্বগামী রুধিরধারা মস্তিষ্ক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। তৃষ্ণায় অন্তরাত্মা যেন দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পালাইবার উপক্রম।

ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন। কিয়দ্দূরে দুই পাহাড়ের সংযোগস্থলে এক গভীর গহবর তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল. গুহামুখ লতাগুল্মে কতকটা আচ্ছন্ন। সেইগুলি ফাঁক করিয়া উভয়ে নিম্নদিকে তাকাইয়া দেখে-গুহাতল বেশ প্রশস্ত যেন; কিন্তু ভিতরে অমানিশার অন্ধকার বুঝি স্তূপীকৃত।

কুলছুম সায়ফুনের হাত ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "সায়ফুন! আর তো বাঁচতে পারবো না! তোমাকেও যে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু আজরাইলের প্রতীক্ষায় বাইরে না দাঁড়িয়ে গুহাভ্যন্তরে অনিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াই সমীচীন।

শিগগির ভিতরে চল!" এই বলিয়া সায়ফুনের হাত ধরিয়া কুলছুম গুহামধ্যে লম্ফ প্রদান করিল।

গভীর অন্ধকারে গুহাভ্যন্তরে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পদতলে অসমতল উপলখণ্ড, অসংখ্য কাঁকর কাঁটার ন্যায় ফুটিতে লাগিল। ভিতরে অধিক দূরে প্রবেশ করিতে তাহাদের সাহস হইল না। প্রস্তরময় গুহাপাত্র ঘেঁসিয়া উভয়ে ভয়ে কাষ্ঠ–পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, মুহুর্মুহু দয়াময় আল্লাহর করুণা ভিক্ষা করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সেই অশ্বারাহী মালভূমি পার হইয়া পাহাড়ের পাদমূলে পৌছিয়াছে। পথিমধ্যে সে দেখিল, এক মুমূর্ষু অশ্ব যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গাত্রোত্থান করিতে নিষ্ফল পদসঞ্চালনে রত। যাহাদের পশ্চাতে সে এতদূর ছুটিয়া আসিয়াছে, সেই শিকারদ্বয় নিকটেই যে কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। সাবধানে দলিত লতাগুল্ম ও পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমে সে গুহামুখে আসিয়া রক্ত–রঞ্জিত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল।

গুহাভ্যন্তর হইতে কুলছুম অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করিয়া চিনিতে পারিল। দেখিল, অনুসরণকারী কোন বেদুঈন দস্যু নহে–তাহারই দজ্জাল স্বামী রাহেল! স্বামীর স্বভাব সে জানিত। জানিত জঙ্গলে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাহাদের সে বাহির করিবেই। তবুও একটা আশার আলো তাহার চোখেমুখে ফুটিয়া উঠিল। ভাগ্যিস কোন হিংস্র বেদুঈন ছুটিয়া আসে নাই! মুহূর্ত মধ্যে একটা মতলব ঠিক করিয়া গুহাভ্যন্তর হইতে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

হর্ষোৎফুল্ল কুলছুম রাহেলকে জড়াইয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "ওগো, তুমি! তুমি এসেছ! দস্যুদের হাতে বন্দী হওয়ার ভয়ে আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসছি! বল, তুমি সায়ফুনকে রক্ষ করবে! বল, তুমি দুঃখিনীকে হত্যা করবে না!"

রাহেল তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "শোন কুলছুম! সায়ফুন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, আমাদের প্রাচীন ধর্মের বিরোধী, আমি তাকে হত্যা করতেই এসেছি–রক্ষা করতে নয়! কেন, তুমি কি জান না–তার পিতা তাকে হত্যা করতে আদেশ দিয়েছেন? তা'ছাড়া সে যে আমাকে নিকাহ্ করতে

অস্বীকার করেছে! ভুলে গেছ, সে আমাকে অপমান করেছে? আমি তাকে বাঁচাব! হাঁ-হাঁ-হাঁ!" নিষ্ঠুর ঘাতকের বিকট হাস্যধ্বনি চারিদিকের পাহাড় প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইল।

কুলছুম স্বামীর মুখের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "তুমি এক কঠোর, এত নিষ্ঠুর!"

রোষে অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া রাহেল চেঁচাইয়া উঠিল; আমি নিষ্ঠুর? পাপিষ্ঠা সায়ফুন রায়হানকে ভালবাসে সেই বিদ্রোহী, সেই সমাজদ্রোহী রায়হান! কে তা' সহ্য করবে! আমি এই মুহূর্তে তাহার ভালবাসার সাধ চিরতরে মেটাব। কোথায় সে বিদ্রোহিনী? পাপিষ্ঠা! কে তোকে এবার রক্ষা করে দেখি! কোথায় এখন তোর প্রেমিক রায়হান?" এই বলিয়া রাহেল গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

কুলছুম স্বামীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো শওহর! এত পাষাণ হয়ো না।! এমন করে প্রতিশোধ নিও না। সায়ফুন তোমার কোন অনিষ্টই করেনি, কোন ক্ষতিও করেনি, দুঃখিনীকে এত কঠোর শাস্তি তুমি দিও না।"

রাহেল ভূলুণ্ঠিত স্ত্রীকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "দূর হ, হতভাগিনী! দূর হ! তুই-ই তাকে পালাতে সাহায্য করেছিস, তুই-ই তাকে লুকিয়ে রেখেছিস! তোরও আজ রক্ষা নেই। কোথায় সেই পাপীয়সী? আমি এখনই তাকে হত্যা করে অন্তরের জ্বালা জুড়াব!" এই বলিয়া রাহেল এক লম্ফে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

সায়ফুন গুহামধ্যে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে লুকাইয়া সকলই লক্ষ্য করিতেছিল, ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ অসাড় হইবার উপক্রম। মুহর্মুহ দয়াময় আল্লাহর করুণা ভিক্ষা করিয়া কেবলই সে আকুল প্রার্থনা করিতেছিল। রাহেল গুহামুখে সায়ফুনের কোন সন্ধান না পাইয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে আরও ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ আলোক হইতে আঁধারে আসিয়া রাহেল কিছুই দেখিতেছিল না, কিন্তু অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকিয়া সায়ফুনের চক্ষুদ্বয় অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে লক্ষ্য করিল, রাহেল তাহাকে ডাহিনে ফেলিয়া অন্ধের ন্যায় দুই হাতে কেবলই হাতড়াইতেছে। তাহার কোষবদ্ধ তরবারির মুষ্টি অন্ধকারেও কতকটা চক্‌চক্ করিতেছে। বাঁচিবার উগ্র আকাঙ্খা তাহার প্রাণে এক অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করিল, অপূর্ব সাহস জাগাইয়া তুলিল। সে অকস্মাৎ রাহেলের কোষবদ্ধ তরবারি একটানে ছিনাইয়া লইল, রাহেল ঘাড় ফিরাইয়া তাহা লক্ষ্য করিতে-না-করিতেই এক লম্ফে সে গুহার বাহির হইয়া আসিল।

সায়ফুন উদ্‌গত তরবারি হস্তে গুহামুখে দাঁড়াইয়া তেজোদীপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "রে অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠ! দেখলি, কে আমাকে রক্ষা করেছেন? তোকে কে এখন রক্ষা করবে বল? নরাধম লম্পট! সাবধান! বাইরে এলই জান্‌বি মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রাণভয়ে ভীতা নিরস্ত্রা নারীকে হত্যা করতে খুঁজে বেড়াচ্ছিস? লজ্জা করে না, কাপুরুষ! আয় একবার বাইরে! দেখে নেব কত শক্তিশালী পুরুষ! এক আঘাতে তোকে জাহান্নামে পাঠাব। নারীর অপমান করতে যে হস্ত উদ্যত করছিলি, যে পদে লুণ্ঠিতা নারীকে দলিত করলি, তা কেটে খন্ড খন্ড করে বুঝিয়ে দেব-নারীর ইজ্জতেরও মূল্য আছে, নারীরও বাঁচার অধিকার আছে। তোর পাপদেহের রুধির ধারায় বসন রঞ্জিত করে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উড়িয়ে দেব-আরববাসী লাম্পট্যের পরিণাম দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠবে; ঘৃণায় লজ্জায় ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করবে। একবার শুধু বাইরে আয়, দুরাত্মা- শয়তান।" মহাক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় সায়ফুন যেন রাক্ষসী-মূর্তির ধারণ করিয়াছে। কী এক আসুরিক শক্তির প্রভাবে তাহার সর্বাঙ্গ যেন উদ্বেল-উচ্ছল।

গুহাভ্যন্তরে হতভম্ব রাহেল ভূতগ্রস্তের ন্যায় দণ্ডায়মান! নিরস্ত্র অবস্থায় সে এই উন্মাদিনী রাক্ষসীর সম্মুখীন হইতে ভরসা পাইল না। মুহূর্তে যে কাণ্ড সংঘটিত হইল, ইহা তাহার স্বপ্নের অতীত। নারী হস্তে এইভাবে প্রবঞ্চিত, লান্‌ছিত হইবে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সায়ফুনের এই আকস্মিক পরিত্রাণে কুলছুমের আনন্দ আর ধরে না। অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া এক লম্ফে সে রাহেলের অশ্বে আরোহণ করিল। তারপর

ঘোটকটিকে ত্বরিত গুহামুখের নিকট আনিয়া সায়ফুনকে উহাতে আরোহণ করিতে ইঙ্গিত করিল।

সায়ফুন এই সুযোগকে মনে করিল আল্লাহর এক খাস রহমত। উদ্যত অসি ডান হস্তে ধারণ করিয়া এক লম্ফে কুলছুমের পশ্চাতে আরোহণ করিল। কুলছুম আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা করিল না, ঘোটকের বক্ষদেশে পদাঘাত করিয়া জোরে পূর্বদিকে ছুটাইয়া দিল।

ক্রমে ডাহিনের বালুকাময় প্রান্তর দূরে ফেলিয়া, সম্মুখের অনুচ্চ মালভূমিগুলি একে একে অতিক্রম করিয়া, অশ্ব পার্বত্যপথে যথাশক্তি ছুটিল।

পনর

বেলা দ্বিপ্রহর। অগ্নিবৎ বায়ুপ্রবাহ অশ্বারূঢ়া সায়ফুন ও কুলছুমের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া প্রাণ কণ্ঠাগত করিয়া তুলিল। মাথার উপর প্রখর সূর্য যেন অনলবর্ষী। বস্ত্রাঞ্চলে নাক-মুখ ঢাকিয়া উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে দিগন্ত বিস্তৃত বালুকা ও প্রস্তরময় প্রান্তরে ছুটিতে লাগিল। এক একবার স্থানে স্থানে দুই-একটি খর্জুর বৃক্ষ দেখিয়া এক মুহূর্ত ছায়ায় বিশ্রাম লইবার আশায় উভয়ের প্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠে, কিন্তু সাহস হয় না; ভয় হয়, দুর্দান্ত রাহেল আবার হয়তো অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পশ্চাতে তাড়া করিয়া আসিতেছে।

যুবতীদ্বয় আধমরা হইয়া প্রান্তরভূমি কোনক্রমে অতিক্রম করিল। উভয়ে পশ্চাতে তাকাইয়া দেখে-বহুদূর-বিস্তৃত বালির উপরে প্রখর রৌদ্র যেন লেলিহান অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া দিয়া বায়ুভরে ভাসমান ধূলিবালিতে ক্ষীণ কুয়াশার সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে ওখানে দুই-একটা খর্জুর বৃক্ষ আধপোড়া ডালপালাগুলি এলাইয়া দিয়া নির্জীব-নিঃসাড় দণ্ডায়মান। পথবিহীন বালিসমুদ্রে উষ্ট্র ও ঘোটকের ইতস্তত পদবিক্ষেপে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার সৃষ্টি হইয়াছে। বহু দূরাবধি কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কুলছুম ও সায়ফুন কতকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু ভয় দূরীভূত হইল না।

অদূরে জাবালহোর গিরিমালা গর্বিত প্রহরীর ন্যায় মাথা উঁচু করিয়া দন্ডায়মান। চারিদিকে কোথাও একটা লোকালয় নাই। বহুদূর পর্যন্ত কোন বেদুঈন পল্লীও দৃষ্টিগোচর হয় না। রৌদ্র নয় যেন দোযখের আগুন। তদুপরি উষ্ণ বায়ু হু হু করিতেছে। সেই অগ্নিবৎ রৌদ্র-তাপে অর্ধদগ্ধা যুবতীদ্বয় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিল-অবিলম্বে কোথাও আশ্রয়স্থলের সন্ধান না পাইলে পিপাসায় প্রাণবায়ু হয়তো বহির্গত হইবে। কিন্তু পথ চলার তো বিরাম দেওয়াও চলে না। তাহা ছাড়া দাঁড়াইবার একটু ঠাঁইও যে নাই। এতক্ষণ পরে সায়ফুন শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "যাব কোথায়, কুলছুম?"

কুলছুম সহজে উত্তর দিতে পারিল না–রসনা ও কণ্ঠতালু শুকাইয়া একেবারে কাঠ। অশ্ববল্‌গা শিথিল করিয়া বাম হাতে সে একবার কপালের ঘর্মধারা মুছিয়া লইল। তারপর ঢোক গিলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "সায়ফুন! কোথায় গেলে প্রাণ রক্ষা হবে জানি নে, বুকের ভিতরটা যেন জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চল, ঐ পাহাড়ে গিয়ে কোন নহরের সন্ধান পাই কিনা দেখি। না পেলে মরণ সুনিশ্চিত।"

সায়ফুন কুলছুমকে আশার বাণী শুনাইল, "যে মহান আল্লাহ্‌ আমাদের জালেমের উদ্যত তরবারির তলদেশ থেকে ছিনিয়ে এনেছেন, তাঁর করুণার পার নেই! তিনিই আমাদের বাঁচাবেন। চল যাই ঐ পাহাড়ে। হয়তো পানির সন্ধান সেখানে পাব!"

বহুক্ষণ উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে অর্ধমৃত অবস্থায় পথ চলিল। কথা বলিবার আর কাহারও প্রবৃত্তি নাই। মনে হইল, মরুপ্রান্তরে যোজনবিস্তৃত আগুনের খেলা যেন শেষ হয় না। পরিশ্রান্ত ঘোটক জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে পাহাড়ের দিকে যথাশক্তি ছুটিতেছে।

বেলা অনেকটা গড়াইয়া গেলে উভয়ে এক পাহাড়ের ছায়ায় পৌছিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। কুলছুম নির্বাক সায়ফুনের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবৃছ সায়ফুন?"

সায়ফুন উত্তর করিল, "ভাবছি, তোমারই কথা–আর তোমার পাষণ্ড স্বামীর কথা। আলো–আঁধারের এমন অভাবনীয় মিলন কিরূপে যে সম্ভব হলো তা' ভেবে পাইনে। কুলছুম! আমার দুর্ভাগ্যের অংশীদার হ'তে কেন তুমি ছুটে এলে? এমন করে বারে বারে কেন আমায় বাঁচালে? তোমার শওহর রুষ্ট হয়ে আর যদি তোমায় গ্রহণ না করে?

"তুমি কি মনে কর, সেই বর্বর পশু তোমাকে হাতছাড়া হতে দেখে জ্যান্ত রাখতো আমাকে? অতীতে অকারণে যতসব নিষ্ঠুর নির্যাতন সইতে হয়েছে, আমার সর্বাঙ্গ এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে। এতক্ষণে আমার প্রাণবায়ু অনন্ত আকাশে হয়তো মিশে যেত। দৈবক্রমে বেঁচে থাকলেও সে আমাকে আর গ্রহণ করতো না। কিন্তু কেন এই অদৃষ্টের লিখন? বলতে পার, যে অধিকার বলে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে, স্ত্রী স্বামীকে বর্জন করার সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কেন?"

বণিক-দলপতি তৎক্ষণাৎ উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক নিকটস্থ এক বৃক্ষচ্ছায়ায় নারীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কিছু খাদ্য ও পানীয় আনিতে পুনরায় কাফেলার দিকে ছুটিলেন।

সায়ফুন ঘর্মসিক্ত মুখমণ্ডল মুছিয়া বলিল, "কেমন মনে হয়েছে কুলছুম?"

কুলছুম চকিতা হরিণীর ন্যায় চারিদিকে তাকাইয়া বলিল, "ভালই হবে হয়তো, লোকটার যৌবনের উচ্ছ্বাস কমে গেছে বহুদিন। কাজেই কোন দুর্ভাবনার কারণ দেখি না; কিন্তু ভয় হয়, এখনই সেই জালিম শয়তান পাহাড়ের উপর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে না আসে!"

সায়ফুন বুঝিল, কুলছুম তাহার স্বামীর আক্রমণাশঙ্কায় অস্থির। ভয়ে তাহার মুখমণ্ডলও পাংশু বর্ণ ধারণ করিল। অল্পক্ষণ পরেই সর্দার দুইজন সঙ্গীসহ ফিরিয়া আসিলেন—একের হাতে খাদ্যের পুঁটুলি, অপরের পৃষ্ঠদেশে একটা পানির মশক।

তাপদগ্ধা নারীযুগল প্রথমে প্রাণ ভরিয়া পানি পান করতঃ তৃষ্ণা নিবারণ করিল। জীবনে পানি এত সুস্বাদু আর কখনও বুঝি মনে হয় নাই। সায়ফুন আল্লাহ্‌র শুকর্‌গুযারি করিয়া বলিতে লাগিল—আহা! কি সুমিষ্ট পানি! কি নিয়ামত! ইয়া আল্লাহ্‌! তোমার মহিমা অপার! কোটি কোটি প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিতে যে পানির নহর সৃষ্টি করিয়াছ, ভুবন জুড়িয়া যে পানির দরিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছ—সে তোমার অপূর্ব দান।

তরুণীদ্বয় সামান্য কয়েক টুকরা রুটি ও খর্জুর লইয়া আহারে বসিল। খাইতে খাইতে তাহারা চকিত নয়নে বারংবার পাহাড়ের উপরে এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে দেখিয়া বণিক-সর্দার বুঝিতে পারিলেন, নারীদ্বয় শত্রুভয়ে শঙ্কিতা। সর্দার তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন, "নির্ভয়ে তোমরা পানাহার কর বেটি, সংখ্যায় আমরা অল্প নই। কেউ এখানে তোমাদের অনিষ্ট করতে সাহস পাবে না। দেখে মনে হয় তোমরা ভদ্র বংশীয়া—হয়ত বা ভাগ্য বিড়ম্বনায় বিপদগ্রস্তা। নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্‌ তোমাদের রক্ষা করবেন। আমাদের নিকটে কোন সাহায্য কি প্রত্যাশা কর?"

দলপতির আশ্বাসবাণী কুলছুম ও সায়ফুনের অন্তরে যেন সঞ্জীবনীশক্তি ঢালিয়া দিল। তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না–দলপতি মুসলমান, পাষাণহৃদয় পৌত্তলিক নহে। হৃষ্টচিত্তে ভোজন সমাপ্ত করিয়া তাহারা নিজ নিজ দুর্দশার কাহিনী দলপতির নিকটে খুলিয়া বলিল।

নির্যাতিতা নারীদ্বয়ের করুণ–কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে দলপতির নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "তোমাদের কাহিনী বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক। কিন্তু এ কাহিনী তো নূতন নয় আম্মা। ধর্মের জন্য, ঈমানের জন্য, কত হতভাগ্য মুসলমান কত অমানুষিক অত্যাচার যে সহ্য করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।"

সায়ফুন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "হাঁ, কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কত অসহায় নরনারী মাতৃভূমি ত্যাগ করে আপনাদের মদীনায় নাকি আশ্রয় নিয়েছেন। আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল মুহাম্মদ (সঃ)–কে তাঁর দেশবাসী যেভাবে নির্যাতন করেছিল তা' শুনলে পাষাণের চক্ষেও অশ্রুধারা ঝরে। শেষটায় মদীনা মনোয়ারায় তিনিও শুনেছি আশ্রয় পেয়েছেন।"

কাফেলা সর্দার দরূদ পাঠ করিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র রহমতের উৎস–ধারা সেই পুণ্যাত্মার যখন প্রাণসংশয়, দেশবাসী ও আত্মীয়–স্বজন যখন তাঁর প্রাণ নাশে কৃতসঙ্কল্প, তখন তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে মদীনায় হিজরত করেন। আহা! কী তাঁর সহিষ্ণুতা! কী ক্ষমাগুণ! কী দয়ামায়া! সে সব বলে শেষ করার নয়। কিন্তু মদীনা আজ তোমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না আম্মা, সেজন্য আমরা কত যে দুঃখিত!"

কুলছুম জিজ্ঞাসা করিল, "কেন সর্দারজী? কেন পারবে না?"

সর্দার অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "হুদায়বিয়ার সন্ধি তোমাদের জন্য আমাদের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে আম্মা। নিরুপায় হয়েই আলা–হযরত সেই সন্ধিশর্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এক্ষণে তোমাদের কী উপায়ে যে সাহায্য করবো, ভেবে পাচ্ছিনে।"

সায়ফুন বলিল, আপনার দয়া আমরা ভুলতে পারবো না। শুধু বলে দিন হাবশী দেশে কোন্ পথে যাব, আর কোন্ পথে সমুদ্রতীরে পৌছতে পারবো। আমরা সে-রাজ্যেই আশ্রয় নেব।"

দলপতি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মুলকে হাবাশ্! সে-যে দরিয়ার ওপারে, বহুদূর পথ। সে পথ তো সুগম নয় আম্মা। বিশেষত তোমরা অসহায়া নারী-পদে পদে বিপদাশঙ্কা। সেই দুর্গম পার্বত্য দেশে তোমরা দুই অবলা নারী যাবে কিরূপে?"

কুলছুম বলিল, "স্বদেশ আমাদের ত্যাগ করতেই হবে। সেই হাবশী দেশে যাবার পথটাই দয়া করে দেখিয়ে দিন।"

বণিক-সর্দার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেনঃ "আল্লাহ্ তোমাদের বাঁচবার উপায় নির্দেশ করুন। আমাদের পথ সমুদ্রোপকূল থেকে দূরে থাকবে বটে, তবে মুলুকে হাবাশে গেলে তিন দিবস ধরে আমাদের সঙ্গেই যেতে পারবে, তারপর দরিয়ার কিনারে যাবার সোজা পথ পাবে।"

কুলছুম জিজ্ঞাসা করিল, "চিনবো কি করে সে পথ?"

সর্দার উত্তর করিলেন, "আমাদের ছেড়ে কিছুদূর গিয়েই দেখতে পাবে এক পান্থশালা। বৃদ্ধ আয়ায তার মালিক। তিনি অতি হৃদয়বান পুরুষ। সব কথা তাঁকে খুলে বলো যেন, আল্লাহ্র মরযি যথাসাধ্য সাহায্য তিনি অবশ্যই করবেন।"

সায়ফুন বলিল, "শুনেছি, দরিয়ার কিনারেই নাকি এক বিরাট জঙ্গল?"

সর্দার বলিলেন, "হাঁ, আয়াযের মুসাফিরখানার অদূরেই ঈসের জঙ্গল। সেই জঙ্গল পার হয়েই সমুদ্রোপকূলে পৌছবে। কিন্তু আর বিলম্ব করলে আমরা সায়াহ্নের পূর্বে নিরাপদ স্থানে পৌছতে পারবো না। পথে দস্যু-তস্করের বড় ভয়। এইবার উঠতে হয় বেটি। রহমানুর রহীম তোমাদের রক্ষা করুন। আল্লাহ্ হাফেয।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ়া নারীযুগল একে অপরের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। সর্দার ইহাদের সন্দেহ দূর করিতে হাসিমুখে বলিলেন, "ভয় নেই আম্মা, আমরা মুসলমান-বে-ঈমান মুশ্রিক নই। নারীর ইয্যত রক্ষা করা আমাদের

ধর্ম। যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবে, কেউ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।"

কুলছুম ও সায়ফুন বণিকদের সঙ্গে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে আর দ্বিধাবোধ করিল না। সওদাগরী কাফেলা আবার পথ চলিতে লাগিল।

রৌদ্রের তেজ আর ততটা নাই। মরুভূমির বুকে অগ্নিশিখা কতকটা মন্দীভূত। উষ্ণ বায়ুপ্রবাহও অনেকটা কম। একটু পরেই স্নিগ্ধপ্রায় সন্ধ্যা সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইবে।

ষোল

বেদুঈনদের অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হইয়া কুরাইশগণ দিগ্বিদিকে ছুটিয়াছে। দস্যুরা সংখ্যায় অল্প নহে; কাজেই মুষ্টিমেয় যোদ্ধা লইয়া রাহেল সেই সব দুর্ধর্ষ বেদুঈনদের সম্মুখে অধিকক্ষণ টিকিতে পারে নাই। পর্যুদস্ত নর-নারী মাথার উপর পরাজয় ও লাঞ্ছনার গ্লানি বহন করিয়া যে যেদিকে পারিল পালাইতে লাগিল।

কুলছুম ও সায়ফুনকে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাহেল তৎক্ষণাৎ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যুদ্ধরত বেদুঈনদের কবল হইতে কিছুতেই নিস্কৃতি পাইল না। পরে মুক্তি পাইয়া যখন সে তাহাদের সন্ধানে ছুটিল তখন তাহারা চলিয়া গিয়াছে দৃষ্টির আড়ালে বহুদূরে। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ধাবন করিবার সুযোগ পাইলে হয়তো সেই প্রান্তরেই পলায়মানা কুলছুম ও সায়ফুনের জীবন নাট্যের যবনিকাপাত ঘটিত; কিন্তু দৈবের নির্বন্ধ খণ্ডাইবে কে।

বেদুঈনগণ কুরাইশদের অনেককে হত্যা করিল। তারপর কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করিয়া তাহাদের অশ্ব ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুণ্ঠনপূর্বক বীরদর্পে তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করিল।

*　　　　*　　　　*

শোহেলী-পরিবার এই নিদারুণ অপমান ভুলিতে পারিল না। সামান্য দস্যুদের হাতে প্রখ্যাত কুরাইশ-বীরদের শোচনীয় পরাজয়-এ কলঙ্ক যে ঢাকিবার নহে। অচিরে এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সকলে আল-জবিলের প্রান্তরে সমবেত হইল।

পরাজয়ের গ্লানি গ্রামবাসীদের অন্তরে শত-বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা যেন সৃষ্টি করিয়াছে। দলমধ্যে রাহেল, আবূ তোরাব, আবূ নঈম প্রমুখ কুরাইশ বীরদের এবং বন্দিনী সায়ফুন, কুলছুম ও অপর কয়েকটি নারীকে খুঁজিয়া না পাইয়া সকলের

অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল—দস্যু-হস্তে তাহারা নিহত বা বন্দী হইয়াছে। ক্ষোভে, রোষে, অপমানে কুরাইশগণ আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল।

চারিদিকে সাজ-সাজ রব। দেখিতে দেখিতে কয়েক শত অশ্বারোহী কুরাইশ-বীর পুনরায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শোহেলী-পুত্র ওৎবার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

ওৎবা তেজোদৃপ্তকণ্ঠে সমবেত যোদ্ধাদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "বন্ধুগণ! হিংসার প্রতিশোধ হিংসায় নেব। যারা আমাদের মান-ইয্যত বরবাদ করেছে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হত্যা করেছে, বন্দী করেছে, অস্ত্রাঘাতে তাদের খণ্ড-বিখণ্ড করে প্রতিহিংসা নিবৃত্তি করবো; বন্দীদের উদ্ধার করে, দস্যু-পল্লী পুড়িয়ে ছারখার করবো। কুরাইশ-বংশে কে আছে এমন কাপুরুষ, হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় নিতে যার গায়ের রক্ত টগ্ বগ্ করে ফুটে না? -অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন ধকধক করে জ্বলে না?" সমবেত কুরাইশগণ দেবতা লাৎ-মানাতের নামে শপথ গ্রহণ করিল, "নিতেই হবে এই অপমানের প্রতিশোধ! আনতেই হবে বন্দীদের মুক্ত করে। নির্বিচারে হত্যা করে, বন্দী করে, বেদুঈন-পল্লী ধ্বংস করে, মেটাতেই হবে অন্তরের জ্বালা।"

ওৎবা সেই মুহূর্তে অশ্বারোহণ করিয়া রূঢ়কণ্ঠে নির্দেশ দিল, "যে স্থানে আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম, মনে হয়, তারই অদূরে পাহাড়ের নিম্নদেশে দস্যুদের আড্ডা। সেখানে ডাইনে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, যাকে পাবে তাকেই হত্যা করবে। বর্বর দস্যুদের বুঝিয়ে দেবে কুরাইশ বীরদের আক্রমণ করে শুধূ ঘুমন্ত সিংহকেই জাগিয়ে তুলেছে-আজরাইলকে ধ্বংসলীলায় আমন্ত্রণ করেছে। যাও, এই মুহূর্তে আক্রমণ করে সব মিস্‌মার কর! আমার অনুসরণ কর।"

সেনাপতি ওৎবা অশ্বে কশাঘাত করিবামাত্র শত শত অশ্বারোহী কুরাইশ-বীর চতুর্দিক ধূলিবালিতে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

* * *

বেদুঈনগণ পল্লীর বাহিরে বৃক্ষতলে বসিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির বন্টনে ব্যস্ত, কেহ কেহ তাঁবুতে আহার-বিহারে মত্ত, এমন সময় সকলে অবাক হইয়া শোনে-পাহাড়ে পাহাড়ে অসংখ্য অশ্বের পদশব্দ, অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকার ধ্বনি! চতুর্দিকে বজ্রধ্বনিত আকাশে যেন ঘূর্ণাবর্তের হুহুঙ্কার! পাহাড়ে পাহাড়ে তাহার কর্ণ-

বিদারণ প্রতিধ্বনি! বেদুঈনগণ বড় বিচলিত হইয়া উঠিল। এত শীঘ্র পর্যুদস্ত কুরাইশগণ যে পুনরায় আক্রমণ করিবে, ইহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

তন্মুহূর্তে বেদুঈন-সর্দারের সিঙ্গায় গর্জিয়া উঠিল বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনি। দেখিতে দেখিতে বেদুঈনগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চতুর্দিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ততক্ষণে কুরাইশগণ পাহাড়ের গা বাহিয়া পল্লীর উপকণ্ঠে আগতপ্রায়।

সর্দার আনুসার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সকলকে অবস্থার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া আপন আপন কর্তব্য সাধনে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। তারপর পল্লী-রক্ষার ভার নারী ও প্রৌঢ়দের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে একদল যুবকসহ কুরাইশদের বাধা দিতে ক্ষিপ্রবেগে ছুটিল।

সেই বেদুঈন-পল্লীরই এক প্রান্তে আহত রায়হান সুফিয়ার তাঁবুতে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। আপন ভাগ্য-সন্ধানে প্রভাতেই তিনি পল্লী ছাড়িয়া যাত্রা করিবেন ভাবিতেছিলেন, কিন্তু দুই-একটি দিন থাকিয়া যাইবার জন্য সুফিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে পারেন নাই। দুর্বলতা ও অসুস্থতার অজুহাতে সুফিয়া কিছুতেই তাঁহাকে সেইদিন পল্লী ত্যাগ করিতে দেয় নাই।

কোথা হইতে কাহারা বেদুঈন-পল্লী আক্রমণ করিতে আসিল, রায়হান কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নারী ও শিশু কণ্ঠের আর্তনাদ ধ্বনি-শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেদুঈনগণ আসন্ন মৃত্যু-বিভীষিকায় একান্ত কাতর। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁবুর বাহিরে আসিয়া বর্শাহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। যাহাদের দয়ায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, আজ তাহাদের বিপদের দিনে তাঁহার বীর-হৃদয় কি সাড়া না দিয়া পারে? কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বেদুঈনদের সাহায্যার্থে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিলেন।

সুফিয়া সেই যুদ্ধে পুরুষদের সাহায্য করিবার জন্য পল্লী-নারীদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিতেছিল, এমন সময় দেখিল-রায়হান বর্শাহস্তে ছুটিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সে দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্বক বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েছো রায়হান ভাই? তুমি মেহ্‌মান, তোমাকে রক্ষা করা যে আমাদের ধর্ম; তুমি আবার যাচ্ছ কোথায়?"

রায়হান উত্তর করিলেন, "তোমাদের এই বিপদের দিনে আমি কি নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারি তাঁবুর কোণে? এত বড় নরাধম আমাকে ভেবেছ?"

সুফিয়া পুনরায় বলিল, "উত্তম কথা, আমাদের সাহায্য করিতে চাও তো তাঁবুতে চল। পল্লীর শিশুদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।"

ততক্ষণে পাহাড়ের কোলে দুর্ধর্ষ বেদুঈনগণ বীরবিক্রমে কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদের ক্ষিপ্র-সঞ্চালিত তরবারি ও বর্শাফলকে মুহুর্মুহু যেন বিদ্যুৎ চমকায়। অস্ত্রের ঝনঝনাৎ, যোদ্ধাদের চিৎকার-হুঙ্কার ও আহতদের করুণ আর্তনাদ ধ্বনিতে, অশ্বের ছুটাছুটি, হুটোপাটিতে সেই নিস্তব্ধ পার্বত্য প্রদেশ মুখরিত।

চারিদিক ধূলিকণায় আচ্ছন্ন। পল্লীর বাসিন্দারা অশ্ব-পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিবালির অন্তরালে যুদ্ধরত পুরুষদের আর কাহাকেও বড় একটা দেখিতে পায় না। শুধু এক-একবার অস্ত্রসংঘর্ষ-জনিত বিদ্যুৎবৎ চাকচিক্য, প্রস্তরে প্রস্তরে অশ্বখুর সংঘাতে উত্থিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সেই ধূলির আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের নয়নপথে ভাসিতে লাগিল।

বীর-বিক্রমে বেদুঈনগণ আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প বলিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ কুরাইশদের সম্মুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা পশ্চাতে পল্লীর দিকে হাটিতে লাগিল। বিজয়োৎফুল্ল কুরাইশগণ হুঙ্কার করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সাঁড়াশি অভিযানের পরিকল্পনায় কুরাইশদল দুই ভাগে ডাহিনে এবং বামে ঘুরিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে বেদুঈন-পল্লী আক্রমণ করিয়াছে। ভয়ার্তা নারী ও শিশুকণ্ঠের চিৎকারে, আহত ও মুমূর্ষুদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত। বেদুঈন পুরুষগণ সকলেই প্রাণপণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, স্ত্রীলোকেরাও চুপচাপ বসিয়া নাই-কেহ কেহ পুরুষদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলিয়া দেয়, অনেকেই তাঁবুর অন্তরাল হইতে সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া শত্রুদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

অলক্ষ্যে আড়াল হইতে নারীদের এই দলবদ্ধ আক্রমণ কুরাইশদের সহ্য করা দুষ্কর। বাণ-বিদ্ধ হইয়া অনেকেই ধরাশায়ী হইল; কিন্তু তথাপি তাহারা

পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে বেদুঈন-পল্লীতে প্রবেশ করিয়া সারিবদ্ধ তাঁবুগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিল।

চতুর্দিকে তখন নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও হাহাকার। আহত ও মুমূর্ষু যোদ্ধাদের আর্তনাদ, অগ্নিদগ্ধ বালক-বালিকা ও চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চিৎকার-ধ্বনি কুরাইশদের প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চারও করিল না। কেনই বা করিবে? মৃত্যু-বিভীষিকাই তো যুদ্ধক্ষেত্রের স্বাভাবিক দৃশ্য। মরণ সুনিশ্চিত জানিয়াও সকলে এই স্থানে আজরাইলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া পরপারের দুয়ারে ছুটাছুটি করে; এতটুকু ভয়ও করে না। এখানে আজরাইলের তুহিন-শীতল কঠোর হস্ত মুহর্মুহ জীবাত্মা আঁকড়াইয়া ধরে নির্মমভাবে, তথাপি মৃত্যুভয়ে কেহ ভীত নহে।

তাঁবুগুলি একে একে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে কুণ্ডলীকৃত ধূম্রপুঞ্জ সমগ্র পল্লী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বেদুঈনের এই বিপদকালে রায়হান নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। অগ্নিদগ্ধ তাঁবু হইতে একে একে শিশু ও বৃদ্ধ নর-নারীদের তিনি অদূরে নিরাপদ স্থানে সরাইতেছিলেন। সর্বগ্রাসী অগ্নি যাহাতে সমগ্র পল্লীতে ছড়াইয়া না পড়ে, সে চেষ্টায়ও তাহার কোন ত্রুটি ছিল না।

অনলগ্রাস হইতে পল্লীর অবশিষ্টাংশ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রায়হান যেই একটি প্রজ্বলিত তাঁবুর রজ্জু কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, অমনি অবাক হইয়া দেখিলেন, একেবারে সম্মুখেই কুরাইশ বীর ওলিদ! —তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে! এই সেই পিশাচ ওলিদ, যে তাহাকে গর্দভচর্মে সেলাই করিয়াছিল। আরো দেখিলেন, নিকটে সকলেই তাহার পরিচিত শত্রু—তাঁহারই গ্রামবাসী অবিশ্বাসী কুরাইশদল। লক্ষ্য করিলেন—কিয়দ্দূরে আবূ ইকরাম এক বেদুঈনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত। বিস্ময়-বিহবল রায়হান একেবারে হতভম্ব। এ-দৃশ্য তিনি কল্পনাও করেন নাই, যুদ্ধের কারণও কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই।

ওলিদও এই স্থানে এই সময়ে রায়হানকে দেখিতে পাইয়া কম আশ্চর্য হইল না। মুহূর্তে সমস্ত ঘটনার মূল উৎস যেন তাহার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ভাবিল সব কিছুরই মূলে রহিয়াছে এই রায়হান।

তন্মুহূর্তে ওলিদ হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলঃ "তবে রে বিদ্রোহী শয়তান! এ-সব তবে তোরই কীর্তি! তুই-ই বেদুঈনদের লুণ্ঠনকার্যে উস্‌কানি দিয়েছিস্‌। কুরাইশদের মানসম্ভ্রম নষ্ট করতে তুই-ই এই হীন চক্রান্তে মেতেছিস্‌। পালিয়ে

এসে ভেবেছিস দস্যুদের সাহায্যে প্রতিহিংসা সাধন করবি? এই নে তার পুরস্কার।" এই বলিয়া ওলিদ রায়হানের প্রতি সজোরে এক বর্শা নিক্ষেপ করিল।

রায়হান আত্মরক্ষা করিবার জন্য ক্ষিপ্রগতিতে পাশ কাটাইতেই বর্শা দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। অবিলম্বে তিনি ভূপাতিত বর্শাটি কুড়াইয়া লইয়া অশ্বোপরি ওলিদকে আক্রমণ করিতেই সে তরবারি উত্তোলনপূর্বক যেই রায়হানকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, অমনি তিনি ঘুরিয়া একলম্ফে সজোরে তাহার বক্ষদেশে বর্শাবিদ্ধ করিলেন। হতভাগ্য ওলিদ চিৎকার করিয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

আবূ ইক্‌রাম এতক্ষণ রায়হানকে লক্ষ্য করে নাই। ওলিদের চিৎকার শুনিয়া ঘাড় ফিরাইতেই সে দেখে–নিকটে দাঁড়াইয়া রায়হান! আর ওলিদ ভূতলে পড়িয়া মৃত্যু–যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। আবূ ইক্‌রাম তৎক্ষণাৎ রায়হানকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ থমিয়া গেল। রায়হানকে সে ভালভাবেই জানিত, সেইজন্যই একাকী আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না। তন্মুহূর্তে রায়হান একলম্ফে ওলিদের অশ্বে আরোহণ করিয়া আবূ ইক্‌রামকে আক্রমণ করিতেই কাপুরুষ প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

রায়হান একা, নিকটে বেদুঈনদের কেহই নাই। তিনি চাহিয়া দেখেন–কিয়দ্দূরে চার–পাঁচজন কুরাইশ যুবক আবূ ইক্‌রামের সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বেদুঈনদের আক্রমণ তাহারা এড়াইতে পারিতেছে না। ক্ষিপ্তপ্রায় হিংস্র বেদুঈন দল কুরাইশদের আক্রমণ করিয়া নির্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। রায়হান সেদিকে আর অগ্রসর হইলেন না। এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন–এখানকার কর্তব্য তো শেষ হইয়াছে, তবে আর মিছামিছি বেদুঈনদের স্বপক্ষে আপন আত্মীয়–স্বজন ও পরিচিত লোকদের বিরুদ্ধে এই অন্যায় যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া লাভ কি! হউক না কুরাইশেরা শত্রু, তবুও তো তাঁহারই দেশবাসী, স্বজাতি–স্বগোত্র। এই ভাবিয়া তিনি সেই মুহূর্তে পল্লী ছাড়িয়া দক্ষিণাভিমুখে অশ্বকে কশাঘাত করিলেন।

ছুটিতে ছুটিতে রায়হান অনলপ্রবাহে নিমজ্জিত তাঁবুগুলির আশপাশে সুফিয়া ও হাবিলকে কত সন্ধান করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিঞ্চিৎ থামিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন—অদূরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে—চিৎকার–হাহাকার, অস্ত্রের ঝনঝনাৎ। সমগ্র পল্লী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। —কী

বীভৎস দৃশ্য! বেদুঈনদের দুঃখে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। এই হৃদয়বিদারক ধ্বংসলীলায় তাহাদিগকে ফেলিয়া এমনিভাবে তাঁহাকে পালাইতে হইল! —এ দুঃখ যে দুঃসহ! কিন্তু এ পাপ-যুদ্ধে তাহাদের সাহায্য করাও যে মোটেই সমীচীন নয়। আবার কাপুরুষের ন্যায় ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া এ নিদারুণ দৃশ্য কিভাবেই বা সহ্য করা যায়! তাহা ছাড়া, শত্রুরা যেহেতু তাঁহার সন্ধান পাইয়াছে, এখানে থাকাও যে আর নিরাপদ নহে। তিনি আর এক মুহূর্তও সেস্থানে অপেক্ষা করিলেন না।

হাবিল রায়হানের নিকটে এই অঞ্চলের পথ-ঘাট পূর্বেই কথায় কথায় বর্ণনা করিয়াছিল। ঐ ত অদূরে কয়েকটা প্রস্তরময় পাহাড়; সেইগুলির দক্ষিণে ঘুরিলে বালুকাময় প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে কয়েকটা বালিয়াড়ি ও অনুচ্চ মালভূমি পার হইলেই ওপারে প্রশস্ত রাজপথ। সেই পথ ধরিয়া সোজা ছুটিতে হইবে দক্ষিণে।

রায়হান চিৎকার-কোলাহল-মুখর বেদুঈন-পল্লী পশ্চাতে ফেলিয়া, লু হাওয়া ও অগ্নিবর্ষী রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে সেই মালভূমি বরাবর তীরবেগে ছুটিলেন।

সত্তর

অল্পক্ষণের মধ্যেই বেদুঈনদের সবগুলি তাঁবু পুড়িয়া ছারখার। সমগ্র পল্লী যেন শ্মশানভূমি। সর্দার তাহার দলটিকে কোনক্রমে পরাজয়ের কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিল বটে, কিন্তু পল্লীটিকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিল না। চিরজীবনের সঞ্চিত ধন-দৌলত তাঁবুর ভিতরে পুড়িয়া ছাই হইল, কিন্তু সর্দার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে জানিত তাঁবুগুলি রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিলে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং সে পরাজয় মৃত্যুতুল্য। স্বাধীনতাপ্রিয় বেদুঈনগণ কিরূপে তা বরদাস্ত করিবে?

সর্দার আনসার লক্ষ্য করিল, পূর্বদিকে বেদুঈনগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম। তৎক্ষণাৎ সে তরবারিহস্তে সেদিকে ছুটিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, "বন্ধুগণ! হুঁশিয়ার! এক পা-ও হটবে না, সংকল্প টলবে না। সর্বস্ব ধ্বংস হোক, সন্তান-সন্ততি বিনষ্ট হোক, সেদিকে যেন লক্ষ্যও করবে না। ভুলে গেছ, আল-সাবির আর বীর হারেবের ময়দানে, জাবাল-উস্-সারাতের তলদেশে কুরাইশদের পরাস্ত করেছিলে? ভুলে গেছ, সেদিন বীর ডাহানার খর্জুর বনে তাদের এক বিরাট কাফেলা লুণ্ঠন করেছিলে! প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা তারা করবেই। মনে রেখো—পরাজিত হয়ে বন্দী হ'লে আজীবন কুরাইশদের গোলাম হয়ে থাকবে, ভাগ্যক্রমে কেউ ফিরে এলেও বিবিরা মুখের উপর থুথু ফেলবে। পারবে কি সে অপমান সহ্য করতে? ঐ শোন! তাঁবুতে তাঁবুতে শিশুদের করুণ আর্তনাদ! জ্বাল জ্বাল—প্রতিহিংসার আগুন জ্বাল! আঘাতের পর আঘাত হান! নির্বিচারে হত্যা কর। কোথায় হাবিল, এরশাদ, কুরবান? কোথায় আর সব বীর-পুরুষ? যাও, সদলবলে ডাইনে ঘুরে আক্রমণ কর! শৃগালের ন্যায় কুরাইশদের বর্শাবিদ্ধ কর। এই মুহূর্তে একদল আমার অনুসরণ কর! আজ নির্লজ্জ কুরাইশদের কেটে খান খান করে বেদুঈন-ভূমি রঞ্জিত করবো।"

সর্দারের উত্তেজনাব্যঞ্জক আদেশ শুনিয়া বিপুল বিক্রমে বেদুঈনগণ আগুনের ফুল্‌কির ন্যায় কুরাইশদলে ছিটকাইয়া পড়িল। পরিশ্রান্ত কুরাইশগণ সে আক্রমণের

তীব্রতা সহ্য করিতে পারিল না। মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া, ভয়-সংশয় দূরে ঠেলিয়া, বেদুঈনগণ চারিদিকে মারমার কাটকাট রবে সংহার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বেগতিক দেখিয়া কুরাইশগণ তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলাইবার সুযোগ খুঁজিতে ব্যস্ত, কিন্তু হিংস্র বেদুঈনগণ এই সুযোগ কি হেলায় হারাইতে পারে? দুর্বার বেগে কুরাইশ্দলে তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পলায়মান শত্রুসৈন্যের সংহার করিতে বহু দূরাবধি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

কুরাইশগণ কয়েকজন বেদুঈনকে বন্দী করিয়া পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু অন্যান্য বেদুঈনদের হাত হইতে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইল না। তাহারা যুদ্ধ করিয়া অনেককেই ছিনাইয়া আনিল, মাত্র দুই-একজন তখনো কুরাইশদের হাতে বন্দী রহিল। তাহাদের উদ্ধার করা আর সম্ভব হইল না। ততক্ষণে কুরাইশগণ পাহাড় লঙ্ঘন করিয়া ওপারে পৌছিয়াছে। পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে দুর্ধর্ষ বেদুঈনগণ পাহাড়ের উপরে উঠিয়া সর্দারের আদেশে ফিরিয়া দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হওয়া যে নিরাপদ নয়। রণশ্রান্ত বেদুঈনদল এইবার আহত সৈন্যদের উঠাইয়া লইয়া আপন আপন পরিবার পরিজনের সন্ধানে পল্লীতে ফিরিতে লাগিল।

ভস্মীভূত পল্লীর ধ্বংসস্তূপে আসিয়া বেদুঈন-সৈন্যদের কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। আত্মীয়-পরিজন চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া তাহারা যোদ্ধাদের মধ্যে আপন আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান করিতে লাগিল।

অল্পকাল মধ্যেই পুত্রহারা জননীর করুণ আর্তনাদে, স্বামীহারা, ভ্রাতৃহারা নারীদের চিৎকার-ধ্বনিতে, স্বজন-হারা নর-নারীর বুকফাটা ক্রন্দনে সমগ্র আকাশ-বাতাস যেন বিষাদে ভরিয়া উঠিল। নিষ্করুণ হত্যাকাণ্ডের অবসানে সেই পাহাড়ের কোলে শোকাকুল বেদুঈন নর-নারীর অশ্রুধারা আজ আর কিছুতেই বারণ মানে না।

সুফিয়া যুদ্ধ-ফেরত সৈনিকদের মধ্যে হাবিলকে দেখিতে না পাইয়া পাগলিনীর ন্যায় 'হাবিল হাবিল' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে চারিদিকে

খুঁজিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিটি নিহত সৈনিকের অসাড় দেহ নাড়াচাড়া করিয়া সে হাবিলকে খুঁজিল; রক্তরঞ্জিত প্রান্তরে ছুটাছুটি করিয়া হাবিলের সন্ধান করিল; কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। হতভাগিনীর বুঝিতে বাকী রহিল না—কুরাইশগণ হাবিলকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। অসহ্য বেদনায় তাহার অন্তর ভরপুর; হৃদয়তন্ত্রীর সবগুলি তার যেন হাতুড়ির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন। সে চিৎকার করিয়া উঠিলঃ "হাবিল! কোথায় তুমি? আর কি তোমায় পাব না! ওগো আমার হাবিল!" হৃদয়ভেদী আর্তনাদ সহকারে ভূতলে সে লুটাইয়া পড়িল।

সুফিয়ার অশ্রু—প্লাবিত চোখের কাতর—চাহনি, বুকফাটা বিলাপধ্বনি, তাহার কঠিন—হৃদয় পিতার চোখের ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুকণার সৃষ্টি করিল। সর্দার কোন কথা বলিতে পারিল না; শুধু সম্মুখে ভূলুণ্ঠিতা বিরহিণী কন্যার প্রতি পাষাণ-মূর্তির ন্যায় কতক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তারপর চারিদিকের ধ্বংসলীলা অশ্রুভরা নয়নে দেখিতে লাগিল। প্রান্তরের আগুন—হাওয়া, বিধ্বস্ত পল্লীর ধূলিবালি ও ভস্মাবশেষ লইয়া তখনো ছিনিমিনি খেলিতেছিল—সে তাহা সহ্য করিবে কিরূপে! তাহার হৃদয়ের অন্তস্থলও বুঝি বা চূর্ণ—বিচূর্ণ হইয়া সেই ধূলিবালির সঙ্গে মিশিয়া অন্তর আকাশে বাতাসে উড়ে।

পরক্ষণেই সর্দার নিজেকে সামলাইয়া লইল, কিন্তু অন্তরের হতাশা আর চোখ—মুখের কঠোর ক্রূরভাব দমন করা ত সহজ নয়। কন্যার হাত ধরিয়া উঠাইয়া নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিতে দিতে সে তাহাকে বৃক্ষতলে লইয়া আসিল; কিন্তু হতভাগিনীর হৃদয়—ভাঙা অশ্রুধারা কোনক্রমেই যে বারণ মানে না। বিবাহ তাহাদের হয় নাই বটে, কিন্তু দেবতা মান্‌জলীর সম্মুখে দুইজনেই যে বিবাহ—বন্ধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

সে কি কখনো মিথ্যা হইতে পারে? উভয়ের আশৈশব ভালবাসা কি ব্যর্থ হইবে? পিতার সান্ত্বনাবাক্যে তাহার শোকানল নির্বাপিত হওয়া দূরে থাক, দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল; নিদারুণ নৈরাশ্যে অন্তর ভাঙিয়া চুরমার হইবার উপক্রম।

অদূরে এক বৃক্ষতলে বৃদ্ধ নরনারী ও শিশু-সন্তানগণ নিরাপদে রহিয়াছে দেখিয়া, বেদুঈনেরা ভাবিয়া পায় না-কে ইহাদের রক্ষা করিল! সর্বগ্রাসী অগ্নিকুণ্ড হইতে কে ইহাদের উদ্ধার করিয়া আনিল!

বৃদ্ধ সোলায়মান সর্দারকে ডাকিয়া বলিল, "আনসার! সেই কুরাইশ মুসাফিরকে দেখছি না যে? সে কি তবে বেঁচে নেই? আহা, বড় ভাল মানুষ ছিল! আমাদের সকলকেই কোলে-পিঠে বয়ে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল; নতুবা এই একটি প্রাণীও বাঁচতো না।"

বেদুঈনগণ অতিথির অন্তরের পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিল। সকলে এদিক-ওদিক বহুক্ষণ তাঁহার তল্লাশ করিয়া ব্যর্থ হইল।

সুফিয়া শুনিতে পাইল, অতিথি রায়হানও নাই। একবার সে মনে মনে ভাবে, হয়তো কুরাইশগণ তাহাকেও বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে; আবার ভাবে, হয়তো দুশমনের ভয়ে হাবিলকে লইয়া কোথাও সে লুকাইয়া রহিয়াছে। আশা-নিরাশায় তাহার অন্তর দুলিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় হাবিল! আর কোথায়ই বা রায়হান! চারিদিকে শত খোঁজাখুঁজি করিয়াও কাহারও সন্ধান সে পাইল না।

আহত যোদ্ধাদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইবার সর্দার লোকজনসহ অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া নিহত বেদুঈনদের পাহাড়ের কোলে সমাধিস্থ করিল। তারপর সকলে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রণদেবতার পূজা সারিয়া যখন পল্লীতে ফিরিল, তখন বেলা প্রায় শেষ। আবার কান্নার রোল বাড়িয়া উঠিল। সর্বহারা রমণীদের কাতর আর্তনাদে আবার আকাশ-বাতাস ভরপুর।

সর্দার শোকার্তদের সান্ত্বনা দিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলঃ "বন্ধুগণ! যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। এ স্থান আর নিরাপদ নয়। প্রতিহিংসাপরায়ণ কুরাইশগণ আবার হয়তো গভীর নিশীথে অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোনক্রমে পূর্বদিকের ঐ পাহাড়ের ওপারে পৌছতে হবে। পরে সুযোগমত এ হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় নেব। যতদিন তা' নিতে না পারি, ততদিন মৃত বেদুঈনদের ব্যথিত আত্মার কিছুতেই শান্তি হ'বে না। এই শ্যামল গিরি,

শ্যামল প্রান্তর, ঐ পার্বত্য নহর, ঐ গাছপালা, আমাদের অন্তরে মায়া-মমতার বাসা বেঁধেছে, এই স্থানের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি পাথর, প্রতিটি পশু-পক্ষী আমাদের মমতায় ঘিরে রেখেছে। জানি, এ স্থান ত্যাগ করতে তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবে; কিন্তু উপায় নেই ভাইসব।! যেতেই হবে। জানিনে, আবার এমন উর্বর ভূমি, এমন খর্জুর বন আর কোথাও খুঁজে পাব কিনা! ওঠ, প্রস্তুত হও!" সর্দারের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

আদেশ শুনিয়া যুদ্ধশ্রান্ত ও শোকাকুল নরনারী সজল নয়নে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আপন আপন সন্তান-সন্ততিদের উঠাইতে লাগিল। যে দুই-চারিটি তৈজসপত্র আগুনের গ্রাস হইতে তাহারা বাঁচাইতে পারিয়াছিল, এদিক ওদিক হইতে তাহাও কুড়াইয়া আনিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই করিতে শুরু করিল।

যাত্রার আদেশ পাইবামাত্র যুবকদল পশুপালগুলিকে নানাবিধ দুর্বোধ্য বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে সর্বাগ্রে তাড়াইয়া চলিল, পশ্চাতে অশ্ব ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে বেদুঈন দল। দুঃসহ বেদনায় সকলের অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। কাহারও মুখে ভাষা নাই। প্রত্যেকের নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত।

সুফিয়ার বিরহ-ব্যথা বাঁধ-ভাঙা জলধারার ন্যায় বক্ষপ্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া, উচ্ছ্বসিত কান্নার সুরে প্রকাশমান, তদুপরি এই বিদায় অভিযান। এই স্থানে হাবিলের সঙ্গে কত দিন সে পাহাড়ে-প্রান্তরে ছুটাছুটি করিয়াছে। মনে পড়ে- এইখানে ঘটিয়াছিল উভয়ের কত লুকোচুরি, কত মান-অভিমান! এই স্থানের জীবন স্মৃতি মিলন স্মৃতি সে ভুলিবে কিরূপে? গত জীবনের কত কথা, কত স্মরণীয় ঘটনা তাহার চোখের উপর আজ মূর্ত হইয়া উঠিল। সে আর সহ্য করতে পারিল না, চলন্ত উষ্ট্রপৃষ্ঠে পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে রোরুদ্যমান নরনারী চক্ষু মুছিয়া এক-একবার পল্লীর ধ্বংসাবশেষ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। প্রিয় ভূমির নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হৃদয় হৃদয় বুঝি তাহাদের ফাটিয়াই যায়। সর্দার অশ্বপৃষ্ঠে টিলার

উপরে উঠিয়া আর একবার পশ্চাতে তাকাইল। তাহার গণ্ডদ্বয়েও অলক্ষ্যে ভিড় করিয়াছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুকণা। সুখ-শান্তিপূর্ণ এই আবাস-ভূমি হইতে তাহার সর্বহারা অনুচরবৃন্দ আজ রিক্ত হস্তে বিদায় লইতেছে-এ দৃশ্যের নির্মমতায় তাহার অন্তর যেন শত বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণায় জর্জরিত। জীবনে এমন সুন্দর দেশ, এমন উর্বর ভূমি, খর্জুর বন, পশুচারণ প্রান্তর, এমন মিষ্টি পানির নহর আর হয়তো সে খুঁজিয়া পাইবে না।

চলমান কাফেলার সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে। সূর্য-রশ্মির প্রখরতা ততটা আর নাই। কিছুক্ষণ পরেই কর্মক্লান্ত দিবাকর যাত্রীদলের পশ্চাদ্দেশে শেষ রশ্মি বিকিরণ করিয়া পশ্চিমের পাহাড়ের নীচে এলাইয়া পড়িল।

আঠার

বণিকদের সঙ্গে কুলছুম ও সায়ফুন নির্বিঘ্নে দীর্ঘপথ তিন দিনে অতিক্রম করিল। চতুর্থ দিবসে দুর্গম পার্বত্য–পথ পার হইয়া যখন তাহারা এক বিশাল সমভূমিতে পৌছিল, সূর্য তখন প্রায় ডুবু ডুবু।

আর কিয়দ্দূর পথ চলার পর বণিক–দলপতি সায়ফুন ও কুলছুমকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "বেটি! এইবার আমাদের কাফেলা ছাড়তে হয় যে তোমাদের। ঐ বাঁ দিকে যে সরু গলি দেখছো, সেইটিই দরিয়ায় যাওয়ার পথ। সেই পথেই তোমাদের যেতে হবে। ক্রোশখানেক রাস্তা পার হয়েই দেখবে ডানদিকে জঙ্গলের ধারে বৃদ্ধ আয়াযের চত্বর। বড় ভাল মানুষ আয়ায। তোমরা অসহায়া স্ত্রীলোক, যদি অনুরোধ কর, তবে তিনিই তোমাদের নিয়ে যাবেন দরিয়ায়। হাবশী মুলুকে যাওয়ার ব্যবস্থাও হয়তো তিনিই করতে পারেন। সাবধানে পথ চলো যেন! পথের ধারে গহনবনে নরঘাতক দস্যুরা আর হিংস্র পশুর দল বিচরণ করে। দ্রুত পথ চলতে হবে কিন্তু; নতুবা অন্ধকারের পূর্বে আয়াযের আশ্রয়ে পৌছতে পারবে না। যাও আম্মা, আল্লাহ্ হাফেয।"

সায়ফুন। সেই বৃদ্ধের কাছে আপনার পরিচয় কিছু বলতে হবে না?

দলপতি। দরকার হবে না। তবে বলতে পার–"মদিনার আক্‌কাস সওদাগর আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আল্লাহ্‌র রহমতে সেখানকার মোহাজেরগণ আনসারদের সহায়তায় শান্তিতেই আছেন।"

কুলছুম। তিনি সেই জঙ্গলে বাস করেন কেন?

দলপতি। সে অনেক কথা। তোমাদের মত মজলুম মুসলমানদের সাহায্য করার জন্যই এখনও তিনি সেখানে থাকেন। আচ্ছা, যাও আম্মা, তাড়াতাড়ি যাও। মহান আল্লাহ তোমাদের সহায় হউন।

দলপতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও সালাম জানাইয়া কুলছুম ও সায়ফুন বাঁ দিকের সরু পথে দ্রুত ছুটিল। সায়ফুন তখনো অশ্বপৃষ্ঠে কুলছুমের পশ্চাদ্দেশে

উপবিষ্ট। সম্মুখে কোন অনিশ্চিত বিপদ হয়তো তাহাদিগকে গ্রাস করার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছে, এই আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ উৎকণ্ঠিত।

এই স্থানটি পর্বত ও বালুকাময় নহে, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রস্তরসঙ্কুল। জনমানবশূন্য পথের দুই ধারে দৃষ্টিগোচর হয়—কাঁটা বন, পাতলা ঝোপজঙ্গল ও খর্জুর বাগান। চারিদিকে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। বনপথে চলিতে চলিতে উভয়ের বড় ভয় হইতে লাগিল। পদে পদে বেদুঈন-দস্যুদের আক্রমণাশঙ্কা, তদুপরি পথিমধ্যে দুই একটা হিংস্র পশুর সাক্ষাত পাওয়াও বিচিত্র নয়। এক-একবার জঙ্গলে বৃক্ষপত্রের মর্মরধ্বনি শুনিয়া উভয়ের ক্লান্ত দেহ ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আর কিছুটা অগ্রসর হইতেই দূরে এক অশ্বের হ্রেষারব তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

সায়ফুন সঙ্গিনীর স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া বলিল, "কুলছুম! ঘোটকের চিৎকার শোনা যায় যেন! নিশ্চয়ই নিকটে কোন লোকালয় আছে। চল সেইখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। রাত্রে পথ চলা মোটেই নিরাপদ নয়।"

কুলছুম। তা'ত নয়ই, কিন্তু আয়াযের সরাইখানার কোন চিহ্নই যে দেখি না।। ভুল পথে চলিনি তো আমরা?

সায়ফুন। কাফেলা-সর্দার আমাদের এই পথেই তো যেতে বলেছেন। ভুল হবার তো কথা নয়। চল, সম্মুখে যে লোকালয় পাই, তাতেই আল্লাহ্ ভরসা করে উঠে পড়ি। কি বল?

কুলছুম। তা'ছাড়া আর উপায় তো দেখি না। ঐ দেখ, বনানীর তলায় আবছা অন্ধকার; একটু পরেই দস্যুরা ভাগ্যান্বেষণে বের হবে। বুভুক্ষু হিংস্র পশুগুলিও শিকারের আশায় ওত পেতে বসবে। ও কিসের শব্দ সায়ফুন?

উভয়ে কান পাতিয়া রহিল। সায়ফুন নির্বিকার চিত্তে উত্তর করিল, "কি আর হবে, দুই-একটা নেকড়ে হয়তো নিরীহ পশুদের তাড়া করছে। ভয় কি? ঘাড়ের উপরে দুই একটা লাফিয়ে পড়লে এই তরবারি দ্বারা জাহান্নামে পাঠাবো। কিন্তু পশুর চেয়ে মানুষের ভয়ই যে অধিক; অশ্ব জোরে চালাও।"

কথোপকথনে আর কিয়দ্দূর যাইয়া তাহারা দেখিতে পাইল, সম্মুখে দুই পথ-ডাহিনে ও বামে জঙ্গলের ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। কুলছুম অশ্ববেগ সংযত করিয়া

বলিল, "সায়ফুন, দুই পথই তো সমান দেখছি; কোনদিকে যে যাব কিছুই তো বুঝতে পারছিনে–কোথায় আয়াযের সরাইখানা? এই জঙ্গলে বাঘের পেটে ঢোকার জন্যই কি ছুটে এলাম এতটা পথ?"

সায়ফুন কুলছুমের স্কন্ধদেশে ভর করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে দাঁড়াইল। চারিদিকে তাকাইয়া হতাশ–হৃদয়ে সে আপন মনে বলিল, "তাই তো, কোন্ পথে যে যাব; কোথায়ই বা আশ্রয় পাব!"

এমন সময় উভয়ের কর্ণগোচর হইল–পরিষ্কার মানুষের কণ্ঠস্বর! কে যেন বলিল, "ডাইনে যাও মুসাফির! আশ্রয় মিলবে!"

অকস্মাৎ এই বিজন বনে মনুষ্য–কণ্ঠ শ্রবণ করিয়া উভয়ের দেহ কন্টকিত হইয়া উঠিল। চমকিত হইয়া তাহারা চারিদিকে তাকায়, কিন্তু কোথাও যে জন–মানব দৃষ্টিগোচর হয় না।

কুলছুম দক্ষিণ হস্তে সায়ফুনের বাহুমূল আকর্ষণ করিয়া ভাঙা গলায় বলিতে লাগিল, "সায়ফুন! এ নিশ্চয়ই বনদেবতার নির্দেশ। চল ডানদিকেই যাই।"

সায়ফুন বিরক্তিভরে উত্তর করিল, "ছিঃ! এখনও কি দেবতায় বিশ্বাস কর? তওবা তওবা!!"

"একি তবে মায়াকানন? এ জঙ্গলের পশু–পাখীগুলিও কি মানুষের কণ্ঠ লাভ করেছে? না, এ ভূতলের আড্ডা?"

"রায়হানের মুখে শুনেছি, দেও–দানব, ভূত–পেরেত, কিছুই নাকি নেই? এ নিশ্চয়ই কোন মানুষের কণ্ঠস্বর।"

কুলছুমের অন্তর হইতে কুসংস্কার মুছিয়া যায় নাই। ভয়ে যুক্তকর উর্ধ্বে তুলিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "দেবতা রক্ষা কর! রক্ষা করো প্রভো!" তাহার কণ্ঠস্বর কম্পমান, দেহে শিহরণ। অশরীরী দেবতার উদ্দেশ্যে সে প্রণাম জানাইল।

সায়ফুন কুলছুমের স্কন্ধদেশে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "এ কি করছো কুলছুম? একেবারে গোমরাহ্ হয়ে গেলে? নিকটে নিশ্চয় রয়েছে কোন আদম–সন্তান!" অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "কে? কে তুমি কথা বলছো? নিকটে এস। আমরা আশ্রয়প্রার্থিনী বিপন্না নারী। পথ হারিয়েছি।"

অল্পক্ষণ পরেই এক বৃদ্ধ হাতে কুঠার ও পৃষ্ঠদেশে এক বোঝা শুষ্ক কাষ্ঠ বহন করিয়া জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার ন্যুজদেহ কঠিন পরিশ্রমে ঘর্মাসক্ত; বদনের স্বেদবিন্দু শ্বেত শ্মশ্রু বাহিয়া টপটপ করিয়া ঝরিতেছে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমরা বাছা? এ জঙ্গলে কোথা হতে এলে? গাছের উপর থেকে কথা শুনেছিলাম। যাবে কোথায়?"

আচম্বিতে বনমধ্যে মানুষের দেখা পাইয়া উভয়ের আনন্দ আর ধরে না! কুলছুম তো দেবযোনির পরিবর্তে মানুষ দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক!

সায়ফুন ব্যাকুলভাবে বলিল, "রাত্রিটুকুর জন্য আমরা একটা আশ্রয় তালাশ করছি। বলতে পার আয়াযের বাড়ী কোন্ পথে?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "আমার সঙ্গে এস আম্মা! কোন রকমে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা একটা করা যাবে। যেতে যেতে শুনবো তোমাদের কথা।" এই বলিয়া বৃদ্ধ আগে আগে চলিলেন।

কুলছুম অশ্ববক্ষে মৃদু পদাঘাত করিয়া বলিল, "কে তুমি কাঠুরে? কাঠ কেটেই বুঝি জিন্দেগী চালাও? এই জঙ্গলেই থাক?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ আম্মা! নিকটেই আমার গরীবখানা!"

কুলছুম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "শুনেছি, আয়ায বড় দয়ালু! সত্যই নাকি? চেন তাঁকে?"

বৃদ্ধ স্মিতহাস্যে উত্তর করিলেন, "আম্ম! আমিই সেই হতভাগ্য আয়ায। আল্লাহ্‌র মর্জি, মানুষের উপকার করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করি। সামান্য দানাপানি তোমাদের খেদমতে হাযির করতে পারলে ধন্য হব। আগে বল আম্মা, এখানে এলে কিরূপে?"

উভয়ে লজ্জায় অধোবদন। সায়ফুন বিনম্র বচনে বলিল, "গোস্তাকি মাফ করুন জনাব। এইভাবে আপনার সাক্ষাত পাব কল্পনাও করিনি। আজ আমাদের আলা-নসিব। শুনুন আমাদের দুঃখের কথা!" এই বলিয়া সায়ফুন নিজের ও কুলছুমের দুঃখময় কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই তাহারা আয়াযের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। অশ্বারূঢ়া নারীদ্বয় দেখিয়া মুগ্ধ হইল–জঙ্গলের ভিতরে কি এক মনোরম পরিবেশ! সম্মুখ চত্বরের পাশে দুইখনি ছোট কুটির। স্থানটি মরুভূমি হইতে দূরে বলিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল। বোধ হয় সেইজন্যই বৃদ্ধের কুটিরগুলি প্রস্তর কিংবা মাটির দেয়াল বিশিষ্ট নহে–বৃক্ষশাখা, লতা–পাতা ও কাষ্ঠ–নির্মিত। গৃহের চতুর্দিকে অনেকটা স্থান বেশ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন–বৃক্ষলতাদিশূন্য। দূরে বিস্তীর্ণ অরণ্যের একাংশ যেন কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন টানিয়া নিথর উপবিষ্ট।

আয়ায কাষ্ঠের বোঝাটা চত্বরের এক পাশে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এস আম্মা, এই আমার আস্তানা। চলে এস ভিতরে। ঘোড়াটা এখন এখানেই থাক। একটু পরেই তাকে বেঁধে আসব নিরাপদ স্থানে। মনে হয় তোমরা বড় ক্ষুধার্ত। গৃহে আমার বিবি রয়েছেন! যাও, সেইখানে গিয়ে বিশ্রাম কর!"

বাহিরে অশ্ব–পদশব্দ ও কথোপকথন শুনিয়া আয়ায–পত্নী দুয়ার খুলিয়া দেখিলেন–সম্মুখে এক অশ্বপৃষ্ঠে দুই সুন্দরী যুবতী। বিস্ময়াবিষ্টা মহিলা কিছুক্ষণ সেই দিকে শুধু নির্বাক তাকাইয়া রহিলেন।

আয়ায–পত্নী বৃদ্ধা–দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ গড়ন। বয়স হইলে কি হইবে তাহার সুন্দর সুঠাম দেহ কালের নিষ্ঠুর শাসন যেন কত তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

আয়ায স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "উম্মে সাল্‌মা! এরা আমাদের মেহ্‌মান, শিগ্‌গির এদের খানাপিনার ইন্‌তেজাম কর।"

উম্মে সালমা মৃদু হাসিয়া আরোহিণীদের ভিতরে আমন্ত্রণ জানাইলে সায়ফুন প্রথমে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল। কুলছুম নামিবার উপক্রম করিয়া এক পা ঝুলাইবা মাত্র শুনিল–অদূরে যেন দ্রুতগামী অশ্বের পদশব্দ। তাহার ভয় হইল–নিশ্চয়ই তাহার স্বামী তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে! সে–শব্দ সায়ফুনেরও শ্রুতিগোচর হইল! উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল–অশ্ব পদশব্দ যেন দ্রুত নিকটবর্তী হইতেছে। কুলছুম অবতরণ করিবামাত্র সায়ফুন ব্যস্তভাবে তাহাকে টানিয়া লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

গৃহকর্ত্রী তাহাদের অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমরা বাছা? মনে হয় যেন, বড় ভয় পেয়ে ছুটে এসেছ? কি হয়েছে?"

সায়ফুন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হাঁ আম্মা, আমরা ভয়েই পালিয়ে এসেছি; কিন্তু এখানেও বুঝি পরিত্রাণ পাব না। ঐ শুনুন দুশমন আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে! সন্ধান পেলে আর রক্ষা নেই! ইয়া আল্লাহ্ কী হবে! কোথায় লুকাবো আম্মা?"

আয়ায-পত্নী মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে গৃহকোণে একটা চাটাইর আড়ালে লুকাইয়া রাখিলেন। তারপর নিজে কাষ্ঠ-নির্মিত গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া পশ্চাদ্ধাবমান শত্রুর প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আশ্রিতা নারীদের অভয় দিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় কি বেটি! সর্ব বিপদহন্তা দয়াময় আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই। হাতে তলোয়ার, মুখে আল্লাহ্‌র নাম; তবুও এত ভয়?"

কুটীরের কাঠের দেয়ালের ফাঁকে চক্ষু রাখিয়া সায়ফুন ও কুলছুম অশ্বারোহীকে দেখিবার প্রতীক্ষায় বাহিরে তাকাইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই এক দীর্ঘাকৃতি অশ্বারোহী পুরুষ ধাবমান অশ্বের গতি সংবরণ করিয়া কুটীরের নিকটে চত্বরে আসিয়া উপস্থিত। যুবকের আপাদমস্তক ঘর্মসিক্ত। চত্বরে দণ্ডায়মান বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তিনি অভিবাদনপূর্বক অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনাব! সমুদ্রতীরে এই পথে কি পৌছতে পারবো?"

"জি হাঁ, এই তো পথ। অনেকটা দূরে গিয়ে আবার বাঁ দিকে, কিন্তু-" যুবক আর কিছুই শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া নিমেষ মধ্যে অশ্বে কশাঘাত করতঃ পুনরায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন।

আয়ায পশ্চাদ্দেশ হইতে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন! এই অসময়ে বনপথে যেন যাবেন না।"

কিন্তু যুবক ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে বহুদূরে, আয়াযের ডাক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। মুহূর্তমধ্যে যে ঘটনা সংঘটিত হইল তাহা কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। অশ্বারোহী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আবার কোথায় যেন উল্কার বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাহিরে অশ্বারোহীকে একনজর দেখিবামাত্র সায়ফুন বিপুল বিস্ময়ে হতভম্ব। চোখের উপর এই অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখিয়া সে ভাবিয়া পায় না, কিরূপে ইহা সম্ভব হইল। তৎক্ষণাৎ সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "এ্যা! এ-কি!

রায়হান! রায়হান এল কোত্থেকে এখানে! এ যে সত্যই রায়হান! কিন্তু এ–কি! আবার যে তাকে হারালাম! না না, আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো!" এই বলিয়া দ্বারদেশে আসিয়া সে আয়ায–পত্নীকে বলিল, "আম্মা! আমার এই ভগিনী আপনার আশ্রয়ে রইল, আমি ফিরে আসছি এক্ষণই।"

সায়ফুন ঝড়ের বেগে বাহিরে ছুটিয়া গেল। তারপর এক লম্ফে অশ্বে আরোহণপূর্বক রায়হানের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

কুলছুম কল্পনাও করে নাই এমনভাবে সায়ফুন পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া যাইবে। অশ্বারোহী আগন্তুককে ভালভাবে সে চিনিতেও পারে নাই। সায়ফুন 'রায়হান' 'রায়হান' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে বুঝিল–হয়তো বা সায়ফুন রায়হানকে দেখিতে পাইয়াছে; কিন্তু সায়ফুনকে একটা কথা বলিবার অবকাশও যে তাহার মিলিল না। সে চিৎকার করিয়া ডাকিল "সায়ফুন! যাচ্ছ কোথায়? সায়ফুন!"

কিন্তু সায়ফুন একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইয়াও দেখিল না। সঙ্গিনীর ডাক তাহার উদ্বেলিত অন্তরের দ্রুত স্পন্দনধ্বনি ছাপাইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল কিনা কে জানে!

কিংকর্তব্যবিমূঢ়া কুলছুম বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থায় নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিল; কিছু বলিবার বা বাধা দিবার অবকাশও সে পাইল না। চোখের উপর মুহূর্তে যে–কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহা দেখিয়া আয়ায এবং আয়ায–পত্নীও ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। কাহারও মুখে কথা নাই। সঙ্গীহারা কুলছুম ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, 'আমার সকল চেষ্টাই যে ব্যর্থ হলো।! মৃত্যু ভয়হীনা পাষাণী এমনভাবে আমাকে ছেড়ে আলেয়ার পিছনে ছুটে পালাবে–তা'ত কখনো ভাবিনি! মিছেমিছিই কি ছুটে এলাম এতটা দূর? হে দীন–দুনিয়ার মালিক। এত কষ্টও নসিবে রেখেছিলে? যার জন্য সবই ছাড়লাম তাকেও ছাড়িয়ে নিলে?'

অসহনীয় মর্মবেদনায় কুলছুমের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। পাগলিনীর ন্যায় সায়ফুনের পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে ডাকিল, "সায়ফুন! যেয়ো না! একাকিনী যেয়ো না সায়ফুন!"

বৃদ্ধ আয়ায ছুটিয়া গিয়া তাহার পথ আগলাইয়া বলিলেন, "ছিঃ আম্মা, পাগল হয়েছ? মেয়েটা কোথায় যাবে এই অন্ধকারে? এখনই দেখো ফিরে আসবে। এই জঙ্গলে পথ পাওয়া কি সহজ নাকি!"

কুলছুম বৃদ্ধের পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আব্বা, বড় দুঃখিনী সে। বড় অসহায়া। আমি ডেকে আনবো তাকে, ফিরিয়ে আনবো। যেতে দিন আমাকে!"

আয়ায–পত্নী ছুটিয়া আসিয়া কুলছুমকে ভূমিতল হইতে উঠাইলেন। নিজে তাহার দুই চক্ষু মুছাইয়া নানাবিধ প্রবোধ–বাক্যে ও উপদেশে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সায়ফুনের অশ্ব চত্বর ছাড়িয়া ধাওয়া করিয়াছে বহুদূর। ছুটিতে ছুটিতে সে দেখিল, দূরে দ্রুতগতি অশ্বপৃষ্ঠে রায়হান বনানীর ক্রমেই যেন অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। অন্ধকারে ধাবমান কাল ছায়াটাও যেন আর দেখা যায় না। তাহার সকল আশা–ভরসা বুঝি নির্মূল হইতে চলিল। মরিয়া হইয়া অশ্বকে সে বারংবার কশাঘাত করিতে লাগিল।

এই আকস্মিক ব্যাপারে আয়ায ও আয়ায–পত্নী একেবারে হতভম্ব। কি করিবেন, কি বলিবেন–কিছুই তাঁহারা ভাবিয়া পান না। বৃদ্ধ–বৃদ্ধা নিরুপায় হইয়া শুধু অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন সায়ফুনের দিকে। কুলছুম তখনো সায়ফুনের পিছনে পিছনে ছুটিয়া যাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আয়ায–পত্নীর বজ্রমুষ্টির বন্ধন কাটাইয়া যাওয়া যে সম্ভব নহে।

ওদিকে সায়ফুন বারংবার চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে, "রায়হান! রায়হান! ক্ষণেক দাঁড়াও! একটু দাঁড়াও! শোন রায়হান!" দূরে নিস্তব্ধ বনানীর বুকে সে ডাক বারে বারে প্রতিধ্বনিত হইয়া শূন্যে মিলাইতে লাগিল।

ততক্ষণে বনভূমির বুকে আঁধার গভীর হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষলতাদিবিহীন সরু পথের উপরে সেই তমিস্রা রজনীর স্তূপীকৃত অন্ধকার ঠেলিয়া সায়ফুন রায়হানকে ডাকিতে ডাকিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে।

উনিশ

বিস্ময়-বিমূঢ়া কুলছুমের দুই নয়ন বাষ্পাকুল। অপলক উদাস দৃষ্টি ধাবমানা সায়ফুনের যাত্রাপথে নিবদ্ধ করিয়া সে ভাবিতে লাগিলঃ 'এ কেমন হইল? কেনই বা হইল? পথ বলিতে চলিতে হঠাৎ এইভাবে উভয়ে ছাড়াছাড়ি হইব, ইহা তো কল্পনাও করি নাই। রায়হান আবার কোথা হইতে উল্কার ন্যায় ছুটিয়া আসিল! ভাগ্যদোষে সায়ফুন যদি তাহার সন্ধান না পায়, তবে এই অন্ধকার বনমধ্যে একাকিনী কোথায় সে যাইবে? তাহাকে হিংস্র পশুর কবলে ঠেলিয়া আমিই বা কোন্ সুখে, কিসের আশায় বসিয়া থাকিব এখানে! অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, আমি বনমধ্যে সায়ফুনকে খুঁজিতে যাইবই।'

কুলছুম আয়ায-পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আম্মা! যেতে দিন আমাকে! সায়ফুন জঙ্গলে প্রাণ হারাবে, এ আমি সহ্য করবো কিরূপে? আজরাইলের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে বুঝি ছেড়ে দেব বাঘের মুখে আর দস্যু-তস্করের হাতে? না, মরতে হয় তো উভয়েই মরবো এক সঙ্গে।" ধৈর্যহারা কুলছুম পাগলিনীর ন্যায় ছুটিতে উদ্যত।

আয়ায তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "এই নিশীথে, বনমধ্যে একাকিনী যাবে কোথায় আম্মা? কোথায় তার সন্ধান পাবে? যাও, খানাপিনা সেরে আরাম কর গিয়ে, আমি বরং খানিক ঘুরে তোমার সঙ্গিনীকে সন্ধান করে আনি। জঙ্গলে পথ খুঁজে না পেয়ে নিশ্চয়ই সে ফিরে আসবে।"

আয়ায অবিলম্বে ডান হস্তে এক দীর্ঘ বর্শা ও অপর হস্তে এক জ্বলন্ত মশাল লইয়া বনপথে যাত্রা করিলেন। উম্মে সাল্‌মা কুলছুমকে সান্ত্বনা দিতে তাহার হাত ধরিয়া আপন বাসগৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

বৃদ্ধ আয়াযের প্রতি শ্রদ্ধায় কুলছুমের অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে সে ভাবিল, বণিক-সর্দার ঠিকই বলিয়াছিলেন বৃদ্ধের প্রাণ করুণায় ভরপুর; নতুবা অন্ধকার বনমধ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পরার্থে কয়জনই বা এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে!

উম্মে সাল্‌মা সামান্য রুটি ও কিছু খর্জুর আনিয়া কুলছুমকে খাইবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুলছুমের আহারে প্রবৃত্তি হইল না। সে বৃদ্ধাকে বলিল, "আম্মা! সায়ফুনকে ফেলে আমি কিরূপেই বা আহার্য মুখে তুলি? সে যে বড় ক্ষুধার্ত! ফিরে আসুক সে, উভয়ে একসঙ্গে খাব। আপনি বরং আহারাদি সেরে বিশ্রাম করুন।"

উম্মে সাল্‌মা কুলছুমের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বেটি! মা কি কখনও মেয়েকে উপবাসী রেখে খেতে পারে?"

বৃদ্ধার সস্নেহ কথোপকথন কুলছুমের অন্তর জয় করিয়াছে। সে বুঝিতে পারিল, তাঁহার অন্তর স্নেহ–মমতায় পরিপূর্ণ। কথায় কথায় কুলছুম নিজের ও সায়ফুনের দুঃখময় কাহিনী বর্ণনা করিল। সে কাহিনী আয়ায–পত্নীর অন্তর সীমাহীন বেদনায় ভরিয়া তুলিল; বর্ষণোন্মুখ জলদের ন্যায় অশ্রুকণা তাঁহার দুই নয়ন কানায় কানায় ভরিয়া দিয়া গণ্ডদ্বয়ে গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম।

উম্মে সাল্‌মা কুলছুমকে বলিলেন, "আম্মা! তোমার সঙ্গিনী ফিরে এলে তাকে নিয়ে এখানেই থাক। এ–ঘর তোমাদেরই। আমারও একটি দুঃখিনী মেয়ে ছিল– একমাত্র মেয়ে; আজ তোমাকে দেখে তার কথাই মনে পড়ছে বারে বারে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা চক্ষু মুছিলেন।

কুলছুম জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি এখন কোথায় আম্মা?"

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে বলিলেন, "সে কি আর ইহজগতে আছে মা! অভাগিনী স্বামী–গৃহে অহরহ নির্যাতন সইতেই বুঝি জন্ম নিয়েছিল।"–বৃদ্ধা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কুলছুম আয়ায–পত্নীর অশ্রুধারা মুছাইযা বলিল, "আম্মা! না জেনে আপনার অন্তরে বড় ব্যথা দিয়েছি, মার্জনা করুন।"

বৃদ্ধা আবার বলিল, "না বেটি! অন্যায় কিছুই করনি। আমার অন্তরের ব্যথা ব্যক্ত করার ভাষা নেই। যদি তা' প্রকাশ করতে পারতাম, শোকভার কিছুটা হয়তো লাঘব হতো। দুঃখের কথা কি আর বলবো মা, আমার সেই হতভাগিনী কন্যা জীবনে স্বামীর ভালবাসা তো পায়ই নি, তার উপরও সহ্য করেছিল কত–না লাঞ্ছনা–গঞ্জনা। একদিন তার লম্পট স্বামী একদল ব্যভিচারী মাতাল বন্ধুসহ

ঘরে ঢুকে তাকে অর্ধোলঙ্গ দেহে নৃত্য করতে আদেশ দিল। আমার বুকের মানিক তাতে অস্বীকার করলে, তার দুর্বৃত্ত স্বামী অভাগিনীর বক্ষদেশে সজোরে পদাঘাত করে। তা'তে সেই যে জ্ঞান হারায়, আর ফিরে পায়নি মা।"

বৃদ্ধা আর বলিতে পারিলেন না। শোকাবেগে তাঁহার বাক্‌নিরোধ হইবার উপক্রম; গণ্ডদ্বয় অশ্রুধারায় ভাসিয়া গেল। এই নিদারুণ কাহিনী শুনিয়া কুলছুমের অন্তরও ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল, "হায়, অদৃষ্টে তার এত দুঃখও ছিল।! শেষকালে স্বামীর হাতেই অপমৃত্যু ঘটলো! আম্মা! সেই দুঃখেই কি আপনারা লোকালয় ছেড়ে এই জঙ্গলে এসে বাস করছেন?"

আয়ায-পত্নী উত্তর করিলেন, "না বেটি, এখানে এসেছি সেই ঘটনার দুই বৎসর পর। তখন মহানবী মুহম্মদ(সঃ) সবেমাত্র মক্কায় আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতে শুরু করেছেন। আমরা তখন স্বামী-স্ত্রীতে বাস করতাম বীর-হারেবে।"

কুলছুম জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ বীর-হারেব আম্মা? সেই মক্কা পাক সংলগ্ন বীর-হারেব?"

"হা বেটি, সেই বীর-হারেব।"

"সে-ত বহুদূর পথ! এখানে এলেন কিরূপে?"

"সে অনেক কথা। হযরতের উপদেশে আমরা পৌত্তলিকতা ছেড়ে সত্যধর্মের অনুগামী হই; ন্যায় পথ বেছে নিয়ে মেতে উঠি পরোপকারে আর ধর্মকর্মে। কাহারো ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট করিনি; কিন্তু তবু গ্রামবাসীদের কোপানলে পড়ি। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপে, অন্যায়-উৎপীড়নে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় আমাদের জীবন বিষময় করে তুলে। একদিন উভয়ে খর্জুর কুড়াতে গিয়েছিলাম বাগানে। বড় দুঃখের কথা আম্মা, মনে হলে ফেটে যায় কলেজা!" উম্মে সাল্‌মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষুদ্বয় মুছিলেন।

কুলছুম সহানুভূতিসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল একদৃষ্টে। কথা শুনিতে শুনিতে ক্রমেই সে তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছে, হস্তদ্বয় গণ্ডদেশে ন্যস্ত। পরের দুঃখ নিজের ব্যথা-ভার বুঝি কতকটা হালকা করিয়া তুলিয়াছে।

আয়ায–পত্নী আবার বলিতে লাগিলেন, "বাগান থেকে দু'জনে দু'ঝুড়ি খেজুর কুড়িয়ে নিয়ে এসে দেখি–আমাদের সেই প্রতিবেশিগণ, যাদের রোগে সেবা করেছি, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছি, বিপদে সাহায্য করেছি–আমাদের ক্ষুদ্র কুটিরখানি ভেঙে–চুরে পরিশ্রান্ত হয়ে নিকটে এক বৃক্ষতলে বসে বিশ্রাম করছে। বুঝলাম, মিথ্যা ছেড়ে সত্যের আশ্রয় নিয়েছি, সত্যধর্ম গ্রহণ করেছি–এই আমাদের অপরাধ। আমার শওহর কাউকে কিছু না বলে নীরবে কাঁধের উপর থেকে খেজুরের ঝুড়িটি নামিয়ে আমার বোঝাটিও নামালেন। আমার ছল্‌ছল্‌ নয়নযুগল মুছে দিয়ে তিনি বললেন, "উম্মে সাল্‌মা! দুঃখ করো না। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের দুনিয়ার মোহ ভেঙে দিয়েছেন চিরতরে। চল, সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের সংস্রব ছেড়ে চলে যাই দূরে জঙ্গলে পশুদের কাছে।' আমি কিছুতেই অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না।

"বৃক্ষতলে উপবিষ্ট সেই ক্লান্ত বীর–পুরুষগণ ছুটে এল তখন। আমাদের খেজুরগুলি কেড়ে নিয়ে মহোল্লাসে তারা খেতে বসলো। আমার ক্ষুধার্ত স্বামী আমার হাত ধরে সেই মুহূর্তেই বের হয়ে এলেন, একটি কথাও বললেন না। পশ্চাতে দুর্বৃত্তগণ সমস্বরে হল্লা করে, কত দুর্বাক্য উচ্চারণ করে, আমাদের প্রতি খেজুরের আঁটি ও উপলখণ্ড নিক্ষেপ করে, বড় রূঢ়ভাবে বিদায়–অভিনন্দন জানালো।"

কুলছুম অবাক হইয়া বলিল, "মানুষ এত নিষ্ঠুরও হয়! বাড়ী থেকেই তাড়িয়ে দিল! দুটো খেজুরও নিতে দিল না!"

আয়ায–পত্নী চক্ষু দুইটি মুছিয়া বলিলেন, "না মা! কিছুই না। আমাদের খেজুর বাগানটিই ছিল জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্বল; তা–ও হারালাম! সেইদিন প্রাণের ভয়ে স্বামীর পৈতৃক বাসভূমি ও সেই খর্জুর বাগান ছেড়ে আসতে কী যে কষ্ট হয়েছিল!"

বৃদ্ধা থামলেন! তাঁহার অন্তরের নির্বাপিত অগ্নি বহুদিন পরে আবার যেন ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ব্যথিতা কুলছুম আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এই এত পথ কি হেঁটে হেঁটেই এসেছিলেন আম্মা?"

বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "হাঁ মা! হেঁটেই। প্রায় মাসাধিক কাল কত দুঃখ–কষ্ট ভোগ করে যে এখানে এসেছিলাম তা' বলে শেষ করার নয়। সেই অবধি এই

জঙ্গলে পশুদের মধ্যেই বাস করছি। উভয়ে বন থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনি। আমার স্বামী সেগুলি বিক্রি করে দৈনন্দিন আহার্য সংগ্রহ করেন। এতেই আমাদের চলে যায় কোন রকম। যে দু'চারজন মেহ্মান-মুসাফির কালেভদ্রে আসেন, আল্লাহ্র রহমতে তাঁদের জন্যও বড় একটা ভাবতে হয় না। বেশ শান্তিতেই আছি বেটি,কিন্তু মন বড় কাঁদে দেশের জন্যে।" বৃদ্ধা থামিলেন। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার মর্মস্থল যেন মোচড়াইয়া নিংড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল।

কথোপকথনে রাত্রি বড় অধিক হইয়া গিয়াছে। বাহিরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে চারিদিক নিমজ্জমান। উপরে নক্ষত্র-শোভিত অনন্ত আকাশ যেন মুক্তাখচিত কাল মখমলের এক বিরাট চাদোয়া।

উম্মে সাল্মা স্বামীর প্রতীক্ষায় দ্বার খুলিয়াই বসিয়াছিলেন। রাত্রি গভীর হইয়াছে; তথাপি স্বামীর ফিরিবার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া মাত্র বসিয়াছেন, এমন সময় শুনিলেন—দ্বারদেশে করাঘাত। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিতেই কুলছুম পরম ঔৎসুক্যভরে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "সায়ফুন! সায়ফুন এসেছ?" পরক্ষণেই সে দেখিল, বৃদ্ধ আয়ায ফিরিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু একা; সঙ্গে আর কেহই নাই। নিদারুণ হতাশায় তাহার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আয়ায কুলছুমকে বলিলেন, "আম্মা! অনেক চেষ্টাই তো করলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গিনীর কোন সন্ধান যে পেলাম না। মনে হয়, যার খোঁজে সে ছুটেছিল, তাকে পেয়েছে, উভয়ে চলে গেছে দরিয়ায়; নতুবা চারদিকে বহুদূরে ঘুরেও তার খোঁজ পেলাম না কেন? যাও বেটি, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও। কাল প্রভাতে না হয় আবার বের হব উভয়ের সন্ধানে।" এই বলিয়া আয়ায বর্শাখানি গৃহকোণে রাখিয়া ওজু করিতে বাহিরে আসিলেন।

কুলছুমের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিদারুণ নৈরাশ্যে তাহার ব্যথা-ভারাক্রান্ত অন্তর যেন ভাঙ্গিয়া চুর্ণ বিচূর্ণ। তবুও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বিদ্যুদরেখার ন্যায় ক্ষীণ আশার আলো এক-একবার তাহার মনোমধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল—'হয়তো সায়ফুন রায়হানের সন্ধান পাইয়াছে,তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে। এ পাপ-দেশ ছাড়িয়া কৃষ্ণ মহাদেশে উভয়ে সুখে ঘর-সংসার করিবে। আহা কত সুখের হইবে! আর কুলছুম? কুলছুম নিজে স্বামী-

পরিত্যক্তা হইয়া সুদূর বনবাসে এই কাঠুরিয়ার গৃহে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া জীবন কাটাইবে। দুঃখ নাই তাতে বিন্দুমাত্রও, কারণ এখানে অবিচার–অত্যাচারের বালাই নাই, স্বামীনিগ্রহের আশঙ্কাও নাই। নগরের মহামূঢ় ধনী বিলাসীরা যে ধর্মের আলোক বাধার প্রাচীর তুলিয়া বন্ধ করিবার প্রয়াসী, সে আলোকে এ নির্জন বনভূমির অভ্যন্তরে স্বভাবতই প্রবেশ করিয়াছে। কেহ তাহা রোধ করিতে আসিবে না। বাকী জীবন এখানেই সে থাকিবে।' আবার চিন্তার উদয় হইল—'কিন্তু দুর্ভাগিনী সায়ফুন যদি রায়হানের সন্ধান না পাইয়া থাকে, যদি পথ ভুলিয়া পড়িয়া থাকে বিপাকে, তবে কী হইবে।" কী হইবে, কুলছুম আর ভাবিতে পারে না—জঙ্গলে দস্যু–তস্কর আছে, হিংস্র পশু আছে। প্রিয় বান্ধবীর বিপদাশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁক করিয়া উঠিল, অক্ষিপল্লব অশ্রুভারাক্রান্ত।

কুলছুম শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই রাত্রে সে আর আহার্য গ্রহণ করিতে পারিল না। আয়ায ও আয়ায–পত্নীর শত সান্ত্বনাবাক্যেও তাহার অন্তরের বেদনা কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না। মনশ্চক্ষে সে দেখিল, সঙ্গিনীর মত নিজের দুঃখময় জীবনের মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলিতেও আলোর উন্মেষ যেন কিছুমাত্রও নাই। অতীতের মতই তাহার ভবিষ্যৎও বড় অন্ধকার। জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত সৈনিক ক্লান্তির আবেশে আজ মুহ্যমান! সে কি আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে! যত রাজ্যের দুর্ভাবনা তাহার অন্তরে দলিয়া মথিয়া নিষ্পিষ্ট করিল। নিদ্রার আকর্ষণে যখন সে দুশ্চিন্তার ঘেরাজাল হইতে নিষ্কৃতি পাইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ।

বিশ

অশ্বারোহণে রায়হান সরু পথ ধরিয়া ছুটিতে লাগিলেন। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে আসিতে তাঁহাকে সমুদ্র তীরে পৌছিতেই হইবে, নতুবা আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। তিনি ভাবিলেন, সমুদ্রের ধারে ঈসের জঙ্গলে পৌছিতে পারিলে স্বদেশের মুসলমানদের সন্ধান হয়তো পাওয়া যাইবে। না পাওয়া গেলে পর দিবস ছদ্মবেশে বাহির হইয়া মুল্‌কে হাবাশে পলাইবার একটা উপায় খুঁজিয়া লইবেন। বহু দূরে গিয়া তিনি আয়াযের উপদেশমত বাঁ-দিকে আর একটা সরু পথ ধরিলেন; সমুদ্রোপকূলে যাইবার ইহাই একমাত্র পথ। দিবসের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি তাঁহাকে একবার আয়াযের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই মনোমধ্যে এ ধারণা উদিত হইয়াছিল— বিপদ পিছনে পিছনে তাড়া করিতেছে; যেহেতু কুরাইশগণ তাঁহার সন্ধান পাইয়াছে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়াও রায়হান বিশ্রাম নিতে থামিলেন না।

কুরাইশ-পুরবাসিনী সায়ফুন এই সন্ধ্যাকালে অন্ধকার অরণ্যে পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে, এই ধারণা মুহূর্তের জন্যও রায়হানের কল্পনায় স্থান পায় নাই; মনোমধ্যে এই প্রকার কল্পনা উদয় হওয়ার কথাও নহে। কিয়দ্দূরে যাইয়া পথের সঠিক সন্ধান লইবার জন্য কিছুক্ষণ থামিতেই পশ্চাতে বহুদূরে ঘোটকের পদশব্দ শুনিয়া তিনি অনুমান করিলেন দুশমনেরা হয়তো তাহাকেই ধরিতে ছুটিয়া আসিতেছে! তাঁহার ভয় হইল, পশ্চাদ্ধাবমান অশ্বারোহী দলে নিশ্চয়ই রহিয়াছে ওতবা, রাহেল প্রমুখ কুরাইশ। বারংবার অশ্বে কশাঘাত করিয়া তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন।

বনমধ্যে অন্ধকার বড় গভীর। রাস্তার উপরও বিশ্বের মসিভাণ্ড কে যেন উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় ন্যা। বনপথ ঠিক ঠাহর করা দায়।

ঘোটক পথ ছাড়িয়া বারংবার জঙ্গলে প্রবেশ করে। মাঝে মাঝে বৃক্ষশ্রেণীর আনত শাখা-প্রশাখাগুলি তাঁহার মস্তকে মৃদু আঘাত করিয়া বড় বিব্রত করিতেছে। হঠাৎ তাড়া খাইয়া বৃক্ষশাখায় বিশ্রাম রত পাখীগুলি এক-একবার কিচির মিচির শব্দ করিতে করিতে আকাশে উড়ে।

বৃক্ষলতার ভিতর দিয়া দ্রুত পথ চলিবারও উপায় আই। অশ্ববেগ সংযত করিয়া রায়হান ভাবিতে লাগিলেন, "এ কোথায় আসিলাম! এ-জঙ্গলে পথ নাই, লোকালয় নাই, আশ্রয় নাই! এখনও যে বন্য পশুরা আক্রমণ করে নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্য! অচিরে কোন আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া না পাইলে এ-যাত্রা প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না।" করুণাময় আল্লাহ্‌র দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তিনি অশ্ববল্গা শ্লথ করিলেন। ঘোটক নিবিড় বনানীর অভ্যন্তরে যদৃচ্ছা চলিতে লাগিল।

পশ্চাতে পূর্বোক্ত অশ্বের পদশব্দ ক্রমেই যেন অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কতক্ষণ পরে সে শব্দ আর রায়হানের শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কতকটা আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন, শত্রুরা নিরাশ হইয়া এতক্ষণে হয়তো পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে।

আর কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর, বহু দূরাগত মেঘ গর্জনের ন্যায় একটা গুরুগম্ভীর কল্লোলধ্বনি মুহুর্মুহু তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। রায়হান উপরে তাকাইলেন—কিন্তু কই, আকাশে মেঘের কোন লক্ষণ নাই। অসংখ্য তারকা-শোভিত নীলাকাশ যেন রত্নখচিত নীলাম্বরি পরিয়া, অবগুণ্ঠিতা নববধূর ন্যায় দিবাকর স্বামীর প্রতীক্ষায় জড়সড়ভাবে সলজ্জ উপবিষ্ট। বাতাস নাই, মেঘ নাই, অথচ অবিরাম মেঘ গর্জন!

রায়হানের বুঝিতে দেরি হইল না, এ মেঘমন্দ্র নহে-সমুদ্র কল্লোল! অদূরে সমুদ্র-সৈকতে বিধ্বস্ত তরঙ্গমালার নিষ্ফল আস্ফালন। হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "এই তো আসিয়া পড়িয়াছি! এই নিশীথে আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাইবে! দরিয়া আর বেশী দূরে নয়।" আশা-আকাঙ্খায় তাঁহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল-দূরে, বহুদূরে, সমুদ্রের ওপারে মুল্‌কে হাবাশে আশ্রিত, স্বদেশ-বিতাড়িত মজ্‌লুম মুসলমানগণ তাঁহাকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। মাঝপথ্যের এই বিরাট সমুদ্র পার হইয়া তাঁহাকে

সে-দেশে যাইতেই হইবে। আল্লাহ্র অনুগ্রহে বঞ্চিত না হইলে সকল বাধা-বিপত্তি তিনি অবশ্যই লংঘন করিবেন— দেশবাসীর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। রায়হানের অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার তিনি অশ্ববক্ষে গোড়ালি দ্বারা আঘাত করিলেন। কিন্তু হায়, পথ কোথায়! লতা-গুল্ম-পরিবৃত দুর্গম বনপথে অশ্বচালনা কী দুষ্কর! সমুদ্র-গর্জন-ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া অতি সাবধানে চলিতে চলিতে ক্রমে তিনি জঙ্গলের গভীরতর অংশে প্রবেশ করিলেন।

এতক্ষণ মাঝে মাঝে পাতলা জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে যে চলার পথ অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, এতক্ষণে তাহাও বন্ধ হইল। সরু পথের দুই ধারে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার শাখা-প্রশাখাগুলি ঝুঁকিয়া যেন সুবিন্যস্ত তোরণশ্রেণী রচনা করিয়াছে। যুবকের এক একবার মনে হইতে লাগিল-এ তো পথ নহে, এ তো অন্তহীন বন বীথিকায় গাছপালার স্তূপে কোন সুনিপুণ শিল্পী-রচিত বিরাট সুড়ঙ্গ বিশেষ।

রায়হান অশ্বপৃষ্ঠে ঝুঁকিয়া বৃক্ষশাখার আঘাত হইতে কোনক্রমে মস্তক বাঁচাইয়া চলিতে চলিতে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও আর সেই পথের কোন সন্ধান পাইলেন না। অতি কষ্টে অশ্বকে লতাগুল্ম ঠেলিয়া চালাইতে চালাইতে মাঝে মাঝে তিনি কাঁটাবনে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিলেন। পরিধেয় বসন ও উষ্ণীষ বস্ত্র এক-একবার কাঁটাগুল্মে জড়ায়, বহু কষ্টে ছাড়ায়, পুনরায় জড়ায়! রায়হান অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

সমুদ্রের গর্জন-ধ্বনি এইবার স্পষ্টই শ্রুতিগোচর হয়। তাঁহার মনে হইল, সমুদ্র যেন অতি নিকটে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি এক উন্মুক্ত স্থানের সন্ধান পাইলেন-বৃক্ষলতাদিবিহীন ক্ষুদ্র সমতল ভূমি। সেখানে অন্ধকার অনেকটা কম। অস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন -সমভূমির ওপাশে কয়েকটি ছোট ছোট টিলা মাথা উঁচু করিয়া গর্বভরে যেন অতন্দ্র দণ্ডায়মান।

চারিদিকে কোথাও কোন আশ্রয়স্থল পাওয়া যায় কিনা দেখিবার জন্য রায়হান অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক সর্বাপেক্ষা উচ্চ টিলাটির শীর্ষদেশে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, বহুদূর-বিস্তৃত বনভূমি যেন দিগন্তে মিশিয়াছে। অন্ধকারে

গাছপালা আর পাথরের পাহাড় ফরক করিবার উপায় নাই–সব একাকার। উপরে তারকাখচিত নীলাকাশ যেন এক বিরাট চাঁদোয়া। সেই সীমাহীন চন্দ্রাতপের নীচে কে বুঝি দিগন্তব্যাপী এক কৃষ্ণ লোমশ গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছে; আর সেই বিরাট গালিচায় অসংখ্য ছোট–বড় বৃক্ষ কৃষ্ণ বসনাবৃত তাপসীর ন্যায় গভীর তপস্যায় যেন নিমগ্ন। ধরণীতল বায়ুলেশহীন, নিথর–নিস্তব্ধ! সাগর–তরঙ্গের গভীর গর্জন–ধ্বনি ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নাই। সহসা দূরে গভীর জঙ্গলে এক আলোক–শিখা যেন দৃষ্টিগোচর হইল। ক্ষীণ আলো–দাবানল বলিয়া মনে হইল না। সেখানে লোকালয়ের সন্ধান পাইবে ভাবিয়া রায়হানের অন্তর অনির্বচনীয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া সেই শিখাভিমুখে তিনি দ্রুত ছুটিতে লাগিলেন।

কিন্তু কিছুদূর যাইতেই বৃক্ষলতার অন্তরালে তাঁহার দিগভ্রম হইল, আবার পথ হারাইলেন। আলোকরশ্মিও আর দৃষ্টিগোচর হয় না। দিশাহারা হইয়া তিনি বনে এদিক–ওদিক ছুটিতে লাগিলেন। মনোমধ্যে যে আশার আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আবার হঠাৎ যেন নিভিয়া গেল।

রায়হান শক্তি–সাহস সব হারাইয়া বসিলেন, এক পা অগ্রসর হইবারও আর সাহস হয় না। দুই চোখ বুঝি কালিতে ভরপুর, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এইবার তিনি ভয়ে অভিভূত হইলেন। ক্ষুধা–তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। ক্লান্ত দেহে বিন্দুমাত্র শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট নাই। সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন, চারিদিকে জঙ্গলে কি যেন ছুটাছুটি করিতেছে, আশেপাশে বৃক্ষপত্র–কেবল মর্মরধ্বনি। এই সেদিকে কত দ্রুত চলার শব্দ, ওদিকেও কি একটা ছুটিয়াছে! আবার নিকটেই কি যেন আর একটা! ভয়ে–ভাবনায় তাহার রোমাঞ্চিত দেহে ঘর্মধারা ফিনকি দিয়া বাহির হইতে লাগিল! ঘোটকও ভয় পাইয়া কেবলই এদিক–ওদিক ছুটিতে চায়।

প্রতি মুহূর্তে যুবক আশঙ্কা করিতে লাগিলেন–বন্য পশুরা দল বাঁধিয়া বুঝি বা তাঁহার ঘাড়ের উপরই লাফাইয়া পড়িবে। তরবারিখানি দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তিনি আবার চলিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সেই আলোকরশ্মি পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইতেই তাঁহার মৃতপ্রায় দেহে আবার যেন প্রাণ সঞ্চার হইল, বাঁচিবার আশায় অন্তর পুলকে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু বনমধ্যে অশ্বারোহণে পথ চলা আর সম্ভব নহে।

অগত্যা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বাম হস্তে অশ্ববল্‌গা ও ডান হস্তে তরবারি শক্তভাবে ধারণ করিয়া তিনি আল্লাহ্‌র নাম জপিতে জপিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পদদলিত শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্মর-ধ্বনি শুনিয়া দুই-চারিটি বন্য পশু বুঝি ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটিয়া পালায়; নতুবা জঙ্গলে কিসের ছুটাছুটির আওয়াজ! কিন্তু রায়হানের সেইদিকে কোন নযর নাই; তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য-সেই পরিদৃশ্যমান আলোকশিখা। অবিলম্বে অন্ধকার হইতে আলোকে আসিবেন, আশ্রয় পাইবেন, একমাত্র সেই চিন্তায়ই তাঁহার অন্তরে নিঃসীম আনন্দ।

সেই আলোকশিখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অশ্ববল্‌গা টানিতে টানিতে রায়হানকে বৃক্ষশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে বেশীদূর আর অগ্রসর হইতে হইল না। কতক্ষণ পরেই তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন জঙ্গলের অভ্যন্তরে এক বিরাট বৃক্ষতলে প্রজ্বলিত কাষ্ঠস্তূপ নিঃসারিত অনলশিখায় চারিদিক আলোকিত। বিস্ময়াবিষ্ট রায়হান ভাবিতে লাগিলেন—এ অগ্নি মনুষ্যরচিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কই, কোথাও তো কোন জনমানব দৃষ্টিগোচর হয় না! কোন লোকালয়ও তো নযরে পড়ে না। রায়হান বীরপুরুষ-অন্তর ভয়-লেশহীন। তাঁহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসী নানা অশরীরী ভূত-প্রেত ও দেও-দানবে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম সমস্ত অন্ধবিশ্বাস, গোম্‌রাহী ও কুসংস্কার অন্তর হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। নিবিড় বনমধ্যে গভীর নিশীথে এই অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া তাঁহার পৌত্তলিক দেশবাসী নিশ্চয়ই ইহা দেবতার কীর্তি ভাবিয়া ভূমিতে লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত; কিন্তু রায়হান শুধু প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আশপাশে কোন মনুষ্যমূর্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন।

বিস্ময়াবিষ্ট যুবক সম্মুখে দুই-চারি পা মাত্র বাড়াইলেন। আর খানিকটা অগ্রসর হইলেই আলোর ছটা তাঁহার চোখে-মুখে পড়িবে, এমন সময় সহসা পশ্চাদ্দেশ হইতে কে যেন তাঁহার দুই বাহু সজোরে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে শূন্যে উঠাইয়া ফেলিল।

রায়হান এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল। বন্দীদশা হইতে নিজেকে মুক্ত

করিবার জন্য কয়েকবার তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, প্রতিপক্ষ যেন আসুরিক শক্তির অধিকারী। অন্ধকারে কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না; শুধু মাত্র বুঝিতে পারিলেন, এক বলিষ্ঠ দানব যেন স্কন্ধদেশে নিক্ষিপ্ত তাঁহার অবসন্ন দেহখনি দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জঙ্গলের ভিতরে ছুটিয়া পলাইতেছে।

কঠোর পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিতে রায়হানের সর্বশরীর নিদারুণ অবসাদগ্রস্ত, তদুপরি এই অভাবনীয় আক্রমণ। তাঁহার সর্বাঙ্গে শক্তি সাহস যেন আর এতটুকুও অবশিষ্ট নাই। আক্রমণকারী জীবটা মনুষ্য না অন্য কিছু, তাহাও বোধগম্য হইল না। মৃত্যুভয়ে অধীর হইয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন; ভারাক্রান্ত চেতনা প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম।

একুশ

অশ্বারোহণে সায়ফুন জঙ্গলের বহু দূরে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু রায়হানের সন্ধান পাইল কই। তথাপি সে নিরাশ হইল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল– এই আর একটু অগ্রসর হইলেই হয়তো প্রিয়তমের সন্ধান পাওয়া যাইবে। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, বনমধ্যে আর কতদূরই বা সে যাইতে পারিবে, হয়তো বা নিকটেই কোথাও আশ্রয় নিয়াছে। ইত্যাকার ভাবিতে ভাবিতে সায়ফুন আরো বহু দূর পথ অতিক্রম কলিল; কিন্তু কোথাও কোন আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইল না, রায়হানেরও কোন সন্ধান মিলিল না।

অন্ধকার ক্রমেই যেন গভীরতর হইয়া আসিতেছে, আর একটু পরেই পথ চলা দুষ্কর হইবে। সায়ফুন বারংবার অশ্বে কশাঘাত করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই সে দেখে, সম্মুখে বনপথ দুই ভাগ হইয়া দুই দিকে চলিয়া গিয়াছে– একটি সোজা পূর্বদিকে অপরটি ডাহিনে। যুবতী একটু থামিয়া ভাবিতে লাগিল– সমুদ্র কোন্ দিকে! অতঃপর সে সোজা পূর্বদিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল। হায় অদৃষ্ট! হতভাগিনী ডানদিকের পথ ধরিলে এ–কাহিনী হয়তো ভিন্ন রূপ ধারণ করিত; কিন্তু দৈবের নির্বন্ধ রোধ করিবে কে?

চলিতে চলিতে সায়ফুন ভাবিয়া পায় না–রায়হান এখানে কোথা হইতে আসিল, কোথায়ই বা নিশাকালে ছুটিয়া পলাইল? কোথায় কিভাবে সে অশ্ব সংগ্রহ করিল, কে জানে। হয়তো আর কিছুদূর গেলেই তাহাকে ধরিতে পারিবে, তাহার সকল দুঃখের অবসান হইবে। কুহকিনী আশার রঙিন মায়াজাল কেবলই তাহাকে টানিতে লাগিল সম্মুখের দিকে। সায়ফুন চিন্তা করিতে লাগিল–'এই বনমধ্যে যদি তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাই তবে কি দশা ঘটিবে? কোথায় আশ্রয় মিলিবে? না না, নিশ্চয়ই তাহাকে পাইব, এ অন্ধকার বনমধ্যে কতদূরই বা সে যাইবে!' রায়হানের সন্ধান এখানে পাইবে না– ইহা ভবিতেও তাহার সাহস হইল না। অশ্বকে যথাশক্তি দ্রুত সে চালাইতে লাগিল।

রাস্তার আশপাশে কিংবা বনমধ্যে কোন লোকালয় দৃষ্ট হইল না। কোথাও কোন জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও নাই। এই ঘোর জঙ্গলে রায়হান কোথায় অদৃশ্য হইলেন, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। সায়ফুন ভাবিয়া পাইল না—একাকিনী এই বিজনে আর কতদূরই বা সে যাইবে! ভয় হইল, বন্য পশুরা যে কোন মুহূর্তে তাহাকে আক্রমণ করিত পারে। একবার সে ভাবিল—আয়াযের চত্বরেই ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু রায়হানকে ফেলিয়া, চিরজীবনের মত তাঁহাকে হারাইয়া, কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবে! রায়হানের সন্ধানে কুলছুমকে লইয়া সমুদ্রের পথে সে যাত্রা করিয়াছিল; কিন্তু এই গভীর অরণ্যে তাঁহাকে হারাইয়া হাবৃশী-মুলকে যাইয়াই বা লাভ কি! মনে মনে সে সংকল্প করিল—'না, আর ফিরিয়া যাইব না। অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক! প্রিয়তমের সন্ধানে আবার সমস্ত বন পাতি পাতি করিয়া খুঁজিব। এ জীবনে যদি আশা-আকাঙ্খা না-ই মিটিল, প্রিয়তমের সন্ধান যদি না-ই মিলিল, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি!'

এবম্প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সায়ফুন বনপথে আরও বহুদূর অগ্রসর হইল। অন্তহীন নৈরাশ্য তাহার শক্তি-সাহস যেন নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। অশ্ববল্‌গা শ্লথ। ঘোটক আপন ইচ্ছামত ধীরে ধীরে চলিয়াছে। পথিমধ্যে অন্ধকার কিছুটা পাতলা বটে, কিন্তু সম্মুখে বেশী দূর দৃষ্টিগোচর হয় না। বহুদূর আসিয়াও রায়হানের কোন সন্ধান যখন সে পাইল না, তখন আর স্থির করিতে পারিল না কোথায় সে যাইবে। বনপথের সম্মুখে যেরূপ অন্ধকার, পশ্চাতেও তদ্রূপ; তাহার জীবনযাত্রার পথও যে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেখানে কোন আশার আলোকই নাই। নৈরাশ্যের হাহাকার বুকে চাপিয়া কিরূপে সে জীবন ধারণ করিবে!

শত ঘুরাঘুরি করিয়াও জঙ্গলের বাহিরে যাইবার পথ সে খুঁজিয়া পাইল না। ভাবিয়াছিল, সমুদ্রের ধারে একবার রায়হানের সন্ধান করিয়া দেখিবে—হয় তো সে সেখানেই আছে; কিন্তু সে আশাও সফল হইল না। হতাশায় তাহার অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ, দুই নয়নে অশ্রুধারা। অদূরে বাঘের গর্জন শোনা যায়। নিশাচর পশুগুলি শিকারের সন্ধানে নিকটেই হয়তো ঘোরাফেরা করিতেছে অথবা ওত পাতিয়া রহিয়াছে।

সায়ফুনের মনে হইল মৃত্যু সন্নিকট। যে-কোন মুহূর্তে কোন হিংস্র জানোয়ার তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িতে পারে। আর রায়হানকে হারাইয়া বাঁচিয়া

থাকিয়াই বা লাভ কি! এই দুর্বিষহ জীবনের দুঃসহ ভার বহন করা যে অসম্ভব! না, না, মৃত্যুই শ্রেয়।

এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া হস্তস্থিত তলোয়ার উত্তোলনপূর্বক সে ভাবিল, রাহেল এই তরবারি দ্বারা তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, পারে নাই; আজ রাহেলের ইচ্ছাই সে পূরণ করিবে—স্বহস্তে রাহেলের তরবারি নিজ বক্ষে বিদ্ধ করিয়া সকল দুঃখের অবসান ঘটাইবে। ক্ষিপ্রহস্তে তরবারির সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ সে দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত, এমন সময় শুনিল—নিকটেই কোন মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত চিৎকার ধ্বনি। সায়ফুনের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। মনোমধ্যে উদয় হইল—হয় তো বা রায়হানই নিকটে কোথাও বিপদাপন্ন, এ যেন তাহারই চিৎকার ধ্বনি! নতুবা নিশাকালে এই বিজন বনে আর মানুষ কোথা হইতে আসিবে! না, সে মরিবে কেন! মরিলে রায়হানকে রক্ষা করিবে কে! তন্মুহূর্তে সায়ফুন একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে পুনরায় আরোহণপূর্বক সেই চিৎকার ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

খানিকটা গিয়াই সে দেখিতে পাইল, গভীর বনভূমি যেন শেষ হইয়া গিয়াছে—জঙ্গল সেখানে অনেকটা পাতলা। অবাক হইয়া সে দেখে—অদূরে মাটিতে তৈল-হারা এক নিবু নিবু মশাল মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, আর নিকটে হস্তপদ বন্ধনাবস্থায় এক বলিষ্ঠ পুরুষ ভূতলে শায়িত। অদূরে ঝোপঝাড়-পরিবৃত প্রান্তরে এক বহু প্রাচীন জীর্ণ বাটীতে মনুষ্য কোলাহল যেন শোনা যাইতেছে। সেখানে আলোর শিখাও যে দৃষ্টিগোচর হয়।

সায়ফুন বন্দীর নিকটে আসিয়া দেখে—রায়হান নহে; কে একজন যুবক-পুরুষ আসন্ন মৃত্যুভয়ে অতি করুণ সুরে ক্রন্দনরত। নিকটে অন্য কোন জনমানব নাই। বোধ হয় অশ্ব পদশব্দ শুনিবামাত্র যুবকটি কোন বন্য পশু কিংবা শত্রুর আবির্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া, হাত-পা ছাড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু দুশমন কিংবা হিংস্র প্রাণীর পরিবর্তে সহসা অশ্বপৃষ্ঠে এক নারীমূর্তি অবলোকন করিয়া যুবকটি বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব! সে গদগদকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "কে আম্মা? কে তুমি? তুমি কি বনদেবী? রক্ষা কর আম্মা! রক্ষা কর!" তাহার বেদনাতুর কণ্ঠস্বরে নিদারুণ উৎকণ্ঠা।

বিস্ময়-ব্যাকুল-কণ্ঠে সায়ফুন জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? এইখানেই বা কে তোমাকে বেঁধে রেখেছে?"

লোকটা কাতরকণ্ঠে উত্তর করিল, "আম্মা! আমি হারিস; দুর্ভাগ্যক্রমে দস্যুহস্তে বন্দী হয়েছিলাম। দুশমনেরা চলে গেছে আমাকে হিংস্র-পশুর কবলে ফেলে। আমাকে বাঁচাও আম্মা!"

সায়ফুন অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠ হইত অবতরণ করিয়া তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিল। হারিস অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় না। কাঁপিতে কাঁপিতে সে সায়ফুনের পদতলে লুটাইয়া ব্যাকুলভাবে বলিল, "আম্মা! শিগ্‌গির এ স্থান ছেড়ে দূরে চল! নতুবা এখনই কোন বন্য পশু আমার প্রাণ সংহার করিবে। জানি, কেউ তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না-তুমি দেবী, কিন্তু আমি যে মানুষ! আমি কিরূপে বাঁচব! কোন্ মন্দিরে তোমার আশ্রয় আম্মা? আমি গিয়ে পূজো দেব নিত্য। আম্মা! আমাকে ফেলে অদৃশ্য হয়ো না যেন, দোহাই তোমার! দেবী তোমায় নমস্কার।"

এত দুঃখের মধ্যেও সায়ফুনের হাসি পাইল। সে বলিল, "ভুল বুঝেছ হারিস! আমি দেবী নই-মানবী।"

"এত বোকা ঠাওরিও না আম্মা! আমি বুঝি চিনি নে!"

"বিশ্বাস না হয় ঐ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে কিংবা এই তলোয়ার চালিয়ে পরীক্ষা কর না?"

"এ্যা! মানবী! বলেন কি আম্মা!" অগাধ বিস্ময়ে হারিস দুই চক্ষু কপালে তুলিল। পুনরায় বলিল, "কিন্তু এই রাত্রে মানুষের এখানে আসা তো সম্ভব নয় আম্মা! নিশ্চয়ই কোন দেবতা তবে পাঠিয়েছেন! কোথা থেকে এলেন আম্মা?"

সায়ফুন উত্তর করিল, "সে অনেক কথা, কি হবে শুনে! তুমি যাবে কোথায় তা'ই বল? যে দস্যুরা তোমাকে বন্দী করে এনেছিল তারাই বা এখন গেছে কোথায়?"

হারিস অদূরে সেই জীর্ণ বাড়ীটা নির্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ ভাঙ্গা মন্দিরে তারা আশ্রয় নিয়েছে-মদ্যপান ও আমোদ-প্রমোদে সারা রাত কাটাবে। প্রভাতে

দেখে যাবে বন্য পশুরা আমাকে খেয়েছে কিনা। ঐ শুনুন বাঘের গর্জন! চলুন আম্মা! ত্বরায় এই স্থান ত্যাগ করুন।"

সায়ফুন উত্তর করিল, "হারিস! তুমি মুক্ত, যদৃচ্ছা যেতে পার। আমার যাবার ঠাঁই নেই কোথাও, এই জঙ্গলেই ঘুরে ঘুরে বেড়াব।"

হারিস আবার বলিল, "আম্মা! আপনাকে বাঘের মুখে ফেলে আমি চলে যাব একা! এত বড় নরাধম আমাকে ভেবেছেন? আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন—এ কথা কি ভুলতে পারবো? চলুন আপনাকে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়ে দিই। বলুন, কোথায় যাবেন?"

সায়ফুন উত্তর করিল, "কোথায় বা যাই। সমুদ্রোপকূলে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু পথ যে হারিয়েছি। কে জানে দরিয়া কতদূর। আমার আর যাওয়া হবে না, তুমি যাও হারিস।"

হারিস তৎক্ষণাৎ অশ্ববলগা স্বহস্তে ধারণ করিয়া উল্লাসভরে বলিল, "আমাদের গ্রামে চলুন আম্মা! প্রভাতেই আপনাকে সমুদ্রতীরে পৌছিয়ে দেব। এই বনের পশুরা যেরূপ হিংস্র, বনপ্রান্তের অধিবাসীরাও তদ্রূপ,তা' ছাড়া নিকটেই যে দস্যুরা লুকিয়ে রয়েছে। সাবধানে চলতে হবে।" এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ধীরে ধীরে অশ্ববল্‌গা টানিতে টানিতে জঙ্গলের বাহিরে যাইবার পথ ধরিল।

সায়ফুন আর আপত্তি করিল না, অশ্বপৃষ্ঠে নির্বাক বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, 'আমি বড় হতভাগী, এ সময় হারিসের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া আর উপায়ই বা কি; এখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় না থাকিয়া সমুদ্রতীরে আর একবার রায়হানের সন্ধান করি না কেন?"

মোহিনী আশা তাহার অন্তর আবার জুড়িয়া বসিল। ক্ষণকাল পূর্বে যে প্রাণ হতাশায় মরণাকাঙ্খী হইয়া উঠিয়াছিল, আশার রঙিন নেশায় পুনরায় উহা সঞ্জীবনী—শক্তি লাভ করিল! কেনই বা তাঁহার প্রাণ উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে না! জগতে আশাই তো মানুষের প্রাণে বাঁচিবার আকাঙ্খা জাগাইয়া রাখে—নির্ধন ধনের আশায় পাগল, ধনী সুখ—স্বপ্ন রচনায় মত্ত, ভোগী ভোগের কামনায় দিশাহারা, প্রেমিক—প্রেমিকা প্রণয়ের আশায় মশগুল, সুধীজন যশোলিপ্সু—

মানুষমাত্রই শুধু আশার স্বপ্নে বিভোর। হতভাগিনী সায়ফুনই বা রায়হানের সঙ্গে মিলনাকাঙ্খায় অধীর না হইবে কেন?

হারিস দস্যুদের আশ্রয়স্থল দূরে রাখিয়া অতি সাবধানে বনমধ্যে চলিতে লাগিল। নবজীবন লাভ করিয়া সে আজ ধন্য। আশা–আকাঙ্খায় অন্তর উদ্বেল, কিন্তু জীবন যে এখনও নিরাপদ নহে। ইতস্তত বিচরণকারী বন্য পশুর চিৎকারে সে বারংবার চকিত হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। এক–একবার শুষ্ক বৃক্ষপত্রের খসখসানি শুনিয়া সে ভাবে, দস্যুরা বুঝি সন্ধান পাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। হারিস অশ্ববল্গা যথাসাধ্য জোরে টানিয়া দ্রুত ছুটিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পথ চলার পর সায়ফুন উদ্বিগ্না হইয়া বলিল, "জঙ্গল যে এখনও শেষ হয় না হারিস! আর যেতে হবে কতদূর?"

হারিস–এই তো প্রায় এসে পড়েছি। বনপ্রান্তেই আমাদের ঘর। আমার বৃদ্ধা আম্মা আমাকে দেখে খুশী হবেন খুব। না জানি, দুঃখিনী জননী কি অবস্থায় দিনপাত করছেন!

সায়ফুন–এতদিন তুমি ছিলে কোথায়?

হারিস–সে বড় দুঃখের কথা আম্মা! এতদিন তো বন্দীভাবেই কাটিয়েছিলাম। আজ মরতে মরতে হঠাৎ বেঁচে গেলাম। আমার কোন্ পুণ্যফলে আপনি এই বনে যে এসেছিলেন, জানিনে।

সায়ফুন–কিভাবে বন্দী হয়েছিলে? কে বন্দী করেছিল?

হারিস–আমাদের পল্লীর উত্তর দিকে এই বনের অপর প্রান্তে রয়েছে আর একটি বড় গ্রাম। সেই গ্রামের অধিবাসীদের অত্যাচার কাহিনী বলে শেষ করার নয়। একদিন গভীর রাত্রে আমরা সকলেই নিদ্রায় বিভোর, এমন সময় অতর্কিতে সেই গ্রামের দস্যুরা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে। দেহাতীদের খাদ্যভাণ্ডার ও ধন–দৌলত সব লুণ্ঠন করে, গৃহপালিত পশুগুলিও তারা ধরে নিয়ে যায়। সেই রাতে কত নিরীহ গ্রামবাসী তাদের কবলে পড়ে যে প্রাণ হারায়, কতজন যে বন্দী হয়, তা' মনে হ'লে প্রাণ শিউরে উঠে। সেই সময়েই আমাকে তারা বে–হদ্ মারধর করে বন্দী করেছিল।

সায়ফুন। কিন্তু তোমরা কোন বাধা দিলে না কেন?

হারিস। তা' কি আর দিই নি আম্মা, কিন্তু সংখ্যায় ছিলাম আমরা অল্প, এঁটে উঠতে পারলাম কই।

সায়ফুন। অন্যান্য বন্দীদের কি মেরে ফেলেছে দস্যুরা?

হারিস। না, আত্মীয়-স্বজন মুক্তিপণ দিয়ে তাদের মুক্ত করে নিয়েছে।

সায়ফুন। তোমার মুক্তির কোন ব্যবস্থা হলো না কেন?

হারিস। আমি একজন দরিদ্র চারণ, দেশ-বিদেশে গান গেয়ে কোন রকমে দিন গুজরান করি। সংসারে এক ভগ্নী আর বৃদ্ধা আম্মা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই। কে আমাকে উদ্ধার করবে? এত টাকাই বা কোথায় পাবে?

সায়ফুন। কেন, তোমার বিবি?

হারিস। না, ইচ্ছা করেই সে-বোঝা কাঁদে চাপাই নি আম্মা!

সায়ফুন। আচ্ছা, তোমাকে হত্যা করে দস্যুদের লাভ? বন্দী করে রাখলেই কি কোনদিন মুক্তিপণ পেত?

হারিস। সেই অর্থের লোভেই তো তিন-মাস কাল অপেক্ষা করেছে শয়তানগুলো। আজই সন্ধ্যায় এই মন্দিরে আমার মুক্তিপণ দিয়ে আসার শেষ দিন ধার্য করেছিল তারা; কিন্তু আসবে কে? হয়তো আমার আম্মা সর্বস্ব বিক্রি করেও এত টাকা সংগ্রহ করতে পারেন নি। সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ না আসায় ডাকাতেরা চলে গেছে আমাকে বন্ধনাবস্থায় বন্য পশুর মুখে ফেলে। ভেবেছিল, রাত্তিরে আমাকে বাঘেই খাবে। আর ভাগ্যক্রমে বেঁচে থাকলেও, প্রভাতে আমাকে নির্ঘাত হত্যা করে চলে যেত তারা।

সায়ফুন। কিন্তু এই জঙ্গলে কেন মুক্তিপণ নিয়ে আসার স্থান নির্ধারিত হয়েছিল? কে আসতো এখানে সাহস করে?

হারিস। জঙ্গলে যে বন-দেবতার মন্দিরে দস্যুরা আশ্রয় নিয়েছে, তা' আমাদের পীঠস্থান। সেখানে কোন অত্যাচার হওয়ার জো নেই কারো উপর। আমরা উভয় গ্রামের লোক সেস্থানে পূজো দিতে আসি নির্ভয়ে।

সায়ফুন। এই গহন বনে মন্দির নির্মাণ করেছিল কোন্ পাগলে?

হারিস। আগে তো এখানে জঙ্গল ছিল না আম্মা–ছিল মস্ত বড় দুই গ্রাম। শুনেছি, বহুদিন আগে সব উজাড় হয়ে যায় এক মড়কে। সেই থেকে দিনে দিনে এই জঙ্গলের সৃষ্টি। এখনো বনে দু'চারখানা ভাঙ্গা ঘর–বাড়ী দেখতে পাবেন। আচ্ছা আম্মা! আপনি কোথা থেকে এলেন, কোথায়ই বা যাবেন, বললেন না তো কিছুই?

সায়ফুন। সে অনেক কথা,পরে বলবো। আর কতদূর যেতে হবে তা'ই বল? ও কিসের আওয়াজ হারিস?

হারিস। ও দরিয়ার ডাক। দরিয়া এদিকে যে আর বেশী দূরে নয়।

সায়ফুন। দরিয়া! দরিয়ার কাছেই কি এসে পড়েছি নাকি?

হারিস। হাঁ আম্মা! আমরা সোজা পথে এসেছি। ও–দিকটায় ঐ ঈসের জঙ্গল চলে গেছে বহু দূর। দেখুন না, এদিকে জঙ্গল কত পাতলা।

সায়ফুন লক্ষ্য করিল, সেখানটায় জঙ্গল অনেকটা পাতলাই বটে; বালির উপরে ছাড়া–ছাড়া গাছপালাগুলি কেমন নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান। উপরে সুনীল আকাশে অসংখ্য তারকা মিট মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। চারিদিকে অন্ধকারও ততটা গভীর নহে। এদিক–ওদিক দুই–চারটা ভগ্ন গৃহের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন বসতির অস্পষ্ট সাক্ষ্য এখনো বহন করে। বহুদিন–বর্জিত গ্রাম্য পথগুলির শেষ চিহ্ন এখনো মিলায় নাই। তন্ময় হইয়া সে ভাবে–কোথায় গেল সব! যাহারা এখানে সুখ–দুঃখের পসরা মাথায় নিয়া নাচিয়া–গাহিয়া, হাসিয়া–কাঁদিয়া, দিনপাত করিত, আজ তাহারা কোথায়? সেই সব মধুর হাসি, চপল চাহনি, চঞ্চল গতি, সুমধুর বাণী আজ কোথায় মিলাইল! আর কি তাহারা ফিরিয়া আসিবে? ধরাপৃষ্ঠে কিছুদিন জীবন–সংগ্রামে ছুটাছুটি করিয়া চিরতরে তাহারা বিশ্রাম লইয়াছে ধরণীর বুকে–আপন দেহ–সম্পদ মাটিতে বিলাইয়া দিয়া ধরা–বক্ষ সরস করিয়া তুলিয়াছে। তাই বুঝি ধরিত্রীর এত রূপরস, এত ফুল–ফল, এত সাজ–সজ্জা। হায়! তাহার নিজের জীবনের পরিণতিও বুঝি ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হারিস এইবার অশ্ববল্গা ছাড়িয়া সেই বনাকীর্ণ পরিত্যক্ত গ্রাম্য পথে দ্রুত চলিতেছে। সায়ফুনকে সে কয়েকটা বহু পুরাতন বাস্তুভিটা ও দুই–চারিটা পরিচিত স্থান পথের উপর হইতে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিল, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ

চিন্তায় ভাবাবিষ্টা সায়ফুন কতক দেখিল, কতক দেখিল না; হারিসের সব কথা তাহার কানেও পৌঁছিল না। এতক্ষণ তো হিংস্র পশুর দংষ্ট্রাঘাতে হারিসের আত্মা দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্ত শূন্যে মিশিয়া যাইত, ধরিত্রীর আলো-বাতাস, রূপ রস চিরবিদায় গ্রহণ করিত; কিন্তু সে মরে নাই, নির্বাণোন্মুখ জীবন-দীপ নিবিতে নিবিতে আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাই দেশের মাটি, দেশের হাওয়া, তাহার মন-প্রাণ আকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মনে হইল-এই ধরণীর আকাশ-বাতাস,বনানীর শ্যামলিমা, পথঘাট, কত অপূর্ব,কত মনোহর! এ-ভুবন কত সুন্দর! আনন্দাতিশয্যে হারিস লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিল। সায়ফুনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষুদ্বয় সজল।

ক্রমে তাহারা বনানীর প্রান্তদেশে আসিয়া পৌঁছিল। সায়ফুন চাহিয়া দেখে-সম্মুখে এক উন্মুক্ত বালুকাময় প্রান্তর। প্রান্তরের ও-পাশে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম পাতলা অন্ধকারে অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে, পশ্চাতে বিরাট বনভূমি অন্ধকারের পক্ষপুটে যেন নিঝুম নিথর।

হর্ষোৎফুল্ল হারিস চেঁচাইয়া উঠিল, "ঐ দেখ আম্মা! ঐ আমাদের গাঁ।" এই বলিয়া হঠাৎ এক দৌড়ে প্রান্তরের মধ্যভাগে গিয়া সে দাঁড়াইল। তাহার এই বালকসুলভ চপলতা লক্ষ্য করিয়া সায়ফুন হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে বুঝিল, বাঁচিবার উদগ্র আনন্দ হারিসকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আহা! এমন অনাবিল আনন্দ নিজে যদি সে উপভোগ করিতে পারিত! না, অদৃষ্টে তাহার সে সুখ নাই।

হারিস পর মুহূর্তে আবার সায়ফুনের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে লইয়া দ্রুত চলিল; এক দৌড়ে গৃহে ফিরিতে পারিলে যেন সে বাঁচে। ক্রমে ছাড়া-ছাড়া লতাগুল্ম-সমাবৃত সেই মাঠ পার হইয়া তাহারা গ্রামের প্রান্তদেশে আসিয়া পৌঁছিল।

নিশুতি গ্রাম। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নাই। মনে হয়, কোন মায়াবিনীর মায়া-কাঠির পরশে সমস্ত জীবজগৎ যেন চেতনা হারাইয়াছে। রাত্রি প্রায় শেষ, অন্ধকার আর ততটা নাই।

অল্পক্ষণ মধ্যেই আরো দুই–তিনটি বাড়ী পার হইয়া হারিস নিজের বহির্বাটীতে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার অন্তরের স্পন্দন–ধ্বনি ক্রমেই তখন দ্রুততর হইতেছে। সে দেখিয়া অবাক–বাড়ীর সে শ্রী নাই, পারিপাট্যও নাই; বাসগৃহ যেন জনমানবশূন্য। এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার অন্তর দুরুদুরু কম্পমান।

হারিস গৃহদ্বারে ছুটিয়া গিয়া 'আম্মা আম্মা ' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কোন সাড়া না পাইয়া চিৎকার করিয়া আবার সে ডাকিল "আম্মা! আমি এসেছি। এসেছি আম্মা। ওঠ আম্মা,দুয়ার খোল!" সায়ফুন অনতিদূরে প্রাঙ্গণে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া মাতা–পুত্রের মিলন–দৃশ্য দেখিবার জন্য একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

ডাকাডাকি শুনিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে এক মলিন–বসনা যুবতী প্রদীপ জ্বালাইয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল বাহিরে। সায়ফুন চাহিয়া দেখে, যুবতীর আলুথালু বেশ, রুক্ষ কেশ, শুষ্ক মুখ। রমণী গৃহদ্বারে হারিসকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "ভাইজান! তুমি! তুমি এসেছ!" তাহার কম্পিত হস্ত হইতে আলোক–বর্তিকা ভূতলে গড়াইয়া পড়িল। নারী পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া হারিসকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম। সায়ফুনের বুঝিতে বাকী রহিল না, এই যুবতীই হারিসের ভগিনী।

হারিস ভগিনীকে হাত ধরিয়া উঠাইল। প্রদীপ কুড়াইয়া লইয়া সে 'আম্মা আম্মা' ডাকিতে ডাকিতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে–মা নাই, শূন্য গৃহ। ভয়ে তাহার বুকের ভিতরটায় মোচড় দিয়া উঠিল। সে চিৎকার করিয়া ডাকিল, 'আম্মা! ও আম্মা!'

হারিসের ভগিনী ছাবেরাও বিলাপ করিতে করিতে ভ্রাতার পশ্চাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ম্রিয়মাণ হারিস জিজ্ঞাসা করিল, "ছাবেরা! আম্মাকে যে দেখছি না! কোথায় আম্মা?"

ছাবেরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভাইজান, আম্মাকে কি আর খুঁজে পাবে? দেবতারা বড় নিষ্ঠুর, বড় কঠোর। উঠানের বাইরে ঐ দেখ আম্মার কবর। তোমার শোকে প্রায় এক মাস আগে—।" ছাবেরা আর বলিতে পারিল না, শোকাবেগে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

অকস্মাৎ হারিসের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। ছিন্নমল বিটপীর ন্যায় ভূতলে গড়াইয়া বুক–ফাটা কান্নায় নৈশ–গগন সে ভরিয়া তুলিল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়া সায়ফুন বাহিরে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া এ–দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিল না। হারিসের দুঃখে তাহার অন্তরও ব্যথা–ভারাক্রান্তা; অশ্রুহারা চোখে আবার দুই ফোঁটা পানি গড়াইয়া পড়িয়াছে। চোখ তুলিয়া সে দেখিল,হারিসের একখানা মাত্র কুটীর–খর্জুর শাখা ও পত্র–নির্মিত, তাহাও প্রায় ভগ্নাদশাগ্রস্ত–দেয়াল ও ছাদের পত্রাবরণ খসিয়া পড়িয়াছে এখানে–ওখানে; অদূরে পল্লীবাসীদের ঘরগুলিতেও দুঃখ–দৈন্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুস্পষ্ট তরঙ্গধ্বনি শুনিয়া সায়ফুন বুঝিল, সমুদ্র সন্নিকট। সে তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল, উত্তাল তরঙ্গ–সঙ্কুল জলধি বুঝি তাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে। রায়হান বহু পূর্বেই হয়তো সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া সাগর–যাত্রার আয়োজনে মাতিয়াছে। এখানকার কাজ তো তাহার শেষই হইয়াছে, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি!

প্রস্থানোন্মুখ সায়ফুন সমুদ্রে যাইবার জন্য অশ্বের ঘাড় ফিরাইতেই সভয়ে দেখে–অদূরে আবছা অন্ধকারে দুই অশ্বারোহী যুবক উন্মুক্ত তরবারি–হস্তে সাক্ষাৎ আজরাইলের ন্যায় দণ্ডায়মান। তৎক্ষণাৎ সায়ফুনের আপাদমস্তক যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল অন্তর্দাহক এক বিদ্যুৎ ঝলকে। নিদারুণ ভয়ে সে চিৎকার করিয়া উঠিল। ভাবিল, জঙ্গলের দিকেই পলাইয়া যাবে। ছুটিয়া যাইতে গোড়ালি দ্বারা অশ্বপৃষ্ঠে আঘাত করিবে, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই অশ্বারোহী পুরুষদ্বয় তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাহার দুই পার্শ্বে অশ্বদ্বয় দাঁড় করাইয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

সায়ফুন পলাইবার অবকাশ আর পাইল না। আত্মরক্ষার জন্য তরবারি উত্তোলন করিবামাত্র এক অশ্বারোহী পুরুষ পশ্চাদ্দেশ হইতে উহা কাড়িয়া লইল। দস্যুরা একটি কথাও বলিল না, শুধু তরবারি সঙ্কেতে তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিল।

কুলছুমের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিদারুণ নৈরাশ্যে তাহার ব্যথা-ভারাক্রান্ত অন্তর যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ! তবুও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বিদ্যুদরেখার ন্যায় ক্ষীণ আশার আলো এক-একবার তাহার মনোমধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল—'হয়তো সায়ফুন রায়হানের সন্ধান পাইয়াছে,তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে। এ পাপ-দেশ ছাড়িয়া কৃষ্ণ মহাদেশে উভয়ে সুখে ঘর-সংসার করিবে। আহা কত সুখের হইবে! আর কুলছুম? কুলছুম নিজে স্বামী-

সায়ফুন। কিন্তু তোমরা কোন বাধা দিলে না কেন?

হারিস। তা' কি আর দিই নি আম্মা, কিন্তু সংখ্যায় ছিলাম আমরা অল্প, এঁটে উঠতে পারলাম কই!

সায়ফুন বুঝিতে পারিল—আজরাইল সম্মুখে উপস্থিত, বাঁচিবার চেষ্টা করা বৃথা। পশ্চাতে চাহিয়া দেখে, শোকাকুল হারিস মাতার কবরের উপরে লুটাইয়া কত কাতরস্বরে যে আর্তনাদ করিতেছে! প্রাঙ্গণে বিপন্না নারীর চিৎকার-ধ্বনি হয়তো তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। সায়ফুনের কণ্ঠতালু তখন শুকাইয়া কাঠ, চিৎকার করিবার ক্ষমতাও আর নাই। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাকে এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। পরমুহূর্তেই অশ্বারোহীদ্বয় দুই পার্শ্ব হইতে তাহার অশ্ববল্গা আকর্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

চারিদিকে উষার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্ধকার আর নাই। পল্লীর ঘরে ঘরে কুক্কুট ডাকিয়া, গাছে গাছে পাখীরা কূজন-ধ্বনিতে বনভূমি মাতাইয়া, উষার আগমনী গাহিতে শুরু করিয়াছে

বাইশ

পাহাড়ের সেই গুহা হইতে সায়ফুন ও কুলছুমের আকস্মিক পলায়ন রাহেল কল্পনাও করিতে পারে নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সে কত সাহসী সৈনিককে পরাস্ত করিয়াছে, কত বীর্যবান শত্রুকে বক্ষদেশে বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরাইলের দুয়ারে পাঠাইয়া দিয়াছে; আর আজ কিনা তাহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইল সামান্য একটা স্ত্রীলোকের নিকটে! চতুরা নারী কি কৌশলে তাহারই তরবারি ছিনাইয়া লইয়া, তাহারই অশ্বে পলায়ন করিল! আর তাহাকে সাহায্য করিল কিনা তাহারই স্ত্রী কুলছুম! লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিতে লাগিল।

অস্ত্রহারা–অশ্বহারা রাহেল প্রকাশ্য রাস্তায় বেশীদূর পদব্রজে চলিতে ভরসা পাইল না। সেই পথে বেদুঈন–দস্যুদের বড় ভয়, আবার ডাহিনে বনি ইয়ারমু–পল্লী। এই সেদিন মাত্র বনি ইয়ারমুদের সঙ্গে তাহাদের এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছে। রাহেলেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাহেল সেই পরিবারের এক সুন্দরী যুবতীকে কাড়িয়া আনিয়াছিল। সেই পথে এখন আর একা যাইবার উপায় নাই। অগত্যা সে মনস্থ করিল–বাঁ দিকের পাহাড় পার হইয়া লা–ছমিনির খর্জুর বনের ভিতর দিয়া চুপি–চুপি আপন পল্লীতে ফিরিবে।

বহু পথ দ্রুত হাঁটিয়া রাহেল সেই প্রস্তর–সমাকুল পাহাড়ের পাদদেশে যখন উপনীত হইল তখন বেলা পড়ন্ত। ওপারে গিয়া পল্লীর পথ ধরিতে হইবে। গিরিরাজকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে সে উপরে উঠিতে লাগিল।

রাহেলের অন্তরে আজ কত কথা যে উদিত হইল তাহার অবধি নাই। আপন স্ত্রী এমনভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিবে, বিশ্বাসঘাতকতা করিবে–ইহা তাহার সহ্যের বাহিরে। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে তাহার মস্তক যেন উনপঞ্চাশ বায়ু জোরে প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছে।

রাহেল মনে মনে ভাবিল–'আমি সায়ফুনকে শাদী করিতে চাই, কুলছুমের ইহা অসহ্য! কেন, সে আপত্তি করিবার কে? আমার যত খুশি শাদী করিব,

যাহাকে যতবার খুশি তালাক দিব, ইচ্ছা হইলে আবার তাহাকে গ্রহণ করিব- ইহাতে সে কেন কথা বলিবে? স্ত্রীলোক পুরুষের দাসী-পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি, তাহার আবার এত দাপট। এত আস্পর্ধা! হুঁ, শাদী করিতে দিবে না! যদি গণ্ডা দুই-তিন বিবি আমাকে ঘিরিয়া প্রেম-নিবেদন না করিল, আমার সামান্য এক কণা ভালবাসার ভিখারিণী না হইল, তবে তো এই মনুষ্য-জন্মই বৃথা! স্ফুটিত-যৌবনা ক্রীতদাসীদের সঙ্গে এক-আধটুকু আমোদ-আহলাদ করি ইহাতেও কুলছুমের কত ঘৃণা-ব্যঙ্গ। অসহ্য! অসহ্য! কী আস্পর্ধা! সায়ফুনকে নিয়া পলাইয়াছে; কিন্তু পলাইয়া যাইবে কোথায়? বাড়ী ফিরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া আবার সদলবলে আসিব! সমস্ত পাহাড়-জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিব- খুঁজিয়া অবশ্যই বাহির করিব। সায়ফুনকে শাদী আমি করিবই। এই প্রস্ফুটিত কুসুম-সদৃশ যুবতী অন্যের অঙ্কশায়িনী হইবে ইহা আমার অসহ্য! যদি এখনও সে রাজী না হয় তবে নিজ হস্তে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। তাহার ছিন্ন শির ধূলায় লুটাইব। আর কুলছুম! স্বামীর এই বিরুদ্ধাচরণের প্রতিফল তোকে হাড়ে-হাড়ে ভুগিতে হইবে! মাথা মুড়াইয়া, গণ্ডদ্বয়ে তপ্ত লোহার সেঁকা দিয়া, ছেঁড়া ইযার, ছেঁড়া কোর্তা পরাইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিব। চিরজীবন জঘন্য দাসীবৃত্তি করিয়া খাইবে। এই সুর্যদেব সাক্ষী রহিল। সূর্যদেব তোমায় আমার নমস্কার।'

'হারামী রায়হান! বনে বাস করিয়া সিংহের সঙ্গে বিবাদ! রাহেলের সাথে টেক্‌কা মারা! এত বড় দুঃসাহস! পলাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিস খুব। নতুবা জনমের মত তোর নিকাহর সাধ মিটাইতাম। কিন্তু কী লাভে, কিসের লোভে তোর আজ এই দুর্মতি! তোর শক্তি ছিল, সাহস ছিল, বীরত্বের খ্যাতি ছিল, তবে কেন ইসলাম গ্রহণের এই দুর্বার আকাঙ্খা! কী আশ্চর্য! প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করিলাম, হত্যা করিতে তলোয়ার উঠাইলাম, তবু মুখে আল্লাহ্‌র নাম! না জানি, কি যাদু আছে ইসলামে!'

অকস্মাৎ রাহেলের চিন্তাস্রোতে বড় বাধা পড়িল। শুনিল-নিকটেই সুমধুর সুরে কে যেন কি পাঠ করিতেছে। সুরের রেশ বড় মধুর, বড়ই মর্মস্পর্শী। চারিদিকে তাকাইয়া সে দেখে-কোন জনপ্রাণী নাই, অথচ নির্জন পাহাড়ের কোন কন্দর হইতে যেন সেই সুমিষ্ট সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। সে কান পাতিয়া শুনিল, কে যেন পড়িতেছে—'স্ত্রীর উপর স্বামীর যতখানি অধিকার, স্বামীর উপর স্ত্রীরও ঠিক ততখানিই অধিকার।'

রাহেল আশ্চর্য হইয়া ভাবে—'বলে কি! স্ত্রীর অধিকার! সমান অধিকার! তবে কি কুলছুম আমাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারে? পাগল! পাগল! কিন্তু কে ওখানে? মানুষ? না দেও—দানব?'

আবার সেই সমধুর রব কানে আসিল। কে যেন পাঠ করিতেছে—'দুর্নীতি জলে—স্থলে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।'

বিস্ময়াবিষ্ট রাহেল ভাবিয়া আকুল—কে এই পাঠক! লোকালয় ছাড়িয়া নির্জন গিরিকন্দরে কেনই বা সে পাঠাভ্যাস করিতেছে। তাহার ঔৎসুক্য বাড়িয়া উঠিল—শত্রু হউক, মিত্র হউক, একবার তাহাকে না দেখিয়া সে যাইবে না।

রাহেল সেই সুর লক্ষ্য করিয়া এক পা দুই পা অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে এক গুহামুখে আসিয়া উপনীত হইল। দেখিয়া অবাক—গুহাভ্যন্তরে তাহাদেরই পল্লীর নও-মুসলমান আবু আক্কাস গভীর মনোনিবেশ সহকারে কি যেন পাঠ করিয়া বিবি আছিয়াকে শুনাইতেছে। পার্শ্বে গুহাতলে দুই তিনটি শিশুসন্তান নিদ্রায় বিভোর।

হঠাৎ সম্মুখে ব্যাঘ্র দেখিলেও মানুষ বুঝি ভয়ে এতটা আঁৎকে উঠে না। আবু আক্কাস কাঁপিতে কাঁপিতে তাড়াতাড়ি পাথরের আড়ালে কি যেন একটা লুকাইয়া ফেলিলেন। আছিয়া চিৎকার করিয়া ঘুমন্ত শিশুগুলিকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

বিস্ময়-বিমূঢ় রাহেল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে আবূ আক্কাস? গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছ এই বিজনে? তুমিই না রায়হানের যত সর্বনাশের মূল?"

আবূ আক্কাস থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন, "সর্বনাশ কি বল, রাহেল ভাই! এমন কথাই বা বলছো কেন? আমি তাকে সত্যের সন্ধান দিয়েছি মাত্র। তুমি কি আমাকে হত্যা করতে এসেছ?"

রাহেল কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "না, আমি বড় ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণায়ও প্রাণ বের হবার উপক্রম। পানি থাকে তো কিছু দাও। কি পড়ছিলে?"

আবূ আক্কাস ও আছিয়া কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন। আছিয়া উঠিয়া খাদ্য ও পানীয় আনিতে ভিতরে গেলেন। আবূ আক্কাস উত্তরে বলিলেন, "পাঠ করছিলাম আল্লাহ্‌র পাক কালাম—পবিত্র কুরআন। শুনবে রাহেল ভাই?"

রাহেল গম্ভীরভাবে গুহামুখে একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া হস্ততালুতে দুই চারিটা উপলখণ্ড তুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, উত্তরে কিছুই বলিল না। খানিক পরে আছিয়া পাথরের বাটিতে সামান্য কয় টুকরা খেজুর ও এক ঘটি পানি আনিয়া রাহেলের সম্মুখে হাযির করিল।

আহার করিতে করিতে রাহেল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সত্যি সত্যিই প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করলে আবূ আক্কাস?"

আবূ আক্কাস উত্তর করিলেন, "ধর্ম বলছো কাকে রাহেল ভাই? জড়-প্রকৃতি, শিলাখণ্ড ও মাটির ঢিবিকে পূজা করা, চন্দ্র-সূর্য ও পাহাড়-পর্বতের বন্দনা করাকে ধর্ম বলছো? স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করে বুক ফুলিয়ে প্রচার করা; পুত্র সন্তান লাভের আশায় আপন স্ত্রীকে ব্যভিচার করতে দেওয়া; কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে প্রোথিত করা-এই সবকে কি ধর্মকর্ম বলতে চাও? সমাধি-পার্শ্বে একটা তাজা উট বেঁধে রেখে, দিনের পর দিন অনাহারে তিলে তিলে তাকে শুকিয়ে মেরে তোমরা মনে কর-সমাধিস্থ ব্যক্তি হাশরের দিন তার পিঠে চড়ে বিচার-সভায় উপস্থিত হবে-এই না তোমাদের প্রাচীন ধর্ম? তোমরা ভাব, নিহত ব্যক্তির আত্মা পেচকের রূপ ধরে কবরের চারপাশে 'খুন চাই, খুন চাই' বলে চিৎকার করে ঘুরে। হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় নিলে, সেই পেচক-বেশধারী আত্মা পরিতৃপ্ত হবে ভেবে, তোমরা প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে দাও, নির্বিচারে নরহত্যায় মেতে উঠ। একে তোমরা ধর্ম বলতে চাও?"

রাহেল অধোবদনে বসিয়া রহিল নিরুত্তর। কথাগুলি মন্দ লাগিল না-কেমন যেন অন্তরস্পর্শী, রূঢ় বাস্তবতার আলেখ্য। জীবনে আর কখনও তো সে এমন কথা শুনে নাই! সে যেন এক নূতন আলোর সন্ধান পাইল। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল—সত্যই কি আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ এতই জঘন্য! আমরা কি কুসংস্কার আর অনাচারে এতটাই ডুবে রয়েছি!" আপন সমাজের পাশবিক লাম্পট্য ও ব্যভিচার-ছবি তাহার অন্তরে কেবলই কাঁটার ন্যায় খোঁচা দিতে লাগিল।

আবূ আক্কাস রাহেলের মৌন ভাব লক্ষ্য করিয়া উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কোন অপরাধে তোমরা রায়হানকে হত্যা করলে রাহেল ভাই? তোমাদের কি অনিষ্টটা সে করেছিল?" খোঁচা খাইয়া রাহেলের ধ্যান ভাঙিল। সকল কথা তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই, শুধু 'হত্যা' কথাটাই শুনিয়াছিল।

মাথা তুলিয়া সে বলিল, "এ্যা এ্যা! কি বলছো? তুমি কি আমাকে কতল করতে চাও নাকি?'

আবূ আক্‌কাস হাসিয়া বলিলেন, "রাহেল! মুসলমান ক্ষমা করতে জানে, খুনের বদলে খুন করা তার ধর্ম নয়। তুমি নিরস্ত্র,তাই না ভাবছো আমি তোমাকে কতল করতে পারি? হাতে অস্ত্র থাকলে এ-প্রশ্ন হয়তো করতে না! তখন তোমার হাত থেকে রেহাই পেতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু জেনে রেখ ভাই, দুর্বল অসহায়কে রক্ষা করা মুসলমানের ধর্ম; মহাশত্রুকেও ক্ষমা করা ইসলামের শিক্ষা। শুন নি দেশবাসী কত নির্মমভাবে যে আলা-হযরতকে নির্যাতন করেছে- অত অত্যাচারে তাঁকে অতিষ্ঠ করেছে; কিন্তু মহাপ্রাণ রসূল (সঃ) তাদের প্রতি কোনদিন একটি অভিশাপ-বাক্যও উচ্চারণ করেন নি। রাহেল ভাই, এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন তুমি নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারবে, রায়হানের হত্যার জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরগায় ক্ষমা ভিক্ষা করবে।"

রাহেল মাথা নাড়িয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, ভুল শুনেছ, ভুল বুঝেছ আবূ আক্‌কাস! রায়হানকে তো আমরা হত্যা করতে পারি নি! শুন নি সায়ফুন তাকে মুক্তি দিয়েছে?"

আবূ আক্‌কাস আনন্দে বিহবল হইয়া বলিলেন, "কী বললে? রায়হান বেঁচে আছে! বেঁচে আছে রাহেল ভাই?" তন্মুহূর্তে তিনি ভিতরে আছিয়ার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "শুনলে আছিয়া! দেখলে আল্লাহ্‌র মহিমা! বেঁচে আছে রায়হান! দুই হাত উঠাইয়া তিনি গদগদচিত্তে প্রার্থনা করিলেন, "ইয়া রাব্বেল আ'লামীন! ইয়া রাহমানুর রহীম। তোর অসীম রহমত! অসীম কুদরত! তুই গাফ্‌ফার! তুই সাত্তার!" তাঁহার কৃতজ্ঞতাভরা দুই নয়নে আনন্দাশ্রু টলমল। আছিয়ার অন্তরেও আনন্দ আর ধরে না।

আনন্দাতিশয্যে আবূ আক্‌কাস রাহেলকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "দেখলে রাহেল ভাই! দেখলে আল্লাহ্‌র কুদরত? আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন, মানুষ কি তাকে মারতে পারে? তুমি দেখনি নিঃসহায় হযরতের পবিত্র দেহে অস্ত্রাঘাত করতে কুরাইশগণ কতবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত যাঁর উপর

পূর্ণভাবে বিরাজমান, কে তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে? তুমি শুনবে রাহেল ভাই? শুনবে আল্লাহ্‌র পাক কালাম?"

রাহেল অধোবদনে নিরুত্তর। আবূ আক্‌কাস উৎসাহভরে লুক্কায়িত কুরআন লিপিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন "তোমাকে পাঠান হইয়াছে সেই জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্য, সাবধান করার জন্য, যাহাদের পূর্বপুরুষগণ কোন উপদেশ পায় নাই, শিক্ষা পায় নাই, সুতরাং ধর্ম কথায়ও কান দেয় নাই।"

রাহেল মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কে তিনি?"

আবূ আক্‌কাস উৎফুল্ল হইয়া উত্তর করিলেন, "তিনিই তো সেই রসূলুল্লাহ্‌-আবদুল্লাহ্‌-পুত্র মুহম্মদ (সঃ)। শুন নি, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, "হে প্রভো! তাদের দল থেকে একজন নবী পাঠাও, যিনি তোমার পবিত্র কালাম তাদের শুনাবেন, ঐশী-গ্রন্থের জ্ঞানভাণ্ডার তাদের নিকট উন্মুক্ত করে দেবেন; তাদের অন্তর পবিত্র করে তুলবেন।" করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলা "তাঁদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন।"

"ইনিই কি সেই নবী?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি। তিনিই তো 'রহমতুল্লিল আ'লামীন'- নিখিল বিশ্বের মূর্তিমান কল্যাণ! জগদ্বাসীর নিকট তিনিই তো এই শাশ্বত সত্য প্রচার করেছেন-আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) এই নবীর আবির্ভারেব কথাই তো ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

'আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই'—এই বাণী রাহেলের মর্ম স্পর্শ করিল, অন্তরের রুদ্ধ দ্বার এক আঘাতে ভাঙিয়া চুরিয়া খুলিয়া দিল। তাহার হৃদয়ে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব-কোলাহলে কী যেন এক অন্তর্বিপ্লব সূচিত হইয়াছে। আনমনে গুহা ত্যাগ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধীরে ধীরে সে নীচে নামিতে লাগিল।

আবূ আক্‌কাস রাহেলকে আল্লাহ্‌ পাকের পবিত্র বাণী শুনাইতে শুনাইতে সঙ্গে চলিলেন অনেকটা পথ; রসূলের কত কথা, কত উপদেশ, তাহাকে শুনাইলেন।

ইসলামের শিক্ষা, ইসলামের সৌন্দর্য তাহার হৃদয়পটে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টার কোন কসুর করিলেন না।

রাহেলকে ছাড়িয়া আবূ আক্কাস অপরাহ্নে আপন শৈলাবাসে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি ভাবিতেও পারেন নাই, সেই অবিশ্বাসীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরের প্রাচীর ভাঙিয়া সত্য ধর্মের আলোকসম্পাত শুরু হইয়া গিয়াছে।

* * *

চিন্তামগ্ন রাহেল ধীরে ধীরে যখন বাটীতে প্রবেশ করিল, আকাশের আলো তখন নিবু নিবু; কিন্তু সত্যের আলোকে তাহার হৃদয়-গগন তখন উদ্ভাসিত। গত জীবনের অসংখ্য অনাচার-ব্যভিচার-স্মৃতি তাহার হৃদয়ে অন্তর্দাহী অনুতাপানল জ্বালাইয়া দিয়াছে। আজ কেবলই মনে হইতে লাগিল— যে বিরাট পাপের পসরা অহরহ সে বহিয়া বেড়াইতেছে, তা' বুঝি তার অন্তরকে নিদারুণ নিষ্পেষণে মিস্‌মার করিয়া দিবে।

গৃহে ঢুকিয়া রাহেল সর্বপ্রথম প্রস্তর দেবতাগুলিকে বেদীর উপর হইতে টানিয়া নামাইল, তারপর একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! পার তুমি আমার অন্তরের জ্বালা দূর করতে? বলতে পার তুমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে? হে দেবতা হোবাল! পার তুমি আমার অন্তরের শান্তি ফিরিয়ে দিতে? দেব-গোষ্ঠী লাৎ, মানাৎ, উজ্‌জা! হে দেবী কমর! দেবতা শাম্‌স! পার তোমরা আমাকে রক্ষা করতে? কী! কিছুই বলছো না যে? বুঝেছি তোমাদের ক্ষমতা— কিছুই পার না! আচ্ছা, পারবে তোমরা নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে?"

দেবতারা নিরুত্তর। রাহেল হোবালের মূর্তিটি বাম হস্তে তুলিয়া গৃহতলে আছড়াইতে আছড়াইতে বলিল, "যাও দেবতা জাহান্নামে যাও!" তারপর একে একে সব-কয়টি প্রস্তর-মূর্তিই আছড়াইয়া ভাঙিয়া দূরে ফেলিয়া আসিল। এইবার রাহেল গৃহের মদ্যভাণ্ড ও পানপাত্রগুলি একে একে ভাঙিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল ঘরের বাহিরে একটা খর্জুর বৃক্ষের গোড়ায়।

বাঁদীরা লুকাইয়া লুকাইয়া ব্যাপারটা দেখিয়া ভয়ে কম্পমান। রাহেলের ভার্যাগণও আপন আপন গৃহের দ্বারদেশ হইতে উঁকি মারিয়া স্বামীকে এক-একবার দেখিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে একেবারে কাঠ। ব্যাপারটা কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। কেহ নিকটে আসিতেও সাহস পাইল না; তাহারা শুধু দরজায় দাঁড়াইয়া একে অপরের দিকে চক্ষু ঠারিয়া, ঠোঁট উল্টাইয়া ইশারায় বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। অঙ্গুলি দ্বারা আপন আপন মস্তক নির্দেশ করিয়া একে অপরকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল-স্বামীর সদর দফতরে কিছুটা গোলযোগ বাঁধিয়াছে।

বাঁদী ছহিমন, বাঁদী ঈরা বড় বিবি রোকেয়ার ঘরে চুপি চুপি আসিয়া ফিসৃফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বিবিজান কী হয়েছে?" মধ্যমা বিবি হাযেরা ভাবিয়া পাইল না—অসময়ে সপত্নী-গৃহে কিসের এত ভিড়! তাহারও যাইবার ইচ্ছা হইল সেখানে। কিন্তু সন্ধ্যা হয় হয়, কোলের শিশুটিও নিদ্রিত, কি করা যায়! আগ্রহ দমন করা যে বড় কঠিন ব্যাপার। অগত্যা সে ঘুমন্ত শিশুপুত্র কায়েসকে কোলে তুলিয়া ওড়নাঞ্চলে তাহার সর্বাঙ্গ ঢাকিল, তারপর ধীরে ধীরে নিঃসাড়ে ঘরের পশ্চাদ্দিক বাহিয়া রোকেয়ার গৃহে গিয়া উপস্থিত। উদ্বেগের সুরে অনুচ্চকণ্ঠে সে রোকেয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি গো আপা! কী হয়েছে?"

রোকেয়া অতি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "লক্ষণ ভাল দেখি না হাযেরা! কুলছুমকে হারিয়ে বোধ হয় দেওয়ানা হয়েছে!"

হাযেরা বিরক্তিভরে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "হুঁ! কুলছুমের জন্য তার আর ঘুম হয় না! ভুলে গেছ, সায়ফুনকে দেখে মজেছিল?"

"ঠিক বলেছ! সায়ফুনের মৃত্যুই তাকে পাগল করেছে! এশ্‌ক্! এশ্‌ক্!!

"হুঁ! এশ্‌ক্ না ছাই! হয়তো বা আর কাউকে দেখে মজেছে। দেখনি, ও-বাড়ীর শামসির পিছনে পিছনে কতদিন ঘুরেছে! কিন্তু একেবারে যে দেওয়ানা! পাগল না মাতাল! ঢং করে না তো?"

"ঢং-ঢাং তো বুঝি না, মাতলামিও দেখি না! বদ্ধ পাগল যেন। পাগল না হলে কেউ কখনো দেবতার গায়ে হাত তুলতে পারে?"

হাযেরার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ভাব, ভয়ে চক্ষু স্থির। ব্যস্তভাবে সে সপত্নীর হাত ধরিয়া বলিল, "কি হবে আপা! যদি মেরে ফেলে আমাদের? আমার এই

মাসুম বাচ্চা-!” হাযেরার কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ শব্দও যেন আর বাহির হয় না,দুই চোখ ছলছল।

রোকেয়া নিজের হাত দুইটি একত্রে দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিল, “চল আগে হাত-পাগুলি বেধে ফেলি।” তার বাঁদীদের বলিল, “যা ছহিমন, কয়েকটা শক্ত দড়ি কুড়িয়ে আন! যা তো ঈরা! সবে মিলে বেঁধে ফেল গিয়ে মিঞা সাহেবকে!”

এমন সময় রাহেল ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে অবাক হইয়া দেখে-গৃহকর্তা বড় চুপচাপ, শুধু একটা স্তব্ধ-গম্ভীর গুমট ভাব ছাড়া উন্মাদের লক্ষণ আর কিছুমাত্র নাই।

রাহেল বেশ শান্তভাবেই বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া পাঠাইল। তৎক্ষণাৎ সভা ভাঙিয়া কে কার আগে রাহেলের ঘরে ছুটিয়া যাইবে, এই নিয়া শুরু হইল যেন প্রতিযোগিতা। কেহ স্বামীর হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য পানি আনিতে ছুটিল, কেহ হাতপাখা লাইয়া বাতাস করিতে লাগিল। দাসদাসীদের কেহ শরাব আনিতে মদ্যশালায় ছুটে; কেহ যায় রান্নাঘরে মনিবের আহার্যের যোগাড়ে। রোকেয়া স্বামীর বিছানা পরিপাটি করিতে ব্যস্ত।

রাহেল লক্ষ্য করিল-তাহার ভার্যাদের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে, কাহারও মুখে কথা নেই। আজ নিজেকে সে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, কাহাকেও কিছু বলিতে পারিল না। বুঝিতে পারিল, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ইহা নহে; ইহারা কিছু-না-কিছু হাতে লইয়া যে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহা মোটেই ভালবাসায় নহে-ভয়ে। নিশিদিন পশুর অধম ব্যবহারে তাহাদের অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলি সে নষ্ট করিয়া দিয়াছে,তাই স্বামীর প্রতি ভয় ও ঘৃণায় তাহাদের অন্তর ভরপুর। মনে পড়ে এই সেদিন বিবি হাযেরাকে নিষ্ঠুর বর্বরের ন্যায় প্রহার করিয়া বাটী হইতে সে তাড়াইয়া দিয়াছিল; আর একজন তো প্রাণভয়ে সায়ফুনের সঙ্গেই পালাইয়া বাঁচে। সায়ফুন রায়হানকে ভালবাসে, রায়হানও তাকে মনেপ্রাণে চাহে-ইহা জানিয়া শুনিয়াও সায়ফুনকে সে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। যখন দেখিল, সে আশা সফল হইবার নহে, তখন তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছিল। ধিক্ তাহাকে!

লজ্জায় অনুতাপে রাহেল আজ ভার্যাদের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইতেই পারিল না। তখনই দ্বার রুদ্ধ করিয়া নীরবে সে শয্যাগ্রহণ করিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল যেন শত বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণায় অভিভূত। সীমাহীন অনুশোচনার বহ্নিশিখায় তাহার পঙ্গু দেহ-মন বুঝি বা ভস্মীভূত।

প্রভাতে উঠিয়াই রাহেল সর্বাগ্রে দাসদাসীদের মুক্তি দেয়, ভার্যাদের তাহার নিষ্ঠুর আচরণ ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করে; ভাবাবেগে অধিক আর কিছুই তাহাদের বলিতে পারিল না। তারপর ডানহস্তে এক যষ্ঠি, অপর হস্তে সামান্য আহার্য ও দুই একখানি বস্ত্রের একটা ছোট পুঁটুলি লাঠির অগ্রভাগে ঝুলাইয়া বাটী হইতে সে ধীর পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তেইশ

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাহেল ভগ্নী যোহরা ও তাহার স্বামী ওৎবার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার মনস্থ করিল। ভাবিল, হয়তো ওৎবা সায়ফুনের অনুসন্ধান করিয়া থাকিবে; কুলছুমের খবরও সে জানিতে পারে; কেননা, দুইজন একই সঙ্গে যে পলায়ন করিয়াছিল। তাহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল—দুইজনকেই গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে,তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কতকটা হয়তো হইতেও পারে।

প্রথমে রাহেল ওৎবার সন্ধানেই যাত্রা করিল। পথিমধ্যে সে দেখে, কয়েকজন পল্লীযুবক একটি হৃষ্টপুষ্ট গাভীর পুচ্ছে লাপাতা জড়াইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। অগ্নিভয়ে ভীতা গাভীটি পাহাড়ের দিকে দ্রুত ধাবমান; পশ্চাতে একপাল দুষ্ট যুবক ও বালক-বালিকা আনন্দে হাত তালি দিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়াছে। রাহেলের মনে পড়িল—তথাকথিত বৃষ্টি-দেবতাকে আমন্ত্রণ জানাইতে, এই অপকর্ম সে নিজেও যে কয়েকবার করে নাই, এমন নহে। আজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসীদের কবলে পতিত গাভীটির দুরবস্থা দেখিয়া তাহার অন্তর বড় ব্যথিত হইল। অনুতপ্ত হৃদয়ে যুবকদের প্রতি শুধু ঘৃণাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত করিয়া আবার সে বিষণ্নবদনে পথ চলিতে শুরু করিল।

শোহেলীর বহির্বাটীর নিকটে আসিয়া রাহেল দেখিতে পাইল, ওৎবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারমুজ ধনুকে একটা লাল রঙের তীর যোজনা করিয়া উন্মুক্ত মাঠে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত, নিকটে একটা কাল আর একটা শ্বেত বর্ণের তীরও ভূতলে পতিত। রাহেল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাই হারমুজ! ফাঁকা মাঠে তীর ছুড়ছো যে? লক্ষ্যবস্তু তো দেখছি না কিছুই!"

হারমুজ ধনুর্বাণ নীচে নামাইয়া খুব গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভাগ্য পরীক্ষা করছি।" তাহার দুই চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ, চেহারা রুক্ষ।

রাহেল বুঝিল, যুবক সুরার দৌলতে কাণ্ডজ্ঞানহীন, চোখে-মুখে হিংস্র ভাব পরিস্ফুট। হারমুজের হাত ধরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্য ভাগ্য পরীক্ষা করছো হারমুজ?"

হারমুজ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "খুন করবো-খুন! কিন্তু হত্যা করার আগে তিনটি তীরই পর পর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করবো। যেটি সবচেয়ে দূরে পড়ে তারই নির্দেশ মত কাজ হবে। দেখছো না লাল তীরটি হত্যার ইঙ্গিত, কালোটি নিষেধাজ্ঞাসূচক? কিন্তু তৃতীয়টি আগে বাড়লে আবার নতুন করে ভাগ্য পরীক্ষা করতে হবে। কেন, তুমি কি স ব ভুলে গেলে নাকি?"

রাহেল কিছুই ভুলে নাই। কুসংস্কার-ঘেরা পরিবেষ্টনে এতদিন যাহা দেখিয়াছে, যাহা শিখিয়াছে, এত সহজে কি তাহা ভোলা যায়! নানা উপায়ে সেও তো সর্বদা ভাগ্য পরীক্ষা করিয়াই কাজ করিয়াছে। এই ত সেইদিন সায়ফুনের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব উথাপন করিবার পূর্বে দুইটি ফুল পর পর পানিতে ভাসাইয়া সে অদৃষ্ট যাচাই করিয়াছিল। ফুল দুইটি ভাসিতে ভাসিতে যখন এক সঙ্গে মিশিয়াছিল, তখন তাহার আনন্দ দেখে কে! কিন্তু কোথায় আজ সায়ফুন আর কোথায় রাহেল! পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুন করবে হারমুজ?"

হারমুজ গম্ভীরভাবে বলিল, "বড় ভাই ওৎবাকে।

রাহেল আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওৎবাকে! কেন সে কি করেছে?"

হারমুজ উত্তর করিল, "কিছুই জান না বুঝি? থাক কোথায় তুমি? আরে সে যে মুসলমান হয়েছে! আমাদের ধর্মের অপমান করেছে, ঘরের সবকয়টি দেবতার মূর্তি আছড়িয়ে ভেঙ্গে দূরে ফেলে দিয়েছে।"

"কী বললে? ওৎবা মুসলমান হয়েছে? ওৎবা মুসলমান!"—রাহেলের বিস্ময়ের আর অবধি নাই। আনন্দে তাহার বুকখানা ভরিয়া উঠিয়াছে। দুই হাতে হারজুমকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল, "ভাই হারমুজ! আজ তোমার পরীক্ষা বন্ধ রাখ। অনর্থক তার প্রাণনাশ করে কি লাভ হবে বল? আমি বরং তাকে বুঝিয়ে-সমঝিয়ে দেখি। আমার কথা মানতেও তো পারে। চল না, একবার তাকে দেখে আসি।"

হারমুজ নড়িতে চাহিল না। কিন্তু রাহেল আনন্দাতিশয্যে তাহার হাত ধরিয়া প্রায় টানিয়াই লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে হারমুজ বলিল, "কিন্তু কি দেখবে রাহেল ভাই? সে তো আজ উঠতেই পারে না। গতরাত্রে পাড়ার সবাই মিলে কি না ঠেঙিয়েছে। তবুও তো তার লজ্জা হয়নি। প্রভাতে উঠে আবার সেই একই কথা। তাই তো দেবতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে তীর-ধনুক নিয়ে ছুটে এসেছি! আবার শুনেছি, তার বিবিরাও নাকি প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করবে মনস্থ করেছে। আস্পর্ধা দেখনা!"

রাহেল জিজ্ঞাসা কিরল, "যোহরাও কি ইসলাম গ্রহণ করেছে?"

হারমুজ উত্তর করিল, "হাঁ, হাঁ, সব কয়টিকে একই ব্যারামে ধরেছে, একই ভূতে পেয়েছে। আমিও ভূত ছাড়াতে জানি।"

রাহেলের নিকটে ওৎবার কাহিনী বড় অপূর্ব শোনাইল। নও-মুসলমানদের ভাগ্যে যে এইরূপ দুর্দশা ঘটিবে তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। কথায় কথায় ধর্মান্তরের কাহিনীটা পুরোপুরি শুনিয়া রাহেল হারমুজের সঙ্গে শোহেলীর বাটীতে প্রবেশ করিল।

প্রাঙ্গণে পা দিতেই রাহেলের নজরে পড়ে—ওৎবার মাতা উঠানে এক মাটির টিবি তৈয়ার করিয়া তাহার উপরে একটি উষ্ট্র দোহন করিতেছে। রাহেলকে দেখিয়াই বৃদ্ধা ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা রাহেল! শুনেছ বাপ?-সায়ফুনকে তো পাওয়া গেল না। বোধ হয় বেদুঈন দস্যুরা তাকে মেরেই ফেলেছে। আহা! অদৃষ্টে আমার এত দুঃখও ছিল! এদিকে আবার বড় ছেলে ওৎবাও বুঝি পাগল হয়ে গেল। সব কয়টি দেবতাকে ভেঙ্গে সে টুকরো টুকরো করেছে; তাইতেই না এই মাটির টিবিতে উপাসনার ব্যবস্থা। দেবতার অভিশাপে কিছুই থাকবে না বাবা, সব নির্বংশ হবে। তুমি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলবে বাপ? আহা, বেচারাকে কাল রাত্রে কি মারটাই না মেরেছে! বাছা আমার উঠতেই পারে না! সেই অলিদের বেটা আবূ তালহা-চেন না তাকে? বড় জোর মেরেছে বাবা! দুঃখের কথা কি আর বলব! মেয়েটাকে তো বলতে গেলে তোমরাই খুন করেছ। আমার কলিজা ফেটে খান্ খান্, মরণ কেন যে আসে না! দেখ বাবা, ছেলেটাকে যদি বাঁচাতে পার।" বৃদ্ধা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, পাগলিনীর ন্যায় বিলাপ করিয়া অঝোরে শুধু কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় সর্দার শোহেলী কোথা হইতে সেখানে ত্রস্তপদে আসিয়া বকিতে বকিতে একেবারে ভূমিতলেই বসিয়া পড়িলেন হতাশায়। রাহেলকে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "কে বাবা, রাহেল নাকি? না বাপু, চারদিকে যত সব কুলক্ষণ। পথে আসতে আসতে ঠিক মাথার উপর দিয়ে একটা অলক্ষুণে পাখী উড়ে গেল ডান দিক থেকে বামে। কী তার বিকট চিৎকার। মনে হলো আমার পাঁজরার ভিতর কে যেন একটা বল্লমের খোঁচা এপার-ওপার বসিয়ে গেল। এখনও বুকের ভিতরটা ঠক ঠক করে কাঁপছে। নিমকহারাম ওৎবাই আমার সর্বনাশ করেছে।। দেবতার অভিশাপে একেবারে যে সবংশে ধ্বংস হতে হবে। পাহাড়ের ধারে যখন উট চরাতে যাব, তখন তার ভিতর থেকে শত শত দেও-দানব, ভূত-পেরেত ছুটে ঘাড় ভাঙবে না? আহ্! পূর্বপুরুষদের দেবতা সব—কত আদরের ধন। সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে আমাদের দূরে রাখতেন সব সময়। রোগে, শোকে, দুর্ভিক্ষে, কে এখন বাঁচাবে বল? হারামজাদাকে আস্ত রাখবো ভেবেছ!" এই বলিয়া শোহেলী একটা কাঠের মুদ্গর লইয়া ওৎবার ঘরের দিকে ছুটিলেন।

রাহেল ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া বলিল, "অত বিচলিত হবেন না, মিছেমিছি ভয় পাবেন না। থামুন, আমিই সব ব্যবস্থা দেখছি!"

শোহেলী ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! মেয়েটাকে দস্যুরা সাবাড় করেছে শুনে ভাবলাম—আপদ গেছে, কিন্তু ঘরে যে আর একটা অকাল-কুষ্মাণ্ড গজিয়ে উঠেছে, তা' কে জানতো! অদৃষ্টে এত লাঞ্ছনাও ছিল। বল, সমাজে মুখ দেখাব কি করে? তোমরা দশজনে গঞ্জনা দেবে না? ঐ হারামী মাগীই শয়তানটাকে পেটে ধরেছিল। খুন করব তাকেও।" এই বলিয়া শোহেলী স্ত্রীর প্রতি কটমট করিয়া চাহিলেন।

রাহেল নানা মিষ্টবাক্যে বৃদ্ধ সর্দারকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ওৎবা এখন বড় অসুস্থ, মন-মেজাজ ঠিক নেই তার; কিছুদিন তাকে আমার সঙ্গে থাকার অনুমতি দিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "হাঁ বাবা, এই কুপুত্রকে নিয়ে যাও আমার সমুখ থেকে। দেখ, যদি শোধরাতে পার। প্রভাতে উঠে হারামীর মুখ দেখলে অমঙ্গল একটা নিশ্চয়ই ঘটবে।"

রাহেল আবার বলিল, "কিন্তু যাবে কি করে? সে ত নাকি উঠতেই পারে না। একটা উট পেলে নিয়ে যেতাম পিঠে চড়িয়ে। আপনার অনুমতি পেলে তার স্ত্রী-পুত্রদেরও নিয়ে যাই বাইরে আমাদের সঙ্গে।"

শোহেলী খুশী হইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ-হাঁ, নিয়ে যাও বাবা! বউ দু'টাকেও নিতে পার সঙ্গে। দূর কর সব আমার বাড়ী থেকে।"

তৎক্ষণাৎ সর্দার পুত্রকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "হারমুজ! একটা উটের পিঠে সুগদুফ পেতে ঐ ঘরের পিছনে নিয়ে যা। হারামজাদার মুখ যেন আর দেখতে না হয় আমাকে।"

হারমুজ চলিয়া গেল উটের সন্ধানে। রাহেল তখন হৃষ্টচিত্তে ওৎবার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। শোহেলীও আরক্ত নয়নে আপন গৃহে ঢুকিয়া বাঁদীকে শরাব আনিতে আদেশ দিলেন।

চলৎশক্তিহীন ওৎবা শয্যায় শুইয়া বাহিরে পিতা ও রাহেলের কথোপকথন শুনিতেছিল। রাহেল তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতে চায়, কিছুই সে বুঝিল না; তবুও পিত্রালয় হইতে বিদায় লইতে পারিলে সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। এখানে থাকিলে ত মরণ সুনিশ্চিত।

রাহেল ওৎবার দুরবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। ওৎবার চোখে-মুখে কিন্তু আশার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই বন্ধু কতক্ষণ একে অন্যের গললগ্ন হইয়া নীরব অশ্রুপাত করিল। তারপর রাহেল ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যিই কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?"

ওৎবা উত্তর করিল, "হাঁ ভাই। যা' সত্য তা' মেনে নিয়েছি। আল্লাহ পাক আমার চোখের পর্দা খুলে দিয়েছেন, আমার বিবিরাও সত্য ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও রাহেল ভাই? আমার বন্ধুরা কিন্তু আমাকে আদর করতে বাকী রাখে নি কিছুই। এই দেখ না—পিঠের উপরে যে সব কাল দাগ দেখছো তা' আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু তালহার দান বেত্রাঘাতের চিহ্ন।"

রাহেল মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার বন্ধুরা ভেবেছিল-বিপথগামী হয়েছ, শোধরাবার দরকার। বন্ধুর কাজই ত করেছে।"

ওৎবা সভয়ে রাহেলের প্রতি তাকাইয়া বলিল, "এ্যা! ওসব কি বলছো রাহেল? আমি যে আলোর সন্ধান পেয়েছি? তুমি কি আবার আমাকে অন্ধকারে ফিরিয়ে নিতে চাও?"

রাহেল ওৎবার অন্তরের ব্যথাটি বুঝিতে পারিয়া তাহার কানে কানে বলিল, "ভয় নেই ওৎবা, তোমাকে আলোর রাজ্য থেকে ছিনিয়ে নেব না। তোমার ধন-দৌলত যা কিছু আছে সঙ্গে নাও। এদেশ ছেড়ে চলে যাব বহু দূর। তোমার স্ত্রী-পুত্রদেরও নিয়ে চল সঙ্গে। যোহরা! তোমরাও প্রস্তুত হও! ভাই ওৎবা! আর বিলম্ব করা মোটেই কিন্তু নিরাপদ নয়—ভয়ের সমূহ আশঙ্কা! নির্ভয়ে চল, পরে বলবো সব ব্যাপার! ভাল কথা, সায়ফুন ও কুলছুমের কোন স ন্ধান কি পেয়েছ?"

ওৎবা সাশ্রুনয়নে উত্তর করিল, "না ভাই! সন্ধান আর পেলাম কই! হতভাগিনী সায়ফুন বেদুঈনদের হাতেই হয়তো প্রাণ হারিয়েছে। তোমার কুলছুমেরও কোন সন্ধান নেই রাহেল! সায়ফুন ও রায়হানের অপূর্ব ধর্ম বিশ্বাসই আমার চোখের পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছে, হৃদয়-কপাট খুলে দিয়েছে। কি ঈমানের জোর! বলতে পার ভাই, কতটুকু মনের বল, কতটুকু ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী হলে মানুষ মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে পারে? তাদের উপর কি অত্যাচারই না করেছি, ভাবলে গা শিউরে উঠে! সবকিছু সহ্য করে এরাই আমাকে দিয়ে গেল যে এক নতুন আলোর সন্ধান।"

এমন সময় হারমুজ গৃহের পশ্চাদ্দেশ হইত ডাকিল, "রাহেল ভাই! উট এনেছি! আমার বিদ্রোহী ভাইকে জানিয়ে দাও-যে দেবতার মূর্তিগুলি সে ভেঙ্গে ফেলেছে, সেগুলো আবার ভালভাবে গড়ে ভক্তিভরে নিজের মাথায় করে যেন বয়ে আনে; নতুবা এই দুয়ার চিরতরে বন্ধ। শুধু তাই নয়, জীবনটাকেও খোয়াতে হবে যে কোন মুহূর্তে। বলে দাও শাসিয়ে।"

রাহেল একে একে উটের পিঠে ওৎবার স্ত্রী-পুত্রদের তুলিয়া পরে হারমুজের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া ওৎবাকে সেখানে উঠাইল। সর্বাঙ্গে প্রহারজনিত বেদনায় সে সোজা হইয়া বসিতেই পারে না, বিবি যোহরার ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কাত হইয়া শুইল। রাহেল কোথায় তাহাদিগকে লইয়া যাইতে চায়, ওৎবা ও তাহার স্ত্রী-পুত্রগণ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

যাত্রার পূর্বে রাহেল এক মুহূর্ত কি ভাবিল। তারপর অগ্নিবৎ রৌদ্রতাপ হইতে আরোহীদের বাঁচাইবার জন্য একখণ্ড মোটা বস্ত্রে সুগদুফের উপরে শামিয়ানা প্রস্তুত করিয়া উষ্ট্রকে সোজা পূর্বদিকে চালাইতে লাগিল।

এদিকে শোহেলী-পত্নী ছাহেরা পুত্র ওৎবা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া বড় অীস্থর হইয়া উঠিল। স্বামীর অগোচরে সে চুপি চুপি গৃহের আনাচ-কানাচ বাহিয়া বহির্বাটিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখে-সত্যিই ওৎবা পিত্রালয় ত্যাগ করিতেছে। বৃদ্ধা সায়ফুনকে হারাইয়া শোকে অধীরা, এইবার পুত্র ওৎবাও চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কিছুতেই সে স্থির থাকিতে পারিল না। কিন্তু উষ্ট্রপৃষ্ঠে শায়িত ওৎবাকে সে দেখিতে পাইল না। শুধু নযরে পড়িল-দুই শিশুপুত্রসহ তাহার পুত্রবধূ জুবায়দা ও যোহরা একদৃষ্টে কাতর নয়নে তাহারই দিকে যেন তাকাইয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধার মর্মস্থল ভাঙ্গিয়া চুরমার। মাথার উপর দজ্জাল স্বামীর ক্রোধানল সত্ত্বেও শত চেষ্টা করিয়াও সে হৃদয়াবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। হতভাগিনী চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওৎবা! তুইও চল্‌লি বাপ? চলে গেলি বৃদ্ধা মাকে ফেলে? ফিরে আয় ধন! ফিরে আয়!" ছাহেরা পাগলিনীর ন্যায় বসন-ভূষণ ফেলিয়া বিলাপ করিতে করিতে পুত্রের পশ্চাতে ছুটিল।

বাঁদী ছফুরা তাহাকে বাধা দিয়া উদ্বেগের সুরে বলিল, "বিবি! একি করছেন? হুযুর শুনতে পেলে কি আর রক্ষে থাকবে? ঘরে চলুন।" কিন্তু শোকাকুলা বৃদ্ধার অন্তর আজ বারণ মানে না। দিশাহারা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাঁদীর হাত ছাড়াইয়া ছুটিল।

ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেই ওৎবা আর্ত কষ্টে মাথা তুলিয়া অভাগিনী জননীর প্রতি কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। অশ্রুধারায় তাহারও দুই নয়ন ঝাপ্‌সা। কি বলিয়া মাতাকে যে প্রবোধ দিবে, সে ভাবিয়া পায় না।

রাহেলের এই দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ কই; অনতিবিলম্বে তাহাকে এই গ্রাম ত্যাগ করিতেই হইবে নতুবা বিপদের সমূহ আশঙ্কা। উষ্ট্রকে যথাসাধ্য দ্রুত চালাইয়া ছাহেরার দৃষ্টির আড়ালে সে অদৃশ্য হইল। বৃদ্ধার শোকাবেগ তখন উথলিয়া উঠিয়াছে শত গুণ।

এদিকে স্ত্রীর বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় শোহেলী বাটীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। নিষ্ঠুর সর্দার ছাহেরার কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করিয়া নিকটস্থ

একখণ্ড কাষ্ঠ তুলিয়া প্রহার করিতে করিতে বলিলেন, "হারামজাদী! কুপুত্রের জন্য কেন এত মায়া? কেন এমন কুলাঙ্গারকে গর্ভে ধারণ করেছিলি? আমার কুলদেবতাকে যে অপমান করেছে, তার প্রতি কেন এত দরদ? এই মুহূর্তে তুইও আমার বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে যা।"

পল্লীর নরনারী সকলে আপন আপন গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ওৎবার বিদায়দৃশ্য দেখিতেছিল। এইবার ধর্ষিতা বৃদ্ধার চিৎকার শুনিয়া সকলে অকুস্থলে ছুটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সর্দারের ভয়ে কেহই নিকটে আসিতে সাহস পায় না, অদূরে ভিড় করিয়া শুধু অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল।

বৃদ্ধা ছাহেরা স্বামীর পদতলে লুটাইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে বলিল, "ওগো, এত নিষ্ঠুর হয়ো না, এত কঠোর হয়ো না। কন্যাকে হারিয়েছি, পুত্রকেও আবার তাড়িয়ে দিও না।" অবিরাম বৃষ্টিধারার ন্যায় অশ্রুবন্যা তাহার গণ্ডদ্বয় ভাসাইয়া গড়াইতে লাগিল।

ক্রোধান্ধ শোহেলী একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞানহারা। স্ত্রীকে পদাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রহার করিতে করিতে তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন, "হারামজাদী! যে নিমকহারাম আমার মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে দিয়েছে, আমার মান-সম্মান সব নষ্ট করেছে, গৃহ-দেবতার অপমান করেছে, তার জন্য কেন এত দরদ? কেন তুই ধর্মদ্রোহী শয়তানকে আমার ঘরে আশ্রয় দিতে চাস্? তুইও কি তবে ধর্মত্যাগের মতলব করেছিস? না, তোকেও আমি ঘরছাড়া করে ছাড়বো। শত্রুর শেষ আমি রাখবো না। এখনই তোকে বিক্রি করে ফেলবো।" এই বলিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় শোহেলী রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে সজোরে টানিতে টানিতে বাড়ীর অদূরে পথের ধারে লইয়া আসিলেন—পশ্চাতে কৌতূহলী স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকার দল।

সত্য সত্যই পাষণ্ড শোহেলী তাঁহার স্ত্রীকে কেহ খরিদ করিতে চাহে কিনা চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে সর্দার হাঁকিতে লাগিলেন, "কে একে খরিদ করবে এস! সস্তায় বিক্রি করবো, খুব সস্তায়। কে নেবে এস।"

সর্দারের মুখে এই অলক্ষুণে কথা শুনিয়া পল্লীবাসিনী সকলে চমকিয়া উঠিল। ছাহেরার দুঃখে তাহাদের অন্তর নিদারুণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু প্রতিবাদের

উপায় নাই, প্রতিকারের পথও নাই। নীরবে ভূলুণ্ঠিতা ছাহেরার প্রতি তাকাইয়া তাহারা ওড়নার প্রান্তদেশে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় কোথা হইতে এক বিদেশী সওদাগর উষ্ট্রপৃষ্ঠে কিছু পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া সেই পথেই যাইতেছিল। হল্লা শুনিয়া সে ঘটনাস্থলে তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত।

বণিকের ক্রীতদাসীর কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি বড় সুবিধায় পাওয়া যাইবে শুনিয়া সে লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। জগতে অর্থই যাদের একমাত্র কাম্য, সেই সব অর্থগৃধ্নুদের হৃদয়ে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতার স্থান কোথায়? পরের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিবারই বা অবকাশ কোথায়? স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে-কোন অনর্থই তাহারা ঘটাইতে পারে। বৃদ্ধার অদৃষ্টই মন্দ, এই সময় কোথা হইতে ঘটিল এই অর্থপিশাচ বণিকের আবির্ভাব। সওদাগর অল্পমূল্যে ছাহেরাকে ক্রয় করিয়া লইল। বৃদ্ধার ক্রন্দনে প্রস্তরও বুঝি গলিয়া যায়, কিন্তু তাহা পাষাণ-হৃদয় শোহেলী বা অর্থগৃধ্নু বণিকের অন্তর স্পর্শও করিল না।

সওদাগর আপন উষ্ণীষ-বস্ত্রে ছাহেরার হস্তপদ উত্তমরূপে বাঁধিয়া তাহাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে গাদাগাদি বোঝাই করা পণ্যদ্রব্যের ভিতরে ঠেলিয়া তুলিল। খুব তাড়াতাড়িই কাজটা সে সারিয়া ফেলিল; কেননা ভয় ছিল, সর্দার হয়তো অনুতপ্ত হইয়া মতটা ঘুরাইয়াও ফেলিতে পারে। তবে ত, তাহার এত বড় একটা লাভের সওদা ফাঁসিয়াই যাইবে।

অভাগিনী ছাহেরার হৃদয়-ফাটা আর্তনাদে প্রতিবেশিনীরা বড় ব্যথিতা হইল, কিন্তু সর্দারের কথার উপরে কাহারও কিছু বলিবার উপায় নাই মুহূর্তমধ্যে যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কেহ তাহা কল্পনাও করে নাই। সকলে অদূরে দাঁড়াইয়া চোখের পানি বারবার মুছিতে লাগিল।

বণিক কালবিলম্ব না করিয়া উষ্ট্র হাঁকাইতে লাগিল। ক্রন্দনরতা ছাহেরার অশ্রু-সজল চোখের কাতর চাহনি আবাল্য-বান্ধবী প্রতিবেশিনীদের দিকে, হৃদয়হীন ক্রোধান্ধ স্বামীর দিকে, বহুদিনের বসতবাটী ও কত স্নেহ মমতায় ঘেরা, পুরুষানুক্রমে আশ্রয়দাত্রী গ্রামখানির দিকে নিবদ্ধ।

শোহেলী গৃহে ফিরিয়া আকণ্ঠ মদ্যপান করিলেন, তারপর পুষ্পনির্যাসে গোঁফজোড়া চর্চিত করিয়া তাহার অগ্রভাগ দুই হাতে পাকাইয়া উপরে তুলিয়া পাড়ার ভ্রষ্টা বিধবা ছামিনার দ্বারস্থ হইতে পা বাড়াইলেন। ছামিনা সর্দারের রক্ষিতা–বহুদিনের অনুগৃহীতা; বয়সে প্রৌঢ়া বটে, কিন্তু এখনও সে রঙ্গরসে, চটুল হাস্যে, রূপের গরবে সর্দারের অন্তরে রঙীন নেশা জাগাইয়া রাখিয়াছে।

যাহারা পাপী, মহাপাপের বিভীষিকাও তাহাদিগকে বিচলিত করে না। অহরহ পাপাচরণ করিতে করিতে তাহাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে। তখন দয়া–মায়া, স্নেহ–মমতা সেখানে আর স্থান পায় না। নহিলে অল্পক্ষণ পূর্বে যে অঘটন সংঘটিত হইল, শোহেলী এত সহজে কি তাহা ভুলিতে পারিতেন।

চব্বিশ

ঈসের জঙ্গলের গভীরতম প্রদেশে এক উচ্চ পাহাড় বহুদূর-বিস্তৃত বনভূমির উপরে মাথা তুলিয়া সগর্বে দণ্ডায়মান। নিশাকালে যাহারা রায়হানকে বন্দী করিয়াছিল, তাহাদের দুইজন সেই পাহাড়ের এক অন্ধকার গুহায় তাহাকে নামাইয়া রাখিল, গুহার মুখে প্রহরায় নিযুক্ত রহিল; অপর একজন ছুটিল ভিতরে তাহার সঙ্গীদের ডাকিতে। গুহামধ্যে গভীর অন্ধকারে রায়হান কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেবল মানুষের চলাফেরার আওয়াজ, ফিস্ ফিস্ কথা বলার অস্পষ্ট শব্দ, তাঁহার কানে আসিতে লাগিল। হাত-পা দৃঢ়ভাবে বাঁধা, শত চেষ্টা করিয়াও তিনি নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না।

রায়হানের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। প্রতি মুহূর্তে তিনি ভাবিয়া আকুল—এইবার বুঝি দস্যুদের শাণিত তরবারি তাঁহার বন্ধনাবদ্ধ বিবশ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিবে। ভয়ে তাঁহার ঘর্মাক্ত দেহ বেতসলতার ন্যায় কম্পমান,অন্তরে শুধু মুহুর্মুহ আল্লাহ্‌র নাম-ব্যাকুল আবেদন। এমন সময় একজন গুহাবাসী চকমকি ঠুকিয়া শুষ্কপত্র সংযোগে আগুন জ্বালিল।

আলোকে রায়হানের নযরে পড়িল-গুহাগাত্রের এবড়ো-থেবড়ো পাথরগুলি কেমন যেন দানবের ব্যাদিত মুখের দন্তরাজির মত। পরক্ষণেই অপরিসীম বিস্ময়ে তাঁহার বাছ্য নিঃসরণ হইল না। অপলক নেত্রে তিনি তাকাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে দণ্ডায়মান তাঁহারই পরিচিত নও-মুসলমান দেশবাসী এবং বন্ধু-বান্ধব-জা'ফর, আব্দুল্লাহ্। আবূ আব্বাস, আবূ তোরাব প্রমুখ অনেকে। আরও কয়েকজন পরিচিত ও অপরিচিত পুরুষ গুহাতলে প্রস্তর-শয্যায় নিদ্রিত। বন্দীকে দেখিয়া গুহাবাসীদেরও বিস্ময়ের অবধি নাই। চোখের উপর তাঁহারা দেখিলেন—যাহাকে শত্রু ভাবিয়া, অবিশ্বাসী কুরাইশঘাতক মনে করিয়া, বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তিনি শত্রু নহেন- তাঁহাদেরই দেশবাসী, তাঁহাদেরই মত একজন মজ্‌লুম মুসলমান। এ দৃশ্য যে স্বপ্নাতীত! লজ্জায়, অনুশোচনায় সকলের মাথা হেঁট হইয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ জাফর-ইব্‌ন্-সাদেক ও আবদুল্লাহ্ বন্দীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া উঠাইয়া বসাইলেন।

ভাগ্যিস্ অন্ধকারে কেহ তাহাকে অস্ত্রাঘাত করে নাই—এই ভাবিয়া সকলে মনে মনে বিশ্বস্রষ্টার দরবারে বারবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

রায়হানের মুখে ভাষা নাই। নিঃসীম পুলকভারে তাঁহার দুই নয়নে অশ্রুবন্যা। ভক্তি–কৃতজ্ঞতায় গদগদচিত্তে রাহ্‌মানুর রাহীম আল্লাহ্‌র সিজদায় গুহাতলে পাথরের উপরে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন।

গুহামধ্যে উত্থিত হইল কী এক অনুপম আনন্দ–হিল্লোল, হাসির রোল! সমবেত অট্টহাস্যে সেই নিথর বনভূমির স্তব্ধ নীরবতা এমনভাবে আর কখনো বুঝি ভাঙে নাই, ব্যাহতও হয় নাই।

আবূ তোরাব মহানন্দে রায়হানকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আরে, রায়হান ভাই যে! তুমি এলে কোথা থেকে এই গহন বনে?"

আব্দুল্লাহ রায়হানের হাত ধরিয়া বলিলেন, "রায়হান! তোমাকে না বন্দী করেছিল শোহেলীরা? এলে কিরূপে?"

আবূ আব্বাস আরও নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করে মুক্তি পেলে রায়হান ভাই?"

জাফর–ইবন্–সাদেক সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "আরে থাম! বেচারাকে একটু সুস্থির হ'তে দাও। তোমরা ত তার হাত–পা বেঁধে টিপে টিপে প্রায় মেরেই ফেলেছ! একটু হাঁফ ছাড়তে দাও। পানি আন আবূ তোরাব। এস রায়হান, আগে কিছু পানাহার করে দিল্ ঠাণ্ডা কর। শোহেলীদের হাত থেকে বড় পালিয়ে এসেছ, কিন্তু আমাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া বড় সহজ নয়। দেখলে ত কেমন বীর–পুরুষ এরা? সব যেন আজরাইলের চেলা!"

সকলের মুখেই অনাবিল হাসি আর স্বস্তির নিঃশ্বাস। অসময়ের এই আনন্দ–কোলাহল ঘুমন্ত গুহাবাসীদেরও চেতনা সঞ্চার করিয়াছে। তাহারাও জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময়–বিস্ফারিত নেত্রে নবাগত অতিথির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সকলেই যখন জানিতে পারিলেন, রায়হানও পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়াছেন, তখন তাঁহাদের আনন্দ দেখে কে! সকলে মিলিয়া করুণাময় বিশ্বপতির মহিমা–কীর্তন ও বিশ্বনবীর গুণগান শুরু করিলেন। সমগ্র আকাশ–বাতাস ও বনভূমি তখন আল্লাহ্–রসূলের জয়গানে মুখরিত।

জাফর রায়হানকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "বড় কষ্ট পেয়েছ রায়হান ভাই! আবদুল্লাহ্‌টা মুণ্ডু গোঁয়ার, হাত-পা সাপ্‌টে ধরে যেন নিয়ে এসেছে ছোঁ মেরে। তবু আল্লাহ্‌র হাজার শোকর—জানের কোন খতরা হয় নি। তোমার মত বীর যোদ্ধাকে দলে পেয়ে আজ আমাদের বুকের বল বেড়ে উঠেছে শতগুণ। দুশমনের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়তে আজ আর শঙ্কা নেই কোন। এস ভাই, খানাপিনা সেরে ফেল। তোমার মুক্তি-কাহিনী শোনার জন্য ঐ দেখ সকলেই চেয়ে রয়েছে কেমন হাঁ করে।"

রায়হানকে ঘিরিয়া লইয়া সকলেই তাঁহার অভিযান-কহিনী শুনিবার জন্য কত যে উৎকর্ণ। স্বদেশে রায়হান বীরত্ব ও চরিত্র মাধুর্যে দেশবাসী ও আত্মীয়-স্বজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। আজ মনুষ্য-সমাগমবিহীন এই দুর্গম বন-মধ্যেও স্বদেশ-বহিষ্কৃত এই কয়জন গুহাবাসী হৃদয়মাঝে তাঁহাকে উচ্চাসনেবসাইলেন।

রায়হান ধীরে ধীরে তাঁহার দুঃখময় কাহিনী অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। কাহিনী দীর্ঘ করিয়া লাভ কি? যাহারা শ্রোতা তাহাদেরও তো প্রায় একই কাহিনী, একই অভিজ্ঞতা। সকলেই স্বদেশবাসী ও স্বজনদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া, সমস্ত ধনসম্পদ ও বিষয়-আশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া জন্মভূমির নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন।

পলায়ন প্রসঙ্গ শেষ করিয়া রায়হান বলিলেন, "জাফর ভাই! মহান আল্লাহ্‌ আমার সহায়। পথ হারিয়ে এমন আচম্বিতে আপনাদের সন্ধান পাব,তা' কখনো কল্পনাও করিনি। ভেবেছিলাম ছদ্মবেশে বন্দরে গিয়ে ভাই আবদুল্লাহ্‌র সন্ধান করবো; তার আর দরকার হলো না।"

আবদুল্লাহ্‌ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বন্দর থেকে প্রকাশ্যে যাত্রা করার কি উপায় আছে ভাই! শুননি কুরাইশ বন্ধুগণ বন্দরে বন্দরে আমাদের সন্ধান করে ফিরছে? শুননি তারা সুদূর আদন থেকে বিলহাফিয়ার আবূ মূসাকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে?"

রায়হান মাথা ঝুঁকাইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ, শুনেছি। আল্লাহ্‌ পাক তাঁর বেহেশ্‌ত নসীব করুন। তাঁর শাহাদত নিরর্থক হবার নয়। ইসলামে তাঁর অবিচলিত

বিশ্বাস, ঈমানের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে দৃষ্টান্ত আমাদের ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদ যেন শক্ত করে গড়ে।"

আবূ তোরাব বলিলেন, "শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও যাতে মুসলমানগণ আশ্রয় না পায় সে চেষ্টাও কি এরা কম করেছে? এই জাফর ভাইয়ের মুখেই শুনেছি, যাতে মুসলমানগণ সে রাজ্যেও আশ্রয় না পায়, কুরাইশগণ সেজন্য কি চেষ্টাই না করেছে।"

রায়হান। শুনেছি, সেই দেশে বিফল-মনোরথ হয়েই কুরাইশগণ স্বদেশে ফিরে আবার পূর্ণোদ্যমে মুসলমান দলনে ব্রতী হয়েছে।

আবদুল্লাহ্। সেই দুঃখেই তো আশ্রয় নিয়েছি এই গভীর জঙ্গলে। এখানে বড় বড় গাছ কেটে বহু কষ্টে এক বৃহৎ নৌকা আমরা নির্মাণ করেছি। ভাগ্যক্রমে তুমি বড় ঠিক সময়েই এসেছ। এই শেষ রাত্রের জোয়ারেই আল্লাহ্‌র মরজি আমরা নৌকা ভাসাবো। এই কয়দিন সকলেই বড় অধীরভাবে শুধু জাফর ভাইয়ের প্রতীক্ষায়ই ছিলাম।

রায়হান। জাফর ভাই নাকি নৌকায় বহু দেশে সফর করেছেন?

আবদুল্লাহ। হাঁ হাঁ। বহুদিন তিনি তেজারতি উপলক্ষে দরিয়ায় ভ্রমণ করেছেন। হাবশী-মুলুকে তিনিই তো প্রথমে নিয়ে গিয়েছিলেন কয়জন মুসলমানকে। সেখানে রাজদরবারে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তিনিই আবার আমাদের নিতে এসেছেন পথ দেখিয়ে। আজই সন্ধ্যায় কি অবস্থায় বনে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তা' শুনুন তাঁর মুখেই। বলুন না জাফর ভাই, আপনার কাহিনী। আমাদেরও ত শোনা হয়নি। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়েছিলেন বলে আমরা আর জাগাইনি।

রায়হান বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন, জাফর ভাই ত শুনেছিলাম বাড়ী থেকে বের হয়েছিলেন সেই তিন মাস আগে? তবে কেন এত বিলম্ব?"

জাফর সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়সে পৌঢ়। নির্বাণোন্মুখে অগ্নিকুণ্ডে আরো কয়েকটা ডালপালা ফেলিয়া দিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বের হলেই তো আর আসা যায় না ভাই, কপালে দুর্ভোগ থাকলে ছাড়বো কিরূপে। আমি যে আদৌ এ স্থানে এদের সঙ্গে মিলতে পারবো, সে ভরসাই তো ছিল না; একান্ত

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই না পৌঁছুতে পেরেছি। বাড়ী থেকে বের হবার পর কি ঘটেছিল, কিছুই কি শুননি?"

রায়হান মাথা নাড়িলেন। সকলের মুখেই বিস্ময় বিমূঢ় ভাব।

জাফর পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "তবে শোন। আমি হাবশী মুলুক থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছি আর দেশ থেকে কয়েকজন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় পালাবার আয়োজন করছি, কুরাইশ বন্ধুগণ তা' জানতে পারলে আর রক্ষা ছিল না। আবূ আব্বাসের এই জঙ্গলের পথঘাট জানা ছিল। তার সঙ্গে নিশাকালে এই গুহাবাসীদের পাঠিয়ে দিয়ে, আমি পরদিনই বিদেশী সওদাগরের বেশে বাড়ী থেকে বের হলাম। ইচ্ছা ছিল, মদীনা মনোয়ারায় গিয়ে একবার আলা–হযরতের কদম মোবারক যিয়ারত্ করে আসবো, হাবশী মুলুকে মুসলমানদের সৌভাগ্যের কাহিনীও তাঁর খেদমতে পেশ করবো। একটা খেজুর বোঝাই ঝুড়ি পিঠে বয়ে আমি পথ চলতে লাগলাম। কেউ কিছু বললো না, আমার সেই ছদ্মবেশে কেউ আমাকে চিনতেও পারলো না।"

রায়হান–খুব সহজেই তা' হলে পালিয়ে এলেন?

জাফর—হাঁ সহজে বৈ কি—শুনই না। সারাদিন পথ চলার পর সন্ধ্যাকালে আতিথ্য গ্রহণ করলাম এক ধনীর গৃহে। ভাবলাম, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সকলের শ্যেনদৃষ্টি খুব এড়িয়ে এসেছি। নিভৃত গৃহকোণে আল্লাহ্‌র আরাধনায় বসে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালাম। বাহির থেকে গৃহস্বামী যে দেয়ালের ছিদ্রপথে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, তা' যদি জানতাম তবে অদৃষ্টে এত দুর্গতি ঘটতো কিনা সন্দেহ।

সকলে বিস্ময়–বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। জাফর পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "নামাযের পর বাইরে আসতেই গৃহস্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুসাফির। তুমি মুসলমান?" আমার অন্তর কেঁপে উঠলো। ধরা পড়লে অদৃষ্টে কি যে ঘটবে জানা ছিল, তবুও ধর্ম্মমত অস্বীকার করতে পারলাম না। মনে মনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে কম্পিত কণ্ঠে বললাম, 'হাঁ, মুসলমান।' গৃহস্বামী আর কিছু না বলে চলে গেলেন বাড়ীর ভিতরে। কতক্ষণ একাকী বসে বসে ভাবলাম, "তারপর কি করলাম জান?"

আবদুল্লাহ্ জাফরের প্রায় সমবয়সী। ভূতলে কাত হইয়া শুইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পগার পার হ'লে আর কি এক দৌড়ে।"

রায়হান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "গৃহস্বামী যখন মুসলমান বলে চিনতে পেরেছে, তখন পলায়ন ছাড়া আর উপায় কি?"

জাফর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমারও মনে হয়েছিল পলায়ন করাই শ্রেয়। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, রাত্রিকালে কোথায়ই বা যাই ইত্যাদি ভেবে উঠি-উঠি করছি, এমন সময় গৃহস্বামী নিজে এসে আমাকে একবাটি সুমিষ্ট পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত করলেন। অল্পক্ষণ পরেই গৃহস্বামীর এক সুন্দরী দাসী নানাবিধ সুখাদ্যপূর্ণ এক ভোজন পাত্র হাতে নিয়ে উপস্থিত। আমার মন থেকে সব সন্দেহ, সব দুর্ভাবনা উবে গেল। পরম তৃপ্তি সহকারে আহার সেরে নামাযের পর শয্যা গ্রহণ করলাম।"

জাফর কিঞ্চিৎ থামিয়া বলিলেন, "কি হে আবদুল্লাহ্, আমাকে পগার পার হতে বলে তুমি যে বড় লম্বা হয়ে পড়েছিলে? এখন দেখলে তো মুসলমান মেহমানের কত কদর?"

শ্রোতারা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চমুখে গৃহস্বামীর প্রশংসা শুরু করিলেন। সমগ্র আরবে যেখানে নবজাত ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু হইয়াছে সম্মিলিত অভিযান, সেখানে এবংবিধ অভ্যর্থনা লাভ পরম সৌভাগ্য বৈ কি!

জাফর একটু হাসিয়া বলিলেন, "খুশী হ'বারই কথা বটে, কিন্তু যা ভাবছ তা, নয়—শোন শেষটা। প্রভাতে বিদায় নিয়ে ঘরের বার হয়ে দেখলাম—সহৃদয় গৃহস্বামী আমারই অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন, নিকটে দণ্ডায়মান দুইজন দীর্ঘকায় যুবাপুরুষের শ্যেনদৃষ্টি আমারই দিকে নিবদ্ধ; অদূরে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটি সজ্জিত উষ্ট্র। আমি বের হতেই গৃহস্বামী আমাকে দেখাইয়া যুবকদের কানে কানে কি যেন বললেন। যুবকদ্বয় কি সব পরামর্শের পর তার হাতে কতগুলি অর্থ গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল আমার দিকে। ব্যাপারটা ভাল বোধ হলো না। আমি চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তারা আমার বাহুদ্বয় জোরে আকর্ষণ করে বলল, 'যাচ্ছিস কোথায়? তোকে যে আমরা ক্রয় করেছি।' এই বলিয়া আমাকে সজোরে টেনে নিয়ে চললো তারা সেই উটের দিকে। আমার মনের অবস্থা তখন কি হয়েছিল, বুঝতেই পারছো।"

জাফর একটু থামিয়া অগ্নিকুণ্ডটা খোঁচাইয়া তাজা করিয়া দিলেন। বিমর্ষ শ্রোতাদের মুখমণ্ডল তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় ভারাক্রান্ত।

জাফর পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "বুঝলাম গৃহস্বামী মেহ্‌মানদারীর মূল্য নিয়েছেন কড়ায়–গণ্ডায় আদায় করে। রাত্রের সাদর–সম্ভাষণের অর্থটাও এইবার পরিষ্কার হয়ে উঠলো। প্রতিবাদ করে, জোরজবর করে, কোন ফায়দা হলো না; অদৃষ্ট বিমুখ হলে আমি আর কি করতে পারি।"

রায়হান ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কে আপনাকে মুক্ত করলো? কে–ই বা এখানে নিয়ে এল?"

জাফর উর্ধ্বদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "সেই তিনিই। সেই রাব্বেল–আ'লামীন। বলছি শোন। তখন তখনি আমাকে প্রভুদের সঙ্গে উটের পিঠে চড়ে যাত্রা করতে হলো কোথায় চলেছিলাম জানিনে; পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। মানসনেত্রে তখন ভেসে উঠেছিল—এই বনানীর দৃশ্য যেখানে তোমরা দেশত্যাগের আয়োজনে মেতে আমারই অপেক্ষায় অধীরভাবে দিন গুণছিলে; ভেসে উঠেছিল দিগন্ত–বিস্তৃত সমুদ্র বক্ষের অফুরন্ত তরঙ্গশ্রেণী। ঘন নীলাভ ঢেউগুলি সগর্বে মাথা উঁচু করে কোথায় কোন্ সুদূরে যেন চলেছিল। কর্ণপটে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, মেঘ গর্জনের ন্যায় সমুদ্রের গুরুগম্ভীর কল্লোল ধ্বনি। মনশ্চক্ষে তখন দেখেছিলাম, অসীম জলধি–বক্ষে তোমাদের এক ক্ষুদ্র তরণী বৃক্ষপত্রের ন্যায় ভেসে ভেসে সুদূরে চলেছে, আর আমি সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে তোমাদের যেন ডেকে মরছি। কিন্তু পরক্ষণেই প্রভুর চপেটাঘাতে ফিরে এলাম বাস্তবে। মনিবদ্বয় উত্তমরূপে আমার হস্তদ্বয় বেঁধে শাসিয়ে দিল খুব করে। বলা বাহুল্য আমার দুই চোখ তখন পানিতে পানিতে ঝাপসা।"

জাফর আবার আরম্ভ করিলেন, "সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তায়েফ নগরে নতুন মনিবের বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। আমার করণীয় কাজগুলি তখন তখনি আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। মনে পড়ে সেই রাত্রেই এক গাদা খেজুরের আঁটি ভাঙতে রাত্রি প্রায় ভোর।"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "না হে, আর নয়, রাত যে প্রায় শেষ হয়ে আসছে! পাথরের পরশে তোমরাও কি একেবারে পাথর হয়ে গেলে নাকি?

এদিকে এই পরিশ্রান্ত মেহমানটির যে আহারের প্রয়োজন, সে কথা কি ভুলে গেলে?"

সকলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। আবূ তোরাব ও আবূ আব্বাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রায়হান বাধা দিয়া বলিলেন, "কাহিনীটা আগে শেষ করুন জাফর ভাই, নতুবা আহারে রুচি হবে না।"

জাফর একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভয় কি ভাই! আমরা মেহমানদারীর কোন মূল্য নেব না।"

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে বেমক্কা হাস্যধ্বনি শব্দহীন ধরিত্রীর বক্ষোপরি নিথর বনভূমির নৈশ-গাম্ভীর্য কেমন যেন বেআবরু করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল।

জাফর পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, তবে সংক্ষেপেই শেষ করে ফেলি। অহোরাত্র আমার উপর যে সব নির্যাতন-উৎপীড়ন চলেছিল, তা' বলে তোমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। সকলে আমাকে চোখে-চোখে রাখতো, রাত্তিরে আমার শয়নকক্ষে বাহির থেকে বন্ধ করে দিত। দিবসে মেষ চরাতে হতো পাহাড়ের নীচে। সঙ্গে যারা যেত, তারা মেষ চরাতো আবার আমাকেও হামেশা পাহারা দিত।

"সত্তর দিন এইভাবে কেটেছিল। তারপর এল তায়েফ নগরার সাংবাৎসরিক বিজয়োৎসব। কোনকালে ইয়েমেন দেশের এক নগরী নাকি তায়েফীরা জয় করেছিল, সেই বিজয়স্মৃতি এখনও তারা ভুলেনি।

"স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে মেতে উঠলো উৎসবে। নাচ-গান ও আমোদ-প্রমোদে সমগ্র শহর মশগুল। প্রতিটি নরনারী বিচিত্র সাজ-সজ্জায় সজ্জিত। কত হৈ-চৈ, কি আর বলবো! আমার মেষপালকসঙ্গিগণ সেইদিন প্রভাতে কেউ বড় একটা সঙ্গে এল না মেষ চরাতে। যে কয়জন বালক সাথে এসেছিল তারাও দুপুরের আগেই মেলায় যাবার প্রস্তাব করলো।

"সৌভাগ্যক্রমে আমার কয়েকটি মেষ দল-ছাড়া হয়ে চলে গেছিল দূরে। আমি রাখালদের সঙ্গ ছেড়ে ধীরে ধীরে চললাম সেই মেষগুলির সন্ধানে। লক্ষ্য করলাম—কেউ আমার অনুসরণ করলো না। তারা মেষপাল নিয়ে বাড়ী ফেরার

আয়োজনেই ব্যস্ত। আমি তাদের ডেকে বললাম, 'মেষগুলি খুঁজে তাড়িয়ে আনছি। তোমরা না হয় এগুতে থাক।' কেউ আর কিছু বললো না।

"ক্রমে দূরে চলে এলাম অনেকটা। পশ্চাতে তাকিয়ে দেখি, বালকগণ তখনও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে এক দৃষ্টে। আমি তাদের ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম–মেষপাল নিয়ে একটু পরেই ফিরছি। দেখলাম উৎসব দর্শনেচ্ছু ব্যগ্র–চঞ্চল বালকদল কতক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর, এক–পা এক–পা করে পশুপাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে বাড়ীর দিকে।

"অল্পক্ষণ পরেই মেষগুলি খুঁজে পেলাম এক পাহাড়ের আড়ালে। বলা বাহুল্য, আমি তাদের আহারে কোন ব্যাঘাত ঘটালাম না। মেষপাল চরতে লাগলো উত্তরে, আমি আল্লাহ্‌র নাম করে হাঁটত লাগলাম সোজা দক্ষিণে। কিছুদূর গিয়ে একটা টিলায় উঠে দেখি–সঙ্গী বালকগণ চলে গেছে বহুদূর। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম; কিন্তু ঠিক জানতাম, কিছুক্ষণ পরেই লোকজন ছুটে আসবে আমার সন্ধানে। এইবার মনুষ্যচক্ষুর অন্তরালে ছাড়া–ছাড়া ঝোঁপ–ঝাড়–ভরা বালির প্রান্তরে দৌড়াতে লাগলাম।"

শ্রোতারা সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

জাফর পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "কেউ আমার সন্ধানে বের হয়েছিল কিনা জানি নে। সাবধানে লোকালয় থেকে দূরে দূরেই ছিলাম। পথিমধ্যে আর কোথাও আতিথ্য গ্রহণ করার সাহস পাইনি। রাত্রিতে বৃক্ষশাখায় উষ্ণীষ–বস্ত্রে দেহ বন্ধন করে নিদ্রায় যেতাম। মেষ চরাবার সময় যে সামান্য খাদ্য এনেছিলাম তাই অল্প অল্প খেয়ে তিন দিন তিন রাত কাটিয়ে দিলাম। চলার পথে বাগানের খর্জুর ও ঝর্ণার পানি খেয়ে আরো তিন দিন কাটলো। সপ্তম দিবসে এই বনের প্রান্তদেশে যখন পৌছি তখন ক্ষুৎ–পিপাসায় ও দীর্ঘকাল ভ্রমণজনিত পরিশ্রমে একান্ত কাতর।"

জাফর একটু থামিয়া আবূ আব্বাসের নিকটে পানি চাহিলেন। পানি পান করিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "প্রায় সমস্ত দিনই এই বনে ঘুরে ঘুরে মরলাম; কিন্তু পথের কোন ঠাহর পেলাম না। সমুদ্রের গর্জনধ্বনি আমার প্রাণ আকুল করে তুলেছিল, চলৎশক্তিহীন দেহে সঞ্জীবনী সুধায় যেন চাঙ্গা করে দিয়েছিল; কিন্তু

বহুদূর গিয়েও সাগরতীরের কোন সন্ধান পেলাম না। আমার পদদ্বয়ের গ্রন্থিগুলি তখন বেদনায় জরজর, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত; বুকের ভিতরে শুরু হয়েছিল যেন শত শত হাতুড়ির অবিরাম ঠুকাঠুকি। সহসা একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়লাম জঙ্গলে। জানি নে, চেতনা কখন বিলোপ হয়েছিল।

"জ্ঞানলাভ করে শুনতে পাই, নিকটে কাঠের উপরে হাতুড়ি পেটার খটাখট্ শব্দ। তখন বেলা প্রায় শেষ। চেয়ে দেখি, জঙ্গলে একটা ফাঁকা জায়গায় আমার এই বন্ধুদেরই কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে আমাকে ঘিরে, ভাই আবূ আব্বাস তখনও আমার চোখে-মুখে পানির ধারা ছিটিয়ে দিচ্ছে; অদূরে কয়েকজন জোয়ান মরদ বড় বড় তক্তা আগুনে সেঁকে নৌকায় জুড়তে ব্যস্ত। বলা বাহুল্য, আমার এই বন্ধুগণই আমাকে অচেতন অবস্থায় কুড়িয়ে এনেছিল জঙ্গলের ভিতর থেকে।"

রায়হান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্‌র রহমত কখন কিভাবে নাযিল হয় বোঝা ভার। জঙ্গলে এরা কাঠ কাটতে গিয়েছিল বুঝি?"

জাফর উত্তর করিলেন, "না না, জঙ্গলেই ত এদের বাস—এরা পাহারায় ছিল। কুরাইশদের ভয়ে নিশিদিনই ত তারা পাহারা দেয় পালা করে জঙ্গলের ভিতরে। এই একটু পূর্বে তুমিও যে তাদের পাল্লায়ই পড়েছিলে হে! এরাও ত দেশত্যাগ করেছে কষ্ট পেয়ে। আল্লাহ্‌র মরজি দরিয়ায় পাল তুলে দিয়ে এদের কাহিনী একে একে শোনবো।"

রায়হান জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমুদ্রযাত্রার আর বিলম্ব কত জাফর ভাই?"

জাফর উত্তর করিলেন, "না আর বিলম্ব কি! নৌকার বাকী কাজটুকু ত কালই শেষ হয়েছে-যাত্রার আয়োজনও সব সম্পূর্ণ। এইবার কিছু মুখে দাও ভাই। ঐ দেখ, রাত্রি প্রভাত হয়ে উঠেছে, আজই যাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে।"

রায়হান একখণ্ড শুষ্ক রুটি ও কয়েক টুকরা খেজুর গলধঃকরণ করিয়া জাফরের সঙ্গে বাহির হইলেন। বনের পাখীরা তখন বিচিত্র সুরে প্রভাতী সঙ্গীত শুরু করিয়া দিয়াছে। রায়হান দেখিতে পাইলেন, অদূরে পাহাড়ের পাদদেশে এক অপরিসর শীর্ণ পার্বত্য নদী একটানা প্রবহমান। সেখানেই রহিয়াছে এই দুঃসাহসী যাত্রীদলের প্রতীক্ষায় সদ্যমিলিত সেই বৃহৎ জলযান। নদীতে জোয়ার লাগিয়াছে।

রায়হান নদীতীরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিঃসহায় নিঃসম্বল অথচ দৃঢ়চিত্ত এই গুটিকতক নও-মুসলমানের অদম্য সাহস, অশেষ কর্মপ্রেরণা, অপূর্ব মনোবল ও আল্লাহ্‌র প্রতি অসীম তাওয়াক্‌কুল লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি নাই। প্রত্যূষের স্নিগ্ধ সমীরণ তাঁহার বিলম্বিত কেশগুচ্ছ বারংবার চোখে-মুখে উড়াইয়া পরম সমাদরে যেন দীর্ঘপথ ভ্রমণজনিত শ্রান্তি দূর করিতে ব্যস্ত। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁকে এই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছাইয়া দিয়াছেন ভাবিয়া অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। আজ তাঁহার মনে পড়িল, প্রিয়তমা সায়ফুনকে—যে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের মাথায় লইয়া গভীর নিশীথে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিল। কত গভীর তার প্রেম! কত মহৎ তার অন্তর! রায়হান মোনাজাত করিলেন, "হে দয়াময় প্রভো! রাব্বেল আ'লামীন, রহমানুর রহীম! যে করুণায় এ-অধমকে ধন্য করেছ, আমার প্রাণাধিক্য সায়ফুন তাতে যেন বঞ্চিতা না হয়।"

পঁচিশ

মাথার উপর রৌদ্র যেন দোযখের আগুন। সেই প্রখর তাপে রাহেল নিজে উষ্ট্র চালাইয়া যাইতেছে, পশ্চাতে ওৎবা ও তাহার স্ত্রী–পুত্রাদি আরূঢ়। কিয়দ্দূর আসিয়া রাহেল ঘাড় ফিরাইয়া দেখে–আরোহিগণ সকলেই যেন এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় মৃতপ্রায়, আড়ষ্ট–কাহারও মুখে কোন কথা নাই। তাহাদের ভয় দূর করিবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওৎবা! কি ভাবছো? তোমার বন্ধুদের নিকট যে ব্যবহার পেয়েছ, আমার নিকটে তার অধিক কিছু কি প্রত্যাশা করছো?"

ওৎবার বুকের ভিতরটায় কেমন যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। ক্ষীণ আর্তনাদ সহকারে একবার সে রাহেলের দিকে তাকাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্যথা–ভারাক্রান্ত দুর্বল দেহ উত্তোলন করিতেই পারিল না। মৃত্যুভয়ে তাহার পাণ্ডুর মুখমণ্ডল একেবারে যে পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে। রাহেল ইহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিল। বলিল, "ওৎবা! কুরাইশ–দলপতি আবূ সুফিয়ানকে তো ভালভাবেই চেন?"

ওৎবার অন্তর আবার কাঁপিয়া উঠিল। মুসলমানের দুশমন আবূ সুফিয়ানের নাম শুনিবামাত্র তাহার স্ত্রী–পুত্রাদির মুখও ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে। সে চিৎকার করিয়া বলিল, "রাহেল! তুমিও কি শেষকালে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? সেই জালেমের কাছেই নিয়ে চললে আমাদের?"

রাহেল হাসিয়া বলিল, "তোমার কি মনে হয় ওৎবা? কি কৌশলে নিয়ে এলাম দেখলে?"

ওৎবা পুনরায় চিৎকার করিয়া উঠিল, "রাহেল! উট থামাও, যেতে দাও, যেতে দাও আমাদের! বুঝেছি, তুমি আমাদের মেরেই ফেলবে।"

রাহেল হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভয় নেই ওৎবা! আমি তোমার সেই পৌত্তলিক বন্ধু নই; আবূ সুফিয়ানের জুলুমের কথাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু

হঠাৎ অমন আঁতকে উঠলে কেন? বিশ্বাস কর, আমিও সত্য ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু এক্ষণে যাই কোথায় বল? কিছুই ত ভেবে পাচ্ছিনে। কোথায় সায়ফুন আর কোথায়ই বা কুলছুম?"

রাহেলের কথা শুনিয়া যাত্রিগণ এইবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ওৎবা যেন নব জীবন লাভ করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার রাহেলকে বুকে জড়াইয়া ধরে।

যোহরা এতক্ষণ ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়াছিল। কৃতকর্মের অনুশোচনায় সে জ্বলে পুড়ে খাক। রাহেলকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "ভাইজান। আমিই সায়ফুনের দুর্ভাগ্যের কারণ, কেন তাকে জোর করে তোমার সঙ্গে নিকাহ্ দিতে চেয়েছিলাম? আমার পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নেই!" এই বলিয়া সে নয়নযুগল ওড়নার আঁচলে মুছিতে লাগিল।

রাহেল ভগ্নীকে বলল, "আমার অপরাধের তুলনা হয় না যোহরা; আমিই তাকে জ্যান্ত সমাধিস্থ করার আয়োজন করেছিলাম। আহা! কী অন্যায়ই না করেছি! গত জীবনের দুষ্কর্মগুলি মনে পড়লে অন্তর ভয়ে শিউরে উঠে! যোহরা! আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাও, প্রার্থনা কর, ধর্মের আলো আমাদের অন্তরের গ্লানি যেন দূর করে দেয়।"

ওৎবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠিকই বলেছ রাহেল! গত জীবনের কার্যকলাপ মনে পড়লে অধমের প্রাণ ভয়ে ও অনুশোচনায় কেঁপে উঠে। ভেবে দেখ, রায়হানের প্রতি কি নির্মম ব্যবহারই না করেছি।"

রাহেল। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অমানুষিক অত্যাচার কল্পনাও করা যায় না। আহা! জানি না আজ সে বেঁচে আছে কিনা। যদি খুঁজে পেতাম, তবে অকপটে তাঁর নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাইতাম।

ওৎবা। বোধ হয় রায়হান বেঁচে আছে। তোমার কি মনে পড়ে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে আবূ ইক্‌রাম বলেছিল? সে নাকি রায়হানকে হত্যা করতে ছুটে গিয়েছিল বেদুঈন পল্লীতে? আর বেগতিক দেখে রায়হান ঈসের জঙ্গলের দিকে পালিয়েছিল উর্ধ্বশ্বাসে?

রাহেল। তুমি কি পাগল হয়েছ? বাঘের সঙ্গে শিয়ালের তুলনা। যে বীরপুরুষ ওহুদের যুদ্ধে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়েছিল, সে রায়হান কিনা কাপুরুষ আবূ ইক্‌রামের ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালায়? ইহাও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?

ওৎবা। তবুও একবার সেইদিকেই সন্ধান করা প্রয়োজন। আমার মনে হয়, তাকে সেই জঙ্গলেই পাওয়া যাবে। শুননি অনেক নও-মুসলমান সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন?

রাহেল। বেশ, তবে সেইদিকেই চল। সেই বিস্তীর্ণ জঙ্গলের একাংশে আমরা লুকিয়ে থাকবে। অন্ধবিশ্বাসী দেশবাসীদের সংস্রব থেকে জঙ্গলে পশুদের সঙ্গলাভও অনেক ভাল। তা' ছাড়া সায়ফুন ও কুলছুমকেও ত সেইদিকেই খুঁজতে হবে।

ওৎবা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তারা কি বেঁচে আছে মনে কর? যুদ্ধক্ষেত্রে তো খুঁজে পাই নি। বোধ হয় বেদুঈন দস্যুরা তাদের মেরেই ফেলেছে। আমাদের পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নেই রাহেল।"

রাহেল উত্তর করিল, "না, বেদুঈনগণ সন্ধান পায়নি। আমি দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম তাদের হত্যা করতে, কিন্তু পারি নি। তারা পালিয়েছিল আমাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে।"

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে ওৎবার আনন্দ আর ধরে না। যোহরার মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে রাহেলকে বলিল, "কি বললে ভাইজান? জিন্দা আছে সায়ফুন? বেঁচে রয়েছে ভাবী কুলছুম? সেই দিকেই চল তবে! যতক্ষণ না তাদের খুঁজে বের করতে পারি ততক্ষণ দিলে শান্তি পাব না।"

ওৎবা রাহেলকে বলিল, "চল তবে সেই বনেই যাই। হয়তো সেই পথে সায়ফুন ও কুলছুমের সন্ধানও পাব।"

* * *

বিস্তীর্ণ মরুভূমি বামে রাখিয়া যাত্রীদল সোজা দক্ষিণে বহুদূর পথ অতিক্রম করিল। প্রখর রৌদ্র আর মরুভূমির লু-হাওয়া একেবারে অসহ্য, তাহাদের সর্বাঙ্গ যেন অগ্নিদগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

রাহেল বস্ত্রখণ্ডে নাক-মুখ ও মস্তক উত্তমরূপে আবৃত করিয়া অতিকষ্টে উষ্ট্র চালাইতে লাগিল। সুগদুফের নীচে, বস্ত্রনির্মিত ছাউনির অভ্যন্তরে ওৎবা স্ত্রী-

পুত্রাদিসহ নাক–মুখ গুঁজিয়া কোনক্রমে পড়িয়া রহিয়াছে। মরার মত ইতস্ততঃ বিস্তৃত কন্টক–বনাকীর্ণ বালুকাময় প্রান্তর পার হইয়া যাত্রীদল ক্রমে কূহ্‌মালুমের পাদদেশে পৌছিল। তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর।

কূহ্‌মালুম বহুদূর ব্যাপী এক অরণ্যময় পার্বত্য স্থান। চারিদিকে খর্জুর বন–পরিশোভিত পার্বত্য ভূমি অনেকটা উর্বর। ঘন–সন্নিবিষ্ট বৃক্ষতলের স্নিগ্ধ ছায়া বালুকা ও প্রান্তরময় দেশের এক অমূল্য সম্পদ। তাই এই কূহ্‌মালুম পথিকদের বড় লোভনীয় স্থান। তাহারা দিবসের প্রখর রৌদ্রতাপে এইখানে বৃক্ষতলের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লইয়া শরীর জুড়ায়। কিন্তু রাহেল সেই স্থানে পথিপার্শ্বে কোথাও বিশ্রাম নিবার সাহস পাইল না; কেননা, যে কোন মুহূর্তে কোন কাফেলা আসিয়া পৌছিতে পারে, ধরা পড়িবার ভয় আছে; অথচ বিশ্রাম না নিলেও নয়; চারিদিকে সন্ধান করিয়া পানি আনিতে না প ারিলে প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না।

সাত–পাঁচ ভাবিয়া রাহেল পাহাড়ের পাদদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে উষ্ট্র বাঁধিল; তারপর বৃক্ষচ্ছায়ায় একখণ্ড বস্ত্র পাতিয়া সকলে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলে ছেলেমেয়েরা পানির অভাবে শুরু করিয়া দিল বুকফাটা চিৎকার–আর্তনাদ।

পানির সন্ধানে রাহেল পাহাড়ের উপরে ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। হঠাৎ মানুষের চিৎকারধ্বনি ও কোলাহল শুনিয়া উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই যে অভাবনীয় দৃশ্য নয়নগোচর হইল তাহাতে ভয় ও বিস্ময়ে তাহার বুকের ভিতরটা মুহূর্তে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। দেখিল পাহাড়ের উপরে কয়েকজন যুবক ও প্রৌঢ় এক বন্দী পুরুষ ও এক বন্দিনী নারীকে যেন শিখরদেশ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিবার আয়োজনে রত। সেই নারী ও পুরুষ প্রাণভয়ে করুণ আর্তনাদ করিতেছে। সমবেত পুরুষদের কয়েকজন বন্দী ও বন্দিনীর হস্তপদ উত্তমরূপে বাঁধিতে ব্যস্ত। বাকী সকলে নিকটে এক বৃক্ষতলে বসিয়া মদ্যপান, নৃত্য–গীত ও আমোদ–প্রমোদে মশ্‌গুল। রাহেল বুঝিতে পারিল বন্দী ও বন্দিনীকে হত্যা করিতে এই উৎসবের আয়োজন; এখনই পাথরের উপর গড়াইতে গড়াইতে হতভাগ্যদের দেহপিঞ্জর চূর্ণ–বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার অনুশোচনার অবধি নাই– সে নিজেও না কয়েকবার অংশগ্রহণ করিয়াছিল এবংবিধ বীভৎস উৎসবে।

রাহেল নিজের এবং যাত্রীদের ক্ষুধা–তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া গেল। কিরূপে এই মরণোন্মুখ নর–নারীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যায়, একমাত্র সেই চিন্তায়

সে অস্থির। সহসা তাহার মাথায় একটা মতলব উপস্থিত হইল। সে জানিত, দৈত্য-দানবে ও প্রেতাত্মায় দেশবাসীদের অগাধ বিশ্বাস। ভাবিল, বন্দী ও বন্দিনীকে রক্ষা করিতে কোন এক পাহাড়ী দানবকে তাহার সাহায্যে আমন্ত্রণ করিলে মন্দ হয় কি।

আর এক মুহূর্তও নষ্ট করিবার উপায় নাই। রাহেল তাড়াতাড়ি এক বাবলা জাতীয় কাঁটা-গুল্মের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, পোশাক ছাড়িয়া, লতাপাতা ও ডালপালায় তাহার সর্বাঙ্গ বিচিত্র সাজে সজ্জিত করিল। লক্ষ্য করিল-অদূরে সেই ঝোপের ছায়ায় কোন কালে কোন যাযাবর বা পথিক রন্ধনকার্যে বা শীত নিবারণ করতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহার কয়লাগুলি বহুদিন বালির উপরে পড়িয়া থাকিয়া যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি কতকগুলি কয়লা কুড়াইয়া আনিয়া সে মুখমণ্ডল ও সর্বাঙ্গ কালিমালিপ্ত করিল। বিচিত্র গায়ে পাতার বসন, পাতার ভূষণ; দুই হস্তে দুই বৃক্ষশাখা, মাথায় পল্লব-মুকুট। তারপর এক গুহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া যথাসাধ্য জোরে বিকৃত কণ্ঠে সে চিৎকার করিতে লাগিল, "কে রে তোরা লাম্‌পিনির রাজ্যে? আমি পাহাড়ী দেবতা লাম্‌পিনি! ক্ষুধার্ত লাম্‌পিনি। কে তোরা? বন্দীদের পাহাড়ের উপর বেঁধে রাখ। হত্যা করে রক্তপান করবো। কেন তোরা আমার রাজ্যে এলি? কে তোরা?" এবংবিধ চিৎকার করিতে করিতে অদ্ভুত সাজ-সজ্জায় দানব বেশধারী রাহেল পাহাড়ের উপরে ছুটিয়া গেল। সেই চিৎকার গুহার ভিতরে প্রচণ্ড ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পাহাড়ের উপরে উৎসবরত পুরুষগণ অদূরে অপর পাহাড়ে এক বিকট বেশধারী দানবমূর্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতলে লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল; গিরি-দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে ভাবিয়া সকলে ভয়ে চেতন হারাইবার উপক্রম। রাহেল উৎসাহিত হইয়া পুনরায় গুহামধ্যে ফিরিয়া নাকিসুরে চিৎকার করিতে লাগিল, "শিগ্‌গির আমার রাজ্য পরিত্যাগ কর! নতুবা পরিত্রাণ নেই; কারো আজ রক্ষা নেই! বন্দীদের পাহাড়ের উপরে ফেলে রেখে পলায়ন কর! আমি উপবাসী লাম্‌পিনি! কে তোরা? -জিন্, ইন্‌সান, না ইবলীস?"

এই বলিয়া সে পুনরায় পাহাড়ের চূড়ায় ছুটিয়া গিয়া দুই হাত উপরে উঠাইয়া দানবের ন্যায় লম্ফঝম্ফ শুরু করিল।

অপর পাহাড় হইতে ভূতলশায়ী পুরুষগণ আর একবার কোনক্রমে সাহসে ভর করিয়া দেবতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়ে মাথা নত করিয়া চক্ষু মুদিল; দ্বিতীয়বার তাকাইবার শক্তি সাহস কাহারো অবশিষ্ট নাই। অবিলম্বে সকলে নিঃসাড়ে গাত্রোত্থান করতঃ চোরের ন্যায় পাহাড়ের গা বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

রাহেল উৎফুল্ল হইয়া দেখে, শুধুমাত্র বন্দীরাই পাহাড়ের উপরে বন্ধনাবস্থায় শায়িত, নিকটে আর কোন জনপ্রাণী নাই। অল্পক্ষণ পরেই অদূরে বহু অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া তাহার বুঝিতে দেরী হইল না।–বীরপুরুষগণ ভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিতেছে, নিকটেই পাহাড়ের আড়ালে ঘোড়াগুলি কোথাও হয়তো বাঁধা ছিল।

রাহেল ভয়ে অর্ধমৃত অশ্বারোহীদের আরও সন্ত্রস্ত করিবার জন্য পুনরায় গুহামধ্যে ঢুকিয়া বিকট স্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। সে চিৎকারধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া চারিদিকে সৃষ্টি করিল দানবের বজ্রহুংকার। মহানন্দে রাহেলের অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। এইবার যে স্থানে বন্দীদ্বয় পড়িয়াছিল, দ্রুতপদে সেই পাহাড়ের দিকে সে ছুটিল।

অপূর্ব বেশভূষায় সজ্জিত রাহেল সেই পাহাড়ের চূড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখে– নিকটে অর্ধ-অচেতন বন্দী ও বন্দিনী ছাড়া আর কোন মানুষ নাই; বন্ধনাবদ্ধ বন্দীদ্বয় রৌদ্রতপ্ত পাথরের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অদূরে বৃক্ষতলে কয়েকটি মদ্যভাণ্ড, কিছু খাদ্য ও পানীয়পূর্ণ মৃৎপাত্র ও দুই-চারিটা শূন্যভাণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

রাহেল বন্দীদের চিনিতে পারিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "কে-ও? আবু আককাস! আরে! এ কে? আছিয়া!"

উভয়েই প্রায় অচেতন। রাহেল বুঝিতে পারিল না, পাহাড়ের গুহা হইতে এই স্বামী-স্ত্রী কিরূপে বন্দী হইয়া এখানে আসিল। তাড়াতাড়ি সে দুইজনকেই

বন্ধনমুক্ত করতঃ বৃক্ষতলে আনিয়া, চোখে–মুখে পানি ছিটাইতে ছিটাইতে আস্তে আস্তে বলিল, "ভয় নেই, আমি মানুষ, চেয়ে দেখ, আমি রাহেল।"

উভয়ে চক্ষু মেলিয়া একবার তাকাইল, কিন্তু সম্মুখে বিকট রাক্ষসমূর্তি দেখিয়া আবার চিৎকার করতঃ চক্ষু মুদিল। রাহেল বুঝিতে পারিল, তাহার এই বিচিত্র বেশভূষা পরিত্যাগ না করিলে ইহাদের জ্ঞান সঞ্চারের কোন আশাই নাই; কিন্তু পাছে বনান্তরাল হইতে কেহ লক্ষ্য করে, সেই ভয়ে ডালপালার আবরণ খুলিতেও সাহস পাইল না।

রাহেল শক্তিমান পুরুষ। সে শীর্ণদেহ আবূ আক্কাসকে বাহুতলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এবং ক্ষীণকায়া আছিয়াকে স্কন্ধদেশে ফেলিয়া নিম্নে গুহাভিমুখে ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল।

সেই গিরিশিখরে উৎসবকারীদের পরিত্যক্ত খাদ্য ও পানীয়ও রাহেল গুহামধ্যে আনিতে ভুলিল না। তাড়াতাড়ি পল্লবাবরণ খুলিয়া আবূ আক্কাস ও আছিয়ার চোখেমুখে আবার সে পানি ছিটাইতেই ধীরে ধীরে তাঁহাদের চেতনা সঞ্চার হইল। আবূ আক্কাস সম্মুখে উপবিষ্ট রাহেলকে দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ে হতবাক। দুই চক্ষু বারবার মুছিয়া তিনি মহানন্দে রাহেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "রাহেল ভাই! তুমি এলে এখানে কোথা থেকে? তুমিই কি আমাদের মুক্ত করলে? কিন্তু এ কি দেখলাম? এক ভয়ঙ্কর দানব যেন এসেছিল? কি দেখলাম? কোথায় সেই দানব?"

রাহেল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "দানব নহে, পাহাড়ের দেবতা! আল্লাহ্‌র মর্জি এক ফুৎকারে তাড়িয়ে দিয়েছি বহুদূরে। এই দেখ দেবতার সাজ–সজ্জা সব কেড়ে এনেছি।" এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিত অদূরে নিক্ষিপ্ত ডালপালাগুলি অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া দিল।

আবূ আক্কাস ও আছিয়া ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। উভয়েই ভাবিলেন, রাহেল বিদ্রূপ করিতেছে। পরক্ষণেই পার্শ্বে রক্ষিত খাদ্য ও পানীয় লক্ষ্য করিয়া তাহারা লুব্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। উভয়ের কাতর নয়ন অশ্রুপূর্ণ।

রাহেল বুঝিতে পারিল, নিদারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় উভয়ের প্রাণ কণ্ঠাগত। অবিলম্বে কিছু আহার্য ও পানীয় তাঁহাদের সম্মুখে দিয়া সে বলিল, "আগে কিছু দানাপানি খেয়ে দিল্ ঠাণ্ডা কর। বন্দী হয়েছিলে কি করে ভাই আবূ আক্কাস?"

আবু আক্কাস এক টুকরা রুটি ও কিছু পানি খাইয়া বলিলেন, "সেই দিন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাহাড়ে ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছিল। আমি গুহার ভিতরে প্রবেশ করবো, এমন সময় কোথা থেকে আবূ ওবায়দা ও তার দলবল এসে আমাকে প্রহারে প্রহারে আধমরা করে বন্দী করলো। আমার স্ত্রী ও শিশু সন্তানগণও পরিত্রাণ পেল না। আমিই রায়হান ও সায়ফুনকে ইসলাম ধর্মের সন্ধান দিয়েছি, আবূ তাহের, আবূ তোরাব ও আবদুর রহমানকে আল্লাহ্ ও রসূলে আকরম (সঃ)-এর গুণ-গরিমা ও সত্য ধর্মের মহিমা বুঝাতে পেরেছি-এই হল আমার অপরাধ। কিন্তু সে সব পরে হবে, আগে বল ভাই, ফেরেশতার বেশে এই সুদূর পাহাড়ে তুমি এলে কোথা হতে?"

রাহেল উত্তর করিল, "সে অনেক কথা। ধীরে ধীরে বলবো সবই। অগ্রে তোমার সন্তান-সন্ততির ভাগ্যে কি ঘটেছে, তাই বল। তাদের না তোমাদের সঙ্গে সেই পাহাড়ের গুহাতেই দেখে এসেছিলাম?"

হাঁ, সেইখানেই ছিল। আবূ ওবায়দা দলবল নিয়ে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে বন্দী করে আনলো, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমাদের সন্তানদের নির্মমভাবে প্রহার করে ফেলে এসেছিল সেই গুহাতেই। হয়তো তারা ভেবেছিল, বন্য পশুরা খেয়ে ফেলবে তাদের। কিন্তু রাহেল ভাই, বেঈমানেরা আল্লাহ্র মহিমা কি বুঝবে? আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন কে তাকে মারতে পারে! ওহ! আল্লাহ্র শোকর-গুজারি করার ভাষা আমার নেই। তোমার ঋণও এ জীবনে শোধ করার নয়!"

"এখনও কি তারা সেই গুহাতেই রয়েছে?"

"না, শুনেছি আমরা বন্দী হবার পর সেই রাত্রেই আবূ ইউসুফ চুপি চুপি এসে তাদের নিয়ে গিয়েছে জাবাল-হুর পাহাড়ে।"

"কোন্ আবূ ইউসুফ?"

আরে, সেই আবুল-আস-ইবনু সা'দের বেটা। যাকে তুমি কত কাণ্ড করে শিবৃলির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলে। শিবৃলিও আছে সঙ্গে। উভয়েই মুসলমান হয়েছে। এইবার হয়তো চিনতে পেরেছ?"

"হাঁ, চিনতে আর পারব না। আল্লাহ্ তাদের মঙ্গল করুন। ভাই আবূ আক্কাস। আমরা স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি দূরে—এ দেশে আর নয়। তোমরা কি পুত্র-কন্যাদের সাথে নিয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে।"

আল্লাহ্ আমাদের মুক্তির জন্যই বুঝি তোমাকে পাঠিয়েছেন। এ সুযোগ কি হারাতে পারি। ছেলেমেয়েদের ত নিয়েই যাব সঙ্গে, আবূ ইউসুফ ও শিবৃলিকেও বাদ দেব না; কিন্তু যাবে কোথায় রাহেল ভাই?"

"চল তো আগে এ স্থান ত্যাগ করি, আবূ ওবায়দার দল এখনই হয়তো ছুটে আসবে তোমাদের সন্ধানে।"

"আবার ফিরে আসবে ভাবছো?" ভাগ্যক্রমে দানবের কবল থেকে যে রক্ষা পেয়েছে-জীবনে এ কথা কেউ ভুলতে পারবে? কিন্তু আমাদের মুক্তি-রহস্য এখনও ত উদঘাটন করলে ন' রাহেল ভাই?"

"সে কিছু না। তোমার মনে পড়ে—কৈশোরে পাহাড়ের ধারে দেও-দানব সেজে রাখাল বালকদের কত ভয় দেখাতাম? তারই একটু পুনরাভিনয় করেছিলাম মাত্র। বল্‌ছি চল। শিগ্‌গির এই স্থান পরিত্যাগ করে আমার অনুসরণ কর।" এই বলিয়া রাহেল কুড়ানো পানির মশক ও খাদ্যদ্রব্যগুলি কাঁধের উপরে তুলিয়া লইয়া পাহাড়ের নীচে নামিতে লাগিল। পশ্চাতে স্বামী-স্ত্রী হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার অনুগমন করিলেন। আছিয়া তখনও সুস্থ হইয়া উঠেন নাই, দেহের বন্ধনজনিত ব্যথা কিছুটা কমিয়াছে মাত্র; পদদ্বয় তখনও মৃদু কম্পমান। মৃত্যুভয়ে ভীতা নারী নবজীবন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু হৃদপিণ্ডের স্পন্দনধ্বনি তখনও বড় দ্রুত, বড় চঞ্চল।

উৎসব করিয়া যাহারা নিরীহ আবূ আক্কাস ও আছিয়াকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, দেবতার দৌরাত্ম্যে তাহাদের সে উৎসব এমনভাবে পণ্ড হইবে, কেহ তাহা কল্পনাও করে নাই। মদ্যভাণ্ড ও অন্যান্য ভোজ্য-সামগ্রী পাহাড়ের উপরেই

পড়িয়া রহিল, কেহ আর সেদিকে পা বাড়াইতেই সাহস পাইল না। অবিলম্বে সকলে দলপতি আবু ওবায়দার সঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে নামিতে লাগিল।

ইবন হারেব হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পিতৃব্য আবূ ওবায়দাকে বলিল, "চাচা! বেঁচে গেছি খুব; কিন্তু দুঃখ রইল, বদমায়েশ আবূ আক্কাস ও তাঁর স্ত্রী আছিয়াকে হত্যা করে আসতে পারলাম না।"

আবূ ওবায়দা গিরিদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া বলিল, "আরে নির্বোধ! দেবতার মাহাত্ম্য তুই কি বুঝবি? এতক্ষণে ক্ষুধার্ত লাম্‌পিনি নিশ্চয়ই বন্দী ও বন্দিনীর লহু পান করে তুষ্ট হয়েছেন। ঐ শোন, তাঁর চিৎকার-ধ্বনি আর কানে আসে না। দেবতা সন্তুষ্ট হ'লে আমাদেরই মঙ্গল, কিন্তু তাঁর ক্ষুধা না মিটলে আমাদের কারো রক্ষা নেই জানবে; ছোঁ মেরে এখনই হয়তো কাউকে টেনে নিয়ে হত্যা করবে। মুসলমানেরা দেবতাকে বিশ্বাস করে না। এখন দেখলে তো সব? সকলেই ত স্বচক্ষে দেখলে? দেবতাকে প্রণাম কর।"

আবূ ওবায়দার সঙ্গী আবূ নাসীর ভয়ে আধমরা হইয়া উঠিয়াছিল। মুখমণ্ডলের ঘর্মবিন্দু মুছিতে মুছিতে সে বলিল "বাপ্‌রে, কি বিকট মূর্তি! জীবনে ভুলতে পারবো না। চাচা! পিয়াসে প্রাণ বের হয়ে গেল! আর বুঝি বাঁচি নে।"

কায়েস ছুটিয়া আসিয়া আবূ ওবায়দার দুই হাত ধরিয়া বলিল, "সর্দার রক্ষা কর; একটু পানি দাও, দিল্ ঠাণ্ডা করি।"

আবূ ওবায়দা বিরক্তিভরে হাত ছাড়াইয়া বলিল, "পানি কোথায় পাবরে হতভাগা? সব তো লেগেছে দেবতার ভোগে। কেন, দেখিসনি? সাহস থাকে ত যা না। নিয়ে আয় গিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে।" এই বলিয়া সে উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

কায়েস দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "বাপরে! আবার! তুমি ক্ষেপেছ সর্দার? পানি না খেয়ে বরং এখানেই মরবো! এতক্ষণে দেবতা নিশ্চয়ই আবূ আক্কাসের বউটাকে কচ্‌কচ্ করে খেয়েছে, তার দু'কশ বেয়ে মেয়েটার টাটকা লহু গড়িয়ে পড়ছে। আবার সেখানে! সাত সালাম বাবা, এখানে আমার কবর খোঁড়, সে-ও ভাল।"

ইবন্ হারেব চেঁচাইয়া উঠিল, "বাপ্‌রে, কি কর্কশ আওয়াজ। কি দেখলাম চাচা?–দেবতা, জিন, শয়তান, না ইফ্‌রাত? পালাই চল। লামপিনি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আবার না ছুটে আসে এদিকে।"

আবূ ওবায়দা পাহাড়ের নীচে বাঁধা অশ্বটিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বলিল, "তা' আর বলতে? এমন জানলে এই গিরিদেবের আবাসে কি আসতাম কখনও? কি জানি দেবতা যদি রুষ্ট হয়ে থাকেন? শিগ্‌গির পালাও!" এই বলিয়া সে এক লম্ফে অশ্বে আরোহণ করিয়া জোরে কশাঘাত করিল।

তন্মুহূর্তে সকলে সর্দারের পিছনে আপন আপন অশ্ব ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিল। সম্মুখে লূ-হাওয়া ও প্রখর রৌদ্র এবার আর কেহ গ্রাহ্যই করিল না।

ছাব্বিশ

সেই নিশীথে অশ্বারোহী যুবকদ্বয় সায়ফুনকে বন্দী করিয়া বনপ্রান্তে যে স্থানে লইয়া আসিল তাহা এক বেদুঈন-পল্লী। সেখানে এক উন্মুক্ত বালুকাময় প্রান্তরে ছোট ছোট বহু তাঁবু পাতলা অন্ধকারে ঝাপসা ঝাপসা সায়ফুনের দৃষ্টিগোচর হইল। সে বুঝিল, মৃত্যু সুনিশ্চিত, নিষ্ঠুর বেদুঈনদের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন আশাই নাই। আজ প্রিয়জনকে হারাইয়া তাহার জীবনের প্রতি কোন মোহও আর নাই। সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া এই কথাই তাহার বারংবার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল কী আশায় তবে ছুটিয়া আসিলাম? কেন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলাম? যদি জন্মের মত প্রিয়জনের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, তবে এ জীবনে আর প্রয়োজনই বা কি! আহা! কেন আত্মহত্যা করিলম না। এই বর্বর বেদুঈনদের হাতে লাঞ্ছিত বন্দী-জীবন যাপন করিতেই কি মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম? বুঝিলাম, মৃত্যুদূত আমার সঙ্গে উপহাস করিয়াছে। শুধু তিক্ততায় হৃদয়তল ভরিয়া দিতে আমাকে পাঠানো হইয়াছে বেদুঈনদের আবাসে। দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান যুবকদ্বয়কে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আর নিয়ে যাচ্ছ কোথায়? কেনই-বা মিছেমিছি বিলম্ব করছো? অবিলম্বে আমার প্রাণ সংহার করে তোমরা তৃপ্ত হও, আমাকেও এই অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দাও।"

যুবকদ্বয় উত্তরে কিছুই বলিল না, বন্দিনীকে সঙ্গে লইয়া সোজা চলিয়া গেল সর্দারের তাঁবুতে। ততক্ষণে পূর্বাকাশ অনেকটা ফর্সা হইয়া উঠিয়াছে।

বাহিরে টাঙানো একটা দফের গায়ে দুই তিনবার মৃদু আঘাত করিতেই ভীষণ-দর্শন এক প্রৌঢ় সর্দার তাঁবুর বাহিরে আসিল। তাহার স্কন্ধদেশবিলম্বিত কেশগুচ্ছ বড় এলোমেলো, পরিধানে শুধু ময়লা ঢিলা ইযার, কোমরে একখণ্ড বস্ত্র বাঁধা। তাহার আকর্ষণ বিস্তৃত চক্ষুদ্বয় অন্ধকারে চকচক করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁবুর বাহিরে আড়াআড়ি রক্ষিত একখানা দীর্ঘ বর্শা কুড়াইয়া লইয়া ক্রূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীর পদক্ষেপে গম্ভীরভাবে সে বন্দিনীর সম্মুখীন হইল।

সায়ফুনের অন্তরাত্মা দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে যেন ছটফট করিয়া মরিতেছে। সর্দারের প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ দেহ, দীর্ঘ বাহুযুগল এবং হিংস্র মূর্তি দেখিয়া সে ভাবিল-সাক্ষাৎ আজরাইল সম্মুখে উপস্থিত, এখনই বর্শাফলক তাহার বক্ষদেশ এপার ওপার ভেদ করিয়া ফেলিবে। হতভাগিনীর মস্তিষ্ক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, তাহার সর্বাঙ্গ উজাড় করিয়া রক্তস্রোত মস্তকে যেন ভিড় করিয়াছে। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম।

সর্দার বন্দিনীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, "এ কি। নারী। কুরাইশ নারী" সারারাত্রি পাহারা দিয়ে শেষটায় কিনা বন্দী করে আনলে এক আওরতকে?"

ক্রোধে সর্দারের দুই চোখে যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়ে। তাঁবুর সম্মুখে সে পায়চারী করিতে করিতে বলিল, "না, নারী হোক, পুরুষ হোক, কেউ আর নিস্তার পাবে না। কুরাইশ আমাদের জাত শত্রু, নির্বিচারে ধ্বংস করে হত্যার প্রতিশোধ নেবে। যাও, একে আমার কন্যার হেফাজতে রেখে তোমরা গিয়ে বিশ্রামকর। বেটি নিজ হাতে তার মুণ্ডচ্ছেদ কর অন্তরের জ্বালা দূর করুক। বলে দাও-কাল প্রভাতেই এর ছিন্ন শির আমি দেখতে চাই।" এই বলিয়া সর্দার তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল।

ব্যথাভারে সায়ফুনের নিষ্পিষ্ট অন্তরও কত কঠোর, কত নির্মম। মুহুর্মুহু মরণ যে কামনা করে মৃত্যুদণ্ড তাহাকে আর ব্যাকুল করিবে কেন? তথাপি মস্তিষ্কের উত্তাপ শনৈঃ শনৈঃ যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

উদাস দৃষ্টিতে শূন্য প্রান্তরে সে নির্বাক তাকাইয়া রহিয়াছে। যুবকদ্বয় কখন তাহার অশ্বের লাগাম টানিয়া অপর এক তাঁবুর দ্বারদেশে লইয়া আসিল, ইহা সে টেরও পাইল না।

কোলাহল শুনিয়া তাঁবুর ভিতর হতে যে ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল, সে এক সুন্দরী বেদুঈন-কন্যা। যুবতীর আলুথালু বেশ, আলুলয়িত কেশ। সদ্য-নিদ্রোথিতা নারী ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, দ্বারদেশে দুই বেদুঈন যুবক-মামুন ও মাসুম দণ্ডায়মান, এক অশ্বারূঢ়া যুবতী। অন্ধকারেও বেদুঈন-কন্যা বুঝিতে পারিল, সেই নারী বেদুঈন নহে। সে তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকিয়া প্রদীপ

জ্বালিয়া আনিতেই মামুন গম্ভীরভাবে বলিল, "এইবার তোমার বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এই নাও তরবারি। সর্দারের আদেশ–প্রভাতেই তুমি নিজ হস্তে এর শিরচ্ছেদ করবে।"

অবসাদগ্রস্তা সায়ফুন নিদারুণ নৈরাশ্যে বেদুঈন–কন্যার প্রতি অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "জানি না, তোমাদের নিকট কি অপরাধে আমি অপরাধিনী, তবুও তোমার প্রদত্ত শাস্তি মাথা পেতে নেব। লও তরবারি, এতে তোমার আত্মার শান্তি হয় হউক, আমার যন্ত্রণারও অবসান ঘটুক।"

বেদুঈন–নারী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথা থেকে নিয়ে এলে মামুন?"

মামুন উত্তর করিল, "মাঠের অপর ধারে বনমধ্যে আমরা পাহারায় ছিলাম। রাত্রিশেষে দেখি, দূরে এক পুরুষ যেন আগে আগে দৌড়ায় আর পশ্চাতে অশ্বারোহণে এই নারী। ছুটে গেলাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না। প্রায় কাছাকাছি গিয়েছি, এমন সময় যুবক এক পল্লীকুটীরে প্রবেশ করে। তাকে কিন্তু কুরাইশ বলে মনে হলো না; কিন্তু এই নারী নিশ্চয়ই কুরাইশ–বংশীয়া, এ আমাদের দুশমন। একে কতল করতেই হবে।"

বেদুঈন–কন্যা উত্তর করিল, "আচ্ছা, প্রভাতে এর দণ্ডবিধান করবো। তোমরা গিয়ে বিশ্রাম কর এখন।" এই বলিয়া সে সায়ফুনের হস্ত ধারণপূর্বক তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া তাঁবুর ভিতরে খেজুর পাতার দড়ির তৈরি একখানা খাটিয়ায় নিয়া বসাইল।

সায়ফুন কেমন যেন আশ্চর্যান্বিত হইয়া বেদুঈন–বালার মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। দেখিল, সুন্দর মুখমণ্ডলে ক্লান্তির ছায়া পরিস্ফুট; চক্ষুকোণ কালিমালিপ্ত, রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ –অকালে যৌবন গাঙে যেন ভাটা পড়িয়াছে। কতক্ষণ উভয়েই নীরব। বেদুঈন–কন্যা কি যেন ভাবিতে ভাবিতে তাঁবুর ভিতরে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করিতে লাগিল।

সায়ফুনের কণ্ঠতালু শুষ্ক। জড়িত কণ্ঠে কোনক্রমে সে বলিল, "আবার প্রভাতের অপেক্ষায় কেন? আমার কাতর অনুরোধ–এখনই হত্যা করে সকল যন্ত্রণার অবসান কর, আমার আত্মার মুক্তি দাও।"

বেদুঈন–নারী অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল, "কেন, মৃত্যু যত বিলম্বে আসে ততই ত মঙ্গল। জীবন–রজ্জু যতটুকু টেনে বাড়াতে পার ততটুকুই ত লাভ। মরণের পর তোমার আত্মা কবরের অন্ধকারে হুটোপুটি করবে, পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে ঘুরে বেড়াবে, অন্ধকারে প্রেতাত্মা সেজে পথিকের ঘাড় মটকাবে; দুই চোখে তখন দেখবে না আর পৃথিবীর এত রঙরস, এত আমোদ–আহ্লাদ, এত আলো–হাওয়া–সেই মৃত্যুই কি তোমার কাম্য?"

সায়ফুন বিস্ময়ে কতক্ষণ হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল, "তবে কি আমাকে হত্যা করবে না?"

বেদুঈন–কন্যা আড়চোখে তাকাইয়া বলিল, "নারী কি কখনও নারীকে হত্যা করতে পারে? আর একটা উৎসব না করে একা একাই কি হত্যা করবো ভেবেছো?"

একজন কুরাইশ কন্যাকে বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে শুনিয়া বেদুঈন পল্লীর অনেকেই তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে তুমুল শোরগোল।

কয়েকজন স্ত্রী–পুরুষ বন্দিনীকে দেখিবার জন্য ইতিমধ্যে সর্দার–কন্যার তাঁবুর বাহিরে ভিড় করিয়াছে। কিন্তু সে তাহাদিগকে স্ব স্ব তাঁবুতে পাঠাইয়া দিয়া দরজার পর্দা ফেলিয়া দিল। তারপর সায়ফুনের সম্মুখে পায়চারি করিতে করিতে ক্রূর স্বরে বলিল, 'তোমরা কুরাইশ–আমাদের দুশমন। তোমরাই না আমার বুকে যতসব দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ? কেন দিলে? কেন আমার যৌবনের যতসব সঞ্চয় বিফল করে দিলে? হালকা–পাখা পাখীর ন্যায় উড়ে বেড়াতাম যেখানে সেখানে, পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটাছুটি করতাম। কিন্তু কেন আমার হাত–পা তোমরা ভেঙে দিলে? ক্ষমা। না না, আমার আঠার বছরের নষ্ট–যৌবন ক্ষমা করতে জানে না। দুর্বল যারা ক্ষমার হাত তারাই ত বাড়ায়, ক্ষমার মাহাত্ম্যও তারাই প্রচার করে। জানি, তোমার জীবন নষ্ট করলে আমার সে সুখ আর ফিরে পাব না; কিন্তু

এক–একবার মনে হয় উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ছুটে যাই দিগ্বিদিকে, নির্বিচারে নরহত্যা করে অন্তরের খেদ মিটাই।"

নিষ্ফল প্রতিহিংসার পুঞ্জীভূত মর্ম–যাতনায় যুবতীর ডাগর চোখে যেন আগুনের ফুলকি। কিন্তু পরক্ষণেই নিদারুণ নৈরাশ্যে দুঃখিনীর দুই নয়নে নামিয়া আসিল বিরামহীন অশ্রুধারা।

কতক্ষণ নীরব থাকিয়া মনকে সংযত করতঃ হতাশ কণ্ঠে পুনরায় সে বলিতে লাগিল, "না, না, কি হবে তাতে। যাকে হারিয়েছি তাকে কি আর ফিরে পাব? জীবনে বিরহ জ্বালা এই আমার প্রথম, এই শেষ; জীবন নাট্যের যবনিকাও বুঝি ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু কেন দিলে? কেন আমার সুখের নীড় এমন করে ভেঙে দিলে? কে তুমি? তুমিও কি দুঃখিনী? নিস্তার পাবে না তবু। আমার পিতার বজ্র–কঠিন আদেশ বড় নির্মম, বড় কঠোর। সে আদেশের ব্যত্যয় নেই।" পরক্ষণেই ঘুরিয়া তাঁহার কাছাকাছি আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, বলবে তুমি কে? কেন হলো তোমার এ দশা?"

বেদুঈন–কন্যার কণ্ঠস্বর আবেগভরে রুদ্ধপ্রায়। বিরহিনী শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার সে হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পাগলিনীর ন্যায় বসন–ভূষণ ফেলিয়া সায়ফুনের নিকটে আসিয়া বলির, ব্যস্তভাবে তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল না, কে তুমি? তুমিও কি কুরাইশ?"

সায়ফুন একবার ভাবিল, বেদুঈন হইলেও এই নারী ঠিক বেদুঈন–প্রকৃতি লাভ করে নাই, নিষ্ঠুর পৈশাচিক আবেষ্টনের মধ্যেও তাহার অন্তরে মায়া–মমতার বীজ যেন উপ্ত রহিয়াছে; আবার সে ভাবিল হয়তো নারী প্রকৃতিস্থা নহে। কিন্তু তাহাতে কি–ই বা আসে যায়। তাহার নিজের ভবিষ্যত ত অন্ধকার–সর্দারের আদেশ নাকি অলংঘনীয়। সায়ফুন স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

বেদুঈন–কন্যা তাহার হাত দুইটিতে ঝাঁকুনি দিয়া পুনরায় বলিল, "বল না, তুমি কে?"

সায়ফুন জানিত, নিজের দুঃখময় কাহিনী বলিয়া আর লাভ নাই, তাহার শেষ মুহূর্ত ত ঘনাইয়াই আসিয়াছে। তবুও বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া কাহিনীটি তাহাকে সংক্ষেপে বলিতেই হইল। ততক্ষণে রাত্রি প্রায় শেষ। পূর্বাকাশে শুকতারা দেখা দিয়াছে। চারিদিকে ভোরের আভাস।

কাহিনী শুনিয়া বেদুঈন-কন্যা কিছুকাল চিত্রার্পিতবৎ অনিমেষ নয়নে সায়ফুনের মুখের দিকে নির্বাক তাকাইয়া রহিল। তারপর বলিল, "কিন্তু, তোমার সেই বাঞ্ছিত পুরুষটির নাম ত বললে না? সন্ধ্যাকালে কোথায় তাকে দেখেছিলে?"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস সায়ফুনের অন্তর আলোড়িত করিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "তিনি ওকায়া বংশের বীর সৈনিক রায়হান। সন্ধ্যাকালে তাঁকে ঈসের জঙ্গলে প্রবেশ করতে দেখে ছুটেছিলাম অন্ধকারে পিছু পিছু; কিন্তু যা পেয়েছি বলেছি। অপরের জীবন বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুকে যে বরণ করেছি, তা' ত বুঝেছি! তুমিও তা' নিজেই দেখছো।"

বেদুঈন-নারী বিস্ময়-বিহবল-কণ্ঠে বলিল, "কি বললে? রায়হান! ওকায়া বংশের বীর-সন্তান তোমার মাশুক!" তাহার যেন আর বাক্যস্ফুরণ হয় না। কিছুক্ষণ যাবত সায়ফুনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কি যেন সে ভাবিতে লাগিল। তারপর জড়িত কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন তিনি বলেছিলেন?"

সায়ফুন বেদুঈন-কন্যার চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। উত্তরে বলিল, "শুনেছিলাম-বৃদ্ধ আয়াযের কাছে তিনি সমুদ্রপথের সন্ধান নিয়েছিলেন, বোধ হয় সেই দিকেই গিয়েছেন।"

তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া বেদুঈন-কন্যা তাঁবুর দ্বারদেশে আসিয়া হাঁকিল, "রাহেলা! হাসিনা।!"

ডাক শুনিয়া অপর তাঁবু হইতে দুই বেদুঈন-যুবতী ছুটিয়া আসিল। সর্দার-কন্যা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই তাঁবুতে এক বন্দিনী রয়েছে, দেখিস যেন পালায় না। দেখিস, কেউ যেন তার কেশাগ্রও স্পর্শ না করে। আব্বার আদেশ-আমি স্বহস্তে তার শাস্তিবিধান করবো।" এই বলিয়া দ্রুতবেগে সে বাহির হইয়া মাসুম ও মামুনকে ডাকিয়া আনিল; তাঁবুতে তাঁবুতে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি

করিয়া পল্লীর অন্যান্য যুবকদেরও একত্রিত করিল। তারপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিতে লাগিল, "যে নারীকে তোমরা বন্দী করে এনেছ–সে কুরাইশ; তার সঙ্গী পুরুষটি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সমুদ্রোপকূলে পলায়ন করেছে, ত্বরায় অশ্বপৃষ্ঠে সমুদ্রতীরে চল। তাকেও আনতে হবে বন্দী করে। একসঙ্গে উভয়ের শাস্তিবিধান করবো। পারবে তাকে ধরে আনতে? পারবে কি বেদুঈন হত্যার প্রতিশোধ নিতে? যাও, এই মুহূর্তে প্রস্তুত হও।"

খোঁচা–খাওয়া সিংহের ন্যায় তর্জন–গর্জন করিতে করিতে যুবকদল আপন আপন অশ্বের তল্লাশে আর অস্ত্রের সন্ধানে ছুটিল। কেহ দ্বিরুক্তি করিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। কালবিলম্ব না করিয়া সর্দার–কন্যাও পিতার অশ্বশালায় প্রবেশ করিল।

নিস্তব্ধ বেদুঈন–পল্লী অসময়ে অকস্মাৎ কোলাহল–মুখর হইয়া উঠিল। সর্বত্র এক অপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য, অনুপম কর্মব্যস্ততা। অল্পক্ষণ মধ্যেই যুবকদল অশ্বপৃষ্ঠে বনাভিমুখে ছুটিল–সর্বাগ্রে সেই বেদুঈন–নারী। চারিদিকে অন্ধকার আর নাই। প্রত্যূষের স্নিগ্ধ সমীরণ সুপক্ক খর্জুর ফলের, আঙুরের ও জাফরান ফুলের গন্ধ বহিয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে প্রবহমান। একে একে বনের পাখী সেই মধুর প্রভাতে সমস্বরে সুমধুর সঙ্গীত শুরু করিয়া দিয়াছে।

সদ্যজাগ্রত সর্দার বাহিরে আসিয়া দেখে,বেদুঈন–দল প্রান্তরে বহু দুরে চলিয়া গিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে তাহারা ছুটিয়াছে–সে কথা শুনিয়া, রোষে সে অধরোষ্ঠ দংশন করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, পারিস্ ত মনের খেদ মিটিয়ে নে তুই পরাণভরে, প্রতিহিংসায় লহুর দরিয়া যদি বহাতে পারিস্ তবেই বলবো শাবাশ্ বেটী। বাপকা বেটী!"

সর্দার–কন্যা জঙ্গলের প্রান্তদেশে পৌছিয়া চারিদিকটা একবার পর্যবেক্ষণ করার মানসে এক উচ্চ টিলায় আরোহণ করিল। দেখিল, জঙ্গলের এক স্থান হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম্রপুঞ্জ যেন বহু উর্ধ্বে উত্থিত হইতেছে। তৎক্ষণাৎ সে সেইদিকে তাহার সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

মামুন চেঁচাইয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই ঐ স্থানে কোন লোকালয় আছে। যাকে আমরা খুঁজতে এসেছি, তাকেও হয়ত্তো সেখানেই পাওয়া যাবে। চল, একবার দেখে আসি ওখানটায়।"

বেদুঈন–কন্যা দলবলসহ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে যথাসম্ভব দ্রুত অশ্ব চালনা করিতে লাগিল। এখানে ওখানে জঙ্গল বেশ পাতলা বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালা দুর্লংঘ বাঁধার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের গতি বড় মন্থর করিয়া তুলিয়াছে।

সূর্যোদয়ের বিলম্ব নাই; তবু বনমধ্যে অন্ধকার তেমন দূরীভূত হয় নাই। পাছে দিগ্‌ভ্রম হয়, এই ভয়ে মামুন আর একবার উচ্চ বৃক্ষশাায় আরোহণ করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের সন্ধান করিতে লাগিল। এইবার সে দেখিল, কুণ্ডলীকৃত ধূম্রপুঞ্জ আর নাই, কেবল একটা ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা বায়ু প্রবাহে শূন্যে ভাসমান। বুঝিল, নিকটেই বনমধ্যে কোথাও রহিয়াছে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। মামুন তাড়াতাড়ি নামিয়া সর্দার–কন্যাকে সেই কথা বলিতেই সে সকলকে লইয়া সেই দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

সাতাশ

প্রত্যূষে ঈসের জঙ্গলে একসঙ্গে নামায আদায় করিয়া স্বদেশ বিতাড়িত দুঃস্থ মুসলমানগণ তখন তখনই সমুদ্র পাড়ি দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। জোয়ারের পানি উপরে উঠিয়াছে। কাষ্ঠনির্মিত বিশাল তরণীখানি জঙ্গলের ধারে নদীর কিনারে ভাসমান। জোয়ারের পানিতে প্রায় অর্ধক্রোশ অবধি দাঁড় টানিয়া সমুদ্রে নামিতে হইবে, তারপর পাল খাটান চলিবে। নৌকায় ছোট-বড় তিনখানা পালই একসঙ্গে তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবূ আব্বাস ও হাবীব ছদ্মবেশে আদন বন্দরে গিয়া বহুকষ্টে নৌকার পাল ও সাজসরঞ্জাম পূর্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গত সন্ধ্যায় নৌকা ভাসাইয়া উপরে যে সুবৃহৎ ছই খাটান হইয়াছিল, তাহার ভিতরে যাত্রীদের শয়ন-উপবেশন চলিবে। নৌকার খুঁটিনাটি বাঁধন-কষণ শেষ হইলে, দাঁড় বাঁধিয়া,পাল খাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া, নৌকাখানিকে সমুদ্রে চালানোপযোগী করিতে আরও কিছু সময় কাটিয়া গেল।

ততক্ষণে অন্ধকার আর নাই। পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়-মৃদু-মন্দ বাতাসে ও তরঙ্গাঘাতে নদীতীরে বন্ধনাবস্থায় নৌকাখানি দুলিতেছে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত হয়তো ইহা সহ্য করিতে পারিবে; তথাপি প্রয়োজনমত সংস্কার সাধন করিতে কিছু অতিরিক্ত কাষ্ঠ, কাঠ কাটিবার যন্ত্রপাতি, হাতুড়ি, রজ্জু প্রভৃতি সরঞ্জাম নৌকায় লওয়া হইল। উদ্যোগ-আয়োজনে যাত্রীদের ছুটাছুটির শেষ নাই, উদ্দীপনারও বিরাম নাই।

কয়েকটি বৃহৎ পাত্রে পানীয় জল ভর্তি করিয়া নৌকায় পাটাতনের তলায় সযত্নে রাখা হইয়াছে। এক কোণে ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রক্ষিত। এইবার সকলে প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটি জিনিসপত্র বহন করিয়া আনিতে গুহাভিমুখে ছুটিয়াছে। জাফর রায়হানকে সঙ্গে লইয়া নিজেই সবকিছু তদারক করিতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত।

দীর্ঘকাল সমুদ্রে কাটাইবার মত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর কিছুই বাকী রহিল না। সুনিপুণ নৌ-শিল্পী আবূ আব্বাস ও আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে সকলে এই বনানীর কোলে নিশিদিন পরিশ্রম করিয়া যে সুবিশাল জলযান নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট না হইলেও নিকৃষ্ট যে নয়-এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে বড় বড় নৌকা পাল তুলিয়াই অকূল সাগরে পাড়ি জমাইত। বৈজ্ঞানিকের কল্পনারাজ্যে যান্ত্রিক জলযানের অভিনব রূপ তখনও মূর্ত হইয়া উঠে নাই।

এইবার স্বদেশের বনভূমিতে শেষবারের মত আহার-পর্ব সারিয়া লইবার জন্য কয়েকজন যুবক গুহার বাহিরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। জোয়ার বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু সাদামাটা সামান্য খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিতে আর কতক্ষণ। গুহাবাসীদের অনেকে দীর্ঘকাল সে-গুহায় বসবাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু শত্রুভয়ে কখনও গুহার বাহিরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে সাহস পান নাই; কি জানি, দূরের পাহাড়ের উপর হইতে শত্রুগণ যদি ধূম্রজাল লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সন্ধানে ছুটিয়া আসে। আজ যাত্রার প্রাক্‌কালে গুহার বাহিরে এই প্রথম তাঁহারা আগুন জ্বালিলেন।

স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে তাঁহারা আশ্রয় খুঁজিতে যাইতছেন-এই চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইতেই সকলের অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল। আজ জঙ্গলের এই অন্ধকার গুহাটি ছাড়িয়া যাইতে কেমন যেন বড় মায়া হইতেছে। তাহাদের অন্তরে এই কথাই বারবার গুমরাইয়া উঠিতেছে-বিদেশীর রাজপ্রাসাদে আশ্রয়লাভ অপেক্ষা স্বদেশের গভীর জঙ্গলে এই গুহামধ্যে বাস করাও যে ছিল সহস্র গুণে শ্রেয়; কিন্তু কি করা যায়! সমাজের বাহিরে লোকালয় হইতে বহুদূরে এই বিজন বনে বাস করিবারও উপায় নাই। শত্রুর গুপ্তচর চারিদিকেই নিশিদিন তাঁহাদের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। কেহই নিজের অন্তরকে বুঝাইতে পারিলেন না-কেন, কী অপরাধে আজ তাহাদিগকে এমনভাবে রিক্ত হস্তে স্বদেশ হইতে বিদায় লইতে হইতেছে? তাহারা জড়-পাথরের পূজারী নহে, নানা দেব-দেবী ও জড়-প্রকৃতির উপাসক নহে; তাহারা অন্ধবিশ্বাসে আস্থাহীন কুসংস্কার-মুক্ত মুসলমান—ইহাই কি তাহাদের অপরাধ? এই তাহাদের দেশ। আশৈশব এই দেশে তাহারা লালিত-

পালিত। দেশের মাটি, দেশের বালি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমির লু-হাওয়া তাহাদের কত পরিচিত, কত অন্তরঙ্গ; দেশের ফলমূল, দেশের খাদ্যসম্ভার, তাহাদের প্রতি রক্তবিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে; কিন্তু আজ তাহারা স্বদেশ-তাড়িত, স্বদেশের অধিকারে বঞ্চিত। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। দুর্বিষহ মনোবেদনায় প্রত্যেকের নয়নযুগল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুকণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

দুই-তিনজন যুবক আগুনের ধারে নির্বাক বসিয়া কয়েকটা মোটা মোটা রুটি সেঁকিতেছিল। আবদুল্লাহ্, ওমর,হাবিব, আবূ তাহের প্রমুখ আরও কয়েকজন যুবক মিলিয়া নিকটস্থ খর্জুর-বীথিকা হইতে কয়েক ঝুড়ি সুপক্ক খর্জুর-স্তবক কাটিয়া আনিলেন। এমন সময় দূরে বনমধ্যে যেন বহু ধাবমান অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। তন্মুহূর্তে সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে। অবশিষ্ট আহার্য আর রন্ধন করা সম্ভব হইল না। সেঁকা রুটি এবং খর্জুর-বোঝাই ঝুড়িগুলি তখন তখনই তুলিয়া লইয়া সকলে একসঙ্গে দ্রুতপদে নৌকার দিকে ছুটিলেন।

জাফর ও তাঁহার সঙ্গিগণ অশ্ব-খুরধ্বনি শুনিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। সে শব্দ মাঝে মাঝে মন্দীভূত হইয়া কতক্ষণ পরে আবার স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। সকলে বিষণ্ন মনে ভাবিয়া আকুল-এই বিজনবনে কাহারা ছুটিয়া আসিতেছে! বুঝি বা শত্রুদলই তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছে।

অবিলম্বে জাফর সকলকে ডাকাডাকি করিয়া নৌকায় উঠাইলেন। দেখিলেন, একমাত্র আবূ তাহের ছাড়া আর সকলেই নৌকায় উপস্থিত। এখনও কোথায় রহিল আবূ তাহের। সকলে তাঁহার জন্য মহাব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আবদুল্লাহ্ এক লম্ফে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আবূ তাহেরের সন্ধানে সেই পরিত্যক্ত গুহাভিমুখে ছুটিলেন।

এদিকে অশ্ব-খুরধ্বনি ক্রমেই যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। নৌকারোহীগণ প্রতি মুহূর্তে শত্রুর আগমনাশঙ্কায় মুহ্যমান। আবদুল্লাহ্ ও আবু তাহেরের মন-প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া তাঁহারা তটদেশে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ

পরেই আবদুল্লাহ্ ও আবু তাহের পৃষ্ঠদেশে দুই বোঝা জ্বালানি কাষ্ঠ বহন করিয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিলেন।

আবূ তাহের কৈফিয়তের সুরে জাফরকে বলিলেন, "নৌকায় জ্বালানি কাঠ বড় কম লওয়া হইয়াছিল জাফর ভাই! মাঝ দরিয়ায় ফুরিয়ে গেলে মহা ফ্যাসাদ হতো আর কি!"

জাফর এ-কথার কোন উত্তর দিলেন না। সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! সাহস সঞ্চয় কর, ধৈর্য ধর; রহ্মানুর রহীমের করুণায় নির্ভরশীল হও। আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি মহব্বতের যে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সকলে এই স্থানে মিলিত হয়েছি, তা' যেন ব্যর্থ না হয়। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসিগণ ভ্রান্ত পথ ধরেছে। বন্ধুগণ! আমরা মাত্র গুটিকয়েক মুসলমান, তা'ছাড়া অস্ত্রবলেও বলীয়ান নই। মনে হয়, আক্রমণকারিগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বহু সংখ্যক পৌত্তলিক; কাজেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নির্বুদ্ধিতার একশেষ হবে। চল, এই মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ করে দরিয়ায় ভেসে যাই! কিন্তু কে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন? কে আমাদের অধিনায়ক হবেন?"

রায়হান সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় দলপতি হওয়ার মত উপযুক্ত লোক জাফর ভাই। তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি এখানে আর কেউ আছে বলে ত মনে হয় না। এতে কোন দ্বিমত হবে কি?"

সকলে 'না, না' বলিয়া উত্তর করিয়া হর্ষধ্বনি সহকারে জাফরকে অধিনায়ক পদে বরণ করিলেন। জাফর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! নৌ-বিদ্যায় আমার কতকটা অভিজ্ঞতা আছে বটে, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় আপনারা অধিকতর পারদর্শী। স্বদেশের যুদ্ধবিগ্রহে আপনারা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন বহুবার। দরিয়ায় নৌকা চালানোর ভার আমি নিলাম বটে, কিন্তু প্রয়োজনবোধে এই মুষ্টিমেয় মুজাহিদদের নিয়ে শত্রুদলে ঝাঁপিয়ে পড়বে কে? সমুদ্রপথ নিরাপদ নয়, পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা। দরিয়া ছেড়ে নদীপথে মূল্‌কে হাবাশে প্রবেশ করলে দুর্ধর্ষ হাবশিগণও যে কোন মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। কে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পরিচালনা করবেন?"

আবূ আক্কাস উত্তরে বলিলেন, "রায়হান বীর-পুরুষ, বীরত্বের সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। ওহুদের যুদ্ধে তিনি যে শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কখনও ভুলবার নয়। সেনাপতি পদে তাঁকেই বরণ করা উচিত।"

জাফর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আমিও ঠিক তা'ই মনে করি। আপনারা কি সকলেই একমত?"

সকলে পুনরায় হর্ষধ্বনি করিয়া এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে জাফর অবিলম্বে নৌকা ছাড়িতে আদেশ দিলেন।

যাত্রিগণ মহোল্লাসে সমস্বরে 'আল্লাহু-আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন জোয়ারের মুখে। নৌকার দুই ধারে দশটি দাঁড়ে দশজনকে বসাইয়া পিছনে হাল ধরিয়া বসিলেন জাফর নিজে। তরণী অনুকূল স্রোতে তীরবেগে ছুটিতে লাগিল।

তরীখানি নদীপথে কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় যাত্রীগণ অবাক হইয়া দেখেন, জঙ্গল ভেদ করিয়া নদীতীরে প্রায় বিংশতি অশ্বারোহী কোথা হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে-সকলের পুরোভাগে এক অশ্বারূঢ়া নারী। রমণী নৌকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া অনুচরদের কি যেন বলিতেই তাহাদের কয়েকজন তন্মুহূর্তে নৌকারোহীদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুক উত্তোলন করিল; কিন্তু কি জানি কেন স্ত্রীলোকটি আবার হাত উঠাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিল। নদীতীরে দণ্ডায়মান যুবকগণ নিষ্ফল ক্রোধে কেবলই আস্ফালনে রত, যুবতীর অপলক দৃষ্টি কিন্তু নৌকার দিকেই নিবদ্ধ।

নৌকারোহীগণ দূর হইতে সেই নারী ও পুরুষদের চিনিতে পারিলেন না। তাঁহারা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন-কোথা হইতে ইহারা এই প্রত্যূষে ছুটিয়া আসিয়াছে? কে-ই বা উহারা? আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বড়জোর বাঁচিয়া গিয়াছে-এই মনে করিয়া সকলে আল্লাহ্‌র দরগায় শুকরিয়া আদায় করিতে করিতে জোরে দাঁড় টানিতে লাগিলেন।

নৌকা নদীর বাঁক ঘুরিতেই অশ্বারোহীগণ দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। নদীতটে দণ্ডায়মান খর্জুর বৃক্ষগুলির গলদেশে রাশি রাশি খর্জুর স্তবক তখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই তটদেশে ছাড়াছাড়া গাছপালাগুলি জোয়ারের পানিতে যেমন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জঙ্গলের ধারে ধারে পানির উপরে অসংখ্য পাখী এক-একবার উড়িতেছে, আবার তটদেশে বৃক্ষশাখায় বসিতেছে, আবার উড়িতেছে। রায়হান উদাস মনে লক্ষ্য করিলেন, কিয়দ্দূরে নদীতীরে শুষ্ক বৃক্ষশাখায় বসিয়া এক লম্বচঞ্চু সারস চঞ্চুপুটে প্রেয়সী সারসীর মস্তকে ও গ্রীবাদেশে সুড়সুড়ি দিয়া মনোরঞ্জন করিতে ব্যস্ত, সারসী অর্ধনিমীলিত নেত্রে আরাম উপভোগ করিতেছে। এক সময় নৌকাখানি নিকটে যাইতেই দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দে উভয়ে বিরক্ত হইয়া কর্কশ ধ্বনি সহকারে গাছের উপরে উড়িতে লাগিল। রায়হান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

সমুদ্র সন্নিকট। নৌকা নদী-মোহনার কাছাকাছি আগতপ্রায়। ততক্ষণে দুই দিকের প্রস্তরময় ও স্থানে স্থানে বনাকীর্ণ তটভূমি ধীরে ধীরে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তরঙ্গাঘাতে ধূসর সৈকতে শ্বেতপুষ্পরচিত মালার ন্যায় ধবল ফেনপুঞ্জ সুনীল জলরাশির কিনারে কিনারে যে শুভ্র রেখা টানিয়া দিয়াছিল, এক্ষণে তাহাও অস্পষ্ট হইতে হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে! নৌকা ক্রমে লোহিত সাগরে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণে অরণ্যানীর কাল রেখাও প্রায় বিলীয়মান। যাত্রীদল জন্মভূমির শেষ রেখাটি দেখিবার জন্য অপলক নেত্রে দিগন্তে তাকাইয়া রহিলেন। সকলেই নির্বাক। তাহাদের মানসপটে তখন স্বদেশে পরিত্যক্ত স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের শোকাতুর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক অব্যক্ত বেদনায় সকলের অন্তর ভরপুর। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নের দৃষ্টি বড় উদাস, বড় করুণ। বন্য-বল্লরী-সদৃশ তন্বী সায়ফুনের সোনার ছবিটি রায়হানের নয়নপথে ভাসিয়া উঠিল। মনোমধ্যে উদিত হইল —না জানি সায়ফুনের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া যে নারী সেই গভীর নিশীথে তাহাকে মুক্তিদান করিয়াছিল তাহার প্রেম, তাহার মমতা, হৃদয়ের উদারতা, কত গভীর; এই অকূল বারিধির মতই কত মহান!

রায়হান আর ভাবিতে পারিলেন না, হৃদয়াবেগ দুঃসহ, অশ্রুধারায় দুই নয়ন ঝাঁপসা। করতলে চক্ষুদ্বয় ঢাকিয়া তিনি নৌকায় পাটাতনের উপরে লুটাইয়া পড়িলেন।

বহুদূরে দিকচক্রবাল-রেখা অসীম নীলাম্বুর চারিদিকে নীলাকাশকে কত নিবিড়ভাবে যেন আলিঙ্গন করিয়াছে। দিগন্ত-প্রসারী গগনতলে অনন্ত নীল সমুদ্র সমগ্র জগত বুঝি ডুবাইয়া রাখিয়াছে-মৃত্তিকা, গাছপালা ও জীবজন্তুর চিহ্নমাত্রও আর নাই। ততক্ষণে অপরূপ সুবর্ণ রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে তরঙ্গসঙ্কুল বিরাট জলধির বিক্ষুব্ধ বক্ষদেশ। আরোহিগণ তন্ময় হইয়া দেখিলেন, অকূল বারিধিবক্ষে এক বিরাট স্বর্ণ-গোলক উদ্দাম, চঞ্চল হইয়া নাচিতে নাচিতে কোথায় বুঝি পালাইতেছে, হাসিতে হাসিতে সেই সোনার তাল ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া চারিদিকে যেন ছড়াইয়া পড়ে; আবার আসে, আবার নাচে, আবার যায়। এইবার সমুদ্রবক্ষে রাশি রাশি সোনার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। অফুরন্ত স্বর্ণভাণ্ড হইতে চারিদিকে মুঠা মুঠা সোনা ছড়াইয়া সেই সোনার তাল চারিদিকে নাচিয়া খেলিয়া, অগণিত তরঙ্গমালা সোনার পাতে মুড়িয়া দিয়া খল খল করিয়া যেন হাসিতেছে। চারিদিকে রাশি রাশি সোনার পাহাড় সৃষ্টি করিয়া তরঙ্গমালার মাথায় মাথায় অজস্র হীরার ফুল ফুটাইয়া দিয়া, অবশেষে সেই সুবর্ণ গোলক কাঁপিতে কাঁপিতে সলিলসমাধির প্রাচীর ঠেলিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিল। সূর্য উদিত হইয়াছে।

আকাশ নির্মল। মেঘ নাই, কুয়াশা নাই। বহুদূরাবধি সমুদ্রবক্ষে অপর কোন জলযানের চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না। গাঙচিল জাতীয় কতকগুলি ধূসর বর্ণের সামুদ্রিক পাখী নৌকার উপরে চারিদিকে বৃত্তাকারে কেমন উড়িয়া বেড়ায়। পর পর ক্ষেপণীর আঘাতে উত্তাল তরঙ্গমালা ক্রমাগত লণ্ডভণ্ড হইতে থাকিলে পাখীগুলি এক-একবার ছোঁ মারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যশাবক ধরিবার প্রয়াস পায়। মাঝে মাঝে তাহাদের কেহ কেহ নৌকার ছইয়ের উপর বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়, আবার উড়ে। পাহাড়ের ন্যায় উঁচু উঁচু গাঢ় নীলাভ ঢেউগুলি নৌকাটিকে

এক-একবার আকাশে তুলিয়া আবার যেন মহাক্রোধে আছাড় মারিয়া পাতালের দিকে নিক্ষেপ করে।

অকূল সমুদ্র গুরুগম্ভীর গর্জনধ্বনি সকলের ভয়-বিহবল অন্তরে সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়াছে। মহাসমুদ্রে মহান স্রষ্টার বিরাটত্বের পরিচয় চারিদিকেই দেদীপ্যমান; আরোহিগণ তখন সমস্বরে বিশ্বস্রষ্টার মহিমা কীর্তনে মশগুল। চতুর্দিকে অথৈ পানি। ঢেউগুলি যেন এক-একটি চলন্ত পাহাড়। তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তরণীটি বৃক্ষপত্রের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই অনুকূল বায়ুভরে মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে নৌকার গতিবেগ বহু গুণ বাড়িয়া উঠিল।

আটাশ

বেদুঈন-যুবতীর অদ্ভুত আচরণ সায়ফুনের নিকটে হেঁয়ালির ন্যায় ঠেকিল। সে ভাবিয়া পায় না-কেন এই অসভ্য নারী তাঁহাকে এত আদর করিয়া তাঁবুতে বসাইল, কেনই বা অকস্মাৎ একদল অশ্বারোহীসহ বাহিরে ছুটিয়া গেল। কাহার বিরুদ্ধে এই অভিযান। ঘটা করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্যই কি এত সব আয়োজন? মরণ আসন্ন বুঝিয়া সে সর্বান্তঃকরণে মহান বিশ্বপ্রভুকে স্মরণ করিতে লাগিল।

এদিকে বেদুঈনদের লইয়া সর্দার-কন্যা বাহির হইতেই একদল বালক-বালিকা তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া সায়ফুনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বন্দিনীকে হত্যা করা হইবে শুনিয়া তাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাহারা নানাভাবে অঙ্গভঙ্গী করিয়া সায়ফুনকে বিদ্রুপ করিতে লাগিল, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিতে শুরু করিল। কিন্তু বাহ্যজ্ঞানশূন্যা সায়ফুন নিরুত্তর। দুষ্ট বালক-বালিকাগণ কৌতুক করিয়া কেহ তাহার চুল ধরিয়া টানে, চিমৃটি কাটে, কেহ-বা বন্দিনীর পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া ছুটিয়া পালায়।

দ্বারদেশে দণ্ডায়মান স্ত্রী-পুরুষগণ বালক-বালিকাদের আচরণ লক্ষ্য করিয়া বেশ কৌতুক বোধ করিতেছিল। কেহ কিছু বলিল না। যে কয়টি যুবক পল্লীতে ছিল তাহারাও বারংবার উঁকি মারিয়া বন্দিনীর তাঁবু-আলো-করা রূপ নয়ন ভরিয়া দেখিতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ আবার যুবতীর প্রতি প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সর্দারের আদেশ সকলেই জানিত; জানিত বলিয়াই মনের কথা কেহ প্রকাশ করিতে সাহস পাইল না, দূর হইতে শুধু লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া নয়নের ক্ষুধা মিটাইতে লাগিল।

লজ্জায় অপমানে সায়ফুনের নয়ন-ঝরা অশ্রুধারা গণ্ডদেশে প্রবহমান। এই অপমান, এই লাঞ্ছনার হাত হইতে মুক্তি পাইতে অধীরভাবে মৃত্যু কামনা করা

ছাড়া তাহার গত্যন্তর কি। কিন্তু হত্যাযজ্ঞের পুরোধা তো নিকটে নাই, মরণ এত তাড়াতাড়িই বা আসে কই।

বালক-বালিকাদের কথোপকথন শুনিয়া সায়ফুন বুঝিতে পারিল, বেদুঈনগণ যেন কাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কে যেন বলিল, বন্দিনীর সঙ্গীকে তাহারা ধরিতে গিয়াছে। দুর্ভাবনায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল-তবে কি তাহারা রায়হানের সন্ধানে বাহির হইয়াছে! আহা! কেন আমি বেদুঈন-কন্যাকে এত কথা বলিলাম। কেন আমার দুঃখের কাহিনী ডাইনীকে জানাইলাম! এতক্ষণে বুঝলাম, এ নারী মানবী নহে-দানবী! রাক্ষসী কৌশলে আমার নিকট হইতে রায়হানের সন্ধান লইয়াছে মাত্র। আহা! কেন আমি বলিলাম, কেন আমি অন্তরের জ্বালা বাড়াইলাম!

সায়ফুন কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "ইয়া রব্! ইয়া রাব্বেল আ'লামীন! দস্যুরা তাঁকে যেন খুঁজে না পায়। আমার প্রাণ যায় যাক, রায়হানকে তুমি রক্ষা কর প্রভো! জঙ্গলের হিংস্র পশুদের গ্রাস থেকে তাঁকে যদি বাঁচিয়ে থাক, এই পিশাচদের কবল থেকেও তাঁকে যেন রক্ষা করো!"

বিরামহীন অশ্রুধারা সায়ফুনের পুষ্পদলবৎ গণ্ডদ্বয় ভাসাইয়া বক্ষোপরি বসন ভিজাইতে লাগিল। অশ্রুস্নাত নয়নে বাহিরে উদাস দৃষ্টিতে সে শুধু নির্বাক তাকাইয়া রহিয়াছে, কৌতুকরত বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীদের একটি কথাও বলিল না।

কতক্ষণ পরেই দেখা গেল, প্রান্তরের ওধারে অশ্বারোহী বেদুঈনগণ ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র তাঁবুর ভিতরের দজ্জাল বালক-বালিকাগণ ছুটাছুটি করিয়া পলাইবার পথ পায় না। বাহিরের যুবকগণও কালবিলম্ব না করিয়া যে যাহার পথ ধরিল। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহিগণ পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া বেদুঈন-বালা ঘর্মাক্ত কলেবরে তাঁবুতে প্রবেশ করিল। বসনাঞ্চলে মুখ মুছিতে মুছিতে আপন মনেই বলিতে লাগিল, "না, এত সব পরিশ্রম বিফলই হলো; শিকার হাতছাড়া হয়েছে-পালিয়েছে।"

সর্দার-কন্যার স্বগতোক্তি সায়ফুনের অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়া তুলিল। তার উল্লাস যেন আর ধরে না। মনে মনে ভাবিল-ডাইনিটা রায়হানকে তবে ধরিতে পারে নাই; অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বেদুঈন-কন্যার প্রতি তাহার অন্তরে ঘৃণার

অবধি নাই। সে ভাবিল, এ রমণী কদাচ মানবী নহে–নারীরূপী রাক্ষসী, দোযখের প্রহরিণী, নহিলে নারীর এই আচরণ!

বেদুঈন–বালা চাহিয়া দেখে–বন্দিনীর চোখে–মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা নাই, শুধু জলভরা নয়নে একটা উৎকট হিংস্রভাব যেন জাজ্বল্যমান। যে হিংসানল সম্মুখের জীবজন্তু, বেদুঈন–পল্লী, বাস্তু–চরাচর–সবকিছু যেন দাহন করিয়া ভস্মসাৎ করিবে। চক্ষু ফিরাইয়া সে বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখে–পলায়মান দুই–একটা দুষ্ট বালক আবার ফিরিয়া আসিয়া পর্দার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিতেছে। প্রান্তর হইতেই সে ইহাদিগকে ছুটিয়া পলাইতে যেন দেখিয়াছিল। এইবার ইহাদের শয়তানী বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ চুপি চুপি সে বাহিরে আসিয়া তাঁবুর ছিদ্রপথে উঁকি মারিবার কালে এক বালককে ধরিয়া ফেলিতেই বালক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাদের কীর্তিকলাপ সব প্রকাশ করিয়া দিল।

বেদুঈন কন্যার বুঝিতে বাকী রহিল না–বায়সকুল যেমন অসহায় পক্ষিশাবককে ঠুকরাইয়া ঠুকরাইয়া মারে, দুষ্ট বালক–বালিকাগুলিও তদ্রূপ বন্দিনীকে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছে, নির্লজ্জ যুবকগুলিও কিছু কম করে নাই। রাহেলা ও হাসিনার উপরই তাহার রাগ হইল খুব। সে না তাহাদিগকে ইহার দেখাশুনা করিতে বারবার বলিয়া গিয়াছিল।

সর্দার–কন্যা উত্তেজিত হইয়া রাহেলার সন্ধানে গিয়া দেখে– সে আপন তাঁবুতে গভীর নিদ্রায় অচেতন। শেষ রাত্রির কোলাহলে নিদ্রার যেটুকু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, এক্ষণে সেইটুকু বুঝি পুরাইয়া লইতেছে। বেদুঈন–কন্যা ঘৃণায়, ক্ষোভে ও ক্রোধে নিদ্রিত রাহেলাকে জোরে পদাঘাত করিয়া বলিল, "বজ্জাত, কমিনা মাগী! একেবারে মরে আছিস?" কিন্তু ইহাতেও তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না, শুধুমাত্র একবার গোঙাইয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

বেদুঈন–কন্যা সায়ফুনের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, "মার্জনা চাই বোন, এই অসভ্য জংলী জানোয়ারগুলোকে ক্ষমা কর। তোমাকে যে তারা চিনতে পারে নি।"

সায়ফুনের বিস্ময়ের অবধি নাই, তলোয়ারের আঘাতের পরিবর্তে মেয়েটা বলে কি! ফ্যালফ্যাল নয়নে অসভ্য রমণীর দিকে সে চাহিয়া রহিল, ভাবিয়া পাইল

না, এই নারী কি বলিতেছে! এই দূরদূরান্তে কে আবার তাহাকে চিনিবে? সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বললে? চিনতে পারে নি? আমাকে তারা চিনবে কিরূপে? তুমিই কি চিনতে পেরেছ নাকি?"

সর্দার-কন্যা। ভেবেছ তোমাকে না চিনেই কি এতসব পণ্ডশ্রম করেছি? মিছেই কি বনমধ্যে ছুটে গিয়েছিলাম এতদূর?

সায়ফুন। তোমাদের শ্রম পণ্ড হয়েছে শুনে সুখীই হয়েছি।

সর্দার-কন্যা। মিথ্যে কথা। আমার পরিশ্রম সার্থক হলে বরং খুশীই হতে, দুই হাতে এই বেদুঈন-কন্যার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে।

সায়ফুন। তোমার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু এখনও আমাকে হত্যা করছো না যে?

সর্দার-কন্যা। বলি নি বুঝি, নারী-হত্যা আমার পোষায় না?

সায়ফুন। নারীকে হত্যা করতে পার না, পুরুষকে পার নাকি?

বেদুঈন-কন্যা। না, বন্দী করে আঁচলে বেঁধে রাখতে পারি। কেন, তুমি পার না পুরুষকে বন্দী করে ভেড়া বানাতে?

সায়ফুন। ঠাট্টা রাখ। নিজে যদি না-ই পার তবে অন্য কোন পুরুষকে ডাকলেই পার!

বেদুঈন-কন্যা। সে ডাকতেই তো গিয়েছিলাম।

সায়ফুন। কেন, এখানে লোকের কোন অভাব আছে নাকি?

বেদুঈন-কন্যা। এদের দ্বারা এ কাজ হবার নয়, এরা আবার বীরপুরুষ নাকি? গিয়েছিলাম আমার ভাইকে ডাকতে। কিন্তু তোমার মত সুন্দরীকে হত্যা করতে মন যে সরে না, বড় মায়া লাগে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? করবে কি?

সায়ফুন। কেন মিছেমিছি আর জ্বালাচ্ছ? আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তোমার লাভ? কি করতে বলছো?

সর্দার-কন্যা। এমন কিছু নয়! তুমি যদি আমার ভাবী হতে রাজী হও, তবে তোমাকে বাঁচাতে পারি। বল, রাজী?

সায়ফুনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল–দুর্মুখী বলে কি! তাহাকে বেদুঈনের বউ করিবার দুরাশা! ক্রোধে তাহার বাক্যস্ফূরণ হইল না, কেবল ওষ্ঠদ্বয় মৃদু কম্পমান।

বেদুঈন–কন্যা তাহার মুখের ভাবখানা দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না। নিকটে বসিয়া তাহার স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া বলে, "কেন, মন ওঠে না বুঝি? আমার ভাইটির মত এমন বর কি কোথাও পাবে ভেবেছ? যেমন রূপ, তেমই গুণ।"

সায়ফুন ঘৃণাভরে তাহার স্কন্ধদেশ হইতে বেদুঈন–বালার হাত সরাইয়া ফেলিয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল। বেদুঈন–কন্যা হাসিতে হাসিতে আবার তাহার গা ঘেঁষিয়া বলিল, "ভয় কি গো? আমার ভাইটি তো আর বাঘ নয়, ভালুক নয়, তোমার অজানাও নয়– অনেক দিনেরই চেনা। বল, বল তবে, ভাবী হবে?"

সায়ফুনের অশ্রুভরা নয়নে যেমন আগুনের ফুল্‌কি। রোষপ্রদীপ্ত লোচনে অসভ্যা রমণীর প্রতি সে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। সর্দার–কন্যা সোহাগভরে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, "আহ্! রাগ করলে নাকি? আমার ভাইকে বুঝি মনে ধরে না? বেশ, তাকে যদি পছন্দ নাই হয় আমাকেই বিয়ে করে ফেল! অমন ফুলের মত সুন্দরীকে কতল্ করি কি করে!" এই বলিয়া সে হাসিয়া কুটপাট।

সায়ফুনের ইচ্ছা হইল, এই মুখরা বেদুঈন–যুবতীর ওষ্ঠদ্বয় টানিয়া ছিঁড়িয়া চৌচির করে। ঘৃণায়, রোষে তাহার সর্বাঙ্গ থর থর কম্পমান। ব্যাপার দেখিয়া বেদুঈন–কন্যা হাসিয়া লুটোপুটি খায়। হাসিতে হাসিতে আবার বলে সে, "কি, ভাইকে বুঝি চিনতে পারলে না? এখনও বুঝতে পার নি হাবা মেয়ে! তোমার সেই প্রেমিক পুরুষ! —যার পিছু পিছু আমরু–সমুদ্রতট ধাওয়া করেছ, পাহাড়–জঙ্গল চষে ফেলেছ। এক্ষণে চিনতে পেরেছ?"

সায়ফুনের চোখে–মুখে যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল আষাঢ়ের বিদ্যুচ্ছটা। আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে বেদুঈন–কন্যার মুখের প্রতি সে নির্বাক তাকাইয়া রহিল।

সর্দার–কন্যা সায়ফুনকে পরম সোহাগভরে আরো কাছে টানিয়া আনিয়া আপন বসনাঞ্চলে তাহার অশ্রুধারা মুছাইয়া দিল। তারপর দুই আঙ্গুলে তাহার গণ্ডদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার দয়িত রায়হান আমার ভাই। আমি সুফিয়া। বলত তুমি আমার কে?"

সহসা সায়ফুনের হৃদয়-গগনের পুঞ্জীভূত মেঘ কোথায় যেন উড়িয়া গেল। সেখানে পূর্ণিমার চাঁদ বুঝি বা হাসিয়া লুটোপুটি খায়। চারিদিকের পাহাড়-পর্বত বাস্তু চরাচর সে হাসিতে যেন নিমজ্জমান।

সুফিয়া রায়হানের সম্বন্ধে যত কথা জানিত, ধীরে ধীরে বলিল।

সব কথা শুনিয়া সায়ফুন মনে মনে ভাবে, এ নারী মানবী নহে-বেহেশতের হুর, কন্টকাকীর্ণ কাননের সুরভি কুসুম। আনন্দে বিহবল হইয়া সে সুফিয়ার কণ্ঠদেশ গভীর আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিল।

প্রভাতসূর্য হাসিতে হাসিতে তাঁবুর পর্দার ফাঁকে উঁকি মারিয়া ফুল্ল কুসুম-সদৃশ যুবতীদ্বয়ের রক্তিম গণ্ডদেশ অপূর্ব রঙ্গে রঙিন করিয়া তুলিল।

উনত্রিশ

বালুকা ও প্রস্তরময় অঞ্চলে সারাদিন পথ চলার পর রাহেল যাত্রীদলসহ আবূ ইউসুফের শৈলাবাস জাবালহুরে যখন উপনীত হইল, তখন সায়াহ্ন। অবিলম্বে আবূ আক্কাস ও তাঁহার স্ত্রী আছিয়া সন্তানদের দেখিবার জন্য দ্রুত পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন।

সেই পাহাড়ের এক গুহামুখে বসিয়া আবূ ইউসুফ বিষণ্নবদনে ভাবিতেছিলেন—কুরাইশগণ হয়তো আবূ আক্কাস ও তাঁহার স্ত্রীকে এতক্ষণে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। আহা! এই অপোগণ্ড সন্তানগুলির দশা কি যে হইবে আল্লাহ্ই জানেন। গুহাভ্যন্তরে স্ত্রী শিবৃলি রন্ধনকার্যে রত। এমন সময় গুহাদ্বারে আবূ আক্কাস ও আছিয়াকে সশরীরে উপস্থিত দেখিয়া আবূ ইউসুফের বিস্ময়ের পরিসীমা নাই। স্বামীর ডাকে রান্না ফেলিয়া শিবৃলিও ছুটিয়া আসিলেন। বাক্যহারা আবূ ইউসুফ ও শিবৃলি হাঁ করিয়া শুধু তাকাইয়া রহিলেন, সহসা কিছুই বলিতে পারিলেন না।

নিপীড়িতা আছিয়া পুত্র-কন্যাদের ডাকিতে ডাকিতে পাগলিনীর ন্যায় গুহাভ্যন্তরে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের সন্ধান করিতে লাগিলেন। আবূ আক্কাস আবূ ইউসুফকে আলিঙ্গন করিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ভাই আবু ইউসুফ! আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে বেঁচে গেছি খুব! আবার যে তোমাদের নিকটে ফিরে আসবো, ছেলেমেয়েদের দেখতে পাব, সে ভরসা আদৌ ছিল না। নীচে দেখবে চল, তোমাদের নিয়ে যেতে কত সব মজলুম মুসাফির আজ এখানে উপস্থিত। কোথায় রেখেছ আমাদের জীবন-সর্বস্ব সন্তানদের? কোথায় আমার সব বুকের মানিক?" এই বলিয়া তিনিও গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন, মাতৃহারা সন্তানগণ মাতাকে ফিরিয়া পাইয়া চারিপাশ হইতে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। মাতার চোখে আনন্দাশ্রু। আবূ আক্‌কাস সাশ্রুনয়নে পুত্রকন্যাদের কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন।

মনুষ্য সমাগমবিহীন সেই নির্জন গিরিকন্দরে দেশত্যাগী কয়টি স্ত্রী-পুরুষ কথায় কথায় সারা রাত্রিই প্রায় কাটাইয়া দিলেন। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে গুহা ছাড়িয়া সকলে যখন আবার যাত্রা করিলেন, তখন প্রায় ভোর। যাত্রার প্রাক্কালে আবূ ইউসুফ ও শিবৃলি গুহামধ্যে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যের অল্পস্বল্প যাহা উদ্‌বৃত্ত ছিল সেসব এবং পানির মশকগুলি সঙ্গে লইতে ভুলিলেন না।

পাহাড়ের ওপারে এক বালুকাময় প্রান্তর। প্রান্তরের স্থানে স্থানে বাবলা জাতীয় দুই-একটি কন্টক বৃক্ষ, কাঁটাগুল্ম, বৃক্ষলতা-বিরল কয়েকটি বালিয়াড়ি ও এখানে-ওখানে কয়েকটি খর্জুর-বৃক্ষ ছাড়া সবুজ তৃণলতা আর কিছুই নাই। সে প্রান্তর পার হইয়া যাত্রীদল ক্রমে মরুভূমির বুকের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ছেলেমেয়েদের গুহা হইতে তুলিয়া আনা হইয়াছিল ঘুমন্ত অবস্থায়ই। তখনও তাহারা উটের পিঠেই ঘুমাইয়া রহিয়াছে। একপার্শ্বে উপবিষ্টা স্ত্রীলোকগণ নিজেদের ও পাড়া-পড়শীদের কাহিনী লইয়া মশ্‌গুল। পুরুষেরা জীবনযুদ্ধের ভবিষ্যত রূপ কল্পলোকে আঁকিয়া আলোচনায় মগ্ন। মাঝে মাঝে বালির উপর হইতে দুই-একটা মৃত পশুর বিকৃত ও শুষ্কপ্রায় দেহের উৎকট দুর্গন্ধ যাত্রীদের বড় বিব্রত করিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত পশুগুলি কবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আগুনের তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে কে জানে! যতদূর দৃষ্টি যায়-চারিদিকে মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় উঁচু-নীচু বালির ঢেউগুলি চন্দ্রালোকে কেমন চাকচিক্যময়! বালিসমুদ্র দিঙ্‌মণ্ডলে যেন মিশিয়াছে। এই বালুকাময় প্রান্তর পার হইতে পারিলেই ওপারে পার্বত্য পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

মরুভূমির বুকেই সূর্যোদয় হইল। দেখিতে দেখিতে চঞ্চল রবিরশ্মি বালির উপরে লাখে লাখে মণিমুক্তা যেন ছড়াইয়া দিয়াছে। মরুবক্ষের স্তূপীকৃত মণি-

মানিক্যের চাকচিক্যময় আভায় যাত্রীদের চোখ ঝলসিয়া গেল; কিন্তু সে অধিকক্ষণ নহে। ধীরে ধীরে সূর্য উপরে উঠিতেই সে–দৃশ্য ভোজবাজির ন্যায় উবিয়া গেল। সৌরকর তখন চারিদিকের লু–হাওয়ায় যেন আগুনের ফুলকি ছড়াইতে ব্যস্ত। এইবার পথ চলাই দায়। উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ যাত্রীদের চোখে–মুখে ও নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সর্বাঙ্গ যেন দাহন করিতে শুরু করিয়াছে।

দ্বিপ্রহরের পূর্বেই যাত্রীদল মরুভূমি অতিক্রম করিল। সম্মুখে বালুকা ও প্রস্তরময় পর্বতসঙ্কুল দেশ। অপরিসর পার্বত্য পথে এইবার অগ্রসর হইতে হইবে। তাপদগ্ধ পথিকগণ সম্মুখে এক বৃক্ষছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পানাহারে বসিলেন। আহারান্তে সকলে আবার উষ্ট্রপৃষ্ঠে যখন আরোহণ করিলেন তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ন।

আবার বালুকাময় প্রান্তর। শুধু এখানে ওখানে কন্টকময় লতাগুল্ম ও খর্জুর বন। সেই প্রান্তরে অতি কষ্টে যাত্রীদল বহুদূর পথ অতিক্রম করিলে প্রখর দিবাকর ক্রমে শৌর্যবীর্য হারাইয়া ধরণীবক্ষ হইতে বিদায় লইল। সূর্যাস্তের পর কিছুক্ষণ পথ চলা বেশ আরামদায়ক, কিন্তু অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আর ভ্রমণ করা নিরাপদ নহে। বন্য পশু ও দস্যুদের আক্রমণ ভয়ে রাহেল আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। সেই উন্মুক্ত স্থানেই সকলে রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

রাহেল আবূ ইউসুফকে সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ বাবলা বন হইতে কতকগুলি শুষ্ক ডালপালা আহরণ করিয়া আনিল। তারপর হায়না ও চিতাবাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আগুন জ্বালাইয়া দিল সেই বিশ্রামস্থলের চতুর্দিকে। যাত্রিগণ ইচ্ছা করিয়াই লোকালয় হইতে দূরে রহিলেন। স্বগ্রাম হইতে তাঁহারা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বিপদাশঙ্কায় কোন মনুষ্যসংস্রবে যাইতে সাহস পাইলেন না।

পরদিবস প্রভাত হইতে না হইতেই আবার যাত্রা শুরু, সায়াহ্নে পথে–প্রান্তরে নির্জন স্থানে বিশ্রাম। উষ্ট্রারোহী পথিকগণ এইভাবে দিনের পর দিন পথ চলিয়া সপ্তম দিবসে নিশাগমে ঈসের জঙ্গলের উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। এদিকে খাদ্যাভাবে শিশুগণ বড় কাতর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু লোকালয় ছাড়া আর কোথাও যে খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিবার আশা নাই। অনন্যোপায় হইয়া

সকলে এক মেষপালকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সৌভাগ্যবশত গৃহস্বামী কোন সন্দেহ পোষণ করিলেন না। তাহাদের কাহিনী শুনিয়া তাহার বিশ্বাস হইল—যাত্রীদল সত্য সত্যই ভাগ্যান্বেষী দুঃস্থ মুসাফির। প্রত্যূষে সেই বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া আবার পাহাড়-প্রান্তর পার হইয়া তাঁহারা ঈসের জলে যখন প্রবেশ করিলেন তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর।

এই সেই আসমুদ্র-বিস্তৃর্ত নিবিড় বনানী, যেখানে রায়হান পলাইয়া আসিয়া হাবশী দেশে গমনেচ্ছু স্বদেশ-বিতাড়িত নও-মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। এই বনেরই একাংশে ভাগ্য-বিড়ম্বিতা কুলছুম ও সায়ফুন আয়াযের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আবার এই বনেই হতভাগিনী সায়ফুন অলক্ষ্যে আপন প্রিয়জনকে অনুসরণ করিয়া একমাত্র সঙ্গিনী কুলছুমকে হারাইয়াছিল, নিজেও বন্দিনী হ ইয়াছিলেন।

রাহেল ও অন্যান্য যাত্রিগণ রায়হান, সায়ফুন ও কুলছুমের বৈচিত্র্যময় পলায়ন-কাহিনীর বিশেষ কিছুই জানিলেন না; শুধু শুনিয়াছিলেন, এই বনের দিকেই তাহারা আসিয়াছিল; এই বনেই হয়ত তাহারা আশ্রয় লাভ করিয়াছে—এই ক্ষীণ আশা সকলের মনে বারবার উঁকি মারিয়া উঠিতে লাগিল। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আজ বনে ঢুকিতেই যাত্রিগণ লোক-বসতিহীন অরণ্যে অনেকটা নিরাপত্তার আভাস যেন পাইলেন। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করিতে করিতে সকলে হৃষ্টচিত্তে বনানীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাহেল মনে মনে ভাবিল—শুনিয়াছি, রায়হান নাকি এই বনের দিকেই ছুটিয়া আসিয়াছিল। হয়তো কুলছুম ও সায়ফুনও এই বনের ভিতরেই কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে তাহাদের সাথে পুনর্মিলন ঘটিতেও পারে; কিন্তু যে বর্বরোচিত ব্যবহারে তাহাদের জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছি, তাহার প্রতিকার কি! কোন্ মুখে আবার তাহাদের সম্মুখীন হইব! সায়ফুনের রূপ-লালসার মোহে নিতান্ত পশু প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়াই রায়হানের সঙ্গে সায়ফুনের আবাল্য-বাঞ্ছিত মিলন ঘটিতে দেই নাই; উভয়ের জীবন ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের হাহাকারে ভরিয়া দিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, আপন স্ত্রীকেও দূরীভূত করিয়াছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? ইহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে—না মরিয়াছে, কে বলিবে! আহা! কেন

ইহাদিগেকে দুঃখের সাগরে ভাসাইলাম? কেন ইহাদের মৃত্যুর কারণ হইলাম? দুঃখে, লজ্জায় ও অনুশোচনায় তাহার অন্তর যেন শত বৃশ্চিকদংশন–যন্ত্রণায় মুহ্যমান।

চিন্তাক্লিষ্ট রাহেল বনমধ্যে পথের কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া যদৃচ্ছা উট চালনায় রত। তাহার অসাবধানতাবশতঃ ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির আনত শাখা–প্রশাখা, কাঁটাগুল্ম ও লতাপাতা আরোহীদিগকে বড় বিব্রত করিয়া তুলিল। কিন্তু রাহেল গভীর অনুশোচনায় তন্ময়, এদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। বেলা কখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, কখন পাহাড়ের আড়ালে গড়াইয়া পড়িয়াছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। ঘন–পল্লবময় বৃক্ষগুলির পত্রাবরণ ভেদ করিয়া রবি–রশ্মি তলদেশে বড় একটা পৌছিতেই পারে না। সুশীতল বনছায়ায় চলিতে চলিতে যাত্রীদল ততটা ক্লান্তিবোধ না করিলেও হিংস্র পশুর আক্রমণাশঙ্কায় অনেকটা যেন উদ্বিগ্ন। কেবলমাত্র চিন্তাভারাক্রান্ত রাহেলের মুখমণ্ডলেই চাঞ্চল্যের লেশমাত্রও নেই।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই আরোহিগণ নিকটে কি একটা খটাখট শব্দ শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। "ও কিসের শব্দ রাহেল?" ওৎবা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যমনস্ক রাহেল উট চালাইতেই ব্যস্ত। ওৎবার ডাক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

উত্তর করিলেন আবূ ইউসুফ। বলিলেন, "হয়তো কাঠঠোক্‌রা পাখী বাসা তৈয়ার করছে, এই সময়েই যে পাখীগুলো ডিম পাড়ে।"

কিন্তু বনমধ্যে আর কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তাঁহাদের ভুল ভাঙিল। তাঁহারা অবাক হইয়া দেখেন–অদূরে দুই কাঠুরিয়া রমণী কাষ্ঠ সংগ্রহে ব্যস্ত। কিন্তু লতাগুল্মের আড়ালে কার্যরতা নারীদের মুখমণ্ডল কেহ ভালভাবে লক্ষ্য করিবার পূর্বেই বনচারিণী নারীযুগল ক্ষিপ্রপদে অদৃশ্য হইতে লাগিল, বৃক্ষলতার ফাঁকে ফাঁকে গভীর অরণ্যে।

আরোহিগণ উৎফুল্ল হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই নিকটে কোন লোকালয় রয়েছে, নতুবা কোথা হতে ঐ মেয়েগুলো কাঠ কাটতে এল?"

আবূ আক্কাস বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক দুটির অনুসরণ করলে হয়তো লোকালয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। একটা আশ্রয় না পেলেই নয়। কেননা, গভীর জঙ্গলে বেশীদূর নিরস্ত্র ভ্রমণ করা নিরাপদ নহে। এ বনের অধিবাসীরা আর যা-ই হোক, মক্কাবাসীদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত নয়, সুতরাং আমাদের উপর তারা জোর-জুলুম না-ও করতে পারে।"

ওৎবার আদেশে আবূ ইউসুফ রাহেলের স্কন্ধদেশে ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, "রাহেল ভাই! ঐদিকেই চল যাই। মনে হয় মেয়ে দুইটি সেই দিকেই যেন গিয়েছে। খুঁজে ওদের বের করতেই হবে।"

রাহেল চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি বললে? মেয়ে দুইটি! সায়ফুন ও কুলছুম নয় ত?"

ওৎবা উষ্ট্রপৃষ্ঠে অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিল। রাহেলের কথা শুনিয়া সে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "কি বললে? সায়ফুন ও কুলছুম! তারা কেন আসবে এই বনে কাঠ কাটতে? দুটি কাঠুরে মেয়েকে যে দেখেছি!"

রাহেল মনে মনে ভাবিল-শুনিয়াছি ভাগ্যবিপাকে এক রাজকন্যাও নাকি ভিক্ষার ঝুলি নিয়া বাহির হইয়াছিল, কাঠ কাটা আর বিচিত্র কি! দ্বিরুক্তি না করিয়া ওৎবার নির্দেশিত পথে সে উট চালাইতে লাগিল।

কিন্তু বহুদূর পথ চলিয়াও সেই বনমধ্যে জনমানবের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। নারীযুগল যেন যাদুমন্ত্র বলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যবশত গভীর অরণ্যে কোন বন্য পশু যাত্রীদের ভ্রমণে ব্যাঘাত ঘটাইল না; কেবল মাঝে মাঝে উচ্চ বালিয়াড়ি, গুল্মাচ্ছাদিত টিলা ও প্রস্তর-ঢিবি তাহাদের বড় বিব্রত করিতে লাগিল।

এ বনে পথ নাই, মনুষ্য চলাচলের কোন লক্ষণই নাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া নিতান্ত পায়ে চলার পথও যে আবিষ্কার করা গেল না। জঙ্গলের ডালপালা, লতাপাতা, উষ্ট্রারোহীদের এক একবার আলিঙ্গন করিয়া বড় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। নারী ও শিশুদের লইয়া পদব্রজে চলিবারও উপায় নাই। চারিদিকটা

একবার দেখিয়া লইবার জন্য রাহেল উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নিকটে এক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল, কিন্তু লোকালয়ের চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। দেখা গেল—অদূরে বাঁ–দিকে এক ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী ধীরে ধীরে প্রবহমান; সেই দিকে জঙ্গলও যেন অনেকটা পাতলা। রাহেল নামিয়া আসিয়া সেই দিকেই উষ্ট্র চালাইতে লাগিল। কাঠুরিয়া নারীদের সন্ধান আর মিলিল না।

বাঁ–দিকে ঘুরিয়া অনেকক্ষণ বনানীর বৃক্ষলতার সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে যাত্রীদল অবশেষে কিয়দ্দূরে এক পাহাড়ের পাদদেশে এক শ্যামল প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এইবার বহুক্ষণ পর অপরাহ্নের সূর্য তাহাদের দৃষ্টিপথে পুরাপুরি ধরা দিল। দিবাকর তখন পশ্চিম গগনে অনেকটা হেলিয়া পড়ায় রৌদ্রের তেজ অনেকটা মন্দীভূত। সম্মুখে প্রান্তরের উত্তর দিকে এক অনুচ্চ পাহাড় পূর্ব–পশ্চিমে বহুদূরব্যাপী দণ্ডায়মান। দক্ষিণে এক অপরিসর পার্বত্য নদী পাথরে পাথরে ঘা খাইয়া মহাবেগে প্রবহমান। নদীর কলকল ছলছল ধ্বনি মহাসমুদ্রের গুরু–গম্ভীর গর্জন–ধ্বনির সহিত বিলীন হইয়া এক অপূর্ব গাম্ভীর্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই জনমানবহীন পাবর্ত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা কত চিত্তাকর্ষক! বড় নিরাপদ স্থান৷৷ কি মনোরম দৃশ্য! মানব চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিবার উপযুক্ত জায়গাই বটে। কুরাইশদের অত্যাচার–অনাচার এই সুদূর বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে পৌছিবার কথা নহে। সকলে একবাক্যে এই স্থানেই বসবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চারিদিকের অগণিত ফলবান খর্জুর বৃক্ষ নির্ঝরিণীর স্ফটিক জল এই মুষ্টিমেয় উদ্বাস্তুদের বুঝি সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। পরিশ্রান্ত যাত্রিগণ অবিলম্বে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পাহাড়ের ছায়ায় তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল প্রান্তরে উপবেশন করিলেন।

বিশ্রামের পর অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যগুলি বাহির করিয়া কোনক্রমে আহারাদি সমাপ্ত করিলে সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণজনিত ক্লান্তি নারী ও শিশুদের দেহে নিদারুণ অবসাদ চাপাইয়া দিল। অনতিবিলম্বে তাহারা প্রকৃতির উন্মুক্ত ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িল।

অসুস্থ ও অবসন্ন ওৎবার বিশ্রামের প্রয়োজনই সর্বাধিক। অল্পক্ষণ মধ্যে সেও তাহাদের সঙ্গে উন্মুক্ত আকাশতলেই গা ঢালিয়া দিল।

কালবিলম্ব না করিয়া আবূ ইউসুফ অদূরে এক পাহাড়ের অন্তর্দেশে কোন বাসোপযোগী গুহা বা আশ্রয় পাওয়া যায় কিনা খুঁজিতে বাহির হইলেন। একদিকে রাহেল আবূ আক্কাসকে যাত্রীদের প্রহরায় মোতায়েন রাখিয়া নিজে উষ্ট্রপৃষ্ঠে চারিদিকে কোন লোকালয়ের সন্ধান করিতে যাত্রা করিল–কিছু খাদ্যদ্রব্য ও সামান্য তৈজসপত্র যে না হইলেই নয়।

ত্রিশ

বৃদ্ধ আয়ায ও আয়ায-পত্নী উম্মে-সাল্‌মা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, আর কুলছুম নিজে নিষ্কর্মা বসিয়া তাঁহাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে উদরপূর্তি করিবে, ইহা তাহার মোটেই ভাল লাগিল না। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার নিষেধবাক্য সত্ত্বেও পরদিবস হইতেই সে উম্মে-সাল্‌মাকে কাষ্ঠাহরণে সাহায্য করিতে লাগিল।

কঠোর পরিশ্রমে অনভ্যস্তা কুলছুমের প্রথম প্রথম খুব কষ্ট বোধ হইত। কিন্তু দিনে দিনে তাহা গা-সহা হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে আর কোন তকলীফ মনে করে না, পরন্তু স্নেহময়ী বৃদ্ধাকে কার্যে সাহায্য করিতে পারিলে মনে মনে গর্বিত ও আনন্দিতই হয়। বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের স্নেহ-মমতা কুলছুমের অন্তর জয় করিয়াছে। গত জীবনের দুঃখের দিনগুলির কথা ভাবিবার অবসরও তাহার আর নাই। কিন্তু নূতন পরিবেশে পুরাতনকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেও মাঝে মাঝে সায়ফুনের জন্য তাহার অন্তর বেদনায় ভরিয়া ওঠে। তবু উম্মে-সাল্‌মার শিক্ষাগুণে সে আজ আল্লাহ্‌র রহমে নির্ভর ও সবুর করিতে শিখিয়াছে।

সেইদিন জঙ্গলে জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে করিতে কুলছুম হঠাৎ বৃক্ষপত্রে খচ্‌ খচ্‌ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। ভয় হইল। নিশ্চয়ই এ-কোন হিংস্র পশু! কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে দেখিল কিয়দ্দূরে ছোট বড় বৃক্ষগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটি লোক উষ্ট্র চালাইয়া তাহাদের দিকেই যে অগ্রসর হইতেছে। বৃক্ষের পত্রাবরণ ভেদ করিয়া সূর্য-রশ্মি এক-একবার আরোহীদের গায়ে ঋজু রজত-রেখা বুলাইয়া দেয়, আবার মিলায়। কুলছুম ভাবিল, নিশ্চয়ই ইহারা কুরাইশ দল বাঁধিয়া তাহার ও সায়ফুনের খোঁজে বাহির হইয়াছে, পলাইবার আর উপায় নাই। ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূতা কুলছুম সেই দিকে আয়ায-পত্নীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া

বলিল, "আম্মা! ঐ বুঝি আমাকে ধরতে আসছে। এখনই যে বন্দী করবে! কি হবে আম্মা! কোথায় পালাব?"

উম্মে-সাল্‌মা উষ্ট্রারোহীদের দেখিবামাত্র কুলছুমের হাত ধরিয়া বৃক্ষের আড়ালে আবডালে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে পলায়ন করিলেন।

বাড়ীতে গৃহকোণে বসিয়াও কুলছুমের ভয় দূরীভূত হইল না, অন্তর দুরু দুরু কম্পমান, কণ্ঠনালী শুকাইয়া কাঠ। তাহার ভয় হইল-হয়তো কুরাইশগণ তাহাকে দেখিয়াই ফেলিয়াছে, এই মুহূর্তেই ধরিবার জন্য আয়াযের গৃহে বুঝি হানা দিবে। নিরুপায়া কুলছুম আয়ায-পত্নীর গা ঘেঁষিয়া যে-কোনো মুহূর্তে উষ্ট্র-পদশব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। মুখে ভাষা নাই, বুকে সাহস নাই। বিপদভঞ্জন আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করিয়া মুহুর্মুহু সে একমনে আকুল প্রার্থনায় রত।

কিন্তু বহুক্ষণ বাহিরে কোন মনুষ্য সমাগমের সাড়া পাওয়া গেল না। উম্মে-সাল্‌মা কুলছুমকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন-তাহার সন্দেহ অমূলক, উষ্ট্রারোহীরা তাহারই মত হয়তো কোন মজ্‌লুম মুসাফির।

নানা কথোপকথনের পর কুলছুমের সন্ত্রাসভাব অনেকটা কাটিল বটে, কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য হ্রাস পাইল না। এদিকে বেলা প্রায় শেষ। জঙ্গলে সংগৃহীত কাষ্ঠগুলি এখনই যে কুড়াইয়া আনিতে হইবে; নতুবা বিলম্বে ভয়ের কারণ আছে। হিংস্র পশুগুলি সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধানে বাহির হয়। প্রভাতেই আয়াযকে কাষ্ঠগুলি বিক্রয় করিয়া খাদ্যের সংস্থান করিতে হইবে, নতুবা উপবাস ছাড়া গত্যন্তর নাই। সাত-পাঁচ ভাবিয়া উম্মে-সাল্‌মা আবার জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। কতক্ষণ ইতস্তত করিয়া কুলছুমও ভয়ে ভয়ে তাহার অনুগমন করিল।

জঙ্গল হইতে কাঠগুলি কুড়াইয়া আনিয়া উভয়ে উঠানে আটি বাঁধিতে ব্যস্ত। বিষণ্নবদনা কুলছুমের অন্তরে সান্ত্বনা দিতে উম্মে-সাল্‌মা নানাবিধ গল্পের অবতারণা করিয়াছে। আরম্ভ করিলেন তাঁহার কৈশোরের কাহিনী-দুর্দান্ত বেদুঈন-কন্যাদের সঙ্গে তাঁহার হৃদ্যতার কথা, তাহাদের সঙ্গে মরুভূমির বুকে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটাছুটি, পাহাড়ের উপর হইতে বন্যফল আহরণ ইত্যাদি কত কথা।

গল্প করিতে করিতে উভয়ে হাত চালাইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। আটিগুলি যে ভাবেই হউক আজই বাঁধিয়া শেষ করিতে হইবে, নতুবা প্রভাতে আয়াব সেইগুলি লইয়া বহুদূরে বাজারে যাইবেন কিরূপে? এদিকে বেলাও আর নাই; সূর্য প্রায় ডুবুডুবু।

আটি বাঁধা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় আয়াব বহির্বাটির ঘর হইতে ডাকিতে লাগিলেন, "আম্মা ছবিলা! মেহ্‌মান এসেছে, কিছু পানি নিয়ে আয় বেটি!" কুলছুমকে আয়াব ও আয়াব-পত্নী তাঁহাদের মৃতা কন্যা ছবিলার নামানুসারে ছবিলা বলিয়াই ডাকে।

ডাক শুনিয়া কুলছুম আয়াব-পত্নীকে বলিল, "যাই আম্মা। নাশ্‌তা-পানি দিয়ে আসি, মেহ্‌মান এসেছে বুঝি!"

কুলছুম এক হাতে পানির বাটি ও অপর হাতে দুই টুকরা রুটি ও কিছু খর্জুর লইয়া দহ্‌লিজে প্রবেশ করিল। সেখানে আয়াবের সম্মুখে উপবিষ্ট অতিথিকে দেখিবামাত্র তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম। সম্মুখে ভীষণাকার হিংস্র জানোয়ার দেখিয়াও মানুষ বুঝি ভয়ে এতটা ম্রিয়মাণ হয় না। মৃদু পবন-সঞ্চালিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় যুবতীর দেহ থর থর কম্পমান। কম্পিত হস্ত হইতে রেকাবি ও পানির বাটি স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাঁহার সর্বাঙ্গের উদ্দাম রক্তস্রোত বিদ্যুৎবেগে ঊর্ধ্বে ছুটিয়া মস্তকে বুঝি ঘুরপাক খায়। চক্ষুদ্বয় স্থির; অচঞ্চল-যেন দৃষ্টিহীন। যে আশঙ্কায় তাহার অন্তর সমস্ত অপরাহ্নটাই উদ্বেলিত, নিপীড়িত ছিল, শেষটায় কিনা তাহাই নির্মম সত্যে পরিণত হইল। চিৎকার করিয়া কুলছুম কোনক্রমে ছুটিয়া গিয়া উঠানে কার্যরতা উম্মে সালমাকে জড়াইয়া ধরিল। ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আয়াবও কুলছুমের পিছনে ছুটিয়া আসিলেন উঠানে।

আয়াব ও আয়াব-পত্নীর-বিস্ময়ের অবধি নাই। কুলছুমের এই আকস্মিক ভীতির কারণ কিছুই তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না। নিদারুণ অস্বস্তিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দম্পতি ভাবিয়া আকুল-কে এই সর্বনাশা মুসাফির!

মুসাফির আর কেহ নহে-স্বয়ং রাহেল। নিজের, ওৎবার এবং অন্যান্যদের জন্য খাদ্য সংগ্রহের আশায় লোকালয়ের সন্ধানে সে ঘুরিতে ঘুরিতে আয়াবের

চত্বরে আসিয়া উপাস্থিত। সম্মুখে কুলছুমকে দেখিবামাত্র বিস্ময়-বিহবল রাহেলের অপলক দৃষ্টি আর ফিরে না। দেখিল, যে স্ত্রী ভয়ে ও ঘৃণায় স্বামীর সাহচর্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, যাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে সে নানা স্থানে-এ যে সে-ই! মুহূর্তের মধ্যে তাহার অন্তর বিপুল পুলকে নাচিয়া উঠিল। এই ভাবিয়া অন্তর আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল-সায়ফুনও হয়ত এইখানেই রহিয়াছে। রাহেল প্রাঙ্গণে কুলছুমের নিকটে ছুটিয়া গিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "কুলছুম তুমি এখানে? ভয় পেয়েছ কুলছুম? ভয় নেই, আমি তোমাকে শাস্তি দিতে আসিনি, আমি এসেছি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। কুলছুম! আল্লাহ্ আমার চোখের পর্দা খুলে দিয়েছেন। আমার প্রিয় রসূল (সঃ) আমাকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সায়ফুন কোথায় কুলছুম?' রাহেল আর বলিতে পারিল না। ভাবাবেগে ও অনুশোচনায় কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়।

কুলছুম তাহার দজ্জাল স্বামীর মুখে আল্লাহ্‌র ও রসূলের নাম শুনিয়া বিস্ময়ে হতবাক! দেখিল, স্বামীর সে চেহারা আর নাই-মলিন মুখশ্রীতে অনুতাপানল-দগ্ধ অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে; নয়ন সজল।

এ-দৃশ্য দেখিয়া আয়াযও হতভম্ব। রাহেলের পরিচয় জানিতে পারিয়া তিনি তাহাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিতে দিতে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

কুলছুম বুঝিতে পারিল না-কোন্ যাদুমন্ত্রবলে তাহার স্বামীর হিংস্র স্বভাব এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, কোন্ যাদুকরের সোনার কাঠির পরশে তাহার পশু-প্রবৃত্তির বিলোপ ঘটিয়াছে। মুহূর্তমধ্যে কুলছুম তাহার অতীত জীবনের সকল বেদনা সকল লাঞ্ছনা ভুলিয়া গেল। আজ তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত জড়-জগতে, বাস্তু-চরাচরে ফুটিয়া উঠিয়াছে কী এক নূতন মনোহর রূপ! কে যেন তাহার কানে কানে বলিয়া গেল-'ওরে দুঃখিনী হতভাগিনী! তোর দুঃখের দিন ফুরিয়ে এসেছে।"

কুলছুম বহুদিন তাহার মাতাকে হারাইয়াছে। পরলোকগতা জননীর স্নেহমাখা মুখখানি শত চেষ্টা করিয়াও সে স্মরণ করিতে পারিল না। কে তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে? আজ বিশ্বজোড়া ঐশ্বর্য তাহার পদতলে যে

লুটাইয়া পড়িয়াছে। কে যেন সর্বাঙ্গে রাশি রাশি কোমল কুসুম ছিটাইয়া দিয়াছে। মা-নাই, সায়ফুন নাই, আত্মীয়-পরিজন কেহই নিকটে নাই; কে তাহার আনন্দ দেখিয়া আহ্লাদে বিভোর হইবে? কিন্তু কেন? তাহার আবার অভাব কিসের? সে যে আজ নূতন মাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কুলছুম আয়ায-পত্নীর গলদেশ বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া, তাহার মুখের কাছে মুখ তুলিয়া বলিল, "আম্মা! ইনিই আমার শওহর।"

দিনমণি অস্ত গেল।

একত্রিশ

আহারাদির পর কুলছুম স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এ পরিবর্তন কিসে হলো? পরশমণির পরশে লোহা সোনা হয় শুনেছি, কিন্তু তুমি যে মানুষ। বল্‌বে প্রিয়তমে, তোমার সেই পরশমণিটি কি?"

রাহেল উত্তর করিল, "সত্য ও পবিত্র ধর্ম ইসলামই সেই পরশমণি। আজ আমি আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। তুমি কি সায়ফুনের মুখে সত্য ধর্মের কথা কিছুই শোন নি?"

"হাঁ, শুনেছি। যে-ধর্ম তোমার অন্তরের পশুত্ব দূর করেছে, তোমাকে খাঁটি মানুষ করে গড়ে তুলেছে, আমিও অন্তরে অন্তরে সেই ধর্মকেই সত্য বলে জানি। আজ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি-আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই উপাস্য নাই, হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল।"

রাহেল "মারহাবা মারহাবা" বলিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া পত্নী কুলছুমকে নিকটে টানিয়া আনিল। তারপর নিবিড়ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল "ওগো প্রেমময়ী সহধর্মিণী! ওগো আমার হৃদয়রাণী! তুমি যে আজ আমার অন্তরে আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছ, শান্তির উৎস সৃজন করেছ।"

কুলছুম স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আরে ছাড় ছাড়! বুড়া-বুড়ি দেখতে পেলে লজ্জায় মরে যাব। হঠাৎ প্রেম যে বড় উথলে উঠলো?"

রাহেলের দুই চোখে পানি। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "কুলছুম! তুমি জান না, কি আগুন আমার বুকের ভিতরে অহরহ জ্বলছে, তোমাকে পেয়ে আজ হারানিধি ফিরে পেয়েছি। আমার অন্তরের একটা নিবেদন শুনবে কুলছুম?"

কুলছুম স্বামীর বক্ষমধ্যে মুখ রাখিয়া বলিল, "কি সব আবোল-তাবোল বকে লজ্জা দিচ্ছ! বল না কি বলবে!"

রাহেল প্রেমভরে স্ত্রীর কেশগুচ্ছ ধীরে ধীরে নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "কুলছুম! আমার গত জীবনের পুঞ্জীভূত পাপ আমাকে মাথা তুলতে দেয় না; সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে জানিনে; অন্তরের দাহন-জ্বালায় নিশিদিন যে জ্বলে-পুড়ে মরছি। তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে প্রিয়তমে?"

কুলছুম দুই হস্তে স্বামীর মুখ চাপিয়া বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ? কি যে সব বক! যা গত হয়েছে তা আলোচনা করে কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ? ভুলে যাও পুরাতনকে। আজ তোমার মুখ থেকে আমার কত কিছু শোনবার আছে, শিখবার আছে। আচ্ছা, তুমি না ইসলামের ঘোরশত্রু ছিলে? সুমতি হলো কিরূপে?"

"সে অনেক কথা প্রিয়ে! বলবো, একে একে তোমাকে সব কথাই বলবো; কিন্তু সর্বাগ্রে সায়ফুনের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা না করে কিছুতেই যে শান্তি পাচ্ছিনে। যে অবিচারে, অত্যাচারে জর্জরিত করে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়েছি, তার সমুচিত শাস্তি আজ মাথা পেতে নেব। সায়ফুনকে একবার ডেকে দাও না প্রিয়ে?"

সায়ফুনের কথা উঠিতেই কুলছুমের প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সে বিচ্ছেদ-বেদনা অসহনীয়। সায়ফুনের কাহিনী সে সবিস্তারে বর্ণনা করিল। তারপর বলিল, "হয়তো সে রায়হানের সন্ধান পেয়েছে, উভয়ে একসঙ্গে হাবশী দেশে আশ্রয় নিয়েছে।"

এ সংবাদে রাহেল নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "এ জঙ্গলে কাউকে খুঁজে পাওয়া কি বড় সহজ ভেবেছ? দিবাভাগে জঙ্গলে কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে দেখে তোমাদের অনুসরণে করেছিলাম, কিন্তু খুঁজে পাইনি; আর রাতের অন্ধকারে সায়ফুন রায়হানকে খুঁজে পেয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত রয়েছ? দুর্ভাগ্যক্রমে সন্ধান না পেলে সায়ফুনের দশা যে কি হয়েছে কে জানে। এই শ্বাপদসঙ্কুল বনানী পার হয়ে সম্মুখে বিরাট লোহিত সাগর। এক অসহায়া নারীর পক্ষে একাকিনী সেই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে কৃষ্ণ মহাদেশে যাওয়া কী যে দুঃসাধ্য ব্যাপার তা' কি একবার ভেবে দেখেছ?"

রাহেল আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। রাহেলের কথায় কুলছুমের অন্তরও হতাশার বেদনায় ভরপুর। নিদারুণ ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ যেন বিকল হইবার

উপক্রম। ব্যথিত–হৃদয়া নারী বাষ্পাকুল নয়নের দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া আকুল সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, এ কি কথা শোনালে? তবে কি সায়ফুন সে দেশে একাকিনীই গিয়েছে? শুনেছি, সে দেশে দৈত্য–দানবের বাস। অসভ্য জংলী মানুষ নাকি মানুষ ধরে খায়?"

রাহেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কথাটা সত্য নয়, তবে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। সে–দেশে পাহাড়ে জঙ্গলে অসভ্য নরখাদক মানুষ যথেষ্টই রয়েছে; কিন্তু ন্যায়পরায়ণ রাজা নজ্জাসীর সুশাসনে প্রজারা মোটামুটি শান্তিতেই বাস করে।"

"সে দেশের রাজা কি মুসলমান?"

"না, রাজা নজ্জাসী খ্রীস্ট ধর্মীয়, কিন্তু অতি সদাশয় লোক। আমাদের দেশবাসী যে সকল মুসলমান সে দেশে হিজরত করেছেন, শুনেছি রাজা নজ্জাসীর দরবারে তাঁরা পরম সমাদর লাভ করে ধন্য হয়েছেন। শুনেছ নিশ্চয়ই, কুরাইশগণ স্বদেশ থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু বিদেশেও ইসলাম ধর্ম যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, সে চেষ্টারও কসুর করেনি। তারা বিরাট লোহিত সাগর পার হয়ে, দিনের পর দিন সুদীর্ঘ নীল নদের খরস্রোতে নৌকা ভাসিয়ে সেই সুদূর পর্বতসঙ্কুল হাবশী রাজ্যেও মুসলমানদের ধাওয়া করেছিল; তারপর রাজদরবারে পৌঁছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে করেছিল কতই–না কুৎসা রটনা আর মিথ্যা অভিযোগ। শুধু কি তাই! রাজাকে, রাজ–পুরোহিতকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়ে মুসলমানদের তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে ইনিয়ে–বিনিয়ে করেছিল কতই–না অনুরোধ–উপরোধ!"

কুলছুম আঁতকিয়া উঠিয়া বলিল, "কী সর্বনাশ! আবার তাদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল?"

"হাঁ, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ নজ্জাসী তাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। মুসলমানদের তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া দূরে থাক, কত সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। শোননি, কুরাইশ–সর্দার আবদুল্লাহ্–ইব্ন্–রাবি ও আমর–ইবন–আস নজ্জাসীর রাজ্য থেকে বিফলমনোরথ হয়ে বাড়ী ফিরে এসে স্বদেশের

মুসলমানদের উপর কী প্রতিহিংসার আগুনই না জ্বালিয়ে দিয়েছিল? সেই দুষ্কর্মে আমিও কি অংশ গ্রহণ করিনি! তাই ত আজ অনুশোচনার তুষানলে তিলে তিলে জ্বলে–পুড়ে মরছি। কিন্তু যে অঘটন ঘটিয়েছি, তার প্রতিকার কি? রায়হান ও সায়ফুনকে আর কি খুঁজে পাব?"

"দেখ, আমার কেবলই মনে হয়, সায়ফুন রায়হানকে যেন পেয়েছিল। এই পান্থশালার মালিক সেই সন্ধ্যায়ই সায়ফুনের পিছু পিছু ছুটে গিয়েছিলেন জঙ্গলে বহু দূর; কিন্তু অনেক খোঁজ–খবর করেও তাদের কোন সন্ধান পান নি। মনে হয় তারা এক সঙ্গেই হাবশী দেশে পৌঁছেছে।"

"এই সুদীর্ঘ বনানী ভেদ করে তারা কোন সমুদ্রগামী জলযানের সন্ধান পেয়েছিল কিনা কে জানে! বীচি–বিক্ষুব্ধ অকূল পয়োধি পাড়ি দিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় আর বিশাল পার্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করে হাবশী দেশে পৌঁছা কি যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, তুমি তা বুঝবে না। স্থানে স্থানে নীল নদও সহজনাব্য নয়। তা' ছাড়া খরস্রোতা নীলের তটদেশে স্থানে স্থানে কত অসভ্য আদিম অধিবাসীর বাস। মুলকে–হাবাশে পৌঁছা কি সহজ ব্যাপার! শোন কুলছুম! কাল প্রত্যূষেই আমি আল্লাহ্‌র নাম করে তাদের খোঁজে বের হব। এই জঙ্গলের যেখানেই তারা লুকিয়ে থাকুক না কেন, আমি খুঁজে বের করবোই করবো; না পেলে, হাবশী দেশেই চলে যাব। এক কাজ করবে কুলছুম?"

"বল।"

"আমি যাদের এই জঙ্গলে নিয়ে এসেছি, তারা সকলেই দুঃস্থ মুসলমান! তোমার মুখেই শুনলাম, এই বাড়ীর মালিকও নাকি ইসলাম ধর্মাবলম্বী; তাঁর সাহায্যে এই বনবাসী উদ্বাস্তুদের ভরণ–পোষণের একটা সুরাহা করতে পারবে কি? এ মহৎ পুণ্যকার্যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌–পাক তোমাদের সহায় হবেন। পারবে কি? প্রিয়তমে তাদের ভার গ্রহণ করতে?"

কুলছুম গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "কিছু ভেবো না যেন, আল্লাহ্‌র মরজি আমি তাদের দেখাশোনা নিশ্চয়ই করবো। জায়গাটা বেশ নিরাপদ। যদি সম্ভব হয়, ভাই ওৎবার সাহায্যে, স্বদেশের যে–সব মুসলমান শত্রু–পরিবেষ্টিত হয়ে নিশিদিন অত্যাচার–অবিচার সহ্য করছেন, তাঁদেরও এখানে আনাবো। তুমি বরং

সায়ফুন ও রায়হানের সন্ধান কর। ভেবেছিলাম, সায়ফুন প্রিয়জনের সন্ধান হয়তো পেয়েছে, কিন্তু তোমার কথায় উদ্বেগ যে বেড়ে গেল। কবে বের হবে বল?"

"কালই। জীবনভর যত পাপ কাজ করে এ ছার অন্তর কলুষিত করেছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে মন যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। দেশে দেশে, বনে বনে ঘুরে তাদের খোঁজ করবোই করবো।"

"ভাগ্যক্রমে তোমার সঙ্গে যে মিলন ঘটেছে তা' যে এত স্বল্পস্থায়ী হবে, সে-ত কল্পনাও করিনি। কালই চলে যাবে?" কুলছুমের দুই নয়ন অশ্রুপূর্ণ।

"বুঝতেই পারছো, বিলম্বে উৎকণ্ঠা দিন দিন বেড়েই যাবে, মনেও আর শান্তি পাব না। না জানি এতদিনে কি ঘটেছে এদের অদৃষ্টে। তাদের খুঁজে ক্ষমা ভিক্ষা না চাইলে প্রাণে যে আর শান্তি পাব না। কুলছুম?"

কুলছুম গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলঃ "হাঁ, সায়ফুন বড় দুঃখিনী, তাকে হারিয়ে মন বড় খাঁ খাঁ করছে, কেবলই জ্বলে-পুড়ে মরছে। ভেবেছিলাম, সে হয়তো রায়হানকে পেয়ে চলে গেছে মুল্‌কে হাবাশ্‌। কিন্তু তোমার কথায় মনের আগুন যে জ্বলে উঠলো নতুন করে।"

"না, দুইজনের মিলন ঘটেছে মনে করে মোটেই নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। দেরি করাও চলে না। মুহূর্তে কত অঘটন যে ঘটতে পারে। আমি কালই যাব।"

কুলছুম বড় অস্থির হইয়া উঠিল। কাতরভাবে বলিল, "ওগো, কবে ফিরে আসবে? বড় ভয় লাগে; আমি যে বড় হতভাগী, না জানি আবার তোমাকেও হারিয়ে ফেলি।" কুলছুম কাঁদিয়া ফেলিল।

রাহেল পত্নীর অশ্রু মুছাইয়া বলিল, "প্রিয়তমে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে শীঘ্রই হয়তো ফিরে আসবো তোমার কাছে। ভয় কি। নিশ্চয়ই জেনো, আল্লাহ্‌র হুকুমে অচিরে ইসলামের আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তখন আমাদের দুঃখের অবসান হবে। ইসলাম বিশ্বধর্ম, প্রিয় হযরত মুহম্মদ (সাঃ) বিশ্বনবী-এ-সত্য একদিন আরববাসীদের চোখে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কালক্রমে সমগ্র বিশ্ববাসীও এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে-এ বিশ্বাস আমার আছে। যে সত্য প্রচার করতে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) কুরাইশদের অমানুষিক অত্যাচারে

জর্জরিত হয়েও অটল রয়েছেন; সত্যাশ্রয়ী মুসলমানগণ অকথ্য উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়েও যে ধর্মসম্পদ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন; সমগ্র বিষয়–আশয় ও আত্মীয়–স্বজন পরিত্যাগ করে প্রাণভয়ে গিরি–কন্দরে, গভীর অরণ্যে কিংবা বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেও যে সত্যের আলো তাঁরা জ্বালিয়ে রেখেছেন, তা' কখনও বিলীন হবার নয়–মিথ্যা হবার নয়। একি! কাঁদ্‌ছো কুলছুম? কাঁদ্‌ছো? চিন্তা কিসের! আল্লাহ্‌র মরজি ফিরে আসবো; আবার গড়ে তুলবো সুখের সংসার। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি শুধু উদ্বাস্তুদের একটু দেখাশোনা করো।"

কুলছুম ওড়নার প্রান্তভাগে চক্ষুদ্বয় মুছিয়া বলিল, "এই জঙ্গলে কোথায় সেই নির্যাতিত মুসলমানদের রেখে এসেছ–কোথায় আমি খুঁজে পাব?"

"আমি নিজেই তোমাকে তাদের আশ্রয়স্থলে রেখে আসবো। তোমার আশ্রয়দাতা আয়াযকেও সঙ্গে নেব। তাঁরই পরামর্শমত কাজ করবো। মজলুমদের অনেক উপকারই তিনি করতে পারবেন। তাঁর দয়া, তাঁর মহত্ত্ব ভুলতে পারবো না।"

"হাঁ, এই বনবাসী দম্পতির অন্তরের পরিচয় বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বহুদিন মাতাপিতাকে হারিয়েছি, কিন্তু মনে হয় আবার তাঁদের ফিরে পেয়েছি। এঁদের দুঃখের কাহিনী নির্মম পাষাণের চোখেও অশ্রু–বন্যা বহায়।" এই বলিয়া কুলছুম আয়ায ও আয়ায–পত্নীর মর্মান্তিক কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করিতে লাগিল।

সুদীর্ঘ করুণ–কাহিনী। আয়াযের ইসলাম–গ্রহণ, স্বজনদের অত্যাচার, অবিচার, গৃহদাহ, কন্যার অপমৃত্যু–ইত্যাদি নানা করুণ বিবরণ শুনিয়া রাহেল বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। এ বৃদ্ধ দম্পতির প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক নত হইয়া আসিল।

তারপর কত কথাই ত উঠিল–কুলছুমের সপত্নীদের কথা, আত্মীয়–স্বজনের হাল–হকিকত, সায়ফুনের মাতাপিতা ও ওৎবার কাহিনী, রাহেলের ইসলাম–গ্রহণ ও ভ্রমণ–বৃত্তান্ত–ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। কথোপকথনে রাত্রি কখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহারা টেরও পায় নাই। চারিদিকে পাখীরা তখন নবীন উষার আলোকে কলধ্বনি শুরু করিয়াছে। রাহেল ও কুলছুমের চৈতন্য হইল

এতক্ষণে। দ্বার খুলিয়া দেখে–অন্ধকার আর নাই। প্রভাতের মৃদু সমীরণ চারিদিকের বৃক্ষপত্র ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিয়া জড় বনানীর বুকে যেন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে! শোনা গেল, অপর গৃহে বৃদ্ধ আয়ায একান্ত নিবিষ্টচিত্তে বিশ্বপতির বন্দনায় নিমগ্ন।

বত্রিশ

দীর্ঘদিনের অমানুষিক পরিশ্রমে এবং অনশন–অর্ধাশনে অর্ধমৃত অবস্থায় রায়হান, জাফর ও তাঁহাদের সঙ্গিগণ অবশেষে সমস্ত দুর্লংঘ বাধা অতিক্রম করিয়া মুল্‌কে হাবাশের রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই সুদীর্ঘ ভ্রমণ–কাহিনী বড় মর্মান্তিক। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, নীল নদের খরস্রোত, দুর্গম পার্বত্য পথ, বন্ধুর মালভূমি এই যাত্রীদলের যাত্রাপথে কত দুরতিক্রম্য বাধা–বিপত্তির যে সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। তদুপরি স্থলপথে স্থানে স্থানে পার্বত্য জাতিগুলিও দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। উপকূলভাগের অসভ্য জংলী পাহাড়ীরা প্রাকৃতিক বাধা–বিপত্তির সহিত নিষ্ঠুরভাবে সহযোগিতা করিয়া এক–একদিন যাত্রীদের প্রাণ সংশয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ধর্মবলে বলীয়ান এই ক্ষুদ্র মুসলমান দলটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নই অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আনুমানিক ষষ্ঠ হিজরীর শেষাংশে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

নবুয়তের পঞ্চম হইতে চতুর্দশ বর্ষাবধি আরবের যে সকল দুঃস্থ মুসলমান মুল্‌কে হাবাশে বসবাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই জাফর ও অন্যান্য উদ্‌বাস্তুদের আগমন–সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। নবাগত মুসলমানদের শীর্ণ দেহ, ক্লিষ্ট মুখশ্রী, রুক্ষ ও মলিন বেশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের অন্তর বেদনায় ভরপুর। সাশ্রুনয়নে তাঁহারা মুহাজিরদের আলিঙ্গন করিয়া কুশল–সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিলেন না। দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের লোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়া গর্বে, আনন্দে, বিমলহাস্যে সকলের মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল। সকলে মিলিয়া আল্লাহ্‌র দরগায় শোকরিয়া আদায় করিলেন।

হাবশী দেশের মুসলমান–সর্দার আবদুর রহমান হাসিতে হাসিতে জাফরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আরে জাফর ভাই। এত দেরিতে মনে পড়লো যে? কতদিন হয় ছেড়ে গিয়েছিলেন আমাদের, ফেরবার আর নামটিই নেই। কতদিন আপনার খোঁজে বন্দরে লোক পাঠিয়েছি। কত সন্ধ্যায় পাহাড়ের চূড়ায় বসে

আপনার প্রতীক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছি; কিন্তু এলেন কই? এত দিনে বড় উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছিলাম।”

জাফর হাসিয়া বলিলেন, “কি আর করি ভাই! এই সব দুর্ভাগা মুসলমানদের জালিম দেশবাসীর হাত থেকে উদ্ধার না করে কিরূপেই বা এদেশে ফিরে আসি?”

আবদুর রহমান বলিলেন, “এখানেও যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে ভাইজান। রাজার বিপদ, রাজ্যে মুসিবত–সেইজন্যই ত আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছিলাম।”

জাফর চমকিত হইয়া বলিলেন, “কি বললেন? রাজার বিপদ! রাজ্যে মুসিবত! আমাদের আশ্রয়দাতার কি কোন অমঙ্গল ঘটেছে?”

আবদুর রহমান উত্তর করিলেন, “হাঁ, রাজ্যে যুদ্ধ বেধেছে। সেই অসভ্য–রাজ উগাণ্ডি আবার নজ্জাসী–রাজ্য আক্রমণ করেছে! সব কথাই বলবো আসুন। আরে! এ কে মহাবীর রায়হান! ওখানে কে? ভাই আবদুল্লাহ্! আবু আক্কাস! আবূ আব্বাস! ঐ বুঝি তাহের ও হাবীব? আহ্, কি আনন্দ! কি শান্তি! এস ভাই! এস! সকলে এই বৃক্ষতলে বসে খানিক বিশ্রাম কর। এখানেই কিছু পানাহার করে সুস্থ হও। ততক্ষণে পল্লীতে তোমাদের একটা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করা যাক কোন রকম।” আবদুর রহমান নাশ্‌তা–পানি আনিবার জন্য তখনই লোকজন পাঠাইয়া দিলেন তাঁহাদের পল্লীতে।

রাজা নজ্জাসী বিপদাপন্ন–এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র জাফরের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উৎকণ্ঠিত চিত্তে তিনি বলিলেন, “রাজার মহানুভবতা আমরা ভুলতে পারবো না, মুসলমান জাতি কোনকালেই তা ভুলবে না। ভাই আবদুর রহমান! তুমি এদের নিয়ে পল্লীতে যাও! আমি রাজদরবারে গিয়ে মহামান্য নজ্জাসীকে তাদের আগমন–সংবাদ জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, যুদ্ধ–বার্তাও সঠিক জেনে আসি।” এই বলিয়া জাফর ত্রস্তপদে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আবদুর রহমান রায়হানকে চিনিতেন, তাঁহার সঙ্গীদের কয়েকজনকেও জানিতেন। জাফর ত তাঁহাদেরই পুরাতন বন্ধু। তিনি সেখানে উপস্থিত প্রবাসী

মুসলমানদের নিকটে নবাগত উদ্বাস্তুদের পরিচয় একে–একে বর্ণনা করিলেন। রায়হানের শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব–কাহিনী গর্বভরে তাঁহার বন্ধুদের জানাইয়া তিনি বলিলেন, "বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হ'লে কি হয়, রায়হান হাজ্জাজের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের অন্যতম।"

বৃক্ষতলে নবাগত মুহাজিরদের ঘিরিয়া লইয়া আবদুর রহমান ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বদেশের আত্মীয়–স্বজনদের খবর লইতে সকলের আগ্রহের সীমা নাই। নিষ্ঠুর দেশবাসীদের উৎপীড়ন–চিহ্ন তাঁহাদের দেহে তখনও মিলায় নাই, তবুও দেশের সেই সব জালিমদের কুশল সমাচার একে একে জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহারা ভুলিলেন না। সকলে অবাক হইয়া শুনিলেন, সেই সব অত্যাচারী কুরাইশদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া হিজরত করিয়াছেন; আবার অনেকে তখনও সেই অবিশ্বাসীই রহিয়া গিয়াছে এবং পূর্ণোদ্যমে মুসলিম–নির্যাতন চালাইয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে রায়হান রাহেল, ওৎবা, শোহেলী প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে ভুলিলেন না।

আবদুর রহমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, চেন কি সেই কুরাইশ বংশীয় কুস্তিগীর আবূ জান্দালকে, যে আমাকে অগ্নিময় বালুকার উপর ফেলে রেখেছিল হাত–পা বেঁধে?"

রায়হান উত্তর করিলেন, "তাঁকে আর চিনতে পারবো না! আল্লাহর রহমত তাঁর উপরও নাযিল হয়েছে ভাই আবদুর রহমান। তিনিও সত্য ধর্মে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই কুস্তিগীর তিনি আর নেই এখন। অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে তনু তাঁর ক্ষীণ হয়েছে। কুরাইশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আবূ জান্দাল চেয়েছিলেন মদীনায় পালাতে, কিন্তু পারেন নি, অবশেষে জাবাল–উস্–সারাত পর্বতশ্রেণীর অন্তর্দেশে কোথায় যেন লুকিয়ে আছেন।"

সকলে সমস্বরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা–কীর্তন করিলেন।

আবূ লায়াস নামক এক খঞ্জ লাঠিতে ভর করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহার চাচা তামান্নার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই তামান্না–ইবন্–আবূ ওবায়দা, যিনি আবূ লায়াসকে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের জন্য পাহাড়ের উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। দৈবক্রমে আবূ লায়াসের প্রাণরক্ষা হয় বটে কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ পদ ভাঙ্গিয়া যায়।

রায়হান তাঁহাকে জানিতেন না, আবূ আক্‌কাস চিনিতে পারিলেন। তিনি এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তামান্না অবিশ্বাসী অবস্থায়ই গত বৎসর প্রাণত্যাগ করেছ। বনি ইয়ামিন বংশের কে এক দুষ্ট ছোকরা খেলার ছলে পথিপার্শ্বে বাঁধা তাঁর এক অশ্বকে ঢিল ছুঁড়ে মারে। এ উপলক্ষে বচসা হ'তে হ'তে ক্রমে দুই সম্প্রদায়ে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। উভয় দলের প্রায় পনর-বিশ জন পুরুষ এই যুদ্ধে হতাহত হয়। সেই যুদ্ধেই এক প্রস্তরাঘাতে বৃদ্ধ তামান্নাও নিহত হয়। এই ঘটনার প্রায় বৎসরকাল পরে আমি স্বদেশ থেকে বের হই; কিন্তু তখনও শুনে এসেছিলাম-সেই দুই দলের বিবাদ-বিসংবাদ সমানেই চলছে, সুযোগ পেলেই একে অপরকে আক্রমণ করে, হত্যা করে।"

এই সংবাদ শ্রবণমাত্র দুঃখ ও নৈরাশ্যে আবূ লায়াসের অন্তর ভরিয়া উঠিল। পরলোকগত পিতৃব্যের নিষ্ঠুর আচরণ তিনি এক মুহূর্তে ভুলিয়া গেলেন, সর্বান্তঃকরণে তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

বিশ্রামকালে ও আহার করিতে করিতে কথোপকথন চলিল। আহারের পর মুহাজিরদের পল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য খবর আসিলে বন্ধুবর্গসহ আবদুর রহমান, রায়হান ও তাহার সঙ্গীদের লইয়া কিয়দ্দূরে আপন পল্লীর পথে যাত্রা করিলেন।

নিকটেই শহরের উপকণ্ঠে মুসলমানদের নিবাস। রাজানুগ্রহে তাঁহাদের ভরণ-পোষণের সুবন্দোবস্তও সেই দেশে হইয়াছে। রায়হান ও তাঁহার সঙ্গিগণ সর্দার আবদুর রহমানের মুখে দয়ার্দ্রচিত্ত রাজা নজ্জাসীর মহানুভবতার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। সকলে সংকল্প করিলেন, জাফর ফিরিয়া আসিলেই তাঁহারা রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া রাজ-সমীপে শ্রদ্ধা নিবেদন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন।

সম্মুখে এক উচ্চ টিলা। টিলা পার হইয়া ওপারে এক প্রশস্ত রাজপথ। সেই পথেই চলিতে হইবে। যাত্রীদল মোট-গাট পৃষ্ঠে বহন করিয়া ধীরে ধীরে সেই টিলার উপরে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

উপরে উঠিয়া আবদুর রহমান রায়হান ও তাঁহার সঙ্গীদের চারিদিকে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! এই রাজ্যে আমাদের দিন কাটছিল

পরম সুখেই। দেশবাসী ও আত্মীয়–স্বজনদের সাহায্য ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে এই বিদেশী খৃষ্টান নরপতির যে কৃপাদৃষ্টি ও অনুগ্রহ লাভ করেছিলাম তা' বর্ণনাতীত। আমরা এখানে বড় শান্তিতে ধর্মালোচনা করে দিনপাত করতাম; কিন্তু অধুনা মহামান্য নজ্জাসী যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, জানি নে তার পরিণতি কি হবে! না জানি আমাদের অদৃষ্টে আর কি দুঃখই বা রয়েছে!"

নবাগত মুসলমানগণ এই দয়ালু নরপতির বিপদবার্তা শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলে ঔৎসুক্যভরে পল্লী–সর্দার আবদুর রহমানের প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইয়া রহিলেন।

আবদুর রহমান পুনরায় বলিলেন, "অসভ্য রাজা উগাণ্ডি এই রাজ্য আক্রমণ করে কত নিরীহ অধিবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে; কত অসহায় নরনারীর বাসস্থান লুণ্ঠন করে পুড়িয়ে দিয়েছে; কত নরনারীকে যে বন্দী করে স্বরাজ্যে নিয়ে গিয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। ঐ দূরে দক্ষিণে যেখানে পাহাড়ের কাল রেখা আকাশের গায়ে মিশে গেছে, সেখাইে উগাণ্ডির রাজ্য। শুনেছি, সেই অসভ্য রাজার প্রজাগণ প্রায় সকলেই অর্ধোলঙ্গ, স্নেহ–মমতাহীন নিষ্ঠুর নরপিশাচ। এদের কোন কোন দল নরখাদক বলেও শোনা যায়। রাজা নজ্জাসী কঠোর হস্তে এই অসভ্যদের দমন করে বন্দীদের উদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বন্ধুগণ! রাজার এই বিপদকালে আমাদের কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে তাঁর শত্রু সংহার–কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়া একান্ত কর্তব্য।"

রায়হান গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই পরোপকারী রাজার গুণাবলী স্বদেশেও শুনেছিলাম। সেইজন্যই আমরা এ–রাজ্যে আশ্রয় নিতে উৎসাহিত হয়েছিলাম। চলুন, রাজার কল্যাণে, রাজ্যের মঙ্গলে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করে, শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করি।"

আবদুর রহমান উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "মহাবীর রায়হান! মহাবল আবূ আককাস! আপনাদের আগমনে আমাদের বাহুবল শতগুণ বর্ধিত হয়েছে। আজ এই মহামান্য ভূপতির সেবায় অস্ত্র ধারণ করতে মোটেই আমরা ভীত নই। বন্ধুগণ! আপনারা পথশ্রান্ত, অনিদ্রায়–অনাহারে ক্লান্ত; সর্বাগ্রে পানাহার করে বিশ্রাম করুন, পরে আলোচনা হবে এ বিষয়ে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি পল্লীর যুবক আবূ তোরাব ও আবূ লায়াসকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই আবূ তোরাব! "ভাই আবূ লায়াস!

তোমরা পল্লীতে গিয়ে এঁদের খানাপিনা ও বিশ্রামের ইনতিজাম কর। জাফর ভাই তো রাজদরবারে গিয়েছেন। আমিও সৈন্যশিবিরে রাজপুত্র যোফনকে এঁদের আগমন-সংবাদটা জানিয়ে আসি।" এই বলিয়া আবদুর রহমান টিলার গা বাহিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিতে লাগিলেন।

সর্দারের আদেশ শুনিবামাত্র আবূ লায়াস লাঠিহস্তে সকলের আগে আগে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ছুটিতে লাগিলেন। তাঁহার আনন্দের পরিমাপ করে কার সাধ্য। স্বদেশের খবরাখবর আজ তিনিই সর্বাগ্রে পাড়ায় গিয়া সকলকে শোনাইবেন।

আবূ তোরাব নবাগত মুসলমানদের সঙ্গে লইয়া পল্লীর পথে যাত্রা করিলেন। বেলা তখনো প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত। প্রখর রৌদ্রতাপ ও উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ, চারিদিকের গিরিমালা, সকলকে স্বদেশের অগ্নিবৎ সৌরকর লু-হাওয়া ও পাহাড়-পর্বতের কথাই মুহূর্মুহ স্মরণ করাইয়া দেয়।

রায়হান ও তাঁহার সঙ্গিগণ চাহিয়া দেখেন, দূরে অসংখ্য পর্বতমালা আরবের যাবাল-উস-সারাত পর্বতশ্রেণীর ন্যায় সোজা উত্তরে দক্ষিণে সগর্বে দণ্ডায়মান। পর্বতের শিখরপ্রদেশ অনন্ত ঊর্ধ্বে ধূম্রবর্ণ মেঘমালায় নিমজ্জিত। পূর্বদিকে বহুদূরে দিকচক্রবাল রেখার বরাবর স্তরে স্তরে সজ্জিত পাহাড়গুলি কত গাঢ় নীলাভ; অদূরে জন-কোলাহল-মুখরিত পার্বত্য রাজধানীর স্বাভাবিক দৃশ্যও বড় মনোরম। নগরীর অগণিত সৌধমালা যুগ-যুগান্তরের অধিবাসীদের কত কীর্তি কাহিনী বুকে জড়াইয়া রাখিয়া কেমন অনড় অটল। দূরে উদ্যান পরিবেষ্টিত বিশাল রাজবাটীর সুউচ্চ হর্মমালার শীর্ষদেশ, অত্যুচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর চূড়াগুলি ছাড়াইয়া বহু উপরে নীলাকাশে যেন প্রহরায় রত। কিয়দ্দূরে উত্তুঙ্গ গিরিরাজের পাদমূলে রাজপথে কৃষ্ণকায় হাবশিগণ পৃষ্ঠদেশে পণ্যদ্রব্যের মোট-গাঁট বাহিয়া ধীরে ধীরে উঁচু নীচু পথে নগরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

তেত্রিশ

রাজধানীর প্রান্তদেশে মুসলমান পল্লী। পল্লী ছোট–সারি সারি ছোট–বড় বহু কুটীরে শোভিত–বেশ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন। বাঁশ, খড় ও লম্বাকৃতি সরু সরু বৃক্ষপত্রে রচিত কুটীরগুলি ঘিরিয়া চারিদিকে যেন এক পবিত্রতার ছায়া বিরাজমান। এখানে ওখানে কাষ্ঠনির্মিত কয়েকখানা ঘরও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সম্মুখে বহুদূর–বিস্তৃত প্রান্তরের ওপারে ছোট–বড় অসংখ্য পাহাড় স্তরে স্তরে সাজান। দক্ষিণে এক ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী মৃদু কল্লোলধ্বনি সহকারে সাবলীল গতিতে পূর্ব–পশ্চিমে প্রবহমান। কী মনোরম দৃশ্য! নদীর উপরে এক অপরিসর কাষ্ঠসেতু পারাপারের সংযোগ রক্ষার জন্য নির্মিত। অনতি পরিসর রাজপথগুলি স্থানে স্থানে টিলার উপরে উঠিয়া আবার নামিয়া, সমতল ভূমিতে গিয়া মিশিয়াছে। সে উচ্চ–নীচ পার্বত্য পথে, কত কর্মরত নরনারী পৃষ্ঠদেশে পণ্যদ্রব্যের বোঝা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া উঠানামা করিতেছে। নবাগত মুসলমানগণ চারিদিকের এই কর্মব্যস্ততা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলেন।

রায়হান ও তাঁহার সঙ্গিগণ পল্লীতে পৌছিবামাত্র পল্লীবাসীদের কেহ কেহ তাঁহাদের কয়েকজনকে চিনিতে পারিলেন। মহোল্লাসে আবূ লায়াস ছুটাছুটি করিয়া বাকী সকলের পরিচয় দিতে ব্যস্ত। বহুদিন পরে আবার আর একদল মুসলমানের আগমন–সংবাদ শুনিয়া সকলের অন্তর যেন এক অপূর্ব পুলকে নাচিয়া উঠিল।

আবূ লায়াস ও একদল পল্লীবাসী নবাগত মুহাজিরদের বৃক্ষতলে এক বংশ–নির্মিত মঞ্চের উপরে বসাইলেন। আবূ তোরাব ছুটিয়া গেলেন অতিথিদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করিতে; ইব্‌ন হানিফ ছুটিলেন বিশ্রামের বন্দোবস্ত দেখিতে। সমগ্র পল্লী এক অপূর্ব উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিল।

নবাগত মুসলমানগণ কিছু খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া সুস্থ বোধ করিলেন। রায়হান চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বড় চমৎকার পল্লী! রাজা নজ্জাসীর দান বুঝি? নিশ্চয়ই তিনি খুব উদারপ্রাণ, না ভাই?"

আবূ লায়াস বলিলেন, "জি হাঁ, বড় দয়ালু রাজা, বড় মহাপ্রাণ!" রায়হান প্রশ্ন করিলেন, "রাজা নজ্জাসী কি নিজেই এই পল্লী নির্মাণ করিয়েছেন?"

আবূ লায়াস উত্তর করিলেন, "জি না, আমরা স্বহস্তে তৈরী করেছি। ছয়মাস কাল তো রাজপুরী-সংলগ্ন এক উদ্যান-বাটীতেই আমরা বসবাস করছিলাম, কিন্তু তথায় স্থান-সংকুলান না হওয়ায় সকলে মিলে পরে এই পল্লী গড়ে তুলেছি।"

আবূ তোরাব রায়হানের নিকটে বসিয়া বলিলেন, "রাজা নজ্জাসী আমাদের জন্য তাঁর প্রাসাদ-সংলগ্ন আরো কয়েকটি বাগান-বাড়ী ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন,কিন্তু সর্দার আবদুর রহমান ও অন্যান্য সকলে রাজাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে এই স্থানটিই পছন্দ করলেন।"

আবূ আক্‌কাস প্রশ্ন করিলেন, "কেন, এই স্থানটি রাজার উদ্যান-বাটীর চেয়ে কিসে উত্তম?"

আবূ তোরাব আসিয়া উত্তর করিলেন, "না-না, উত্তম কি করে হয়-কোথায় রাজ-প্রাসাদ, আর কোথায় এই পর্ণকুটীর। তবুও তো এই ঘরগুলি আমাদেরই স্বহস্তে নির্মিত, আমাদের নিজস্ব; কাজেই অধিকতর প্রিয়।"

রায়হান বলিলেন, "স্থানটি বড়ই মনোরম। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কত মনোহর!"

আবূ তোরাব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হাঁ, বেশ সুন্দর দেশ। দূরের ঐ পর্বতমালা, ঐ পার্বত্য নহর, পাহাড়ের ওপারে মরুভূমি আমাদের অন্তরে অহরহ স্বদেশের-স্মৃতি জাগরূক রাখে। প্রভাতেই চোখের উপরে ভেসে উঠে ঐ পাহাড়-সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র জন্মভূমি জজিরাতুল আরব আমাদের মনের দুয়ারে যেন উঁকি মেরে যায়। মনে হয় ঐ আমাদের যাবাল-উস্‌-সারাত, ঐ আমাদের স্বদেশের

প্রতীক, ডাকে আমাদের ইঙ্গিতে; অন্তরে সাহস দেয়, শক্তি দেয়, চিত্ত প্রফুল্ল রাখে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঐ পর্বতমালায় দৃষ্টিপাত করে আমরা হিসাব করি আমাদের নির্বাসনের আর একটি দিন অবসান হয়েছে, আমাদের মুক্তির দিনও হয়তো এক ধাপ এগিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দল বেঁধে আমরা ওদিকে যাই, পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটাছুটি করি। চূড়ায় বসে কখনও বা মনের আনন্দে প্রস্তরখণ্ডই আঁকড়ে ধরি, আবার অকারণে দুই-একটা পাথর নীচে গড়িয়ে ফেলে, কত খেলা করি। এই স্থানে আমরা স্বদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করে, নিশিদিন অন্তরে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি। দেশের আলো, দেশের হাওয়া, দেশের মাটি, তপ্ত বালি, পাহাড়-বনানী, ভুলতে পারি না, রায়হান ভাই!"

স্বদেশের স্মৃতি রায়হানের দুই চোখ সজল করিয়া তুলিল। বলিলেন, "চলুন, একবার সমগ্র পল্লীটি ঘুরে আসি। সায়াহ্নে ঐ পাহাড়ে যাব। সেই পাহাড় যেন কত পরিচিত, আমাদেরও ডাকছে যেন হাতছানি দিয়ে।"

সকলে গাত্রোত্থান করিলে আবূ তোরাব পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন, সর্বাগ্রে খঞ্জ আবূ লায়াস। কিয়দ্দূরে গিয়া পল্লীর কেন্দ্রস্থলে একটি রুদ্ধদ্বার গৃহ দেখাইয়া আবু তোরাব বলিলেন, "এইটি আমাদের মসজিদ। ঐ যে সম্মুখে বৃক্ষতলে কয়েকটি বংশনির্মিত আসন পাতা রয়েছে, তাতে দিবসে আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করি; সংসারের খুঁটিনাটি আলোচনায় মাতি। রাত্রে নামাযের পরে ঐ দিকের খোলা ঘরটার চত্বরে বসে স্বদেশের কত কথা আলোচনা করি। ভাবি, কবে আমরা স্বদেশে ফিরবো, কবে আবার স্বদেশের ধূলিবালি আর পাহাড়-পর্বতে ছুটাছুটি করবো; আবার কখন স্বদেশবাসী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হব। রাত্রি অধিক হলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে শয্যা গ্রহণ করি। আমাদের মনশ্চক্ষে তখনও ভেসে ওঠে স্বদেশের দৃশ্যাবলী-সেই পণ্যবাহী উষ্ট্রযুথ! সেই যাবাল-উস্-সারাত, সেই পার্বত্য নহর, সেই খর্জুর-বীথিকা!"

সকলের অন্তস্থল ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। আবূ আক্‌কাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিন গুজরান হয় কিরূপে ভাই? আপনাদের কি রাজার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়?"

আবূ তোরাব উত্তর করিলেন, "জ্বি না, তা' কেন হবে! সকলেই কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করি। প্রথমে আমরা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করেছি। তাতে কোনক্রমে জীবন ধারণ করে সামান্য মূলধন সঞ্চয় করেছিলাম। তারপর ঐ সব পার্বত্য গ্রামাঞ্চল থেকে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য কিনে এনে শহরে বিক্রি করে লাভবান হয়েছি। সবই আল্লাহ্‌র মেহেরবানী। আবদুর রহমান, আবূ হালিম, ইব্‌ন্ হানিফ প্রভৃতি অনেকেই এখন আল্লাহ্‌র রহমতে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন; অনেকেই আবার শহরে দোকানপাট খুলে তেজারতিও শুরু করেছেন।"

আশায়, আনন্দে সকলের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রায়হান অধোবদনে নির্বাক বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন–যাহারা নিঃসহায়, নিঃসম্বল, এমন ভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়াই বুঝি আল্লাহ্‌র রহমত তাঁহারা লাভ করেন, নিশ্চেষ্ট বসিয়া নয়! আল্লাহ্‌র মদদ্ পরিশ্রমী মানুষের উপর কোথায় কিভাবে নাযিল হয়, কে বলিবে! দুর্ভাগ্যের পীড়নে, অভাবের তাড়নে, আর মেহনতের কারণে আমাদের কুব্জ দেহ যখন ন্যুব্জ হইয়া উঠে তখন একবারও বুঝিতে পারি না খোদাওন্দ করীম আমাদের দুর্ভাগ্যের পশ্চাতে কত মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ লুকাইয়া রাখেন।

আবূ আক্‌কাস উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "সকলেই আপন আপন পরিশ্রমলব্ধ অর্থে দিনপাত করেন, এ–ত বড় সুখের কথা।"

আবু তোরাব বলিলেন, "হাঁ, যাঁরা সক্ষম তাঁরা সকলেই খেটে খান। বার্ধক্যহেতু যাঁরা শ্রমসাধ্য কার্যে অপারগ, তাদের ভরণ–পোষণের জন্য আবার বায়তুলমাল খুলেছি। চলুন দেখবেন! চলুন রায়হান ভাই! আমাদের কেউ কেউ আবার কৃষিকার্যও আরম্ভ করেছেন। চলুন, পাহাড়ের তলদেশে দেখবেন–শস্যে ভরা কেমন শ্যামল কৃষিভূমি। সবুজ ভুট্টা, গম ও জোয়ারের গাছগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে চোখ জুড়ায়। বড় উর্বর দেশ রায়হান ভাই। এত স্বল্পশ্রমে এত প্রচুর খাদ্যশস্য আর কোথাও উৎপন্ন হয় কিনা জানি নে।"

"চলুন দেখবেন," বলিয়া আবূ লায়াস লাঠিতে ভর করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সর্বাগ্রে ছুটিলেন।

নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে রায়হান সঙ্গীদের লইয়া সমস্ত পল্লীটি ঘুরিয়া আসিলেন। বিদেশে মুসলমানদের এই প্রথম উপনিবেশ পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের কীর্তিকথা ও কার্যকলাপ শুনিয়া তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ইসলামের গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যত। তাঁহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল—এই জাতি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ প্রাপ্ত অজয়, অমর; স্বদেশে—বিদেশে সকল বাধা—বিপত্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উত্তরকালে মুসলমান এক বিরাট সভ্যতা গড়িয়া তুলিবে; দিকে দিকে ইসলাম সত্যের আলো ছড়াইয়া দিবে; জগদ্বাসী একদিন একবাক্যে স্বীকার করিবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান! ইসলাম সত্য! ইসলাম পবিত্র!

এমন সময় অদূরে সুমধুর বাধ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে সকলে চাহিয়া দেখেন—রাজকুমার যোফন সর্দার আবদুর রহমান ও জাফরকে সঙ্গে লইয়া এই পল্লীর দিকেই আসিতেছেন! পশ্চাতে একদল নাগরিক গীতবাদ্য সহকারে তাঁহাদের অনুগামী। অল্পক্ষণ মধ্যেই সমগ্র মুসলমান—পল্লী আনন্দোল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিল। আবূ তোরাব রায়হান ও তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া রাজপুত্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। আবূ লায়াসের গর্বোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে আনন্দ আর ধরে না। কয়েক পা বাড়াইয়াই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া নবাগত মুহাজির দলটির দিকে ও পল্লীর মুসলমানদের প্রতি উল্লাসভরে সগর্বে বারবার দৃষ্টিপাত করেন।

রাজকুমার যোফন নবাগত মুসলমানদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মেহ্‌মান মুহাজির দল! আপনাদের অপূর্ব ধর্মবিশ্বাস, অসীম সহিষ্ণুতা ও অনুপম বীরত্ব এ দেশবাসীর অন্তর জয় করেছে। আপনাদের দুঃখে হাবশিগণও দুঃখিত। মুলকে—হাবাশের মহামান্য অধিপতি সকলকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনাদর নির্যাতন—কাহিনী, অতুলনীয় সাহস ও চরিত্রের ঔদার্য তাঁকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে। তিনি আপনাদের ভ্রমণ—কাহিনী শুনতে বড় আগ্রহান্বিত। তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

রায়হান বিনীত স্বরে বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় রাজকুমার! আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এই রাজ্যের মহামান্য নরপতির নিকটে মুসলমানগণ

চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর মঙ্গল করুন, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন! আপনারা ইসলামের পরম বন্ধু। আবহমানকাল এ বন্ধুত্ব যেন অটুট থাকে—এই আমাদের প্রার্থনা। বর্বর উগাণ্ডি আপনার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করেছে শুনে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; জানি না, পাষণ্ডের এ—দুর্মতি কেন হল। জানতে পারি কি, কি হেতু উগাণ্ডির এই যুদ্ধের দুরাকাঙ্খা রাজকুমার?"

যোফন উত্তর করিলেন, "বামন চাঁদ ধরতে কেন হাত বাড়ায়? উইপোকা কেন আকাশে উড়ে পাখীর জঠরে প্রবেশ করে? কে বলবে, পতঙ্গ কেন আগুনে ঝাঁপায়? একটা অসভ্য সর্দার মহাপরাক্রম নজ্জাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, এ যে কল্পনাতীত। শয়তানের দুর্বিনেয় দুরাশার কে আবার উৎস সন্ধান করবে?"

উগাণ্ডির বিরুদ্ধাচরণের কারণ রাজকুমার যোফন কিছুই বলিতে পারিলেন না, কিছুই তিনি জানেনও না। রাজধানীর এক প্রবীণ রাজপুরুষ ছাড়া তাহার এই দুষ্কর্মের নিগূঢ় রহস্য আর কেউই অবগত নহেন। কিন্তু বহু কষ্টে রাজ্যময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, লোকালয়ের আনাচে কানাচে আড়ি পাতিলে সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব নয়। লোকমুখে যাহা জানা যায়, যাহা শোনা যায়, বারান্তরে তাহা আলোচিত হইবে।

চারিদিকের কোলাহল ছাপাইয়া মসজিদের মিনার হইতে তখন আছরের আযান—ধ্বনি আকাশে বাতাসে ভাসিতেছে। মুহূর্তমধ্যে পল্লীর কলরব থামিয়া গেল। আযানের পরে রায়হান রাজপুত্রকে বলিলেন, "রাজকুমার! মেহেরবানী করে খানিক বিশ্রাম করুন, আমরা নামায আদায় করে মহামান্য রাজার খেদমতে রওয়ানা হবো।"

অবিলম্বে সংসারের সমস্ত দুঃখ—তাপ, সর্ব চিন্তা—ভাবনা দূরে ঠেলিয়া সকল মুসলমান ইহ—পরকাল—অধিপতি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রার্থনায় নিমগ্ন হইলেন। খৃষ্টান রাজকুমার ও রাজপুরুষগণও এ দৃশ্য দেখিয়া বিমুগ্ধচিত্তে বিশ্ব—স্রষ্টার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিলেন।

নামাযের শেষে রায়হান জাফর, আবদুর রহমান ও অন্যান্য সঙ্গীদের লইয়া রাজপুত্র সমভিব্যাহারে রাজদরবারে যাত্রা করিলেন। নরপতির সম্মানার্থে পল্লী হইতে কিছু উপঢৌকন সঙ্গে লইতেও তাঁহারা ভুলিলেন না।

সূর্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে অনেকক্ষণ। চলার পথে অস্তাচলগামী রাঙা রবির রক্তিম আভায়, দীর্ঘাবয়ব মরুবাসীদের গৌরবপূর্ণ মুখমণ্ডল রক্তজবার ন্যায় লাল হইয়া উঠিয়াছে।

চৌত্রিশ

ধরণীর রঙ্গরস, আমোদ-আহলাদ, সজীবতা সায়ফুনের চিত্তে বিষময় ঠেকে। সমস্ত জগত তাহার চোখে যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষাদময়; জীবন দুর্বিষহ। আশৈশব যাহাকে সে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে হারাইয়া অন্তর আজ নৈরাশ্যে ভরপুর, ব্যর্থ প্রেমের নিষ্ঠুর আঘাতে কোমল বক্ষ ভাঙ্গিয়া চুরমার। বিরহিণীর জীবন-নাট্যের দ্বিতীয়াঙ্ক অন্তহীন বেদনায় পরিপূর্ণ। তবে আর বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কি? নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়জনের স্মৃতি বহন করিয়া এ ব্যথাতুর জীবন আর কতদিন সে ধারণ করিবে? জীবন্মৃত সায়ফুন কোনক্রমে মৃতপ্রায় দিন কাটাইতে লাগিল।

দিন যায়, রাত্রি আসে; রাত্রি যায়, দিন আসে; অহরহ জগতে কত পরিবর্তনই না ঘটিতেছে। কেবল ভাগ্যহীনা সায়ফুনের মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়গগনেই কোন পরিবর্তন নাই। সেখানে স্তূপীকৃত কাল মেঘ আলোর ক্ষীণ আভাটুকুও ঢাকিয়া দিয়া ক্রমেই বুঝি ঘনীভূত হইতেছে।

হতাশ-হৃদয়া সায়ফুন বেদুঈন-কন্যা সুফিয়ার তাঁবুতে অতিকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। কুরাইশ-যুবতীর সে অপরূপা সৌন্দর্য আর নাই, দীপ্তিহীন নয়নদ্বয়ের চটুল চাহনি নাই; রঙ্গের সে বাহারও নাই। অকালে হারাইয়া গেল- নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তলদামের সে অপরূপ শোভা, বসন-ভূষণের পারিপাট্য, গমনে লীলায়িত চাঞ্চল্য, ভাষণে কুহকিনী মাধুর্য। এক কথায় যুবতীর যৌবন-কুসুম ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইবার উপক্রম। কুসুমকোরকে বিষাক্ত কীট প্রবেশ করিয়া অন্তস্থল দংশন করিতে শুরু করিয়াছে। যুবতীর মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ; অবলম্বনহীন দেহবল্লরী ভাঙ্গিয়া মুষড়াইয়া যেন স্থবিরতার প্রান্তসীমায় উপনীত।

সুফিয়া একান্ত একাগ্রচিত্তে সায়ফুনের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। অহোরাত্রই সে সায়ফুনের সঙ্গিনী। নানাভাবে, নানা কথায় হতভাগিনীর দুঃখে সমবেদনা জানাইয়া সান্ত্বনা দিয়া, অন্তরের ব্যথাভার সে হাল্কা করিবার চেষ্টা

করে। কিন্তু সে-ই বা আর কত করিবে! হাবিলকে হারাইয়া সে নিজেও যে বিরহ-কাতরা, নিজের প্রাণও ত শান্তি-লেশহীন। তাহার চোখেও যে সমস্ত জীবজগত, বাস্তু-চরাচর নিরানন্দময় ও বিভীষিকায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তবুও আশৈশব প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত এই বেদুঈনবালার অন্তর বেদনাভারে ততটা দলিত-নিষ্পেষিত হয় নাই। হৃদয়ে আশা পোষণ করিয়া, সাহস সঞ্চয় করিয়া, চারিদিকে সে হাবিলের সন্ধানে লোকজন পাঠাইয়াছে, খোঁজ-খবর করিয়াছে, কখনও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই।

বহুদিন পরে আজ আকাশে কিছুটা মেঘ জমিয়াছে। রৌদ্র নাই। উত্তপ্ত ধরণীর বুকে পশ্চিমের স্নিগ্ধ হাওয়া ধীরে ধীরে বহিয়া উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। মরুভূমির বুকে বারিবর্ষণ প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। তাই পল্লীবাসী বেদুঈনদের আনন্দের আর সীমা নাই। অনেকে তাঁবুর ভিতর হইতে বাহির হইয়া মেঘমালার প্রতি চাতকের ন্যায় সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছে। যুবতী ও প্রৌঢ়ারা বৃষ্টির পানি ধরিবার আশায় বাহিরে চাদর টাঙ্গাইয়া মশক হাতে ছুটাছুটি করিতেছে-চাদরের তলায় মশক ধরিয়া পানি ভরিয়া লইবে। ছেলেমেয়েদের দল বৃষ্টিতে ভিজিবার আশায় চেঁচামেচি করিতে করিতে মহানন্দে সঙ্গী-সাথীদের ডাকিয়া, প্রান্তরে দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটি করিতেছে। তাহাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের পরিমাপ করে কার সাধ্য!

যুবকেরা বাহিরের তৈজসপত্র ও খাদ্যশস্য চামড়ার আচ্ছাদনে ঢাকিতে ব্যস্ত। এমন সময় সুফিয়া তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া দেখে-সায়ফুন শয্যায় শুইয়া উদাস নয়নে বাহিরে তাকাইয়া রহিয়াছে; দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

সুফিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কাঁদছো সায়ফুন? এমন সময় একটু বের হবে না? দেখবে এস, আকাশে কেমন মেঘের মেলা।"

সায়ফুন কিছুই বলিতে পারিল না; শুধু উপাধানে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুফিয়া পার্শ্বে বসিয়া বসনাঞ্চলে সায়ফুনের চোখ মুছাইয়া বলিল, "ভগ্নি! নিরাশ হয়ো না, নিশিদিন এত ভেবো না! তোমার প্রিয়জন নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। অধীর হয়ো না। দুঃখভার যখন সইতে পার না, অপরের ব্যথার কথা তখন স্মরণ করো। যখন বুঝতে পারবে তোমার চেয়ে দুঃখিনীও জগতে রয়েছে,

তখন আপন মনে কতকটা সান্ত্বনা লাভ করবে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কার ভাগ্যেই বা ঘটে বল? দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র দানই নয়, তাঁর মঙ্গলময় বিধান। সোনা আগুনে পুড়ে যেমন নিখাদ হয়, দুঃখ-তাপও সেইরূপ মানুষকে খাঁটি করে গড়ে, প্রতিভার উন্মেষ ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়। অভিশাপের ছদ্মবেশে দুঃখ ত আল্লাহ্‌র মঙ্গল-আশীর্বাদ।"

কথাগুলো সায়ফুনের মন্দ লাগিল না। মুখ তুলিয়া সুফিয়ার প্রতি অনিমেষ নয়নে সে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া কাতরস্বরে বলিল, "আমার চেয়ে দুঃখিনীও কি জগতে আছে?"

সুফিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুম জান না সায়ফুন, ব্যথিতের সংখ্যাই যে জগতে অধিক। আমার ব্যথাও কি কম? কিন্তু দুঃখকে চিত্ত জয় করতে দেই নি, জোর করেই ঠেলে রাখি দূরে। তোমার প্রিয়জন হয়ত জঙ্গলের একাংশে কোথাও লুকিয়ে আছে, নয়তো বা অথৈ জলে নৌকা ভাসিয়ে দরিয়া পাড়ি দিয়ে হাবশী দেশে পৌঁছেছে। আবার তোমার নিকটে সে ফিরে আসবে, আদর-সোহাগ করবে, সুখের সংসার পাতবে। কিন্তু আমার হাবিল কি আর ঘরে ফিরবে? আমার দুঃখের নিশি আর কি কখনও পোহাবে?"

সুফিয়া আর বলিতে পারিল না। হাবিলের কথা মনে পড়িতেই সে বড় অস্থির হইয়া উঠিল। অন্তরের পূঞ্জীভূত বেদনা ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া হতভাগিনীর নয়নযুগল সজল করিয়া তুলিয়াছে; ভাবাবেগে কণ্ঠস্বরও রুদ্ধপ্রায়।

নারী স্বভাবতই কোমল-হৃদয়া, দয়ার্দ্রচিত্ত-নারী কখনও কঠোর হইতে জানে না। অপরকে যে সান্ত্বনা-বাণী সে শোনায় নিজের জীবনে তাহা প্রয়োগ করিতে পারে না। নিজের মনকেও সে প্রবোধ দিতে জানে না। শোকাবেগ তাহাকে যতটা বিচলিত করে, পুরুষকে ততটা অস্থির করে না। নারীর সুকুমার অন্তর স্নেহ-মমতায় ভরপুর, বেহেশতের সুষমায় মহিমান্বিত। লোকচক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভে প্রবাহিত ফল্গুধারার ন্যায় তাহার প্রাণে স্বতঃস্ফূরিত করুণার উৎসধারা সতত প্রবহমান। সেইজন্যই বুঝি নারী বিরহযাতনা সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্যই হয়তো সুফিয়ার নয়নকাণে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সায়ফুন বুঝিতে পারিল না, কি দুঃখ সুফিয়ার অন্তরকে এতটা নিষ্পিষ্ট করিয়াছে। অবাক হইয়া কতক্ষণ সে তাকাইয়া রহিল; তারপর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "সুফিয়া! কি ব্যথায় তোমার প্রাণ কাতর হয়েছে জানিনে, বলবে কি?"

সুফিয়া কাতরকণ্ঠে উত্তর করিল, "ভগিনী! দুঃখের কথা কি আর বলবো। যাকে ভালবেসেছিলাম, যার সঙ্গে শাদীর ব্যবস্থাও সব ঠিকঠাক করেছিলাম, ভাগ্যদোষে সে আজ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, হয়তো জীবনে তার বন্দীদশা আর ঘুচবেই না। বলতে পার, বেঁচে থাকবো আমি কোন সুখে? কিসের আশায় প্রাণটাকে ধরে রাখবো আঁকড়ে?"

সায়ফুন বুঝিল, এ-সংসারের দুঃখের ভার কেবল সে একাই বহন করে না, সুফিয়ার কষ্টও কিছু কম নহে। মুহূর্তের জন্য নিজের ব্যথা সে ভুলিয়া গেল। নানা সান্ত্বনাবাক্যে সুফিয়াকে প্রবোধ দিয়া বলিল, "ভগিনী! বুঝেছি তোমার কাহিনীও বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী। জানি তোমার কোন উপকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও ইচ্ছে হয় তোমার জীবন-কাহিনীটি একবার শুনি; বলবে কি?"

সুফিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "হাঁ বলবো বৈ কি, ব্যথার কথা প্রকাশ করতে না পারলে অন্তর বুঝি ফেটেই যায়।" পরক্ষণেই আবার সে বলিল, "না না, বলবো না, শুনে তোমার ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হবে না, মন শুধু কষ্টই পাবে। মিছেমিছি তোমার ব্যথার বোঝা ভারী করে আর লাভ কি? বরং বাইরে চল, ঐ বৃষ্টিতে একবার ভিজে আসি। এমন দিন বছরে আর একটিও পাবে না। চেয়ে দেখ দুরন্ত ছেলেমেয়েগুলো ভিজে ভিঝে কেমন হল্লা করছে। আহা! আবার যদি ফিরে পেতাম সেই চিন্তালেশহীন সুমধুর শৈশব।"

সায়ফুন বাহিরে তাকাইয়া দেখে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা বালির উপর পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে কেমন অন্তর্হিত হয়। পল্লীর মেয়েরা কেমন ভিজিয়া ভিজিয়া পানিতে মশক ভরে, ওড়না-সালোয়ার তাহাদের গায়ে সাপটাইয়া গিয়াছে। অদূরে পুরুষেরা বৃষ্টিতে আপন আপন উষ্ট্র ও অশ্বগুলোর গাত্র মার্জন করিয়া পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। সায়ফুন দৃষ্টি ফিরাইয়া সুফিয়ার আরও নিকটে আসিয়া বসিল। তারপর

তাহার স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিল, "সুফিয়া! সংসারে সকলকে হারিয়ে তোমাকে পেয়েছি। তুমি যেন আমাকে দূরে ঠেলো না, পর করো না বহিন!"

সুফিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া উত্তর দিল, "একি বলছো সায়ফুন! আমি আবার তোমাকে পর ভাবলাম কখন?"

সায়ফুন তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তবে কেন বললে কষ্ট পাব? যে দুঃখ আমার চিরসাথী, তাকে আমি ভয় করি নাকি? তুমি আমার দুঃখের মাত্রা আর বাড়াবে কি! মিছেমিছি কেন উদ্বিগ্ন হও?"

সুফিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিরহ-কাতর কণ্ঠে বলিল, "শোন তবে! আমার বাল্যবন্ধু হাবিলকে তুমি দেখনি-বড় ভাল মানুষ বেচারা। আমরা এক সঙ্গে কত মেষ চরিয়েছি, তাঁবু খাটিয়েছি, খেলা করেছি; পাহাড়ের কোলে কত ছুটাছুটি করেছি! আহা! যদি জানতাম এমনভাবে তাকে হারাবো!" সুফিয়া অশ্রুভরা নয়নদ্বয় ওড়নার প্রান্তদেশে মুছিয়া লইল।

সায়ফুন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে? তোমাকে ভুলে গেছে বুঝি? পুরুষ মানুষ-"

সুফিয়া। কি যে বল! হাবিল কি আমাকে ভুলতে পারে! এ কি কখনো বিশ্বাস করতে পারি? উভয়ে শপথ করেছিলাম শাদী আমাদের হবেই-ছাড়াছাড়ি হবো না এ জীবনে কখনো। পল্লীতেও জানাজানি হয়েছিল সে কথা; আব্বার সম্মতিও পেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার জীবন এমনভাবে যে জড়িয়ে পড়বে তা' কে জানতো?

সায়ফুন। কি বলছো। আমার সঙ্গে?

সুফিয়া। হাঁ, তোমার সঙ্গে। কেন, বড় আঁতকে উঠলে যে?

সায়ফুন। কী সব বকছো সুফিয়া? কোথায় আমি আর কোথায় তুমি। আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ? ভুল করেছ।

সুফিয়া। ভুল! বেদুঈন–কন্যা ভুল করতে জানে না। আচ্ছা, মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন তুমি বড় জুলুস করে, মিছিল সহকারে আপন সমাধি–ক্ষেত্রে যাত্রা করেছিলে?

সায়ফুন। এখনই কী ভুলে যাব অত সব দুঃখের কাহিনী? না, জীবনে কখনও তা ভুলতে পারবো?

সুফিয়া। তবে শোন! মনে পড়ে, কুরাইশগণ যখন তোমাকে জিয়ন্ত সমাধি দিতে নিয়ে চলেছিল উৎসব করে, তখন এক বেদুঈন দল লুণ্ঠনের আশায় তাদের আক্রমণ করেছিল?

সায়ফুন। তা কি কখনো ভোলা সম্ভব!

সুফিয়া! আমরাই সেই বেদুঈন দল। সৌভাগ্যবশত তুমি মুক্তি পেলে, কিন্তু আমার প্রিয় হাবিলকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। শুনেছি, কুরাইশগণ মক্কার এক বণিকের নিকটে তাকে নাকি বিক্রি করে ফেলেছে। হায়, হতভাগ্য হাবিল! আজীবন দাসত্ব–শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে দিনপাত করবে, নারীর দেহ–মন নিয়ে আমি তা' সহ্য করবো কিরূপে?

সায়ফুন এমন এক কাহিনী শুনিবে কল্পনাও করে নাই। এক নিমেষে তাহার মুখমণ্ডল পাংশু হইয়া উঠিল। তাহারই আত্মীয়–স্বজন যে–সুফিয়ার ভাবী স্বামীকে বন্দী করে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, আজ ভাগ্যবিড়ম্বনায় সেই সুফিয়ার গৃহেই সে বন্দিনী! আর সুফিয়া সবকিছু জানিয়া–শুনিয়াও তাহাকে জিন্দা রাখিয়াছে। বেদুঈন–কন্যার এবংবিধ আচরণ তাহাকে সম্মোহিত করিল। ভাবিয়া পাইল না, এখনও সে তাহাকে হত্যা করে নাই কেন! কেনই বা তাহাকে সমাদরে আশ্রয় দিয়াছে? প্রতিহিংসাপরায়ণ বেদুঈন জাতি শত্রু পক্ষের একজনকে হাতে পাইয়াও যে হত্যা করে নাই– ইহাতে সে পরম আশ্চর্য বোধ করিল।

সায়ফুনকে নিরুত্তর দেখিয়া সুফিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ?"

সায়ফুন। ভাবছি, কেন তুমি আমাকে হত্যা কর নাই।

সুফিয়া। হত্যা করে আমার লাভ? আমার জীবন কি তাতে রঙীন হয়ে উঠবে? না হাবিলকে আবার ফিরে পাব? জানি হাবিলকে যারা বন্দী করেছে, অভাগিনীর জীবন যারা বিষিয়ে দিয়েছে, বরবাদ করেছে; আত্মীয় হলেও তারা তোমার মিত্র নয়।

সায়ফুন। তুমি জান? জান তুমি তারা আমার আপন নয়, বন্ধু নয়? জান তুমি, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা আমার পরম শত্রু?

সুফিয়া। জানি।

সায়ফুন। আহ্, বাঁচালে বোন! কিন্তু এত কথা তুমি জান্‌লে কিরূপে সুফিয়া? কিছু তন্ত্র-মন্ত্র জান না কি?

এত দুঃখেও সুফিয়ার হাসি পাইল! কোনক্রমে তাহা চাপিয়া সে বলিল, "শৈশবে এক ডাইনী বুড়ির কাছে কিছু তুক্‌তাক্ শিখেছিলাম, সেইগুলোই মাঝ মাঝে কাজে লাগাই। জান না, গুটি কতক জিনপরীও যে আমার তাবেদার, আমার কথায় উঠে-বসে? দরকার মত তাদেরও কত ফাইফরমাশ খাটাই!"

সায়ফুন উৎফুল্ল হইয়া আবেগভরে সুফিয়ার কণ্ঠদেশ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, "ভগিনী! তুমি কি মায়াবিনী? মায়া জান বুঝি? শুনেছি, বেদুঈনরা মন্ত্রবলে অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। শৈশবে শুনেছিলাম এক বেদুঈন বুড়ো দুশমনি করে ডাগড়া এক নওজোয়ানকে আওরতে রূপান্তরিত করেছিল। ওসব তুমিও শিখেছ বুঝি?"

সুফিয়া। সে আর বলতে!

সায়ফুন। তবে কেন বলে দাও না কোথায় আমার রায়হান? ডাক না তোমার জীন-পরীদের!

সুফিয়া আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাবা মেয়ে, আমি আবার তন্ত্রমন্ত্র জানি নাকি? তুমি দেখছি মাশুকের ধ্যানে একেবারেই আত্মভোলা হয়ে গেলে! মনে পড়ে—বলেছিলাম, রায়হান ভাই আমাদের পল্লীতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন?"

সায়ফুন আকাশ হইতে যেন ভূতলে পতিত হইল। বিস্ময়ে সুফিয়ার মুখের প্রতি সে তাকাইয়া রহিল নির্বাক নির্নিমেষ নয়নে। সুফিয়া সায়ফুনের গণ্ডদ্বয় টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "ভাইয়ের মুখে তোমার কাহিনী শোনবো, এতে আর বিচিত্র কি? বড় অবাক হয়ে চেয়ে রইলে যে?"

সায়ফুন। বুঝেছি, তার মুখে সব কথাই তবে শুনেছ, সেই জন্যই বুঝি অভাগীকে হত্যা না করে সাদরে আশ্রয় দিয়েছ?

সুফিয়া। হাঁ, অকালে তোমার জীবন-কলি ঝরে পড়লে ভাই রায়হানের দশাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? বোন সায়ফুন! প্রার্থনা করি, তোমার প্রিয়জনকে ফিরে পাও! তোমাদের মিলন আমার অন্তরের ক্ষতস্থলে খানিকটা ব্যথার প্রলেপ লাগিয়ে দিক! তোমরা সুখী হলে আমার দুঃখের ভারও কতকটা লাঘব হবে।

এই অসভ্যা বেদুঈন-নারীর অন্তরাত্মার পরিচয় পাইয়া সায়ফুনের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। পরের জন্য এমন করিয়া নিজের সুখ বিসর্জন দিতে, নিজের দুঃখ ভুলিতে, সে আর কাহাকেও দেখে নাই। সায়ফুন অভিজাত কুরাইশ-কন্যা, আর সুফিয়া সামান্যা বেদুঈন দুহিতা, তথাপি সুফিয়ার প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক নত হইয়া আসিল। সে বলিল, "ভগিনী। তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারবো না; কিন্তু প্রিয়জনকে হারিয়ে কিভাবে যে জীবন কাটাবো তা' তো বুঝতেও পারছি না।"

সুফিয়া। এত অধীরা হয়ো না। বিপদে ধৈর্য ধরতে হয়- এ নাকি ইসলামের শিক্ষা? ভাই রায়হানের নিকট আমি যে সব ধর্মোপদেশ পেয়েছি, তুমি দেখছি তা'ও পাওনি। চল একটু ঘুরে আসি। চেয়ে দেখ, বর্ষা-বিধৌত ধরণীর কত মনোহর রূপ! স্নিগ্ধ জলোহাওয়া মরুভূমির উত্তাপ-অভিশাপ ঠেলে দিয়েছে বহু দূর। যাবে বাইরে? এমনিভাবে তাঁবুর ভিতরে ঠায় বসে বসে আর কতকাল কাটাবে? তুমিই না সেদিন বলেছিলে-বেড়াতে যাবে দরিয়ার কিনারে? দেখবে চল, নীল সমুদ্রের ঢেউগুলো সুনীল আকাশের গায়ে কেমন লুটিয়ে পড়ে, কত জোরে হুহুঙ্কার দেয়। যাবে?

সায়ফুন। চল যাই, হয়তো সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়ে সে আবার ফিরে আসবে। হয়তো দরিয়ার ধারে ধারে আমাকে খুঁজে বেড়াবে। চল বহিন, চল যাই। ঢেউয়ের তালে তালে তার নৌকাখানি কি করে নেচে নেচে কূলে ভিড়ে আমি দেখবো।

হায়রে দুরাশা। মানুষের অন্তরে এমনি করিয়াই বুঝি আশার আলো তুই জ্বালাইয়া রাখিস! তোর ছলনায় মুমূর্ষু রোগীও রোগমুক্তির আশায় বিভোর। মাতা মৃতপ্রায় পুত্রের শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন দেখে–ছেলে বাঁচিয়া উঠিবে; নিমজ্জমান ব্যক্তি অবলম্বনের আশায় দুই হস্ত উপরে তুলিয়া তৃণখণ্ডও আঁকড়াইয়া ধরে। আবার দেখিতেছি, এই বিরহিণী সায়ফুনের উপরও তোর কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে, হতভাগিনী প্রেমিক–পুরুষের আগমন–আশায় তোরই পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়াছে। জানি, তুই তাহাকেও বঞ্চিত করিবি। তোর স্বভাবই তো বঞ্চনা করা, তুই বড় কুহকিনী, বড় প্রবঞ্চক। বলিতে পারিস জগতে কাহাকে তুই বঞ্চনা করিস্ নাই?

পঁয়ত্রিশ

বেদুঈন-পল্লী সমুদ্রতীর হইতে সোজাসুজি প্রায় অর্ধক্রোশ পথ। সেই স্থান হইতে অকূল-পয়োধিবক্ষের তরঙ্গাভিঘাতজনিত গর্জন-ধ্বনি অনন্ত আকাশের মেঘ-সংঘর্ষ-জাত গর্জন-ধ্বনির ন্যায় পরিষ্কার শ্রুতিগোচর হয়; শুধু শ্রুতিগোচর হয় তাহাই নহে, সে গম্ভীর নাদ অনভ্যস্ত কর্ণে প্রবেশ করিয়া হৃদকম্প সৃজন করে। সায়ফুন সমুদ্র কখনো দেখে নাই, সমুদ্রের ডাক আর কখনো তাহার কানে প্রবেশ করে নাই। প্রথমে কয়েক দিন সে নিদারুণ অস্বস্তিই বোধ করিয়াছিল। কেবলই মনে হইত-কিয়ামত নজ্‌দিগ, সমুদ্রের প্রলয়োচ্ছ্বাস যেন ইস্রাফিলের ধরা-বক্ষ বিদারক শিঙ্গাধ্বনি শুনিয়া উল্লাসে নাচিতে নাচিতে সমস্ত সৃষ্টি গ্রাস করিতে উদ্যত। সেই বিশাল দরিয়ার তটদেশে ভ্রমণ করিবার জন্য আজ সায়ফুন ও সুফিয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিয়াছে।

চলিতে চলিতে পল্লী হইতে অনেকটা পথ দূরে সায়ফুন এক স্থানে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে এক প্রান্তর। স্থানটি কেমন যেন তাহার পরিচিত। অবাক হইয়া সে দেখে-এই যেন সেই প্রান্তর যেখানে হারিসের সঙ্গে সে পথ চলিয়াছিল। হাঁ, ঐ ত হারিসের বাড়ী! সায়ফুন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বহিন! চল না একবার ঐ পল্লীটায় ঘুরে আসি খানিক!"

সুফিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ও-পাড়া কি চেন নাকি?"

সায়ফুন উত্তর করিল, "হাঁ, চেনা-চেনা বলেই ত মনে হয় যেন। ঐ যে বাড়ীটা দেখা যায় না, তাই যেন হারিসের বাড়ী। মনে হয় সেই বাড়ীর প্রাঙ্গণ থেকেই আমাকে তারা নিয়ে গিয়েছিল বন্দী করে। হাঁ হাঁ, ঐ ত সেই হারিসের ভগ্ন কুটীর! ঐ বুঝি হতভাগ্যের মায়ের কবর! দেখ না, অদ্যাবধি কবরের উপরে এক গুচ্ছ তৃণও জন্মেনি।"

কথায় কথায় অল্পক্ষণ পরে উভয়ে হারিসের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গণে অশ্বারূঢ়া দুই-দুইটি নারী-মূর্তি দেখিয়া হারিসের ভগ্নী ছাবেরার বিস্ময়ে

কিছুকাল বাক্য-নিঃসরণ হইল না। গৃহদ্বার হইতে সে একদৃষ্টে তাহাদের দিকে তাকাইয়া ভাবে-মাসাধিক পূর্বে ঘোড়ায় চড়িয়া এক নারী তাহার ভ্রাতাকে লইয়া ত আসিয়াছিল। এইবার অশ্বপৃষ্ঠে দুই যুবতী কে উহারা!

সায়ফুন কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান রমণীকে দেখিয়া বুঝিল, সে-ই হারিসের ভগিনী। নারী আরূঢ়যৌবনা। প্রথম যৌবনের ললিত লাবণ্য দারিদ্র্যের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া মলিন বসনাচ্ছাদনেও দেদীপ্যমান।

সে প্রশ্ন করিল, "কোথায় তোমার ভ্রাতা হারিস!"

ছাবেরার মনে সন্দেহের উদয় হইল। সে তখনও ভাবিয়া পায় না-কে এই নারী! কিন্তু মুখখানা যেন পরিচিত! কোথায় যেন দেখিয়াছে! হাঁ হাঁ মনে পড়িয়াছে; ঠিক তেমনই তো! প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ছাবেরা উত্তর করিল, "ভাইজান সে যে কাল বেরিয়েছেন আর ফেরেন নি।"

সায়ফুন একটু ভাবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজে কোথায় গেছে কিছুই বলতে পার না?"

হতভম্ব ছাবেরার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইবার উপক্রম। কয়েকটা ঢোক গিলে সে উত্তর করিল, "মাস তিনেক পূর্বে দেখতে আপনারই মত এক দয়ালু নারী আমার ভ্রাতাকে আজরাইলের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল। ভাইজান তাঁকে উঠানে রেখে ছুটে যান মায়ের কবরের পার্শ্বে, কিন্তু ফিরে এসে আর খুঁজে পান নি। তদবধি তিনি প্রায়ই তাঁর সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। কয়েকদিন পূর্বে বড় হতাশ-হৃদয়ে বাড়ী ফিরেছিলেন, কিন্তু কালই আবার বের হয়েছেন সকালে। আমার মনোমধ্যে একটি কথা যে বারবার উঁকি মারছে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

সায়ফুন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই বলিল, "তোমার জিজ্ঞাস্য যে কি তা' আমি বুঝতে পেরেছি। আমিই সেই হতভাগিনী।"

এক নিমেষে ছাবেরার সমস্ত সংশয় হৃদয়-কোণ হইতে উবিয়া গেল। অন্তরে কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা সে খুঁজিয়া পায় না। প্রবল আবেগে, উত্তেজনায় তাহার বুকের ভিতরটায় শুরু হইয়াছে ধুকধুকানি, কণ্ঠনালী শুষ্কপ্রায়। সে অকস্মাৎ অশ্বোপরি উপবিষ্টা সায়ফুনের পদপ্রান্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমায় মার্জনা করুন আম্মা, প্রদীপ হস্তে রাত্রিকালে দেখেছিলাম, তাই

প্রথমটায় ঠিক ঠাহর করতে পারি নি। আপনি আমার ভ্রাতার প্রাণদাত্রী। ভাইজান অন্তর-ভরা বেদনা নিয়ে নিশিদিন আপনাকে যে খুঁজে মরছেন। আজ আমার ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন! আমি আপনাকে যেতে দেব না। দয়া করে অবতরণ করুন।" এই বলিয়া সায়ফুনের মুখের প্রতি সে কাতর নয়নে তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু সমুদ্রের গুরুগম্ভীর গর্জনধ্বনি সায়ফুনের অস্থির চিত্তে কি যে আশার বাণী শোনায়, কি এক মোহিনী শক্তি তাহার অন্তরকে কেবলই যেন সাগরের দিকে টানিতেছে, সে ত আর অপেক্ষা করিতে পারে না। বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ? এখানে থাকা কি আমার পক্ষে সম্ভব? ঐ বনের প্রান্তদেশে বেদুঈন-পল্লীতে আমার বাস।" তারপর সুফিয়াকে দেখাইয়া পুনরায় বলিল, "এই রমণী আমার আশ্রয়দাত্রী! বলো তোমার ভাইকে?"

ছাবেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু বেদুঈন পল্লীতে তিনি যাবেন কিরূপে? যদি তাঁকে-

সুফিয়া বাধা দিয়া বলিল, "কোন ভয় নেই। সুফিয়ার তাঁবুতে যাবে শুনলে কেউ কিছু বলবে না। আমার আব্বাই পল্লীর সর্দার।" এই বলিয়া সে সায়ফুনকে লইয়া প্রস্থান করিল।

ম্রিয়মাণা ছাবেরা শুধু অনিমেষ নয়নে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া রহিল, আর কিছুই বলিবার অবকাশ মিলিল না। অকস্মাৎ তাহার অন্তরে একটা আশার আলো জ্বলিতে না জ্বলিতেই যে দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল। উপরে যেমন মুক্ত উদার আকাশ, চারিদিকে সৌরকরোজ্জ্বল দীপ্ত ধরণী তাহার উদাস দৃষ্টির সম্মুখে কেমন যেন বড় বেমকা আর বেমানান ঠেকিতেছে।

কতক্ষণ পরেই সায়ফুন ও সুফিয়া সমুদ্রতটে আসিয়া উপনীত হইল। বিরাট তটদেশ কত বালুকাময়-বীচি-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায়ই অসমতল। বালির উপরে অসংখ্য কাল পাথর ও চিত্র-বিচিত্র নানা আকারের ঝিনুক ছাড়া গাছপালার চিহ্নমাত্রও নাই। বেলাভূমি ক্রমশ ঢালু হইয়া সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে। ঢেউগুলি মহাবেগে এক একবার অনেক উপরে উঠে, আবার নামে। সিক্ত বেলাভূমির উপরে বালিশয্যা উপর্যুপরি তরঙ্গাঘাতে সমতল ও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঢেউয়ের

দৌরাত্ম্যে এখানে–ওখানে পাথর ও ঝিনুকগুলো বালির নীচে আত্মগোপন করিয়া, বুঝি বা ঢেউয়ের টান হইতে বাঁচিবার পরম প্রয়াসে ব্যস্ত।

সায়ফুন ও সুফিয়া সৈকতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া উত্তাল–তরঙ্গ–ভঙ্গ–জনিত জলোচ্ছ্বাসের আয়ত্তের বাহিরে বিরাট–এক প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিল। অনন্ত নীল সমুদ্রের দুগ্ধ–ফেননিভ ফেনাপুঞ্জ ছিটকাইয়া উভয়ের অঙ্গাবরণ ভিজায়; কেহ আপত্তি করে না। জলস্রোত এক একবার উভয়ের পদতল ডুবাইয়া দিয়া সালোয়ারের প্রান্তদেশ সিক্ত করে, কেহ তাহা গ্রাহ্যও করে না। দিগন্ত প্রসারী সমুদ্র উভয়ের দৃষ্টি কাড়িয়া লইয়াছে, কী এক সম্মোহনী মায়ায় উভয়ের মুগ্ধ অন্তর যেন এক অনির্বচনীয় ভাবধারায় আবিষ্ট। সারি সারি ঢেউয়ের পাহাড়গুলি উন্মত্ত দানবের ন্যায় হুঙ্কার ছাড়িয়া কোথায় কোন্ সুদূরে ছুটিয়াছে–শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, যাত্রার শেষও নাই। দানবদলের লীলাভূমি এই লোহিত সাগর কত অসীম! কত বিশাল! নির্বাক যুবতীদ্বয়ের মোহাচ্ছন্ন নয়নের তন্ময় অপলক দৃষ্টি সেই অগাধ জলধিবক্ষে নিবদ্ধ।

সহসা আকাশের প্রান্তদেশে যেন এক টুকরা সাদা মেঘের উদয়। মেঘখণ্ড নাচিতে নাচিতে, ভাসিতে ভাসিতে ক্রমেই বুঝি নিকটে আসিতেছে। অনেকক্ষণ যাবত সায়ফুন ঠাহর করিয়া দেখিল মেঘ নহে, একখানা সমুদ্রপোত পাল তুলিয়া বুঝি–বা এই দিকেই আসিতেছে। তাহার দৃষ্টি আর ফিরে না। কোন এক অদৃশ্য হস্ত হতভাগীর অন্তরে আশার আলো যেন জ্বালাইয়া দিল। যে প্রিয়জনকে সে হারাইয়ছে, তাহারই আগমন–প্রতীক্ষায় যুবতীর অন্তর আনন্দে মাতোয়ারা। মন যেন কল্পনাস্রোতে অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান। সায়ফুন আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, হয়তো তাহার প্রিয়জন এই নৌকায়ই ফিরিয়া আসিতেছে। হাঁ, নৌকাখানা এই দিকেই ত আসিতেছে। রায়হান সমুদ্রের এই তটদেশে আসিয়াই হয়তো সমুদ্র পাড়ি দিয়াছিল, আবার বুঝি এই স্থানেই ফিরিয়া আসে। উল্লাসে সায়ফুনের মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কে যেন তাহার কানে কানে বলিয়া গেল সে কি আর না আসিয়া পারে? কৈশোরে যাহার সঙ্গে খেলা করিয়াছে, কত মান অভিমান করিয়াছে; যাহাকে মনে–প্রাণে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে এত সহজে কি ভুলিতে পারে? সায়ফুন কতদিন কত

ছলে তাহাকে দেখিবার জন্য যে মেষ চারণ-ভূমিতে যাইত, মায়ের অগোচরে কিছু রুটি ও খর্জুর রুমালে বাঁধিয়া দিয়া আসিত-সে কথা কি রায়হান ভুলিয়া যাইবে? প্রান্তরে বিশ্রামকালে কতদিন তাহার লাঠিখানি বালির নীচে সে লুকাইয়া রাখিত, কতদিন তাহাকে হয়রান পেরেশান করিতে ঢিল ছুঁড়িয়া মেষগুলোকে ছত্রভঙ্গ করিত-এত কথা কি সে ভুলিতে পারিবে? যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে সায়ফুন তাহাকে যুদ্ধের পোশাকে সাজাইত, তলোয়ারখানি ঘষিয়া মাজিয়া ধারাল করিয়া দিত, যুদ্ধের বিজয়-গৌরব অর্জন করিয়া রায়হান ফিরিয়া আসিলে আনন্দে সে অধীরা হইয়া চপল শিশুর ন্যায় হাততালি দিয়া নাচিত; সকলের কাছে তাহার বীরত্ব-কাহিনী গর্বভরে বলিয়া বেড়াইত। এত কথা কি রায়হান ভুলিয়া যাইবে?

না, অসংখ্য তরঙ্গমালার প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া নৌকাখানি কিছুতেই যেন আগাইয়া আসিতে পারিতেছে না। এক-একবার ঢেউয়ের মাথায় উঠিয়া আবার যেন উহা তলাইয়া যায়। হায়, হায়! বুঝি-বা ডুবিয়াই গেল! কে যেন একখন্ড উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা সায়ফুনের বুকের ভিতরে এপার-ওপার বিদ্ধ করিয়া দিল। এই আবার নৌকাখানি ভাসিয়া উঠে। সায়ফুন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। তাহার বড় রাগ হইতেছিল। মনে মনে ভাবে সে-কেন? এই অকূল-বারিধিবক্ষে জলস্রোত কি শান্তভাবে বহিতে পারে না? আহা! মূসা নবীর সেই কেরামতী যষ্টিখানি যদি পাইতাম! সেই দৈবশক্তি লব্ধ যষ্টিখানির এক খোঁচায় এই দুর্দান্ত তরঙ্গমালাকে শাসাইয়া যদি সুশান্ত করিয়া দিতে পারিতাম! তবে হয়তো রায়হান নিরাপদে পৌছিতে পারিত। কিন্তু কিসে এত উচ্ছ্বাস! কেন এত আলোড়ন।

নৌকাখানি অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। পরিষ্কার দেখা যায়-দুর্দম হাওয়া নৌকার চারিখানি পাল ছিঁড়িয়া বাহির হইবার নিষ্ফল চেষ্টায় বৃথা ফুলিয়া মরিতেছে। নৌকার আরোহী ও নাবিকদের পুতুলের ন্যায় মনে হয়। নৌকাখানি ডুবিতে ডুবিতে আবার কেমন ঢেউয়ের উপরে নাচিয়া ভাসিয়া উঠে। এই- এইবার বুঝি গেল! এই আর একটা ঢেউ নৌকাখানি ভাঙিয়া যেন চুরমার করিয়া দিল। গেল, গেল, ডুবিয়া গেল, বুঝি-বা সব শেষ। নৌকার সর্বোচ্চ পাল দুইখানির উপরাংশ ছাড়া আর কিছুই যে দৃষ্টিগোচর হয় না। সায়ফুনের শরীর রোমাঞ্চিত,

এক মুহূর্তে শোণিত-প্রবাহ তাহার মস্তকে ঘোরপাক খাইয়া যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবর্ত সৃষ্টি করিল। বাহ্যজ্ঞানহীনা সায়ফুন 'রায়হান, রায়হান' বলিয়া চিৎকার করিয়া এক লম্ফে অগ্রগামী একটা ঢেউয়ের মাথায় ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সুফিয়াও কেমন তন্ময় হইয়া অকূল সাগরের লীলাচাঞ্চল্য দেখিতেছিল। অকস্মাৎ সমুদ্র-তরঙ্গে সায়ফুনের পতন-ধ্বনি শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাকাইয়া দেখে-সায়ফুন একবার ডুবে, একবার ভাসে; স্রোতের টানে ক্রমেই যে আগাইয়া যায়! বারিধিবক্ষে তাহার সলিল সমাধি রচনা করিতে উত্তাল তরঙ্গমালা যেন মহাক্রোধে আষ্টেপৃষ্ঠে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া সুফিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে তৎক্ষণাৎ সাগর-তরঙ্গে লাফাইয়া পড়িল।

সৌভাগ্যবশতঃ সেই স্থানে সমুদ্র ততটা গভীর ছিল না। তরঙ্গমালা বহুদূরব্যাপী বেলাভূমির উপরে মহাবেগে গড়াইয়া আবার নামিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে একটা বিরাট ঢেউ প্রবল ধাক্কায় সায়ফুন ও সুফিয়াকে সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ করিল।

দৈবক্রমে তাহারা খুব কাছাকাছিই উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। নিমেষ মধ্যে সুফিয়া নিকটস্থ বালুকাগভে অর্ধনিমগ্ন এক প্রস্তরখণ্ড বাম হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ডানহস্তে সায়ফুনের মণিবন্ধ আকর্ষণ করিল। তরঙ্গস্রোত উভয়কে ডাঙ্গায় ফেলিয়া আবার সরিয়া গেল দ্রুত অনন্ত সমুদ্রের বক্ষদেশে।

সুফিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সায়ফুনকে টানিয়া উঠাইল। ভাগ্যক্রমে সায়ফুনের চেতনা লুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তরঙ্গাঘাতে লবণাম্বু বেশ খানিকটা উদরস্থ হইয়াছিল; শ্রমাধিক্যে হৃদপিণ্ড ঠক ঠক কম্পমান। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সে কম্পিত পদে তীরে উঠিয়া আবার সমুদ্রের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। দেখিয়া বিস্মিত হইল, নৌকাখানি ত ডুবে নাই-কূল বাহিয়া বরাবর যেন চলিযাছে পূর্ব-দক্ষিণে।

সুফিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "তুমি কি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে? ধিক তোমাকে! জান না আত্মহত্যা মহাপাপ?"

সায়ফুন হতাশ কণ্ঠে বলিল, "কই, নৌকাখানি ত এল না। তবে কি রায়হান আসে নি? আর কি সে আসবে না?"

সুফিয়া বিরক্তিভরে উত্তর করিল, "তুমি দেখছি একেবারেই ক্ষেপে উঠেছ। এই বিজন তটে নৌকা ভিড়বে কেন? কিরূপে জানলে রায়হান ভাই এই নৌকায় আসবেন?"

সায়ফুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "জানি, সে যে আমায় ভালবাসে বহিন! সে কি না এসে পারে!"

সুফিয়া দুঃখে বাঁচে না। অনুযোগের সুরে আবার বলিল, "কিন্তু মুল্‌কে–হাবাশ কি ঐদিকে? বাহ্যজ্ঞানও কি হারিয়েছ? নাঃ, তোমাকে নিয়ে দরিয়ায় এসে বড় ভুল করেছি, খুব শিক্ষ পেয়েছি। ভালয় ভালয় বাড়ী চল এবার।"

সায়ফুন কাতরকণ্ঠে বলিল, "না, যাওয়া আমার হবে না। আমি চলে যাব, আর প্রিয়জন এসে খুঁজে মরবে আমাকে! আমি যাব না। এই সমুদ্রতীরেই নিশিদিন তার অপেক্ষায় বসে থাকবো। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, এইবার আর একটি উপকার কর বোন! আমাকে এইখানে তার অপেক্ষায় বসে বসে মরতে দাও! জনহীন দরিয়ার কূল আমার কবরের উপর এই পাথরখানা স্মৃতি ফলকরূপে রেখে দিও। আমার প্রিয়জনকে পেলে, একবার এসে আমার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতে বলো। সে এলে আমার তুহিনশীতল দেহে মৃতপ্রাণও আনন্দে নেচে উঠবে। দেখো, আমার কবরের উপর এক ফোঁটা অশ্রু না ফেলে সে পারবে না; সে যে আমায় ভালবাসে বহিন।" সায়ফুন আর বলিতে পারিল না। তাহার চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু জড় হইয়া গণ্ডদ্বয়ে গড়াইতে লাগিল।

সুফিয়ার নয়নপ্রান্তেও কয়েক বিন্দু অশ্রু। সে অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি হস্ততালুতে তাহা মুছিয়া সায়ফুনকে কাছে টানিতে টানিতে বলিল, "কি যে সব বক্‌ছো। বাড়ী চল। দেখ্‌ছো না, পাখীরা সব দল বেঁধে বাসায় ফিরছে? ঐ দেখ অস্তরবির সোনালী আভা জঙ্গলের বৃক্ষচূড়াগুলি কেমন রঙীন করে বিদায় নিচ্ছে। আমাদেরও যে যেতে হয় এখন, উঠ।"

সায়ফুন চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "পাখীরা বাসায় ফিরে আপন জনের দেখা পাবে, সুখের নীড় রচনা করবে; আমি যাবো কোন্ সুখে? তুমি যাও বোন, আমাকে থাকতে দাও এইখানেই; আমার মন বলে, দরিয়ায় নৌকা ভাসিয়ে একদিন সে আসবেই আসবে।"

"তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কি একেবারেই লোপ পেল নাকি? এখানে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? ঢের হয়েছে, ওঠ এইবার; কাল না হয় আসবো আবার।" এই বলিয়া সুফিয়া তার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

সায়ফুন কাতর দৃষ্টি মেলিয়া বিনম্র সুরে বলিতে লাগিল, "তবে কথা দাও বহিন, রোজই একবার আমাকে নিয়ে আসবে এখানে! দরিয়ার মায়া আমি কাটাতে পারবো না।"

সুফিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "বেশ, তাই হবে। কিন্তু দেখো, আবার সাগরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো না যেন।"

সায়ফুন নিরুত্তর। সে পশ্চিম গগনে চাহিয়া দেখিল–বিক্রমহারা বিদায়ী সূর্য কাতর নয়নের দৃষ্টি মেলিয়া সসঙ্কোচে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইতেছে। যে দুর্দান্ত বীর রুদ্ররোষে দুর্দণ্ড প্রতাপে সমগ্র বিশ্ব সারাদিন জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছে, সায়াহ্নে রাজ্যহারা হইয়া মৃত্যুর কোলে ধীরে ধীরে কেমন সে ঢলিয়া পড়িতেছে। কত করুণ তাহার চাহনি, কত বেদনাদায়ক! সর্বস্ব হারাইয়া সেও বুঝি সায়ফুনের মতই দেউলিয়া।

সর্বহারা সায়ফুনের বড় ভাবনা–তাহার বিদায়ের ক্ষণও হয়তো ঘনাইয়া আসিয়াছে। অচিরেই তাহাকেও বিদায় নিতে হইবে এই সুন্দর ধরণীর পৃষ্ঠদেশ হইতে; পরাজয়ের গ্লানি বক্ষে পুরিয়া লুকাইতে হইবে ভূগর্ভের অতল অন্ধকারে। আশা–আকাঙ্খা সব কিছু হারাইয়া তাহার অন্তর হতাশায় চূর্ণবিচূর্ণ; দেহের শক্তি–সাহস বিন্দুমাত্রও যেন আর অবশিষ্ট নাই। উঠিয়া দাঁড়াইতেই আর পারে না সে।

সুফিয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে সাহায্য করিয়া নিজে অপর ঘোড়ায় চড়িল। উভয়ের সিক্ত বসন–নিঃসৃত বারিবিন্দু অশ্বদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ বাহিয়া ভূতলে গড়াইতেছে। গ্রাসমুক্ত নারীদ্বয়কে চলিয়া যাইতে দেখিয়া পশ্চাতে গম্ভীরনাদী নীলাম্বুধি মহাক্রোধে যেন হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে শুভ্র ফেনপুঞ্জ উদ্‌গীরণ করিতেছে। সাগরে বায়ুবেগ ক্রমশ যেন উতলা হওয়ার উপক্রম, বুঝি–বা ঝড় উঠিবে!

ছত্রিশ

মুল্‌কে-হাবাশের মহামান্য অধিপতি নজ্জাসীর অন্তঃপুরে সখীদল-পারবৃতা রাজকন্যা শামিনী উচ্ছল কলহাস্যে ও রসালাপে মত্ত। ষোড়শী রাজকুমারী অপরূপ সুন্দরী! ভরা-বর্ষায় দুকূল-ভরা তটিনীর ন্যায় তাহার সর্বাঙ্গ যৌবন প্লাবনে উচ্ছলিত। পাহাড়িয়া রূপকথার মানসী রূপ-রাণীর অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারিণীই বলা চলে তাহাকে; কেননা, কৃষ্ণ মহাদেশে তাঁহার সমকক্ষ রূপসী আর কাহাকেও যে দেখা যায় না। সখিগণও অনিন্দ্য-সুন্দরী, তবে কল্পলোকের সুন্দরী নহে, কিংবা হুর-পরীদের রূপ-লাবণ্যও কাড়িয়া লয় নাই; সে সম্পদ রাজকুমারী শামিনীরই বৈশিষ্ট্য।

লাস্যে, হাস্যে, কৌতুকালাপে রাজকন্যার প্রকোষ্ঠে আজ যেন চাঁদের হাট। অপিচ, দেশ-বিদেশের সুন্দরী নর্তকিগণ সে চাঁদের হাটে যেন তারকার মেলা। নর্তকীদের লীলায়িত অঙ্গের বৈচিত্র্যময় নৃত্য-নৈপুণ্য সুমধুর কণ্ঠ-সঙ্গীতের লালিত্যময় স্বরমাধুর্যে, রূপসী তরুণীদের পেলব হস্ত-সঞ্চালিত সুমধুর বাদ্যনিক্কণে, রাজকুমারীর কলস্বনা বিশ্রাম-কক্ষ যেন উজ্জীবিত। সুন্দরী সঙ্গীদল-পরিবেষ্টিতা উজ্জ্বল মণিমানিক্য-বিভূষিতা পরমাসুন্দরী রাজকুমারীর সম্মুখে উজ্জ্বল স্বর্ণাভরণ-শোভিতা রূপবতী নর্তকীদের নৃত্য-তরঙ্গের লীলাচাঞ্চল্যে রাজান্তঃপুর যেন বিদ্যুল্লতার চাক্‌চিক্যে আজ মহিমান্বিত। রূপসী রাজকুমারী অনূঢ়া, কুমার পরাবীন তাঁহার প্রণয়প্রার্থী। রাজকুমারী শামিনী মনে মনে তাঁহাকেই যে তাঁহার প্রণয়রাজ্যের অধীশ্বর করিবেন ঠিক করিয়াছেন।

পরাবীন আজ অসভ্য-রাজ উগাণ্ডির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে প্রস্তুত; শুধু রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষা। যাত্রার পূর্বে তিনি একবার রাজকুমারী শামিনীর দর্শনপ্রার্থী। আকাঙ্খা-রণক্ষেত্রে অনুপ্রাণনা লাভ করিতে প্রেয়সীর সুন্দর মুখচ্ছবিখানি হৃদয়-মনে পুরিয়া লইবেন! রাজান্তঃপুরের আনন্দোৎসব কুমার পরাবীনের অভ্যর্থনারই আয়োজন। রাজকুমারী শামিনী তাঁহারই আগমন অপেক্ষায় আজ ধৈর্যহারা; তিনি এক একবার উঠিয়া দুয়ারে যান, আর বসেন, আবার উঠেন; বারবার গবাক্ষপথে

বাহিরে দৃষ্টিপাত করেন। সখীরা তাঁহারই আদেশে মধুকরকে প্রলুব্ধ করিতে যেন চারিদিকে মায়াফাঁদ পাতিয়া ফুল্ল-কুসুম-দলবৎ জাঁকিয়া বসিয়াছে।

পরাবীন রাজা নজ্জাসীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র-বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি, সুন্দর সুগঠিত বীরপুরুষ। যুবকের প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, আয়তলোচন, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, সুষমামণ্ডিত দেহে অতুলনীয় বীরত্বের অভিব্যক্তিব্যঞ্জক। পরাবীন ও শামিনী উভয়েই রাজপ্রাসাদে একসঙ্গে লালিত-পালিত, এক সঙ্গে বর্ধিত। রাজোদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমদৃশ এই যুবক-যুবতীর মিলন পথে, ভালবাসার বন্ধনে রাজা নজ্জাসী কোন বাধাই রচনা করেন নাই, কোন অন্তরায় স্থাপন করেন নাই। যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকবারই বিজয়মাল্য অর্জন করিয়া রাজকুমারীর চিত্ত জয় করিয়াছেন বটে, তথাপি আজিকার এই দুর্দিনে রাজকুমারী ভাবী স্বামীর বীরত্বের বহর আর একবার যাচাই করিয়া লইবেন-ইহাই রাজা নজ্জাসীর অভিলাষ।

পরাবীন রাজদরবারে নজ্জাসীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাজ্যের অমাত্যবর্গ মহাবল বীর সেনাপতিগণ পদোচিত বিচিত্র বেশভূষা পরিধান করিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। নবাগত মুসলমান বীর আবূ রায়হান, দলপতি আবদুর রহমান, জাফর প্রমুখ মুসলমানও দরবারে উপস্থিত। কয়েকটি দাসদাসী সিংহাসনের পার্শ্বদেশে ও পশ্চাতে করজোড়ে দণ্ডায়মান। রাজদরবার অতুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। মহামূল্য পরিচ্ছদ ও রত্ন-খচিত রাজমুকুট পরিধান করিয়া কারুকার্যময় সুবর্ণ সিংহাসনে সৌম্যদর্শন নরপতি সমাসীন। দীর্ঘাবয়ব মহীপাল প্রৌঢ় হইলেও বলিষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার উজ্জ্বল দিব্যকান্তি অপূর্ব তেজোব্যঞ্জক। সুসজ্জিত দরবার-গৃহ ভূপতির উজ্জল বসন চাকচিক্যে, মহামূল্য ভূষণ-গরিমায়, অমাত্যবর্গের জমকালো বেশ-ভূষার পারিপাট্যে সমুজ্জ্বল। তরুণী পরিচারিকাদের কেহ কেহ চামর ঢুলাইয়া, গন্ধধূপ হাতে লইয়া রাজসেবায় নিয়োজিত।

রাজা নজ্জাসীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পরাবীন! বিদ্রোহী অসভ্য-সর্দার উগাণ্ডির আস্পর্ধা দেখেছ? আমার নিরীহ প্রজাদের হত্যা করছে নির্বিচারে, ঘর-বাড়ী সব পুড়িয়ে দিচ্ছে।"

পরাবীন মস্তক অবনত করিয়া উত্তর করিলেন, "মহানুভব সম্রাট! এ-সংবাদে রাজ্যের সকলেই বড় উৎকণ্ঠিত। পাপিষ্ঠকে সমুচিত শাস্তি দিতে আমি মহারাজের অনুজ্ঞাপ্রার্থী।"

রাজা নজ্জাসী সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পায়চারি করিতে করিতে বলিলেন, "উত্তম! তোমার বীরত্বে আমার বিশ্বাস আছে পরাবীন! কিন্তু পাষণ্ড উগাণ্ডি বড় ধূর্ত, তাকে বন্দী করতে হবে কৌশলে। পারবে কি শয়তানটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, শৃগালের ন্যায় টেনে আনতে আমার সম্মুখে? পারবে কি বিদ্রোহ দমন করতে কঠোর হস্তে? পুরস্কার পাবে, মহামূল্য পুরস্কার। বিজয় মূল্যে ভূষিত হয়ে এলে তোমার বাঞ্ছিত রাজকুমারীর বরমাল্য লাভ করবে। পারবে কি তা' অর্জন করতে?"

পরাবীন নরপতিকে অভিবাদনপূর্বক বলিলেন, " মহারাজের জয় হোক! এই তরবারি হস্তে প্রতিজ্ঞা করছি, উগাণ্ডিকে বন্দী না করে ফিরবো না। অনুমতি পেলে আমি এই মুহূর্তেই লেগে যাই যুদ্ধযাত্রা আয়োজনে।"

রাজা নজ্জাসী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "শাবাশ বীর! অতুলনীয় বীরত্বে কীর্তিমান হও-এই আমার আকাঙ্খা। রাজ-সেনাপতি পিয়েলোও সৈন্যবাহিনীসহ প্রস্তুত। তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন সর্বতোভাবে। যাও বীর! অবিলম্বে যাত্রার আয়োজন কর!"

অমাত্যবর্গ দরবার-গৃহ প্রকম্পিত করিয়া সমস্বরে মহোৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, "মহামান্য ভূপতির জয়! মহাবীর পরাবীনের জয়!" সে উল্লাস-ধ্বনি চতুর্দিকস্থ পর্বতশ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া নগরের কোলাহল ছাপাইয়া, অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া গেল। সেই বিপুল হর্ষ ধ্বনির মধ্যে পরাবীন নজ্জাসীকে অভিবাদন করিয়া রাজকুমারী শামিনীর নিকট হইতে বিদায় লইতে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

নৃপতি অমাত্যবর্গ ও সেনানায়কদের আসন গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধযাত্রা ও রাজকার্যের আলোচনায় কাটাইলেন; তারপর আহবান করিলেন রাজপুত্র যোফনকে। অবিলম্বে রাজকুমার পিতাকে অভিবাদনপূর্বক অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইলেন।

নরপতি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " রাজকুমার! কোথায় সেই সব আরবের আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান বীর? ব্যস্ততাবশতঃ এদের ভ্রমণকাহিনী সবিস্তারে শোনা হয়নি। পাষণ্ড উগাণ্ডি আমার অন্তরে অশান্তির বীজ বপন করেছে। দেখো কিন্তু, মেহমান মুসলমানদের কোন বিষয়ে যেন কষ্ট না হয়। কোথায় সর্দার আবদুর রহমান?"

আবদুর রহমান তাঁহার সঙ্গীগণসহ রাজ-দরবারেই উপস্থিত ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি রায়হান ও জাফরকে সঙ্গে লইয়া অভিবাদনপূর্বক রাজ সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা নজ্জাসী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সর্দার আবদুর রহমান! নবাগত মুসলমানদের দুর্দশার কাহিনী যতটা শুনেছি, তাতেই আমার অন্তর ভরে উঠেছে সীমাহীন বেদনায়। সবটুকু শোনার আর অবকাশও ঘটলো না! আমাকে যে এখনই সেনাপতি পরাবীনের যুদ্ধযাত্রার আয়োজন স্বচক্ষে দেখতে হবে। এই নবাগত মুহাজিরদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাজকুমার যোফনের হাতে ন্যস্ত রইল, আপনিও তত্ত্বাবধান করবেন।"

আবদুর রহমান রাজা নজ্জাসীকে পুনরায় অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, "হ মহামান্য ভূপতি! মুহাজির মুসলমানগণ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আপনার দয়া-দাক্ষিণ্য তারা ভুলতে পারবে না কোনদিন। আজ এই রাজ্যের উপস্থিত বিপদে তারা সকলেই বড় মর্মাহত। তাদের কাতর প্রার্থনা-রাজ সেবায় ও রাজ্যের সেবায় নিজেদের সামান্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করার সৌভাগ্য থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। এই নবাগত বন্ধু আবু রায়হান একজন বিচক্ষণ সেনানী। সকলে মনস্থ করেছি, আপনার অনুমতি পেলে, তাঁরই নেতৃত্বে উগাণ্ডির বিরুদ্ধে আমরাও একসঙ্গে অস্ত্র ধারণ করবো।"

নজ্জাসী ঘাড় ফিরাইয়া রায়হানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রায়হান নৃপতিকে যথোচিত অভিবাদনপূর্বক আরজ করিলেন, "মহামান্য অধিপতি, দয়ালু প্রজাপালক, আপনার জয় হোক! দয়াময় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমরা আপনার আশ্রয়ে পরম সুখে বাস করছি। এ উপকার কখনও ভুলবো না। মুসলমানগণ অকৃতজ্ঞ নয়, কাপুরুষ নয়। দেহের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে আপনার শত্রু সংহারে সাহায্য করতে তারা প্রস্তুত। আদিষ্ট হ'লে এখনই সকলে সেনাপতি পরাবীনের অধীনে যুদ্ধযাত্রা করবে।"

হাবশী-নরপতি স্মিতহাস্যে উত্তর করিলেন, "হে নবাগত বীর মুহাজির দল! আপনাদের কৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। মুসলমান কাপুরুষ নয়, তা' আমি জানি। ইসলামের তত্ত্বকথাও কিছুটা শুনেছি; শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আমার বিপদকালে আপনারা ছুটে এসেছেন-এ বড় সুখের কথা; কিন্তু আশ্রিতকে এই সংহার কার্যে নিয়োগ করতে মন যে কিছুতেই সায় দেয় না। প্রভু যীশুর কৃপায় এ-রাজ্যের সৈন্যবল নগণ্য নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস-পরাবীনই পাপিষ্ঠ উগাণ্ডিকে বন্দী করে দেশে শান্তি স্থাপন করতে পারবে। ঐ বুঝি সে রণ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসছে! এক্ষণে রাজসভা ভঙ্গ হোক। আমি নিজে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন দেখবে। রাজ-সেনাপতি পিয়েলো! এই যুদ্ধে আপনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে পরাবীনকে সাহায্য করুন! সে-ই এই যুদ্ধের সেনাপতি। রাজকুমারীকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবার আগে আমি আর একবার তার বীরত্ব পরীক্ষা করতে চাই। এই মুহূর্তে সৈন্যদল নিয়ে যাত্রা করুন!"

পিয়েলো 'মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য' বলিয়া নজ্জাসীকে অভিবাদনপূর্বক দরবার-গৃহ হইতে বাহির হইয়া অশ্বরোহণে ছুটিলেন। রাজসভায় পুনরায় 'মহারাজের জয় হোক, জয় হোক' রব। সেই বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে রাজা স্বয়ং পাত্র-মিত্র-সমভিব্যাহারে দরবারগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজপ্রাসাদের অদূরে চতুর্দিকে পাহাড়-বেষ্টিত মালভূমির উপরিভাগে বিরাট দুর্গ। দুর্গের সম্মুখস্থ প্রান্তরে অসংখ্য পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক নানাবিধ সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেনাপতির আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। অপরদিকে পরাবীন রাজকুমারী শামিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। প্রাসাদের বাহিরে দণ্ডায়মান রায়হান চাহিয়া দেখেন সখী-পরীবৃতা রাজকুমারী তখনও প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়াইয়া নবীন সেনাপতি পরাবীনের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছেন। চলিতে চলিতে সেনাপতি বারবার ঘাড় ফিরাইয়া প্রিয়তমার চন্দ্রবদন দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। রাজকুমারী ডান হস্ত মৃদু আন্দোলন করিয়া পরাবীনের অন্তরে এক একবার বিদ্যুৎশিহরণ জাগাইয়া দিয়া বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন।

এ দৃশ্য দেখিয়া রায়হান মুগ্ধ হইলেন। মনে পড়িল-সেই নিশীথে নিজের পলায়ন-দৃশ্য। নিঝুম নিশীথে সায়ফুন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দীপহস্তে কারাগারের

দ্বারদেশে এমনিভাবে দাঁড়াইয়াছিল। দীপালোকে তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল দেখা গিয়াছিল কি যে অপরূপ! প্রাণভয়ে ছুটিতে ছুটিতেও দৃষ্টির আড়াল না হওয়া অবধি বারবার ঘাড় ফিরাইয়া সেই ইন্দুবিনিন্দিত মুখখানি না দেখিয়া তিনি পারেন নাই। এক পা মৃত্যুর দুয়ারে বাড়াইয়া কতখানি মমতা, কতখানি ভালবাসার আকর্ষণে সেই দুঃসাহসিনী নারী এক হস্তে ছুরিকা ও অপর হস্তে প্রদীপ লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, কে তাহার শুমার করিবে! আজ দুইজন দুই দেশে বহু দূরে ছাড়াছাড়ি, মধ্যে বিরাট ব্যবধান। সৃষ্টির আদিম যুগের আদি জনক আদম ও আদি জননী হাওয়ার ন্যায় তাঁহারাও যে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া দুই মহাদেশে নিক্ষিপ্ত। কে জানে সায়ফুন আজ কোথায়! যে জীবন-দীপ তাহার অন্তর আলোকিত করিয়াছে, সে প্রদীপ নির্বাপিত কিংবা ঝঞ্ঝাবর্তের আঘাতে নির্বাণোন্মুখ হইবে, ইহা যে তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না।

দেখিতে দেখিতে যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের কাড়া-নাকাড়ার ধ্বনিতে সমগ্র শহর মুখরিত। রায়হানের ধ্যান ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখেন-চারিদিকে ধূলিবালি ছড়াইয়া, এক বিরাট অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান নাগরিকদের নানাবিধ অভিনন্দনসূচক জয়ধ্বনি শুনিতে শুনিতে যুদ্ধযাত্রা করিতেছে। বিরহকাতর রায়হানের উদাস অন্তর সে দৃশ্যে আকৃষ্ট হইল না, সেইদিকে আর তিনি অগ্রসরও হইলেন না। আজ প্রিয়তমার স্মৃতি তাঁহার প্রাণ যে দলিত-মথিত করিয়া তুলিয়াছে। সঙ্গীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজপথ ছাড়িয়া, নির্জন প্রান্তরপথে পা বাড়াইলেন।

রায়হান বিষণ্নবদনে জনহীন ময়দানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর এক পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলেন, পর্যালোচনা করিলেন নিজের-জীবন-কাহিনীর প্রতিটি অধ্যায়; কিন্তু কোথাও আশার আলো দেখিতে পাইলেন না। দুই হাত উঠাইয়া কাতরভাবে তিনি প্রার্থনা করিলেন, "হে বিরাট বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা! ভুবনভরা সৃষ্ট জীবের পালনকর্তা! হে রাব্বেল আ'লামীন! তোমার কৃপাসিন্ধুর কণামাত্রের ভিখারী আমি! বিমুখ যেন না হই প্রভো! করুণায় যেন বঞ্চিত না হই! কোথায় আমার দেশ, আর কোথায় এই মুল্‌কে হাবাশ! কোথায় সায়ফুন, আর কোথায় আমি! স্বদেশ ছেড়ে, সায়ফুনকে ছেড়ে বাঁচবো কি করে বিশ্বপ্রভু? কোথায় আমার দেশের পাহাড়-জাবাল-সারাত, জাবাল হিন্দ, জাবাল-সামার? কোথায় সেই মরুভূমি নেফ্‌দ, ডাহানা, বাব-এল-খালি?

কোথায় আমার আল–জবিল? কোথায় সেই সব পরিচিত গ্রাম–কিনানা, নাজরান, বীর বহিলা, সাইবান, বীর হামদান? হে প্রভু করুণাসিন্ধু! আমার স্বদেশে, দেশের মাটিতে আমাকে ফিরতে দাও, বাঁচতে দাও, মরতে দাও! প্রিয়তমা সায়ফুনের পার্শ্বে একবার দাঁড়াইতে দাও! চারদিকের এই কৃষ্ণ বনানী, ধূসর পাহাড়, আমার দু'নয়নে তীব্র দহন জ্বেলে দিয়েছে, আমি যে আর বাঁচিনে প্রভো! ওগো দয়াময়! দেশের পানি, দেশের হাওয়া, কবে আমার মন প্রাণ শীতল করবে? কবে আমার সায়ফুন পাশে এসে দাঁড়াবে?" রায়হান ভাবাবেগে বড় তন্ময় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বাষ্পাকুল উদাস দৃষ্টির সম্মুখে উচ্চ–নীচ পার্বত্য প্রদেশ, ধূসর প্রান্তর, আবলুস ও মেহগনির বন শস্য–শ্যামল নিম্নভূমি, জনার, ভূট্টা ও চানার ক্ষেত্রসমূহ সুদূর দিঙ্মণ্ডলে মিশিয়া সবই যেন নাম–নিশানাবিহীন–সয়লাব একাকার।

সহসা কার আগমনে তাঁহার ধ্যান ভাঙিল। চমকিত হইয়া দেখিলেন, পশ্চাতে দণ্ডায়মান আবু জাফর! চক্ষুদ্বয় মুছিয়া সম্মুখে তাকাতেই তাঁহার চোখে পড়িল সূর্য পাটে বসিবার উপক্রম! অস্তগামী রবির শেষ রশ্মির সোনালী আভায়, দূরে পর্বত–শিখরগুলি হৈমবর্ণে রঞ্জিত; আর যে বিলম্ব করা চলে না। অচিরেই পাহাড়–বনানীর ছায়া–ঘেরা পল্লীপথে রাত্রির অন্ধকার নিবিড় হইয়া উঠিবে।

জাফর রায়হানের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে যে খুঁজে মরছি চারদিকে; অমন গমগীন হয়ে বসে বসে চোখের পানি ফেলা তোমার মত বীরপুরুষের কি সাজে ভাই? যুদ্ধযাত্রার অনুমতি আমরা পাইনি বটে, কিন্তু চুপচাপ বসে থেকে শুধু যুদ্ধের তামাসা দেখা ত সাজে না। এখনই সকলে বসে পরামর্শ করে যথাকর্তব্য স্থির করতে হবে। ঘরে চল।"

দুঃখ–ভারাক্রান্ত রায়হান জাফরের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে মৃদু পদক্ষেপে পাহাড়ের গা বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন।

সাঁইত্রিশ

বেদুঈন–পল্লীর স্ত্রী–পুরুষ সকলের মুখেই কেবল সায়ফুনের কথা। এমন রূপ, এমন স্বাস্থ্য, নিটোল অঙ্গ–সৌষ্ঠব, কখনও নাকি দেখে নাই কেউ। যুবতীরা তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে, ভাব জমাইতে চাহে; কিন্তু বড় একটা সুযোগই পায় না। যুবকেরা রূপসী সায়ফুনকে এক নযর দেখিবার জন্য, তাঁবুর আশেপাশে শুধু ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু সুফিয়ার ভয়ে কাছে ভিড়িতে সাহস পায় না।

সায়ফুন প্রতিদিনই সমুদ্রতীরে যাইবার জন্য জিদ ধরে। তাহার একান্ত পীড়াপীড়িতে, বিশেষতঃ পল্লীর কয়েকটি অশিষ্ট নর–নারীর কদর্য আচরণে উত্যক্তা সায়ফুনকে দিবসের অধিকাংশ সময় বাহিরে রাখিবার উদ্দেশ্যে, সুফিয়াও তাহাকে লইয়া রোজই বেড়াইতে যায় সমুদ্রতটে। তথায় সারাটা অপরাহ্ন উভয়েই সেই প্রস্তরখণ্ডেই বসিয়া কাটায়, কখনও কখনও বা আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। সমুদ্রে পাল তুলিয়া কোন নৌকা আসিতে দেখিলে, সায়ফুনের ভাবপ্রবণ অন্তর পুলকে যেন নাচিতে থাকে; মনশ্চক্ষে তখন ভাসিয়া উঠে–তাহার প্রিয়তম রায়হানের তেজোব্যঞ্জক মুখখানি। মনে কত কথাই না উদয় হয়! ভাবে, এইবার তিনি ঠিকই আসিতেছেন। একদৃষ্টে সে তাকাইয়া থাকে। কিন্তু হায়! অভাগিনীর সাধের স্বপ্ন নির্মম আঘাতে ভাঙিয়া দিয়া তরীখানি যে চলিয়া যায় অন্যদিকে– নৈরাশ্যে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠে। সায়াহ্নে পাখীরা বাসায় ফিরিতে শুরু করিলে সুফিয়া ধ্যানমগ্না সায়ফুনের হাত ধরিয়া বলে, "চল বহিন, বাড়ী ফিরি! ঐ দেখ, পাখীরা সব বাসায় ফিরছে, আর বিলম্ব করলে অন্ধকার যে ঘনিয়ে আসবে! ওঠ এইবার!"

সায়ফুনের মুখে ঐ একই কথা, "ওদের আশ্রয় আছে, আপন জন আছে, আমার যে কিছুই নেই! সে ত এল না বোন। আমার রায়হান কি আর আসবে না?" বিরহিণী হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠে। সুফিয়া তাহার চোখ মোছায়, জোর করিয়া

তাহাকে তাঁবুতে লইয়া আসে। এমনিভাবে দিন যায় রাত্রি আসে, দিনের পর দিন কাটে। পল্লীবাসিনী রমণিগণ অনেকেই তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসে, কিন্তু বিরহবিধূরা সায়ফুনের কোন সাড়া পায় না। কেউ কেউ সায়ফুনের উদাসীন ভাব লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভাবে–মেয়েটা বড় অহঙ্কারিণী, বড় আভিজাত্যাভিমানিনী। মনঃকষ্টে তাহারা শোনাইয়া যায়–গর্বিতা নারীর ব্যবহারে তাহারা অপমান বোধ করে। দুই–একজন রুষ্ট হইয়া নানা দুর্বাক্যও উচ্চারণ করে। সুফিয়াকেও তাহারা আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। এই সেদিন শিরিনা তাহাকে শাসাইয়া বলিয়াছিল, "এই দিমাগী মাগীকে কী লাভে তুমি আশ্রয় দিয়েছ? আর কতকাল তাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে? বংশানুক্রমে এরা আমাদের পরম শত্রু, সে কথা কি ভুলে গেছ? আজ হাবিল নেই, তাতেই কি তোমার যথেচ্ছাচার চরমে উঠেছে। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয় সুফিয়া!"

শিরিনার পরিচয় কিছুটা জানিয়া রাখা ভাল; কেননা, এই রত্নটির সঙ্গেই সায়ফুনের আড়াআড়ি চলিয়াছিল সবচেয়ে বেশী।

শিরিনা বেদুইন–পল্লীরই এক বিধবা যুবতী; যুবতীই বলিব, কেননা, যৌবনের প্লাবন তখনও ততটা মনে নাই। তবে ভাটার টান যে একেবারেই লাগে নাই এমনও নয়। বৎসর দুই পূর্বে স্বামী গতাসু হইয়াছে, কিন্তু তদবধি সে অন্য কোন প্রেমিকের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। শিরিনা সুন্দরী, ভাল নাচিতে–গাহিতেও জানে; কিন্তু হইলে কি হয়, মুখরা বলিয়া বদনাম আছে যথেষ্ট। যুবকেরা এই ভয়েই নাকি তাহার সঙ্গে প্রেম–চর্চায় অগ্রসর হয় না। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি গুণের সে অধিকারিণী–অযথা কোন্দল পাকাইতে, মিছামিছি অপরের কুৎসা রটনা করিতে পাড়ায় তাহার আর জুড়ি নাই। দুর্মুখীর স্বামীটি ছিল বড় ভাল মানুষ, স্ত্রীর রসনার দাপটে বেচারা নাকি নিশিদিন চোখের পানিতে বুক ভাসাইত, অসহ্য হইলে মাঝে মাঝে সর্দারের নিকটে নালিশ জানাইত। অতিষ্ঠ হইয়া দুর্ভাগা অলিদ কয়েকবারই আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর শ্যেন দৃষ্টি এড়াইয়া তাহাতেও সফলকাম হয় নাই। হতভাগিনী তাহাকে মরিতেও দেয় নাই; কিন্তু শেষাবধি কালের করাল গ্রাস হইতে সাধের শওহরকে শিরিনা রক্ষা করিতে পারিল কই! আজ আর সে নাই। তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে। পাড়ার বয়স্করা এখনও বলে, 'মরে বেঁচে গেছে খুব, বেচারা অলিদ।'

আজকাল শিরিনা মাঝে মাঝে গভীর রাতে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে কখনও –বা নীরবে চোখের পানি ফেলে। কেউ কেউ বলে– হাজার হোক অলিদকে সে ভালবাসিত, অলিদের জন্যই কাঁদে। কেউ বলে–হুঁ, অলিদের জন্য তার আর ঘুম হয় না। অভাগীর কপালে অন্য বর জুটে না, সেই জন্যই কাঁদে। আমরা অতশত জানি না, স্ত্রীলোকের মন বুঝা কি সহজ কথা? সংসারে যত দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার আছে, তন্মধ্যে ইহাও একটি। শুধু ইহাই জানি, যুবকেরা দোসর লায়লা কিংবা শিরীর খোঁজ করে, কিন্তু শিরিনার দিকে বড় একটা তাকায় না। কিন্তু সংসারে ত পাল–ছাড়া গরু আর দল–ছাড়া মানুষও আছে; শিংভাঙা গরুর গোঁয়ারতুমির আর কান–কাটা মানুষের বেহায়াপনারও ত অভাব নাই। কাজেই শিরিনার দিকে কেউই নযর দিবে না, সে কথা একেবারে হলফ করিয়াও বলা যায় না। পাড়ায় দুই–চারিটা বদ্‌ছোকরা আর কমিন কমবখ্‌ত যে নাই, তা নয়।

আবিদ সেই পাড়ারই এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক। কিছুদিন হয় তাহার তৃতীয় পত্নীর কাল হইয়াছে। পর পর তিন স্ত্রী গত হওয়ায় সে হতভাগারও চতুর্থ পক্ষ–লাভ একটু দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ায় বদ্‌বুদ্ধিতে তাহার জুড়ি নাই, দুষ্টামিরও অন্ত নাই; শয়তানের চেলা বলিয়াই লোকে তাহাকে জানে। ইহার উপর আবার বদ্‌নাম রটিয়েছে, সে নাকি স্ত্রী–খেকো। সেইজন্যই কেউ আর তাহার সঙ্গে আপন–কন্যা, ভগিনী কিংবা আত্মীয়াকে শাদী দিতে সাহস পায় না। অনন্যোপায় হইয়া আবিদ শেষটায় শিরিনার সঙ্গেই ভাব জমাইবার চেষ্টায় আছে। অধুনা রাস্তা–ঘাটে দেখা হইলে দুইজনেই নাকি মুচকি হাসে। যে তাঁবুতে ভয়ে কেউ ঘেঁসে না, সেই শিরিনার তাঁবুর আশেপাশে আজকাল প্রায়ই নাকি সে ঘুরাফেরা করে। কেউ কেউ নাকি এমনও দেখিয়াছে, শিরিনা মাঝে মাঝে আবিদকে দাওয়াত করিয়া কাবাব পরাটা, পাকা খেজুর, পাকা তরমুজ, বাটিভরা ক্ষীরদুধ খাইতে দেয়। ফলতঃ আবিদ শিরিনার রূপ–গুণে মুগ্ধ হইয়া শাদীর পয়গামও নাকি পাঠাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইদানীং ভদ্রঘরের মেয়ে সায়ফুন আসিয়াই শিরিনার সুখ–স্বপ্ন সব ভাঙিয়া দিয়াছে; অপূর্ব সুন্দরী সায়ফুনকে দেখিয়া আবিদ নাকি ভাবে মজিয়াছে।

বন্ধুমহলে আবিদ আজকাল বুক ফুলাইয়া বলে, যেমন করিয়াই হউক সায়ফুনকে সে শাদী করিবেই। চেলা–চামুণ্ডারাও এ বিষয়ে সদা–সর্বদা উৎসাহ

দিয়া তাহার বাসনাগ্নি আরো উদ্দীপ্ত করিয়াছে। শুধু কি আবিদ! দেখাদেখি জাবালি নামক পাহাড় আর একটা ক্ষুদে শয়তানও সায়ফুনের রূপে পাগল। সেও নাকি তাহাকে শাদী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। আবিদের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রায়ই তাহার বচসা, গালাগালি, এমন কি মারামারিও হইয়া থাকে। ব্যাপার দেখিয়া সর্দার-কন্যা সুফিয়া দুইজনকেই সাবধান করিয়া দেয়; কিন্তু উভয়েই তাহাকে উল্টা শাসাইয়া বলে-ছলে হউক, বলে হউক, সায়ফুনকে শাদী করিবেই করিবে।

সুফিয়ার দুশ্চিন্তার আর অবধি নাই; কিন্তু এতদিন কোন কথা সায়ফুনকে সে জানায় নাই। পিতাকে সবকিছু সে বলিয়াছিল বটে, কিন্তু ফল হয়নি বিশেষ। সর্দারের শাসনে আরো দলাদলি, কোন্দল ও তিক্ততার সৃষ্টি হইল মাত্র।

শিরিনারও কপাল ভাঙিয়াছে। অধুনা আবিদ তাহার দুয়ারে বড় একটা ঘেঁষিতেই চায় না। সে শুনিয়াছে, সুফিয়ার সেই আশ্রিতা মেয়ে সায়ফুনকে দেখিয়া আবিদের দিমাগ খারাপ হইয়াছে। এই কারণেই সায়ফুন ও সুফিয়া উভয়েই আজকাল শিরিনার দুই চোখের বিষ। প্রতিবেশিনীদের নিকটে সে বলিয়া বেড়ায়, সর্দার-কন্যা সুফিয়াই তাহার সাধের স্বপ্ন ভাঙিয়া দিয়াছে।

শিরিনা হাবিলের নাম করিয়া প্রায়ই সুফিয়াকে শাসায়। সর্দার-কন্যা শিহরিয়া উঠে। শিরিনার কথাগুলি তাহার প্রাণে বড় বাজে, তবুও সে শিরিনাকে ও পল্লীর অন্যান্য অশিষ্টা নারীদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'সায়ফুন বড় অসহায়া, বড় দুঃখিনী। এ সংসারে তার আর কেউ নেই; তোমরা যেন তাকে ভুল বুঝো না। সে গর্বিতা নয়, কুলটা নয়-অভিজাত-বংশীয়া এক কুরাইশ-কন্যা! তোমাদের উপহাসের পাত্রী সে নয়।' কিন্তু দুরন্ত বেদুঈন-যুবতীরা এত সহজে বুঝিতে চাহে না। ক্রমে নানাজনে নানাভাবে সায়ফুন ও সুফিয়ার নামে কত কুৎসা রটনা করিয়া পল্লীময় বদনাম ছড়াইয়া দিল।

ইদানীং সায়ফুনের নামে পল্লীর নরনারীদের উৎসাহের আর সীমা নাই। পুরুষেরা প্রান্তরে মেষ চরাইবার কালে এবং রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে মজলিসে বসিয়া সায়ফুনের কথা আলোচনা করে; মেয়েরা দল বাঁধিয়া পানি আনিতে গিয়া, বৈকালে তাঁবুর ছায়ায় চুল বাঁধিতে বসিয়া তাহার কথাই বলাবলি করে। পতিহিংসাপরায়ণ যুবকদের একদল তাহাদের জ্ঞাতি-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে

বদ্ধপরিকর; ইহারা সকলে সায়ফুনকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আবার সুন্দরী কুরাইশ–কন্যার প্রতি অনুরক্ত আর একদল তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

পাড়ার এই প্রতিকূল পরিবেশে একমাত্র সুফিয়া অহোরাত্র ছায়ার ন্যায় সায়ফুনের পাশে পাশে থাকে। যুবকদের উদ্ধত আচরণ, পল্লীবাসিনীদের রূঢ় ব্যবহার, অপ্রিয়–ভাষণ ও জ্বালাময়ী বাক্যবাণ হইতে সে তাহাকে নিশিদিন আগলাইয়া রাখে। সায়ফুনও মর্মে মর্মে বুঝিয়াছে, এ সংসারে সুফিয়া ছাড়া তাহার আপন জন আর কেউই নাই। সে সব হারাইয়াছে, কিন্তু সুফিয়াকে পাইয়াছে; তাহার স্নেহমমতা, উদারতা ও সহানুভূতি জীবনে কখনও ভুলিবার নহে। সেইদিন সন্ধ্যার পর সায়ফুন বেদুঈন–কন্যার হাত দুটি ধরিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলিল, "বোন সুফিয়া! তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারবো না। তুমি না দেখলে কবেই হয়তো মিশে যেতাম মাটিতে।"

সুফিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "বাজে বকো না যেন, চল বাইরে খানিক ঘুরে আসি। চেয়ে দেখ, আলোয় আলোয় ভরে গেছে বিশ্বভুবন। কি মধুর চাঁদ! আজ বুঝি পূর্ণিমা?"

সায়ফুন তাঁবুর দরজায় দাঁড়াইয়া দেখে, সত্যই বাহিরে চন্দ্রালোকের বন্যা জ্যোৎস্না–প্লাবিত প্রান্তরে খর্জুর বৃক্ষগুলো মৃদুমন্দ অনিল–হিল্লোলে আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া মাথা নাড়িয়া যেন নাচিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী নিদাঘ রজনীর মৃদুমন্দ সমীরণ বড় লোভনীয়, বড় তৃপ্তিদায়ক। বাহিরে ধরণীর এই অপরূপ রূপ, এই অনুপম মাধুর্য বিরহিণী সায়ফুনের মনপ্রাণও আকৃষ্ট না করিয়া ছাড়িল না। নিঃশব্দে সে সুফিয়ার অনুগমন করিল।

অকস্মাৎ পল্লী–প্রান্তে উত্থিত হইল সমবেত কণ্ঠে চিৎকার–ধ্বনি। মনে হইল, উন্মত্ত জনতা মারামারি–কাটাকাটি করিয়া যেন মরিতেছে। সুফিয়া সে চিৎকার শুনিবামাত্র ব্যস্তভাবে বলিল, "সায়ফুন! তুমি তাঁবুতে যাও, ঐদিকে কিসের শোরগোল, আমি একবার দেখে আসি।"

সায়ফুন বলিল, "চল আমিও যাব, হয়তো বা কারো কোন বিপদ ঘটেছে। তোমার সঙ্গে থেকে বিপন্নকে আমিও সাহায্য করবো।"

সুফিয়া তাহাকে বারণ করিয়া বলিল, "না, রাত্তিরে তোমার গিয়ে কাজ নেই, বিপদ ঘটতে পারে। তুমি বরং তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম কর।"

সায়ফুন বলিল, "তবে ঐদিকের খোলা মাঠে একটু ঘুরে আসি। এই জ্যোৎস্না রাতে ভিতরে বন্দী হয়ে থাকতে মন চায় না।"

"দেখো, অধিক দূর যেন যেয়ো না কিন্তু।" এই বলিয়া সুফিয়া দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে ছুটিল।

কয়েকটা তাঁবু পার হইয়াই সুফিয়া দেখিতে পাইল, পল্লীর ভিতরে এক খণ্ডযুদ্ধ। একদল যুবক আর এক দলকে তলোয়ার ও বর্শা লইয়া আক্রমণ করিয়াছে। নিকটে গিয়া সে দেখে, পাড়ার আবাল–বৃদ্ধ–বনিতাদের অনেকেই যুদ্ধের তামাশা দেখিবার জন্য দুই দলের পশ্চাতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে আর যোদ্ধাদের উস্‌কানি দিতেছে।

সুফিয়াকে দেখিবামাত্র এক প্রৌঢ়া বিধবা চেঁচাইয়া উঠিল, "এই যে সুফিয়া! তোমার সেই দিমাগী সইটি কই? নিয়ে এলে না কেন মজা দেখাতে?" এই বলিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

সুফিয়ার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

শিরিনাও ছিল সেইখানে উপস্থিত। সে আগাইয়া আসিয়া দুই হাত নাড়িতে নাড়িতে অপূর্ব মুখভঙ্গী সহকারে সুফিয়াকে বলিল, "তুমিই তো যত সব অনর্থের মূল! কোথাকার এক কুলটা মেয়েকে কুড়িয়ে এনে পাড়াসুদ্ধ লোক ক্ষেপিয়ে তুলেছ। এইবার মজা বুঝ? মাগীর গুমর কত, কথাটিই কয় না! আচ্ছা বাপু, তোমার এত দরদ কেন শুনি? আমি হ'লে কবেই ত তাকে ঝেটিয়ে তাড়াতাম। বিরাট জঙ্গ্ বাধিয়ে এখন কিনা এসেছ রঙ্গ দেখতে। দেখাই যাক, কে হারে কে জিতে। জাবালীটা আস্ত গাধা, ডানদিকে ঘুরে আক্রমণ করলেই না হয়।"

হাসিনা নাম্নী এক যুবতী সুফিয়ার নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "আপা! শুননি ব্যাপারটা? এই দলের সর্দার আবিদ আর ঐ দলের জাবালী তোমার

সায়ফুনের প্রণয়প্রার্থী। আজ উভয়েই বলছে তাকে নাকি জোর করে শাদী করবে। তাইতেই না এই হাঙ্গামা!"

কথাটা শুনিবামাত্র সুফিয়ার সর্বাঙ্গে কে যেন বিছুটি লাগাইয়া দিল, মস্তকে বুঝি উনপঞ্চাশ বায়ু প্রবহমান। তৎক্ষণাৎ তাহার পিতা পল্লী–সর্দার আনসারকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে সে দ্রুত সেই তাঁবুর দিকে ছুটিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই পরাস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল জাবালীর দল। জয়োল্লাসে তখন বিজয়ী দলপতি আবিদ ভক্তবৃন্দসহ গগনভেদী চিৎকার করিতে করিতে সুফিয়ার তাঁবুর দিকে দৌড়াইল সায়ফুনকে ধরিয়া আনিবার জন্য।

সৌভাগ্যক্রমে সায়ফুন তখনও তাঁবুতে ফিরে নাই। আবিদ ও তাহার সঙ্গিগণ সুফিয়ার তাঁবুতে ঢুকিয়া চারিদিকে খুঁজে দেখে সায়ফুন নাই। হতাশ–হৃদয়ে সকলে বাহিরে আসিতেই যাহা দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে এক নিমেষে উবিয়া গেল তাহাদের উদ্দীপনা আর প্রেমের মূর্ছনা। দেখিল, তাঁবুর সম্মুখে বিকট–দর্শন আনসার উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান; পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সুফিয়া। জ্যোৎস্নালোকে সর্দারের বিশাল চক্ষুদ্বয় চক্‌চক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

সর্দার গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, "আবিদ! তুমি কেন এখানে? যদি সেই আশ্রিতা রমণীর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে, তবে এই মুহূর্তে এক আঘাতে তোমাকে দ্বিখণ্ডিত করতাম। ভাগ্যক্রমে সে অঘটন ঘটেনি। কোথায় সেই দুর্ভাগা নারী?"

আবিদ বিনম্র বচনে উত্তর করিল, "তাঁবুতে কেউ নেই সর্দার।"

আনসার কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যাও সুফিয়া, মেয়েটির খোঁজ কর। তারপর আবিদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমরা আমার কন্যার তাঁবুতে প্রবেশ করলে কোন্ সাহসে? জান না, বেগানা আওরতের খীমায় মরদের প্রবেশ নিষেধ? বিচার হবে এর। এস আমার সঙ্গে।"

সর্দার তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতেই আবিদ অনুচরবর্গসহ বিনা বাক্যব্যয়ে অবনত মস্তকে তাহার অনুসরণ করিল।

সুফিয়া কালবিলম্ব না করিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, কিন্তু সায়ফুনকে দেখিতে পাইল না। সে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া কয়েকবার জোরে জোরে তাহাকে ডাকিল, কিন্তু কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া গেল না; সুফিয়ার দুশ্চিন্তার আর অবধি নাই। প্রান্তরে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে সে দেখিতে পাইল, কিয়দ্দূরে খর্জুর বৃক্ষতলে এক প্রস্তরখণ্ডে সায়ফুন উপবিষ্টা। দুই হাঁটুর উপরে চিবুক স্থাপন করিয়া একান্ত উদ্‌গত চিত্তে কি যেন সে ভাবিতেছে; দুই চক্ষে অশ্রুধারা। সমগ্র পল্লীটায় এতক্ষণ যে একটা বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গেল, তাহার ঝাঁপ্‌টা তাহার কানে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। এত সব ডাকাডাকি–হাঁকাহাঁকিও তাহার কানে যেন পৌঁছেই নাই। সুফিয়া কিছুক্ষণ সেখানে সায়ফুনের পার্শ্বে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তবু সে কিছুমাত্র টের পাইল না। এই অসহায়া দুঃখিনী যুবতীর হৃদয়ের আগুন সুফিয়ার কঠিন অন্তরকেও যেন স্পর্শ করিল, অভাগিনীর দুরবস্থা কল্পনা করিয়া তাহার দুই চক্ষুও অশ্রুকণায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার নিজের দুঃখের ত আর অবধিই নাই, তথাপি মনকে সে আশার আলোকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, নানাভাবে প্রবোধ দিয়াছে। কিন্তু সায়ফুনকে শতভাবে সান্ত্বনা দিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে। অভাগিনী তিলে তিলে, পলে পলে জ্বলিয়া পুড়িয়া এমনভাবেই বুঝি নিশিদিন কাটাইবে।

সুফিয়া বাম হস্তে দুই চক্ষু মুছিয়া ডান হস্ত সায়ফুনের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিবামাত্র সে সন্ত্রস্ত হইয়া চিৎকার সহকারে ঘাড় ফিরাইল। বলিল, "ওহ্ সুফিয়া! ভয়ে আমার অন্তর যে দুরু দুরু কাঁপছে।"

সুফিয়া বড় অপ্রস্তুত হইয়া গেল; কহিল, "মাফ কর বোন, হঠাৎ তোমার ধ্যান ভেঙ্গে বড় অন্যায় করেছি। ঘরে চল, রাত অনেক হয়েছে। আচ্ছা নিশিদিন কি শুধু চোখের পানিতেই বুক ভাসাবে?"

সায়ফুন নিরুত্তর। উঠিয়া চলিতে চলিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের গোলমাল শুনে ছুটেছিলে, সুফিয়া?"

সুফিয়া উত্তর করিল, "ওসব শুনে কি হবে বোন! অসভ্য জংলী মানুষ আমরা, আমরা ত কুরাইশ নই–বেদুঈন!–স্বভাব দুর্বৃত্ত। ছেঁদো কথায় আমাদের ঝগড়া বাধে, কথায় কথায় বর্শা তরবারি নিয়ে একে অপরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

সুফিয়ার অন্তস্থল হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনিই বাহির হইয়া আসিল। তাহার অন্তরাত্মা জানে, কি সত্য সে সায়ফুনের নিকটে গোপন করিয়াছে।

ততক্ষণে মজলিসে সর্দার আনসারের আদেশে উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের শাস্তির আয়োজন চলিয়াছে। সুফিয়ার অন্তরে যে অশান্তির আগুন হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল, বিচার-সভার তর্ক-বিতর্ক ও কোলাহল তাহাতে যেন ইন্ধন সংযোগ করিয়া আরো উদ্দীপিত করিল।

উভয়ের আহার শেষ হইলে সুফিয়া তাড়াতাড়ি সায়ফুনের শয্যা রচনা করিতে করিতে বলিল, "এইবার শয়ন কর বোন, আমি একবার আব্বার তাঁবু থেকে ঘুরে আসি।"

সায়ফুন শয্যা গ্রহণ করিতেই সুফিয়া তাঁবুর দরজা বন্ধ করিয়া একেবারে এক দৌড়ে বিচার-সভায় গিয়া উপস্থিত। শুনিল, তাহার পিতা তখন বজ্রনির্ঘোষে দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিতেছে, "আবিদ! তুমি অপরাধী! এক বেগুনাহ মেহ্মান আওরতের মর্যাদাহানির চেষ্টা করিয়া সমাজ-ব্যবস্থা লংঘন করেছ। শাস্তি কি জান? তোমাকে দলবলসহ তিনমাসকাল পল্লীর সকলের প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাঠ জঙ্গল থেকে বয়ে আনতে হবে। তা'ছাড়া সে সময়ে পল্লীর উট ও দুম্বাগুলোকে পাহাড়ের ধারে চরাতে হবে। সাবধান! এরূপ দুষ্কৃতির জন্য ভবিষ্যতে আর কখনো অভিযুক্ত হলে, বারবার সমাজ-ব্যবস্থা লংঘন করার অপরাধে চরম শাস্তি কিন্তু পাবে। সে শাস্তি কত নির্মম, কত কঠোর, তা' তুমি দেখেছ। মনে পড়ে ছায়াদের মৃত্যু-কাহিনী?"

সভাস্থল নীরব। আবিদ ও তাহার অনুচরবর্গ মাথা হেঁট করিয়া দণ্ডায়মান। প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া ও যুবক-যুবতীরা মাথা ঝুঁকাইয়া সর্দারের আদেশে সায় দিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরে সভার নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া শিরিনা বলিয়া উঠিল, "আমাদের শত্রু বংশীয়া এই গর্বিতা নারীকে আর কতদিন মেহমানের মর্যাদা দেওয়া হবে সর্দার?"

সর্দার দৃঢ়ভাবে উত্তর করিল, "ছয়মাস কাল। কেন, পল্লীর আচার-বিধি কি জানা নেই তোমার?"

শিরিনা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তিনমাস তো গত হয়েছে, তা হলে আরও তিন মাস বাকী?"

সর্দার উঠিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, মনে থাকে যেন।"

সর্দার বাহির হইয়া আসিলে সকলে মৃদুগুঞ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল। সুফিয়া পিতার হস্ত ধারণপূর্বক কাতর কণ্ঠে বলিল, "আব্বা তিন মাস পরে কি হবে? কী উপায় করবে? সায়ফুনের মান–ইজ্জত কি তুমি রক্ষা করতে পারবে না?"

সর্দার আনসার কন্যার মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিল, 'বেটি, সমাজের আইন-কানুন ত কেউ লংঘন করতে পারে না। আচ্ছা, তিন মাস ত ঢের দেরী এখনও। তুমি শোওগে যাও, রাত অনেক হয়েছে।" এই বলিয়া সর্দার আপন তাঁবুর দিকে পা বাড়াইল।

সুফিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া দেখে, সায়ফুন নিদ্রামগ্না। তাহার চক্ষুকোণে দুই ফোঁটা অশ্রু কখন গড়াইয়া নাকে যেন শুকাইয়া গিয়াছে, পানির দাগ তখনো মিলায় নাই। সে বুঝিল, হতভাগিনী চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শিয়রের উপাধান যথাস্থানে নাই। সুফিয়া আস্তে আস্তে তাহার বালিশটা ঠিক করিয়া তাঁবুর দরজা ভেজাইয়া দিতেই তৈলাভাবে নিষ্প্রভ প্রদীপটি দপ্ দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল। সুফিয়া সায়ফুনের পার্শ্বে শয্যা গ্রহণ করিবে, এমন সময় তাহার কানে আসিল–পল্লীতে স্ত্রী–পুরুষের মিলিত নৃত্য–গীত–ধ্বনি। কাহারা নাচিয়া নাচিয়া যেন গান গাহিতেছে। গানের মর্মার্থটা বড় অপ্রিয়। কে যেন তাহার প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "ওগো সখি! আর কতদিন প্রতীক্ষায় থাকবো? আশায় আশায় আর কতকাল কাটাবো? আমার অন্তর যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!"

সখি গানের সুরেই উত্তর করিল, "আর বেশী নয়, মাত্র তিন মাস–নব্বই দিন; খাও দাও ফূর্তি কর, পেয়ালা ভরে শরাব ঢাল।"

গায়ক নাচিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

গায়িকা নাচিতে নাচিতে, গানে গানে উত্তর করিল, "তারপর তুমি তাকে বন্দী করে আনবে। সে তোমায় আদর করবে, সোহাগ করবে, তোমার রুটি সেঁকে দেবে।"

"তারপর?"

"তোমার জন্য ঝরনার পানি বয়ে আনবে, খেজুরের আঁটি ছাড়াবে।"

"তারপর?"

"তোমার বর্শাফলক পাথরে ঘষে ধারাল করবে।"

"তারপর?"

"তারপর তোমায় নয়নবাণে বিদ্ধ করবে। রঙ্গরসে তোমার জীবন রঙীন করবে। এইবার শরাব, লুট, নাচ, গাও—ফূর্তি কর।" প্রশ্নকর্তা নাচিতে নাচিতে এইসব প্রশ্ন করিতেছে প্রেয়সীকে, নর্তকীও উত্তর দিতেছে নাচিয়া নাচিয়া।

নৃত্য-গীত, হাসি-তামাশা ও সুরাপানে হল্লা রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। সুফিয়া বুঝিতে পারিল, মৃতদার আবিদের গৃহেই জলসা; নারীকণ্ঠের গান হাসিনা, জমিলা ও আরও কয়েকটি নির্লজ্জ যুবতীর কণ্ঠ নিঃসৃত। সুফিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না, সায়ফুনকে লক্ষ্য করিয়াই এই গান গাওয়া হইতেছে, নিশ্চয়ই এই উৎসবের মূলে রহিয়াছে শিরিনা! মাগী বড় কমিনা। বয়স হইলে কি হইবে, স্বভাব যাইবে কোথায়! ভাগ্যিস বেচারী সায়ফুন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

সুফিয়া আর একবার সায়ফুনের মুখমণ্ডল দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। তাহার জন্য বড় দুঃখই হইল! কে জানে আর তিন মাস পরে কি হইবে!

বেদুঈন যুবতী শয্যাগ্রহণ করিল বটে, কিন্তু ঘুম আসে কই! শয্যায় শুধুই সে ছটফট করিয়া মরে। গানের আসর হইতে তখনো তাহার কানে ভাসিয়া আসে ক্ষীণ গানের সুর আর সুরাপানের হৈ-হুল্লোড়। সামান্য বিরতির পর আবার নূতন করিয়া শুরু হইল গান। এইবার পুরুষকণ্ঠের দ্বৈত-সঙ্গীত। স্পষ্টই শোনা যায় গীতিকার গানের সুরে বাদ্যের তালে তালে কোন এক প্রেমিককে জিজ্ঞাসা

করিতেছে–কি লাভে, কিসের লোভে সে আপন গোত্র ছাড়িয়া দুশমন কুলের এক বিদেশিনী যুবতীর প্রেমে মজিয়াছে।

প্রেমিক যুবক উত্তর দিতেছে গানে গানে–প্রেমানলে যে প্রাণ জ্বলে–পুড়ে ছাই, তা'কি কোন দেশ–বিদেশ বুঝে, না দোস্ত–দুশমন জানে? তারপর শুরু করিল প্রেয়সীর রূপ বর্ণনা অশ্লীল ছন্দোবদ্ধ গীতিকায়।

সুফিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না প্রেমিক–পুরুষের কণ্ঠস্বরটি আবিদের।

গানের অপ্রিয় অশ্রাব্য সুর তাহার কানে যেন ছুঁচের ন্যায় ফূটিতে লাগিল। কর্ণকুহরে সে–গীতিধ্বনির প্রবেশ ব্যাহত করিতে বিছানার মোটা কাঁথাটা সে সর্বাঙ্গে জড়াইয়া মাথা মুড়িয়া শুইয়াছে। গরম বড় অসহ্য। তথাপি আপাদমস্তক ঢাকিয়া জোর করিয়াই বাহিরের কোলাহল সে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

আটত্রিশ

হারিস দীর্ঘ তিনমাস কাল খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাহার উদ্ধারকর্ত্রীর কোন সন্ধান করিতে পারিল না। পদব্রজে সে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, চেনা-অচেনা কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, গোপনে কত গৃহে অনুসন্ধান করিয়াছে; কিন্তু কোন কিছুই এত্তেলা পায় নাই। অবশেষে নিদারুণ নৈরাশ্যে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। এদিকে গৃহে না ফিরিলেও নয়, অনেক দিনই বাড়ী-ছাড়া; মাঝে মাত্র দুই দিবস বাড়ীতে থাকিয়া ভগিনীকে যে সামান্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আসিয়াছিল, তাহাও হয়তো এতদিনে ফুরাইয়া আসিয়াছে। সাত-পাঁচ ভাবিয়া পরদিনই প্রত্যূষে সে গ্রামের পথে রওয়ানা হইল।

অপরাহ্নে হারিস নিজ গ্রামের সন্নিকটে ঈসের জঙ্গলের প্রান্তদেশে পৌছিয়া ইচ্ছা করিল, একবার বনমধ্যে সেই প্রাচীন মন্দিরে পূজা করিয়া যাইবে। সেই স্থান তাহার নিকট যে এক পরম তীর্থ। কেননা, সেইখানে সে বন্দী ছিল, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গণিতে গণিতে আবার সেইখানেই মুক্তি পাইয়াছিল। তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সুখ-দুঃখের স্মৃতি সেই স্থানেই বিজড়িত। হারিস শৈশবকাল হইতেই শুনিয়া আসিয়াছে, মন্দিরে মানত করিয়া উপাসনা করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তাই সে ভাবিল, আজ সেখানে প্রার্থনা করিয়া সেই বীরাঙ্গনার সন্ধান পাইবার জন্য দেবতার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিবে। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই মন্দির আর জঙ্গল ছাড়িয়া প্রান্তরে পৌছিতে হইবে, নতুবা নিশাগমে বন্য পশু ও দস্যু-তস্করের ভয় আছে। আর দেরি করা চলে না। যষ্টির অগ্রভাগে বাঁধা কাপড়ের পুঁটলি ও দফ্‌খানি ডান কাঁধ হইতে বাম কাঁধে পাল্টাইয়া আরও দ্রুত পদক্ষেপে সে বনাভিমুখে ছুটিল।

হারিস দফ বাজাইয়া ভাল গান গাহিতে পারে। প্রাচীন ইরান, তুরান ও আরবের বাদশাহ্‌দের কীর্তি-কাহিনী, যুদ্ধবিগ্রহের ছবি তাহার সুরের মূর্ছনায়, বাদ্যের ঝঙ্কারে, শ্রোতৃমণ্ডলী বিমুগ্ধ চিত্তে যে মূর্ত হইয়া উঠে। এই বাদ্যযন্ত্রখানি তাহার বহু দিনের বন্ধু-কত সুখ-দুঃখের সাথী!

মন্দির আর বেশী দূরে নয়। ঐ ত বৃক্ষলতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় প্রস্তর নির্মিত ভগ্ন মন্দির-গৃহের বহু পুরাতন জরাজীর্ণ প্রাচীরগুলো অতীতের সাক্ষ্য বহন করিয়া চারিদিকের লতাপাতার নিবিড় আলিঙ্গনে দণ্ডায়মান। বাজপাখী যেমন অসহায় শিকারের দেহ পদতলে নখরবিদ্ধ করিয়া ছিন্নভিন্ন করে, সেইরূপ মন্দিরের ভগ্ন ছাদ ও প্রাচীরের উপর কয়েকটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ শিকড় গাড়িয়া তাহার কঠিন প্রস্তর-দেহ বিদীর্ণ করিয়াছে। সেই সকল ফাটল পথে বন্য লতার অগ্রভাগ বাহির হইয়া মৃদু অনিল-হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। মনে হয়, এই ধ্বংসলীলায় বিজয়-কেতন সগর্বে উড়াইয়া ইহারা মাথা নাড়িয়া নাচিতেছে। বুঝা যায়, অতীতে মন্দিরের চারিদিকে বসতি ছিল; আশপাশে জঙ্গলের বুকে দুইচারিটা বিধ্বস্ত পাকা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও সেই প্রাচীন স্মৃতি বহন করে। কিন্তু এখন আর মনুষ্য-বসতি কোথাও নাই। পুরাতন পথঘাট, আর ভাঙ্গা বাড়ীগুলো ছোটখাট বহু ঝোপ—জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে উঠিয়া হারিস দেখিতে পাইল, নানাবিধ তৈজসপত্র ও পণ্যদ্রব্য বোঝাই করা কয়েকটি উষ্ট্র বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান। নিকটে আরও দুইটি উষ্ট্রপৃষ্ঠে কয়েকজন নারী ও বালক-বালিকা উপবিষ্ট। মন্দিরাভ্যন্তরে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রবণ করিয়া হারিস বড় ভয় পাইল। ভাবিল, নিশ্চয়ই ইহারা দস্যু, নতুবা এই জঙ্গলে পণ্য দ্রব্যসহ বণিকদল কোথা হইতে আসিবে। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের হয়তো তাহারা বন্দী করিয়া আনিয়াছে। হারিস দুই-এক পা পিছাইতে লাগিল। এমন সময় তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, কে যেন মন্দিরে প্রার্থনা করিতেছে, "হে ইহ-পরকাল অধিপতি! আমরা মূঢ়, কিভাবে তোমার স্তুতিবাদ গাহিব জানি না। হে বিচারদিনের মালিক! পুঞ্জীভূত পাপভারে আমরা যে জর্জরিত, তুমি আমাদের ক্ষমা করো প্রভো! হে দয়াময় প্রতিপালক! তুমি আমাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর, ন্যায়পথে চালিত কর!" সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল-'আমীন্ আমীন্।'

মন্দিরে কাহারা প্রার্থনা করিতেছে দেখিবার জন্য হারিস উৎসুক হইয়া ভাবিল-কি আশ্চর্য! দস্যুরা ত কখনও প্রার্থনা করিতে আসে না। নিশীথে হিংস্র পশুর আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্যই শুধু ইহারা এই মন্দিরে আশ্রয় নেয়; সারারাত্রি এই স্থানে মদ্য পান করিয়া গান-বাজনায় কাটায়। তবে কে উহারা! দুই-এক পা করিয়া সে মন্দিরের ভগ্ন প্রাচীরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে

লাগিল। দেওয়ালের ফাঁকে উঁকি মারিয়া দেখে, ভিতরে এক সারিতে আট-দশজন পুরুষ এবং তাহাদের সম্মুখে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি গভীর উপাসনায় নিমগ্ন, সকলেই ভাবাবেশে তন্ময়; কাহারও কাহারও নয়ন ঝরিয়া অশ্রুফোঁটা গড়াইয়া পড়িতেছে। উপাসনার এমন পবিত্র রূপ জীবনে আর কখনও সে দেখে নাই। বিস্ময়াবিষ্ট হারিস একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। উপাসকদের মুখাকৃতি ও বেশ-ভূষা দেখিয়া তাহার মনে হইল, পূজারীরা আরবের ভদ্র বংশ-সম্ভূত। কিন্তু কোথা হইতে আসিয়া এই জীর্ণ মন্দিরে ইহারা আশ্রয় লইয়াছে ভাবিয়া কিছুই সে স্থির করিতে পারিল না।

মন্দিরে কোন দেব-দেবীর মূর্তি ছিল না। আবহমানকাল এখানকার উপাসক দল মন্দিরাভ্যন্তরে রক্ষিত কতকগুলো প্রস্তরখণ্ডকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, হারিসও অনেকবার পূজা করিয়াছে। কিন্তু আজ সে ভাবিয়া পায় না-এ নবাগত পূজারীর দল পাথরগুলোকে এক কোণে সরাইয়া রাখিয়া কোন অদৃশ্য দেবতার উপাসনায় নিমগ্ন। প্রার্থনার ভাষা বড় মর্মস্পর্শী, বড় করুণ, বিশ্বস্রষ্টার দরবারে সকলের মনপ্রাণ যেন লুটাইয়া পড়িয়াছে, ঐহিক সত্তাও যেন বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই অকৃত্রিম আকুলি-ব্যাকুলি ও নিরাড়ম্বর প্রার্থনা তাহার অন্তর বিমুগ্ধ করিল। বড় ইচ্ছা হইল, সে নিজেও একবার উপাসকদের সুরে সুর মিলাইয়া বিশ্বপ্রভুর দরবারে আশীর্বাদ-ভিক্ষা মাগিয়া লয়। পুটলি বাঁধা লাঠি ও দফখানি স্কন্ধদেশ হইতে নামাইয়া মন্দিরের এক কোণে রাখিয়া, হারিসও সকলের পশ্চাতে পৃথক কাতারে আরাধনায় দণ্ডায়মান হইল।

প্রার্থনায় এমন অপূর্ব শান্তি, এমন অনাবিল আনন্দ, জীবনে আর কখনও সে পায় নাই। সেও সকলের সঙ্গে নিবেদন করিল, "হে দীন-দুনিয়ার মালিক! রাব্বেল আলামীন! আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত কর, ভ্রান্ত পথ হতে আমাদের দূরে রাখ। তোমার সৃষ্টি এই জগৎ সংসার কত মনোহর! প্রতিটি জীব তোমারই অনুগ্রহে লালিত-পালিত। নিশ্চয়ই তুমি মহান! যারা অবিশ্বাসী, তারা ভ্রান্ত। হে দয়াল! হে মহান! আমাদের সর্বসন্তাপ দূর কর, অন্তরের জ্বালা নিবারণ কর; পূণ্যালোকে আমাদের অন্তর উদ্ভাসিত কর। আমীন্ আমীন্!"

প্রার্থনার শেষে উপাসক দল মন্দির হইতে বাহির হইবার পথে এক অপরিচিত ব্যক্তিকে তাহাদের পশ্চাতে উপবিষ্ট দেখিয়া বড় আশ্চর্যান্বিত হইল।

দলপতি হারিসের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ভাই এখানে? কোথা হতে এলে? তুমিও কি মুসাফির?"

হারিস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল, "মুসাফির বৈ কি; বিশ্বময় সকলেই ত মুসাফির, আমি আর কোন্ ছার!"

দলপতির ঔৎসুক্য বাড়িয়া উঠিল। মন্দিরের বাহিরে এক প্রস্তরখণ্ডে হারিসকে পার্শ্বে বসাইয়া সে বলিল, "বড় মুল্যবান কথা বলেছ ভাই; মনে লেগেছে। যাবে কোথায়?"

হারিস। এতদিন তো দেশে দেশেই ঘুরে বেড়িয়েছি। এইবার বাড়ী ফিরছি। এই নিকটেই আছে সামান্য একটা আস্তানা।

দলপতি। একাকীই বেরিয়েছিলে দেখছি দেশ-ভ্রমণে? বাহাদুর বটে!

হারিস হাসিয়া বলিল, "না না, একা কেন? এই যে আমার সঙ্গী!" এই বলিয়া তাহার দফ্‌খানি দেখাইয়া দিল!

দলপতি হাসিয়া বলিল, "ওহ্, তুমি গায়ক! গান গাওয়াই বুঝি পেশা? তা' এই জঙ্গলে কেন? এখানে তো লোকালয় নেই!"

হারিস। এখানে এসেছিলাম দেবতার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে। এই স্থানে একদিন মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম। ঐ সম্মুখে যে গাছটি দেখা যায়, তারই তলায় এ জীবন ফিরে পেয়েছিলাম। যিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁরই সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরে এই সবে বাড়ী ফিরছি। কিন্তু আপনাদের তো এ তল্লাটে আর কখনো চোখে পড়েনি! এলেন কোথা হতে? এই মন্দিরে এমনভাবে দেবতাদের দূরে ঠেলে আর কাউকে তো কোনকালে পূজা করতেও দেখি নি?

দলপতি। পাথরগুলোর পূজা করে কোন লাভ আছে বলতে পার? এদের কি কোন চেতনা আছে? এই যে এদের এক কোণে ঠেলে রেখেছি, কই, কেউ তো কিছু বললো না। যিনি এই পাথরগুলো সৃষ্টি করেছেন, আমাদের পয়দা করেছেন, সমস্ত জীবজগৎ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সৃজন করেছেন, আমরা সেই মহান্ আল্লাহ্‌র উপাসনা করেছি। শুননি, মক্‌কায় সেই আখেরী নবী, সেই রহমাতুল্লিল আ'লামীন আবির্ভূত হয়েছেন? তিনিই তো আমাদের আল্লাহ্‌র বাণী শুনিয়েছেন, সত্যের সন্ধান দিয়েছেন!

হারিস। শুনেছি–তিনি মহাপুরুষ! তাঁর দর্শনলাভ এ পাপীর ভাগ্যে ঘটবে কিনা জানি নে। আপনাদের মুখে তাঁর উপদেশ–বাণী শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। যাবেন কোথায়?

দলপতি। আমি এক আওরতের সন্ধানে এই জঙ্গলে ঘুরছি, আরবের ঘরে ঘরে তাকে কত যে খুঁজেছি। অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে এই কয়জন মুসলমানকে দেশবাসীর নির্যাতন হতে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। হারিস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "কি বললেন? এক আওরতকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন? কেমন তিনি?"

দলপতি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞসা করিল, "কেন ভাই? দেখেছ নাকি কাউকে? কোথায় দেখেছ বল!"

হারিস উত্তর করিল, "যিনি এই স্থানে আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, তাঁর কথাই ভাবছি–নারী নয় যেন স্বর্গের দেবী। জানি নে এইখানে কোথা হতে তিনি এসেছিলেন অশ্বারোহণে রণ–রঙ্গিনীর বেশে–হাতে ছিল নাঙ্গা তলোয়ার, মুখে আল্লাহ্‌র নাম।"

দলপতি বিস্ময়ভরা নয়নে হারিসের দিকে তাকাইল। ব্যস্তভাবে তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল, "কি বললে ভাই? নারী অশ্বারূঢ়া। হাতে নাঙ্গা তলোয়ার! মুখে আল্লাহ্‌র নাম! ইনিই ত তিনি। কোথায় গেছেন? দেখতেই বা কেমন?"

হারিস বলিল, "অন্ধকারে তাঁকে দেখতে পাইনি ভাল, কিন্তু তাঁর দয়ার্দ্রচিত্তের পরিচয় পেয়েছিলাম।" সে একে একে নিজের দুঃখের কথা ও সায়ফুনের কাহিনী যতটুকু জানিত বর্ণনা করিল।

দলপতির চোখে–মুখে ফুটিয়া উঠিল আশার আলো। খুশী হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় তাঁর গন্তব্যস্থল, কিছু শুনেছিলে কি?"

হারিস উত্তর করিল, "হাঁ, সমুদ্রোপকূলে যাবেন বলেছিলেন। আমার অবস্থা তো শুনলেন সবই। আম্মাকে হারিয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তাইতে সেই রাত্রে বেশীদূর তাঁর অনুসন্ধান করতে পারি নি। প্রভাতে সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক খুঁজেছিলাম, কিন্তু পাইনি। কুল ছেড়ে একখানি নৌকা তখন সমুদ্র–তরঙ্গে পাল তুলে উড়ে চলেছিল। হয়তো তিনি চলে গিয়েছিলেন সেই নৌকায়ই; কিন্তু মনে তো শান্তি পাইনে ভাই। এই তিন মাস কাল মিছেমিছি কত যে খুঁজেছি"।

দলপতির আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল সহসা আবার মলিন হইয়া উঠিল। হারিসকে বলিল, "ভাই গায়ক! তুমি যাঁর খোঁজ করছো, আমিও তাঁরই সন্ধানে ঘুরছি। সেই নারী সমুদ্রতীরে গিয়েছিলেন বললে না? কাল প্রভাতেই আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সমুদ্রতটে যাত্রা করবো। তটদেশে তল্লাশ করে করে একেবারে বন্দরে গিয়ে পৌঁছবো। তারপর লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে হাবশী রাজ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজবো। তুমি দক্ষিণ দিকে কিছুদূর দরিয়ার কিনারে কিনারে খুঁজে দেখো। ভাগ্যক্রমে যদি সন্ধান পাও, তবে বলো–রাহেল তাঁকে এদেশ–ওদেশ খূঁজে মরছে। আমি ফিরে এসে তোমার সন্ধান করবো। এখন উঠতে হয়, নতুবা অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পথ চলা যে দুষ্কর হবে।"

জঙ্গলে সন্ধ্যার কাল ছায়া ঘনায়মান। সূর্য তখনও ডুবেনি; কিন্তু ঘন–সন্নিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীর পত্রাবরণ ভেদ করিয়া অস্তায়মান রবির শেষ রশ্মি এত দূরে পৌঁছিতে পারে কই। রাহেল উষ্ট্রারোহী মোহাজেরগণসহ ধীরে ধীরে পুনরায় বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। হারিস কালবিলম্ব না করিয়া লাঠির অগ্রভাগে বাঁধা বস্ত্রের পুটুলী ও দফ্‌খানি কাঁধে তুলিয়া ভিন্নপথে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইল।

ঊনচল্লিশ

বেদুঈন-পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ সবেমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁবুর চর্মনির্মিত ছাউনিগুলি প্রভাত-রবির সোনালী আভায় কেমন চাকচিক্যময় দেখা যায়। যুবতীরা ঝরনায় যাইবার জন্য ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতে ব্যস্ত, বৃদ্ধারা পৌত্র-পৌত্রীদের ডাকিয়া লইয়া খোঁয়াড় হইতে দুম্বা ও মেষপালগুলো সবেমাত্র বাহির করিতে শুরু করিয়াছে; যুবকদের কেউ কেউ উঠি উঠি করিয়া আড়মোড়া ভাঙ্গে, কেউ বা উঠিয়া উটগুলোকে জঙ্গলের ধারে লতাপাতা খাইবার জন্য ধীরে ধীরে টানিয়া নিতেছে; এমন সময় হারিস বেদুঈন পল্লীতে প্রবেশ করিল। বহুদিন এই পথে সে চলাফেরা করিয়াছে, কিন্তু এইখানে বেদুঈন-পল্লী কখনও ত দেখে নাই! কোথা হইতে আসিয়া এই যাযাবর জাতি কখন এই পল্লী গড়িয়াছে হারিস কিছুই জানে না। কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার ত কিছুই নাই। আজ এই স্থান ইহারা জুড়িয়া বসিয়াছে, কালই হয়তো অন্যত্র চলিয়া যাইবে; শুধু ইহাদের বাস্তুভিটার তৃণবিহীন শূন্যভূমি মাঝে মাঝে পোড়ামাটির কলঙ্ক বহিয়া যাযাবরদের জীবনস্মৃতি কিছুদিন বুকে ধরিয়া রাখিবে। তাহাদের বাসস্থানের চারিদিকের পশুচারণ ভূমির ঘাসগুলো যখন শেষ হইয়া যায়, কিংবা লু-হাওয়া শুকাইয়া উঠে, পানীয় জলের অভাব যখন দুঃসহ হয়, বেদুঈনদল তখনই চঞ্চল হইয়া নূতন স্থানের সন্ধানে বাহির হয়, আবার কোথাও নূতন পল্লী গড়িয়া তুলে।

পল্লীতে প্রবেশ করিয়া হারিস খুঁজিতে খুঁজিতে সর্দার-কন্যার তাঁবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এক কিশোর বালক তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সুফিয়াকে ডাকিতে ছুটিল।

ডাক শুনিয়া সদ্যোত্থিতা সুফিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখে-তাঁবুর সম্মুখে এক অপরিচিত যুবক! তাহাকে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। সায়ফুন তখনও ঘুম হইতে উঠে নাই। সুফিয়া আগন্তুকের নিকটে

আসিয়া বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আমার খোঁজ করছ এই সাত–সকালে? কে তুমি?"

প্রশ্ন শুনিয়া হারিস প্রথমটায় ঘাবড়াইয়া গেল। সে জানিত, বেদুঈনরা অপমানিত বোধ করিলে বড় উগ্রমূর্তি ধারণ করে। থতমত খাইয়া সে বলিল, "এই নিকটে আমাদের পল্লী। ভগিনীর কাছে জেনেছি কিছুদিন পূর্বে আপনি ও অন্য একজন নারী এই পর্ণকুটীরে আমার সন্ধান করেছিলেন; আপনার সেই সঙ্গিনী এক নিশীথে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। শুনেছি তিনি নাকি আপনার আশ্রয়েই আছেন। একবার তাঁর দর্শনলাভ সম্ভব হলে নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করবো।"

"ওহ্! তুমি হারিস? এস আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া সুফিয়া তাহাকে তাঁবুর অদূরে এক বৃক্ষতলে লইয়া গিয়া খর্জুরপত্র–রচিত একখণ্ড চাটাইয়ে বসিতে দিল। তারপর নিজে আর একখানা আসনে উপবেশন করিয়া বলিল, "হারিস যার দয়ায় তুমি বেঁচে উঠেছিলে, তার কথাত ভুলনি দেখছি! আচ্ছা সেই হতভাগীর একটি উপকার করতে পার কি?"

হারিস উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "সে ভাগ্য কি আমার হবে আম্মা? আমি তো তাঁর কল্যাণে জীবন দিতেও প্রস্তুত!"

সুফিয়া খুশী হইয়া বলিল, "তবে শোন! রায়হান নামক এক কুরাইশ যুবক মক্কার নিকটে আল–জবিলে বাস করতেন। এই মেয়েটি তাঁরই এক পরম আত্মীয়। রায়হান বনি–তামীম বংশের এক বীর্যবান পুরুষ। যুবকের প্রশস্ত বক্ষ, দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ বাহুযুগল সহজেই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেখানে গিয়ে তাঁর খোঁজ করতে হবে। শোন কাহিনী!" এই বলিয়া সুফিয়া রায়হানের কথা যতটা জানিত ধীরে ধীরে বলিল।

হারিস সব কথা শুনিয়া ওয়াদা করিল, কালই সে রায়হানের সন্ধানে যাত্রা করিবে। সুফিয়া তাঁবুর ভিতর হইতে কতকগুলো রৌপ্য মুদ্রা আনিয়া বলিল, "এই সামান্য অর্থ গ্রহণ কর। কিছুটা তোমার পাথেয়, বাকীটা ভগিনীকে দিয়ে যেও

তার খোরপোষ বাবদ! সাবধান! আমার আশ্রিতা সেই মেয়েটির নিকটে কোন কিছু যেন প্রকাশ করো না।"

হারিস অর্থ লইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "আম্মা? অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। পদব্রজেই ঘুরে ঘুরে রায়হানের সন্ধান করবো, আমার ভগিনীর ভরণপোষণ চলে যাবে কোন রকম।"

কিন্তু সুফিয়া তাহাকে এত সহজে ছাড়িল না। বলিল, "হেঁটে হেঁটে সময় লাগবে অনেক। তুমি বরং একটি ঘোটক সংগ্রহ কর। তা' ছাড়া ভগিনীর খোরপোষের একটা ভাল ব্যবস্থা না করে বের হলে বড় অন্যায় হবে; তোমার মনেও অশান্তি বাসা বাঁধবে। দেখো ও মেয়েটিকে কোন কিছু যেন বলো না। ডেকে দিচ্ছি তাকে!" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুফিয়ার পীড়াপীড়িতে মুদ্রাগুলি তাহাকে লইতেই হইল। বিস্ময়াবিষ্ট হারিস ভাবিয়া পাইল না, সেই আশ্রিতা মেয়েটির জন্য এই বেদুঈন–কন্যার কেন এত দরদ। আশ্চর্য মানুষ এরা বটে। পরের টাকা লুটপাট করিয়া খায়, অথচ পরের জন্য অকাতরে টাকা ছড়াইতেও কম নহে!—ইত্যাদি নানা কথাই তাহার মনে উঠিতেছে, এমন সময় দেখিল, তাঁবুর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দীর্ঘাকৃতি এক শীর্ণা যুবতী বাহিরে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অরুণ–রাগ–রঞ্জিত বদন কমলে স্বর্গীয় সুষমা যেন পরিস্ফুট। সুফিয়া তাহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া হারিসকে ইঙ্গিতে ডাকিল।

হারিসের বুঝিতে বাকী রহিল না, ইনিই সেই নারী–তাহার প্রাণদাত্রী। পুলকে তাহার অন্তর নাচিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সায়ফুনকে সে সালাম করিয়া বলিল, "আম্মা! আমি বড় হতভাগ্য, সেই রাত্রে আপনি একাকিনী কোথায় চলে গেলেন কিছুই জানতে পারিনি। এত নিকটে আছেন, অথচ কত জায়গায় যে খুঁজে মরেছি। গত সন্ধ্যায় আমার ভগিনীর নিকটে আপনার সংবাদ শুনে কি যে আনন্দ হয়েছিল, তা' প্রকাশ করতে পারি নে। কিন্তু আপনি না সেই সন্ধ্যায় বলেছিলেন সমুদ্রতটে যাবেন? এখানে কেন এলেন আম্মা?"

সায়ফুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল, "সে অনেক কথা, ভাগ্যবিড়ম্বনায় আসতে হয়েছিল এখানে, সমুদ্রে যাওয়া আর ঘটেনি।"

সুফিয়া তখন তাঁবুর দুয়ারে একটি চাটাইয়ে হারিসকে বসিতে দিয়া পল্লীর মেয়েদের সঙ্গে ঝরনায় চলিয়াছে। যাইবার কালে একবার শুধু হারিসের দিকে সে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া গেল। হারিস অর্থটা বুঝিল।

হারিস পুনরায় বলিল, "আম্মা! এই অসভ্য বেদুঈন-পল্লীতে কেন যে এসে আশ্রয় নিয়েছেন বুঝি নে। কাজ নেই এখানে থেকে, নিজ বাড়িতে কিংবা যেখানে যেতে চান বলুন, নিয়ে যাব হাসিমুখে।"

সায়ফুন তাঁবুর দ্বারদেশে বিলম্বিত পর্দাটি নাড়িতে নাড়িতে ধীরে ধীরে বলিল, "না, যাওয়া আমার হবে না; যে মেয়েটির আশ্রয়ে আছি, এক্ষণে সে-ই আমার মাতা, আমার ভগিনী, আমার আপন জন। আমার আত্মীয়-স্বজন তার প্রতি বড় নির্মম ব্যবহার করেছে। আমাকে এখানে থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

হারিস নিবেদন করিল, "আম্মা। যদি আপনার এতটুকু উপকার করার সৌভাগ্য হতো, তবে অন্তরে কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম।"

সায়ফুন শান্তভাবে বলিল, 'কিন্তু আমার যাওয়ার যে উপায় নেই হারিস, যাওয়ার কোন ঠাঁইও নেই। আচ্ছা যদি উপকারই করতে চাও, তবে একটা কাজ করতে পার?"

'কি কাজ আম্মা?"

"এই বেদুঈন-পল্লীর হাবিল নামক এক যুবককে আমার আশ্রয়দাত্রী মেয়েটি বড় ভালবাসতো। একদিন শোহেলী-বংশের লোকেরা পল্লী আক্রমণ করে সেই হাবিলকে নিয়ে যায় বন্দী করে। শুনেছি, তাকে নাকি তারা বিক্রি করে ফেলেছে। মক্কা নগরীর পশ্চিম উপকণ্ঠে আল-জবিল নামে গ্রাম আছে, শোহেলিগণ সেইখানেই বাস করে। তুমি কি একবার যেতে পারবে সেই গ্রামে?"

হারিস উৎফুল্ল হইয়া উত্তর করিল, "কেন পারবো না আম্মা? গায়কের বেশে যেতে পারবো অনায়াসেই। কি করতে হবে বলুন?"

সায়ফুন বলিল, "সেই গ্রামে গিয়ে হাবিলের সন্ধান লও। কুরাইশগণ কোথায় তাকে বিক্রি করেছে খুঁজে বের কর, মুক্তির চেষ্টা কর। আমি নিঃস্ব, অর্থ-সম্পদ কিছুই নেই; অথচ মুক্তিপণ না দিয়ে তুমি তাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। আমার এই স্বর্ণ-কঙ্কন দুটি গ্রহণ কর।" এই বলিয়া সে কাঁকন দুইটি হাত হইতে খুলিতে লাগিল।

হারিস বাধা দিয়া বলিল, "ও সব থাক আম্মা, বেচারার সন্ধান পেলে মুক্তির চেষ্টা অবশ্যই করবো।"

সায়ফুন বলিল, "এতে অনর্থক সময় নষ্ট হবে মাত্র; খুঁজলে তাকে নিশ্চয়ই পাবে। ও দুটি বিক্রি করে তার মুক্তির ব্যবস্থা কর। আমার এই উপকারটুকু কর হারিস। আজীবন তোমার নিকট ঋণী হয়ে থাকবো।

হারিস দুঃখিনীর একমাত্র সম্বল কঙ্কনযুগল গ্রহণ করিতে কিছুতেই হাত বাড়াইতে পারিল না।কিন্তু সায়ফুন বারংবার অনুরোধ করিয়া সে দুইটি তাহার হাতে তুলিয়া দিল। কাঁকনজোড়া তাহার পরলোকগতা জননীর মৃত্যুকালীন দান। আজ মাতার শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু হাতছাড়া করিতে তাহার প্রাণে বড় বাজিল। কিন্তু উপায় কি। অর্থের যে বড় প্রয়োজন। রায়হান-প্রদত্ত অঙ্গুরিটি ছাড়া স্বর্ণাভরণ ত আর কিছুই নাই; কিন্তু প্রাণ থাকিতে সেইটি সে হাতছাড়া করিতে পারিবে না। হারিসকে না পাঠাইয়াও উপায় নাই; কেননা বেদুঈনদের কেউ আল-জবিলে গিয়া হাবিলের সন্ধান করিতে সাহস পাইবে না। পুরুষানুক্রমেই যে চলিয়া আসিতেছে ইহাদেরবিবাদ-বিসংবাদ।

সায়ফুন কাঁকন দুইটি হারিসের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "সাবধান, আমার আশ্রয়দাত্রী সেই মেয়েটিকে কোন কথা যেন বলো না। আর দেখো, খুব সাবধানে কাজ করতে হবে কিন্তু, নতুবা সমূহ বিপদের আশঙ্কা। আমার গ্রামবাসীদের কাউকেও যেন আমার খবর কিছু বলো না। কেউ জানতে পারলে আমার আর রক্ষে থাকবে না।" সায়ফুনের ভয়ার্ত কণ্ঠে অন্তরের বেদনা যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

সহসা গত সন্ধ্যার ঘটনা হারিসের মনে পড়িল। রাহেল নামক এক মক্কাবাসী যুবক যে একদল অনুচরসহ সায়ফুনের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে- এই সংবাদ সে সায়ফুনকে জানাইতে ভুলিল না।

রাহেলের নাম শুনিয়া সায়ফুনের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভয়ে, বিস্ময়ে ও ঘৃণায় তাহার মুখমণ্ডল তখন ফ্যাকাশে। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "রাহেল এসেছে! সে যে আমার পরম শত্রু; একবার খোঁজ পেলে আর রক্ষা নেই। হারিস, তুমি যেন তাকে আমার সন্ধান কিছুতেই বলো না। তা'হলে আর বাঁচবো না। দুরাত্মা এত দূরেও আমার অনুসরণ করেছে। কি জঘন্য প্রতিহিংসা! কী দুঃসাহস! না জানি হতভাগী কুলছুমের ভাগ্যে কি ঘটেছে। হারিস। তোমার উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করে-একথা যেন ভুলো না।"

হারিস তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "আম্মা! মিছে কেন ভয় পান? নিশ্চয় জানবেন, যে কার্যে আপনার অকল্যাণ ঘটবে, এমন কাজ হারিস কখনও করবে না। দোয়া করুন, সংকল্প সাধনে যেন বিফল না হই।'

সায়ফুন উঠিয়া তাঁবুর সম্মুখে পায়চারি করিতে করিতে দৃঢ়স্বরে বলিল, "পাপিষ্ঠ রাহেল আমার পিছু পিছু ধাওয়া করেছে এতদূর। বেশ আসুক এখানে! শত রাহেলকেও আর ভয় করিনে। একবার কুলছুমকে নিয়ে তাকে নাকাল করেছিলাম, এইবার সুফিয়াকে নিয়ে লম্পটের বিয়ের সাধ চিরতরে মেটাবো। তুমি যাও হারিস, যে প্রকারেই পার হাবিলকে উদ্ধার করে নিয়ে এস। আমি রাহেলের প্রতীক্ষায় এই তাঁবুতে থাকবো। আসুক রাহেল, আসুক আমার হৃদয়হীন পিতা, মমতাহীন ভ্রাতা, আসুক অবিশ্বাসী আত্মীয়-স্বজন—কাউকে আর ভয় করি নে। যে কোন বিপদে, যে কোন দুর্ভাগ্যের নিকটে আমি আর মাথা নত করবো না। পাপিষ্ঠ রাহেল আমার জীবন বিফল করে দিয়েছে, তবুও তার সাধ মিটলো না। এই দুর্গম জঙ্গল ভেদ করে এখানেও সে খুঁজতে এসেছে? বেশ, কাল থেকে আমিও সুফিয়াকে নিয়ে তার সন্ধান করে বেড়াবো; খুঁজে পেলে আমার যত সাধ, যত আকাঙ্খা সে মাটি করেছে, তার প্রতিশোধ হাতে হাতে নেব।" ক্রোধে

যুবতী যেন রাক্ষসী-মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার বিস্ফারিত নয়নযুগল পলকবিহীন, মুখমণ্ডল রক্তাভ।

হারিস সায়ফুনকে উত্তেজিত দেখিয়া আর এক মুহূর্তও সেখানে তিষ্ঠিল না; বুঝিতে পারিল, রাহেলের সংবাদ দিয়া নিদ্রিতা সিংহীকে সে জাগাইয়া দিয়াছে। তাহার বড় দুঃখ হইল, রাহেল এত কথা কিছুই ত বলে নাই। মন্দিরে কথোপকথনকালে তাহাকে বড় ভালমানুষ বলিয়াই সে মনে করিয়াছিল, কিন্তু খবীসের পেটে পেটে এত শয়তানী!

দুই রমণীর দুই কার্যভার গ্রহণ করিয়া হারিস বেদুঈন-পল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ভাবিল-রায়হানের খোঁজে তাঁহার জন্মভূমি আল-জবিলে গেলে হয়তো এই নারীর জীবন রহস্যও উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবে। কালবিলম্ব না করিয়া সে দিকেই সে যাত্রা করিতে মনস্থ করিল।

বেদুঈন-পল্লী পিছনে ফেলিয়া হারিস স্বগ্রামের কাছাকাছি আসিয়া দেখে-এক উষ্ট্রপৃষ্ঠে তিনজন আরোহী টিলার উপর হইতে নামিয়া তাহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। কে উহারা চিনিতে না পারিয়া সেইদিকে সে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল। আরোহিগণ আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে উষ্ট্রচালককে রাহেলের মতই যেন মনে হইল। হাঁ, রাহেলই ত বটে! গত সন্ধ্যার কথোপকথন তাহার মনে পড়িল। বুঝিল, হয়তো তাহার উদ্ধারকর্ত্রীর খোঁজেই সে বাহির হইয়াছে। ক্ষণিকের পরিচিত লোকটির প্রতি ঘৃণায় ও ক্রোধে হারিসের অন্তর ভরিয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল, আগাইয়া গিয়া এই দুরাচার উচ্ছৃঙ্খল যুবকটিকে হুঁশিয়ার করিয়া দেয়-সে যেন সেই দেবী-তুল্যা রমণীর অনিষ্টচিন্তা আর না করে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সে সংযত করিল। ভাবিল, ইহাতে সুফল না হইয়া বরং কুফলই ফলিতে পারে। মিছামিছি অনর্থের সৃষ্টি হইবে মাত্র। তাড়াতাড়ি বড় রাস্তা হইতে সরিয়া আসিয়া একটা ঝোপের ভিতর হইতে রাহেলের গতিবিধি সে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

আড়ালে বসিয়া হারিস দেখিতে পাইল, উষ্ট্রপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাহেল ও তাহার সঙ্গিগণ বেদুঈন-পল্লী পশ্চাতে ফেলিয়া বিপরীত দিকে সমুদ্রতটে যাইবার

উদ্দেশ্যে যেন ধীরে ধীরে সম্মুখে এক টিলার উপর আরোহণ করিতেছে। ওপারেই সমুদ্রে যাইবার পথ। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, সেই নারীর সন্ধান তাহা হইলে রাহেল পাইবে না। ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার সে পল্লীর পথে নামিয়া আসিল।

পথ চলিতে চলিতে হারিস ভাবে—কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে রাহেল যদি বেদুঈন-পল্লীতে আসিয়া সায়ফুনকে ছিনাইয়া নেয়, তবে উপায়! পরক্ষণেই খেয়াল হইল—না না, বেদুঈন-পল্লী হইতে কাড়িয়া নেওয়া এত সহজ নয়! আশ্রিতার অকল্যাণ বেদুঈনগণ কখনও বরদাশত করিবে না। কিন্তু এই লোকটি কি মানুষ, না পশু। যত রকম দুশ্চিন্তা হারিসের অন্তরে জুড়িয়া বসিল।

ক্রমে নিজ গ্রামের কাছাকাছি সে আসিয়া পৌছিল। উপরে প্রখর সূর্য সেই সকালেই যেন আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। দ্বিপ্রহরে অগ্নিবৎ বায়ুপ্রবাহ জোরে বহিতে শুরু করিলে পথ চলাই দুষ্কর হইবে। হারিস পশ্চাতে রাহেলের দিকে একবার ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইয়া জোরে হাঁটিতে লাগিল।

চল্লিশ

হাবশী দেশের দক্ষিণ সীমান্তে বিরাট কাল্লিনী পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওধারে চারিদিকে বনানী–বেষ্টিত টিহিন মালভূমি ও পার্বত্য প্রদেশ উগাণ্ডির রাজ্য। রাজ্যের উত্তরাংশে তাড়াইন পাহাড়ের উপরিভাগে উগাণ্ডির রাজধানী। অর্ধোলঙ্গ কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতি এই রাজ্যের অধিবাসী। ইহারা মনুষ্যাকৃতি হইলেও প্রকৃতিতে হিংস্র পশু–নরপিশাচ। ইহাদের কোন কোন দল নরখাদক বলিয়াও জনশ্রুতি আছে। উগাণ্ডি এই বর্বর নরপিশাচদের অধিপতি।

তাড়াইনের অধোদেশ অরণ্যবেষ্টিত। সেই উচ্চ পাহাড়ের উপরে কাষ্ঠনির্মিত এক বিশাল গৃহই উগাণ্ডির রাজপ্রাসাদ। বৃহদাকার বৃক্ষকাণ্ডের স্তম্ভগুলির উপরে সুদীর্ঘ বৃক্ষশাখা সংযোজিত করিয়া, তদুপরি কাষ্ঠের ছাউনি দিয়া সেই প্রাসাদ নির্মিত। বিশালায়তন গৃহখানা বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। মধ্যস্থলে দরবার–কক্ষ। সে কক্ষের প্রাচীর গাত্র শ্বেত গজদন্তে, বিচিত্র পাখীর পালকে, নানাবিধ হিংস্র পশুর মস্তক–কঙ্কালে ও শুষ্ক চর্মে সজ্জিত। কক্ষতলে এখানে–ওখানে কয়েকটি বিকট–দর্শন দানবের দারুমূর্তি স্থাপিত। এক পার্শ্বে দেয়ালে কতকগুলি ঢাল, তলোয়ার, তীর–ধনুক ও তূণীর দোলায়মান। মেঝেতে অনেকগুলি সুতীক্ষ্ণ বর্শা আড়াআড়ি রক্ষিত। অদূরে রাজপ্রাসাদের বাহিরে কাষ্ঠনির্মিত আরো কয়েকটি বৃহদাকার বাটীতে রাজকীয় সেনানিবাস।

সেইদিন অপরাহ্নে কৃষ্ণকায় উগাণ্ডি দরবার–কক্ষে বিষণ্ন বদনে উপবিষ্ট। তাহার মস্তকে রঙ–বেরঙের পাখীর পালকের রাজমুকুট, গলদেশে ও বাহুতে গজদন্ত ও মণিমানিক্যের বিচিত্র ভূষণ; পরিধানে সামান্য কটিবাসের উপরে আজানুচুম্বিত পালকের ঘের। চিন্তামগ্ন নরপতির কদাকার মুখমণ্ডলে চিত্তচাঞ্চল্যের ছায়া যেন পরিস্ফুট। সম্মুখে আজ্ঞাবহ কয়েকটি দাসদাসী ও পল্লী–সর্দারগণ রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষায় সভয়ে শ্রদ্ধাবনত। দরবার–কক্ষে নিস্তব্ধতা বিরাজমান। অসভ্য

দাস-দাসী ও পাত্রমিত্র সকলেই যেন রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় বড় উদ্বিগ্ন। এমন সময় দৌবারিক রাজসমীপে আসিয়া হস্তদ্বয় সম্মুখে প্রসারণপূর্বক আভূমি প্রণত হইতেই অসভ্য-রাজ রোষপ্রদীপ্ত নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাইল।

দ্বারপাল ভয়ে ভয়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ! হাবশী রাজ্যের সেনাপতি পিয়েলোর এক সংবাদ-বাহক উপস্থিত। সে মহামান্য ভূপতির দর্শনাভিলাষী।"

রাজা এই সংবাদের প্রত্যাশায়ই যেন বসিয়াছিল। কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে সে আদেশ করিল, "হাযির কর দরবারে!"

অবিলম্বে খর্বাকৃতি এক কৃষ্ণকায় সংবাদবাহক রাজসকাশে আসিয়া যথারীতি প্রণত হইল। উগাণ্ডি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত 'করিতেই দূত সভাস্থলে উপস্থিত পাত্রমিত্র ও আজ্ঞাবহদের এক-একবার দেখিতে লাগিল। রাজা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পদপ্রান্তে স্থাপিত নাকারায় পদাঘাত করিবামাত্র দাসদাসী ও সর্দারগণ অবনতমস্তকে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া পশ্চাতে হাটিতে হাটিতে সভাস্থল ত্যাগ করিল।

দূত বক্ষস্থলে হস্তদ্বয় স্থাপনপূর্বক বিনম্র সুরে বলিল, "মহাবল মহারাজ! নজ্জাসীর সৈন্যবাহিনী রাজ্যসীমান্তে কাল্লিনী পাহাড়ের পাদদেশে সমাগত। অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্যদের হুঙ্কার-ধ্বনি পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চারদিক যেন প্রকম্পিত করছে। বিপুল বাহিনীর পদাঘাতে আকাশ-বাতাস ধূলি-বালিতে আচ্ছন্ন। নজ্জাসী সেনাপতি পরাবীন সেই বিরাট ফৌজের অধিনায়ক।"

"তারপর?"

"সেনাপতি পিয়েলো সঙ্কল্প করেছেন, আপনার বিজয়লাভে সাহায্য করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।"

"পিয়েলোর বিদ্রোহ কি প্রকাশ পায়নি?"

"না মহারাজ! আমি ছাড়া আর কেউ তা' জানে না। আজ সন্ধ্যাকালে তিনি শাম্পুনী পাহাড়ের গুহামধ্যে আপনার শক্তিমান সেনাপতি টরামপুকে যথাযথ

উপদেশ দিতে ইচ্ছুক। দয়া করে সে–সাক্ষাতের ব্যবস্থা যেন করেন, এই তাঁর নিবেদন।”

উগাণ্ডির পুরু ওষ্ঠযুগলে স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার আবলুসকাল মুখমন্ডলের ধবল দন্তপাটি অন্ধকার নৈশ–গগনে বিদ্যুতের ন্যায় চমকায়। অসভ্য–রাজ কাষ্ঠনির্মিত বিচিত্র আসনে অর্ধশরীর এলাইয়া দিয়া প্রসন্ন বদনে বলিল, “পিয়েলো ধূর্ত? তারপর?”

দূত নিবেদন করিল, “সেনাপতি পিয়েলো গভীর রাতে এই দরবারে উপস্থিত হয়ে মহারাজের নিকটে আনুগত্য নিবেদন করবেন।”

উগাণ্ডি বিকট হাস্যে মুখ–গহ্বর আকর্ণ বিস্তৃত করিয়া বলিল, “উত্তম! পিয়েলো আমার বিশস্ত বন্ধু। এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাকে দান করবো! দূত! বিজয় সংবাদ নিয়ে এলে তুমিও পুরস্কার পাবে। যাও, এক্ষণে বিশ্রাম কর গিয়ে।”

দৌবারিক অভিবাদনপূর্বক কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল। রাজা অর্ধশায়িত অবস্থায় আসনের বাম পার্শ্বে রক্ষিত কাংস্য ঘন্টায় মৃদু লঘুড়াঘাত করিতেই এক পরিচারিকা সম্মুখে আসিয়া প্রণত হইল।

রাজা গভীর বদনে আদেশ করিল, “সেনাপতি টরামপু!”

আজ্ঞাবাহিকা প্রস্থান করিতেই সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণ–দর্শন সেনাপতি দরবারে প্রবেশ করিয়া হস্তদ্বয় সম্মুখে প্রসারণপূর্বক অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। কটিতটের বিচিত্র পাখীর পালক, গলদেশের গজদন্ত–মাল্য সেনাপতির অঙ্গ–সৌষ্ঠব বর্ধন করিয়াছে; বসন–ভূষণের আর বালাই নাই।

অসভ্য–রাজ দূতমুখে যাহা শুনিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সেনাপতি। বলতে পার কোথায় কিভাবে আক্রমণ করে জয়মাল্য অর্জন করবে?”

সেনাপতি পুনরায় অভিবাদন করিয়া উত্তর করিল, “মহারাজ! ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র যেরূপ মেষপালে ঝাঁপিয়ে পড়ি, নির্বিচারে হত্যা করে, আমরাও সেরূপ নজ্জাসী–বাহিনীকে আক্রমণ করে ধ্বংস করবো।”

উগাণ্ডি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আসন হইতে তড়িদ্‌বেগে লাফাইয়া উঠিল। অস্বাভাবিক মুখভঙ্গী–সহকারে সে হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিল, "আহাম্মক! যেমনই তোমার স্থূল দেহ তেমনই স্থূল বুদ্ধি। শোন!" এই বলিয়া সেনাপতিকে নিকটে ডাকিয়া তাহার কানে কানে কি সব বলিয়া দিল।

সেনাপতি ভয়ে কাষ্ঠ–পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল দণ্ডায়মান। সহসা তাহার কোন বাক্যস্ফূরণ হইল না। উগাণ্ডি একখানা বর্শা উঠাইয়া পায়চারি করিতে করিতে ক্রোধভরে বলিল, "সাবধান সেনাপতি! শত্রু পক্ষের একটি প্রাণীও যেন পালাবার পথ না পায়। পরাবীনকে বন্দী করে আনবে, আমি স্বহস্তে তার শাস্তি বিধান করবো। বর্শাহস্তে শিকারীরা হিংস্র ব্যাঘ্রকে যেভাবে খুঁচিয়ে মারে, গর্বিত নজ্জাসী বাহিনীর প্রতিটি সৈন্যকে সেভাবে হত্যা করবে। পারবে সেনাপতি? শোন, জয়লাভ করে ফিরে এলে আশাতীত পুরস্কার পাবে। কিন্তু বিফলে শাস্তি কি জান?"

সেনাপতি শিহরিয়া উঠিল। উগাণ্ডি বর্শাখানি প্রহরীর হাতে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে পুনরায় পায়চারি করিতে করিতে বলিল, "সেনাপতি সাবধান! আমার সাধের তরী যেন ডুবে না যায়। হতাশার নির্মম আঘাতে যেন মুষড়ে না পড়ি। কাল নিশীথে কি স্বপ্ন দেখেছি জান?"

সেনাপতি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পুরু ওষ্ঠযুগল আরও স্ফীত করিয়া শুধু মাথা নাড়িতে লাগিল। উগাণ্ডি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত গণ্ডদেশে স্থাপনপূর্বক নিকটস্থ এক দারুমূর্তির মস্তকে ঠেস দিয়া বলিল, "দেখি ভূলোক ছেড়ে উর্ধ্বে উঠেছি; বহু উপরে এক স্বর্ণ–সিংহাসনে আমি সমাসীন; ভীষণাকায় দৈত্য–দানব বায়ু ভরে বহন করছে আমার সিংহাসন। বহুনিম্নে আমার পর্বতরাজ্য একখণ্ড সবুজ গালিচার ন্যায় চোখে পড়লো; সেনাপতি কত উর্ধ্বে উঠেছিলাম বলতে পারিনে। মনে হলো অসংখ্য চন্দ্র–সূর্য অগণিত গ্রহ–নক্ষত্র কিলবিল করছে যেন মাথার উপর। সে দৃশ্য মনে হলে এখনও প্রাণ নেচে ওঠে পুলকে। মর্ত্যলোক ছেড়ে আমি তখন দেবলোকে উঠেছি–চারিদিকে সুন্দরীদের মেলা। অসংখ্য অপ্সরা–তরুণী আমাকে ঘিরে নৃত্য করে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করছে

আমার সর্বাঙ্গ কুসুমস্তবকে আচ্ছন্ন। এমন সময় দেখি–অপ্সরারাণী নিজ হস্তে বরমাল্য নিয়ে আমার দিকেই যে এগিয়ে আসছে হাসিমুখে। ব্যস্ত হয়ে আসন ছেড়ে আলিঙ্গন করতে ছুটলাম অপ্সরা রাণীকে। হায়! হায়! কি হলো! কি হারালাম! নিশেষমধ্যে উজ্জ্বল দেবলোক ছেড়ে গড়িয়ে পড়লাম, নীচে–বহু নীচে। কাল্লিনীর শিখরদেশে যেন ছিটকে পড়লাম। সর্বাঙ্গ একেবারে ছিন্নভিন্ন! ভেঙে গেল সাধের স্বপ্ন। দেখে অবাক–শুয়ে আছি রাজপুরীতেই; কি জানি কেন শয্যা থেকে গড়িয়ে পড়ছিলাম গৃহতলে, সর্বাঙ্গ ঘর্মাপ্লুত। সেনাপতি! দেবলোক ছেড়ে, অনিন্দ্যসুন্দরী অপ্সরা–রাণীকে হারিয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলাম। জান, শেষে শান্তি পেয়েছি কিসে?"

সেনাপতি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিরুত্তর তাকাইয়া শুধু মাথা নাড়িতে লাগিল।

উগাণ্ডি কক্ষমধ্যে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতে করিতে বলিল, "প্রভাতে উঠেই ডাকলাম দৈবজ্ঞকে। রাজ–গণৎকার স্বপ্নের মর্মার্থ যা প্রকাশ করলো তা অপূর্ব! বড় আনন্দদায়ক। শুনবে সেই স্বপ্নার্থ?"

বিস্ময়াবিষ্ট সেনাপতি শুধু হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল বোকার মত। রাজ সেনাপতির স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপন করত একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, "জান, আমি হব রাজাধিরাজ–হাবশী দেশের সম্রাট! অচিরেই সেই রাজ্য জয় করবো। নজ্জাসীকে বন্দী করে শৃগালের ন্যায় হত্যা করবো। সেনাপতি! পারবে তুমি সে সংকল্প সাধন করতে? পারবে কি নজ্জাসী–রাজ্য ছারখার করতে? পারবে না রাজপুরীর রূপসীদের বন্দী করে আনতে? শুনেছি, নজ্জাসী–দুহিতা অপরূপ সুন্দরী। ঠিক যেন সেই অপ্সরা–রাণী। সেনাপতি এ কাজ তোমাকেই করতে হবে। রাজকুমারী শামিনীকে আমি চাই। সেনাপতি! পারবে না আমার এ আকাঙ্খা পূরণ করতে? সৈন্যবল আমার নগণ্য নয়, তদুপরি নজ্জাসী–সেনাপতি তোমাকে তার সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু সাবধান সেনাপতি! বিফলে কিন্তু শাস্তি পাবে কঠোর। তোমাকেও তা'হলে যেতে হবে কালঘরে! সেই কাল–ঘর যেখানে অসংখ্য নর–নারী তুমি স্বহস্তে নিক্ষেপ করে তামাশা দেখতে। বুভূক্ষু হিংস্র পশুর দল হতভাগ্যদের দেহ–পিঞ্জরগুলো যখন ছিন্নভিন্ন করে টানাটানি

কোড়াকাড়ি করে গ্রাস করতো, তুমি তখন আনন্দে হাততালি দিয়ে ধিঙ্গী নাচ নাচতে। মনে পড়ে? যাও বীর! অবিলম্বে। যুদ্ধের সব আয়োজন সেরে নজ্জাসী-বাহিনীর নিধন-যজ্ঞের ব্যবস্থা কর।"

সেনাপতি টরামপু রোমহর্ষণ কাল-ঘরের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! সেই রাজ্যের কাল-ঘর বড় ভয়ানক স্থান। অসংখ্য নরখাদক পশু সেখানে লৌহ-নির্মিত এক বিশাল গৃহে পরম যত্নে লালিত-পালিত। সেই গৃহে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের শেষ মুহূর্তের আশ্রয়স্থলে! ক্ষণকাল মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতভাগ্যদের দেহ ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র সিংহগুলি ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া খাইয়া আবার খাদ্যের আশায় জিব্ চাটিতে চাটিতে হাই তোলে, হাঁ করিয়া চারিদিকে তাকায়। সেই কাল-ঘরের নাম শুনিয়া নির্মম অসভ্য-সেনাপতির অন্তরও কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইবার উপক্রম। সে কোনক্রমে 'যে আজ্ঞা মহারাজ' বলিয়া অভিবাদন-পূর্বক রাজসভা ত্যাগ করিয়া সেনানিবাসের দিকে যাত্রা করিল। কিন্তু পদদ্বয় সম্মুখে যেন কিছুতেই সে বাড়াইতে পারিতেছে না। সীমাহীন ভয় ও ভাবনায় তাহার মসিলাঞ্ছিত মুখমণ্ডলে অবিরাম শ্বেদস্রোত গড়াইতে লাগিল।

উগাণ্ডি পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া নিম্নদেশে কাষ্ঠবেদীতে পদাঘাত করিতেই সন্নিহিত কক্ষ হইতে কয়েকজন সুন্দরী তরুণী পানপাত্র সুরাভাণ্ড হাতে লইয়া উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আর একদল অনিন্দ্যসুন্দরী নর্তকী লীলায়িত অঙ্গে নৃত্যের ঢেউ তুলিয়া দরবার-কক্ষে রূপের বন্যা বহাইয়া দিল। নর্তকিগণ সকলেই যুবতী, সকলেই অপরূপ সুন্দরী। তাদের তন্বী গৌরাঙ্গে ভরা যৌবন ভরা নদীর কূলে কূলে যেন ছল্‌ছল। সুন্দরীর দল দেশ-বিদেশের কুড়ান মানিক। উগাণ্ডি প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে ইহাদিগকে বিদেশী বণিকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিল। দুর্ভাগ্য যুবতীগণ কোন পাপে এই কুৎসিত অসভ্য-রাজার মনোরঞ্জন করিতে বন্দী জীবন যাপন করিতেছে কে বলিবে?

সুরা-বিতরণকারিণী যুবতী ও নর্তকীদের বস্ত্রাবাহুল্যের বালাই নাই।

সকলেই প্রায় অর্ধোলঙ্গা, শুধু তাহাদের কটিদেশ আজানুচুম্বিত সূক্ষ্মবস্ত্রে আবৃত, বক্ষোপরি স্বর্ণাভ সূক্ষ্ম কাঁচুলির অন্তরালে উন্নত পয়োধর-বিচ্ছুরিত

পীতাভা কিছুটা নিষ্প্রভ মাত্র; নিতম্বদেশ ধবল কুসুমদাম-গ্রথিত মেঘালয় পরিশোভিত, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, অঙ্গাভরণও শ্বেত-পুষ্প-রচিত। যুবতীদের অনাবৃত গৌরাঙ্গের বিমল প্রভায় রাজসভা ঝলমল। চাঁদের মেলা বসিয়াছে বলা যায় না; কেননা রাজা কাল, প্রজা কাল, চারিদিকে জঙ্গল কাল, প্রস্তরময় পাহাড় কাল। সেই কালোর রাজ্যে এই বিদেশিনী যুবতীরা শুধু কতকটা বৈচিত্র্য আনিয়াছে মাত্র-চন্দ্রহারা গগনে যেন ফুটিয়া রহিয়াছে কয়েকটা তারকার ফুল একত্রে।

উগাণ্ডি আজ সুরার আবেশে উন্মত্ত। একে সুরা তদুপরি চারিদিকে অর্ধোলঙ্গ ও সূক্ষ্মবসনা রূপসী তরুণীর দল। উচ্ছ্বসিত যৌবন-গরিমামণ্ডিত নর্তকীরা গানের তালে-তালে নানাবিধ নৃত্য-ভঙ্গিমায় সুন্দর পেলব হস্তে রঙীন শরাব বিতরণ করিতেছে। উগাণ্ডি মহানন্দে মশ্‌গুল। সম্মুখে এক একটি মোহিনী রমণী যেন পতঙ্গ-আমন্ত্রণকারী পাবক-শিখা। দরবারকক্ষ রূপের আলোয় ঝলমল। রূপ-পিপাসার অদৃশ্য বাসনায় সমগ্র জগচ্ছবি উগাণ্ডির চোখে বুঝি রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। এই পিপাসাই তাহার কাম্য, পিপাসার শান্তিতেই তাহার সুখ। ইহার অধিক আনন্দ সে কল্পনা করিতেও পারে না।

উগাণ্ডি জানে-জীবন নশ্বর, পৃথিবী নশ্বর, যৌবন অনিত্য। অসভ্য-রাজ অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীদের যৌবন-সুধা লুণ্ঠন করাই যদি জীবনের একমাত্র করণীয় কর্ম মনে ভাবে, তবে কে তাহাকে নিবৃত্ত করিবে। সুরার আবেশে তাহার চোখের সম্মুখে নানাবিধ সুখৈশ্বর্যের মনোহারিণী ছবিই ত আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে- সেনাপতি পিয়েলোর বিশ্বাসঘাতকতায় জয় সুনিশ্চিত, তারপর পরমা সুন্দরী শামিনী হইবে অঙ্কশায়িনী? সে কি যেমন তেমন কথা! উগাণ্ডির মনশ্চক্ষুতে যে জুড়িয়া বসিয়াছে নজ্জাসী-নন্দিনীর অপূর্ব রূপ।

অসভ্য-রাজ স্বগত বলিতে লাগিল, "জয় অনিবার্য, বিজয় মাল্য আমার করতলগত। এই বীর-ভোগ্য ধরণীর সকল সুখ-সম্পদ কেন না লুটিয়ে পড়বে আমার পায়ের তলায়। জেনে রাখ মুর্খ পরাবীন, ভীমকায় সেনাপতি টরামপুর হস্তে তোর পরিত্রাণ নেই। তারপর হাবশী দেশ-বিজয় এমন কি দুরূহ কর্ম। দু'দিন পরেই সে-দেশ নিজ রাজ্যে জুড়ে নিয়ে বিশাল সম্রাজ্য স্থাপন করবো; একচ্ছত্র

অধিপতি হয়ে শামিনীকে পার্শ্বে এনে বসাবো। তখন আর রাজা নই–সম্রাট–উগাণ্ডি! হাঁ। হাঁ হাঁ!”

উগাণ্ডির বিকট হাস্যে দরবার কক্ষ প্রকম্পিত। নর্তকীর দল ভয়ে আঁতকিয়া উঠিলে নৃত্যের তাল কাটিয়া গেল। উগাণ্ডি হাসিয়া মাতাল সুরে বলিতে লাগিল, “নাচ, নাচ, শরাব ঢাল, আরও দাও, আরও দাও। শিমপি সুন্দরী আরও ঢাল! ইরানী সুন্দরী লায়লা! কাছে এসে নাচ, আরও কাছে!”

না, অসভ্য উগাণ্ডিটা আজ আর কিছুতেই থামিবে না। নেশার ঘোরে শক্তিহীন হইয়া এলাইয়া না পড়িলে পাষণ্ড কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। লম্পট নৃত্য-গীতে মত্ত থাকে থাকুক, তদবসরে বিশ্বাসঘাতক পিয়েলোর কার্যকলাপ কিছুটা লক্ষ্য করা যাক।

একচল্লিশ

রাজদ্রোহী পিয়েলোর বিশ্বাসঘাতকতার গুপ্ত-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে প্রাচীন ইতিহাস কিছুটা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের শেষাংশের কথা। মক্কাবাসী কুরাইশদের নিপীড়ন দৃশ্য দেখিয়া মহাপ্রাণ রসূল (সঃ)-এর অন্তর অপরিসীম বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। শত্রুর দুঃখেও যিনি ব্যথিত হইতেন, বন্ধুদের দুর্দশা তিনি সহ্য করিবেন কিরূপে! মহানুভব হযরত তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের মূলকে-হাবাশে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "বন্ধুগণ! নজ্জাসী-রাজ্য ন্যায়ের দেশ, বিচারের দেশ; সেই দেশে আশ্রয় নিন। সেই রাজ্যে অন্যায় নেই, অবিচার নেই। দয়াময় আল্লাহ্ যতদিন আপনাদের বিপদের বাইরে আর অন্য পথ না দেখান, ততদিন সেই দেশেই থাকুন।

প্রিয় হযরতের উপদেশ-বাণী শিরোধার্য করিয়া সর্বপ্রথম পঞ্চদশ নরনারী স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। তারপর কয়েকজন নারী ও সন্তান-সন্ততি লইয়া অষ্টাদশ পুরুষ হাবশী দেশে যাত্রা করেন; পরে পৌছিলেন সেই দেশে আরও অনেকে। তাঁদের অকৃত্রিম ও অগাধ ধর্মবিশ্বাস এবং অপূর্ব সহিষ্ণুতার ফলে সকল বাধা-বিপত্তিই নতি স্বীকার করিয়াছিল। অকূল সমুদ্র ও দুর্গম গিরিপথ লঙ্ঘন করিয়া মুলক হাবাশে পৌছিলে রাজা নজ্জাসীর সহানুভূতি তাঁহারা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেন। শান্তির আবাস মিলিল সাগরের ওপারে সেই কৃষ্ণ মহাদেশে। কিন্তু এই সুসংবাদ স্বদেশবাসী অবিশ্বাসী কুরাইশদের বড় বিচলিত করিল। স্বদেশ তাড়িত মুসলমানগণ বিদেশে শুধু আশ্রয়ই নয়, বেশ প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছে, ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিল না। ফলে প্রতিহিংসাপরায়ণ কুরাইশগণ ছলে-বলে-কৌশলে রাজা নজ্জাসীর আশ্রয় হইতে মুসলমান মুহাজিরদিগকে ছিনাইয়া লইবার জন্য নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া রাজদরবারে পৌছিল। তাহারা মুসলমানদের নানাবিধ কাল্পনিক কুৎসা রটনা এবং ইসলাম ধর্মের বহু নিন্দাবাদ

করিয়া মুহাজিরদের রাজা নজ্জাসীর বিরাগভাজন করিতে চেষ্টা করিল। দরবারের খ্রীস্টান পুরোহিতগণকে তাহারা এই বলিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিল, "ইসলাম খ্রীস্ট ধর্মের পরিপন্থী, খ্রীস্ট ধর্মের উচ্ছেদ-প্রয়াসী; সুতরাং মুসলমানগণ খ্রীস্টানদেরও পরম শত্রু!" মুসলমানদিগকে আশ্রয় না দিয়া তাহাদের হাতে ফিরাইয়া দিতে কুরাইশগণ রাজা নজ্জাসীকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল।

হাবশী-নৃপতি মুসলমানদিগকে রাজদরবারে আহবান করিয়া প্রাচীন ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করিবার কারণ জানিতে চাহিলেন। মুসলমানদের পক্ষ হইতে জাফর-ইব্ন্-সাদেক পৌত্তলিক ধর্মের অসারতা ও অন্ধবিশ্বাস এবং ইস্লাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "হে রাজন্। আমরা অজ্ঞ ছিলাম; কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে নানাবিধ মূর্তি ও পাথর পূজায় মত্ত ছিলাম; এমন কি গাছ-পালা, মাটির ঢিবি ও পাহাড়-পর্বতকেও দেবতাজ্ঞানে মান্য করতাম। আমরা চরিত্র হারিয়েছিলাম। ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ ও পরপীড়ন ছিল আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক অপকর্ম। আমরা মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করেছি, নারীর শ্লীলতা নষ্ট করেছি, অকারণে মারামারি-কাটাকাটি করে মরেছি। এমন সময় আমাদের মুক্তির সন্ধান দিতে, সত্যের আলোকে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করতে, অমানিশার আঁধারের পর প্রভাত-সূর্যের ন্যায় উদয় হলেন আমাদের প্রিয় হযরত মহানবী মুহম্মদ (সঃ)। তাঁর বংশগরিমা, তাঁর চরিত্রের ঔদার্য, মহানুভবতা আজ সর্বজনবিদিত। তিনিই আমাদের প্রস্তর-পূজার অসারতা বুঝান, এক আল্লাহ্র উপাসনা করতে শিখান; ব্যভিচার-অত্যাচার হতে দূরে থাকার উপদেশ দেন; মারামারি, কাটাকাটি ও সর্ববিধ গর্হিত কর্ম পরহেজ করার নসীহত করেন। পরস্বাপহরণ, নারীর সতীত্ব হরণ ও পরের অনিষ্ট সাধন তিনি বিশেষভাবে নিষেধ করেন। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছি, অনুসরণ করেছি, তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করেছি। মহারাজ! এই সব কি আমাদের অপরাধ? পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে আমরা সত্য ধর্মের আশ্রয় নিয়েছি, ন্যায়পথে চলেছি। মহানুভব নরপতি! এই কি আমাদের অপরাধ? আমাদের পুনরায় প্রস্তর-পূজায় ফিরিয়ে নিতে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে কুরাইশগণ কত উৎপীড়নই না করেছে। আমাদের দেহে প্রহারজনিত ক্ষতচিহ্নগুলো আমরণ সে অত্যাচার-কাহিনীর

সাক্ষ্য বহন করবে। অবশেষে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। অত্যাচারের মাত্রা সহনসীমা অতিক্রম করে যখন প্রাণ সংশয় দেখা দিল, তখনই আপনার রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছি। মহামান্য ভূপতি! আমরা জানি, এই রাজ্যে অন্যায় নেই, অবিচার নেই, ধর্মাচরণে কোন বাধা নেই। জানি, মহাপরাক্রম নজ্জাসী পরম দয়াবান আর ন্যায়বান প্রজাপালক। সেইজন্যেই এই রাজ্যে আমরা আশ্রয়প্রার্থী। মহান আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।'

জাফর-ইবৃন -সাদেক বক্তব্য শেষ করিয়া পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত নজ্জাসীকে শোনাইলেন। রাজা মুগ্ধ হইলেন। ইসলামের অনাবিল সৌন্দর্য ও শাশ্বত সত্য তাঁহার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। কুরাইশদিগকে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়া দিলেন-আশ্রিত মুসলমানদের কিছুতেই তাড়াইবেন না।

হাবশী নরপতির এবংবিধ ফরমান শুনিয়া কুরাইশগণ বড় হতাশ হইল। তাহাদের দুঃখের, ক্ষোভের আর ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না। কিন্তু এত সহজে তাহারা হাল ছাড়িবার পাত্র নহে। কুরাইশ-দলপতি আমর-ইবৃন্ -আ'স অবশেষে রাজার প্রধান পুরোহিত সলেমীর শরণাপন্ন হইল, তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার দিয়া এবং নানাভাবে মুসলমানদের কুৎসা গাহিয়া ঘোর ইসলাম বিদ্বেষী করিয়া তুলিল।

সলেমী নজ্জাসীর সিদ্ধান্তে কুণ্ঠিত হইলেন। পরদিনই তিনি রাজাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চাহিলেন, "হে রাজাধিরাজ! ইসলাম সনাতন খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী। অতএব মুসলমানগণ শুধু কুরাইশদেরই নয়, আমাদেরও জাতিশ্রত্রু; তাহাদের আশ্রয়দান মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।"

নজ্জাসী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "রাজপুরোহিত! ধর্মের শুধু আবরণই পড়েছেন, তার বিমল জ্যোতির সন্ধান এখনও পান নি।

রাজপুরোহিত অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া ক্ষুণ্ন হইলেন। খ্রীস্টান রাজার এবংবিধ ইসলাম-প্রীতি তাঁহার চক্ষুশূল হইল। সেই দরবারেই অবনত মস্তকে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন-সলেমী প্রাণ

থাকিতে কখনো এ অপমান ভুলিবে না, সুযোগ পাইলেই কড়ায় গণ্ডায়—এর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।

সলেমী আর ইহজগতে নাই। কালের করালগ্রাসে তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে। সেনাপতি পিয়েলো এই সলেমীরই পুত্র। সলেমী মরিয়াছে বহুদিন, দেশবাসীও তাঁহাকে ভুলিয়াছে, কিন্তু পিয়েলো পিতৃ—অপমান ভুলেন নাই। তাই তিনি গোপনে অসভ্য—রাজা উগাণ্ডিকে নজ্জাসী—রাজ্য ও নজ্জাসী কন্যার প্রতি প্রলুব্ধ করিয়া হাবশী—দেশ আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন। আহা! সরলপ্রাণ নজ্জাসী এই ষড়যন্ত্রের লেশমাত্রও যদি জানতে পারিতেন।

প্রদোষকালে পরাবীন ও পিয়েলোর সৈন্যবাহিনী কাল্লিনী পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কাল্লিনীর ওপারেই উগাণ্ডির রাজ্য এক বনাকীর্ণ পার্বত্য দেশ। কয়েকটি ছোট—বড় পাহাড় অতিক্রম করিয়া থিবুই নদী পার হইলেই তারাইন পাহাড়ের উপরিভাগে উগাণ্ডির রাজধানী। নদীর উপরে এক অপরিসর কাষ্ঠ নির্মিত সেতুই পারাপারের একমাত্র উপায়।

পিয়েলো সেনাপতি পরাবীনকে উপদেশ দিলেন, "দিবাভাগে আক্রমণ করা কিন্তু ঠিক হবে না, কেননা অসভ্যগণ বড় দুর্ধর্ষ। এই নিশাকালেই আপনি একদল পদাতিক সৈন্যসহ থিবুই নদীর ওপারে অতর্কিতে শত্রুদের আক্রমণ করুন। সেই সুযোগে আমি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্বদিকে আক্রমণ করলে অসভ্যগণ সহজেই পরাজিত হবে; ভোরের অপেক্ষায় অশ্বারোহী সৈন্যদল কাল্লিনীর ধারেই অপেক্ষা করুক, কারণ প্রস্তর ও জঙ্গলময় দেশে রাত্রিকালে অশ্ব চালান বড় দুষ্কর। তাছাড়া অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নিঃসাড়ে আক্রমণ করাও সম্ভব নয়। প্রয়োজন হলে প্রত্যূষে সে দল আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে। অবশ্য এ যুদ্ধে আপনিই প্রধান সেনাপতি, আমি আপনার আজ্ঞাবহ মাত্র। যথোচিত আদেশ করুন।'

পরাবীন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি রাজ্যের বিচক্ষণ সেনাপতি, অতুলনীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী। আপনার উপদেশতমই আক্রমণ চালাবো: কিন্তু একটা কথা কি ভেবে দেখেছেন?"

পিয়েলো ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা সেনাপতি?"

পরাবীন উত্তর করিলেন,"আমরা বিভক্ত হয়ে যে দু'দিকে আক্রমণ চালাবো, সেই সব দিকে শত্রু সৈন্য প্রস্তুত থাকলে জয়ের আশা কোথায়? শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় পদাতিক নিয়ে কি তিষ্ঠিতে পারবো?"

পিয়েলো পরাবীনের সন্দেহ দূর করিতে বলিলেন,"আমি ভালভাবেই জেনেছি- পূর্ব ও পশ্চিমে তারা প্রস্তুত নয়। দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করে শত্রুদল সেই দিকেই যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। আমরা উভয় দল সর্বদা দূতমুখে সংবাদ আদান-প্রদান করে সংযোগ রক্ষা করবো। ক্রমে দু'দিক থেকে অগ্রসর হয়ে তারাইন পাহাড়ের পাদদেশে মিলিত হব।"

"উত্তম! তা'হলে আপনি পুর্ব দিকেই আক্রমণ করুন, আমি চলি পশ্চিমে। মহামান্য নৃপতির আদেশ যেন স্মরণ রাখবেন- উগাণ্ডিকে বন্দী করতে হবে জীয়ন্ত।"

"মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য। মহারাজের জয় হোক!" এই বলিয়া ধূর্ত পিয়েলো অবিলম্বে সৈন্যদলসহ পূর্বদিকে যাত্রা করিলেন। আহা! সেনাপতি পরাবীন তাঁহার অন্তর্নিহিত গোপন দুরভিসন্ধির কিছুমাত্রও যদি সন্ধান পাইতেন।

সেই রাত্রেই পূর্বদিকে বহুদূর উচ্চ শাম্পুনি পাহাড়ের পাদদেশে পৌছিয়া পিয়েলো সৈন্যগণকে বিশ্রাম গ্রহণের আদেশ দিলেন। সকলকে জানাইয়া দিলেন- পরদিবস প্রত্যূষেই আক্রমণ শুরু হইবে। সৈন্যদল মহানন্দে ছাউনি ফেলিয়া আহারাদির আয়োজনে মনোনিবেশ করিল।

চারিদিকে গভীর আঁধার। গোপন পরামর্শ-মাফিক পিয়েলো অলক্ষে সেই অন্ধকারে শাম্পুনীর এক গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অসভ্য সেনাপতি টরামপুর প্রতীক্ষায়রহিলেন।

এদিকে পরাবীন পিয়েলোর উপদেশমত অশ্বারোহী সৈন্যদল কাল্লিনীর পাদদেশে রাখিয়া সেই নিশীথেই পদাতিক-বাহিনীসহ ধীরে ধীরে থিবুই নদীর তটদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। চারিদিক পিচঢালা অন্ধকারে তখন আচ্ছন্ন, কিছুই বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীর উভয় তীরের বিশালকায় তরুরাজি অসংখ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারণপূর্বক একে অপরকে যেন আলিঙ্গন করিতেছে। আবার

কখনও কখনও বায়ুভরে আন্দোলিত ডালপালাগুলো মহানন্দে বুঝি নৃত্য করিতে থাকে। চারিদিকে শুধুই কালোর মেলা। সেই অন্ধকারে অতিকষ্টে পরাবীন পিয়েলোর নির্দেশিত স্থানে থিবুই নদীর উপরে এক সেতুর সন্ধান পাইলেন। কিন্তু সাঁকো বড় অপরিসর, পাশাপাশি দুইজন কোনক্রমে চলিতে পারে মাত্র। পরাবীন অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সৈন্যদলসহ সেই কাষ্ঠনির্মিত সেতু পার হইয়া অপর পারে পৌছিলেন।

হায়, গর্বিত নর। মিছাই তোমার দম্ভ! মিছাই তোমার অহংকার। অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যত তোমার জন্য পরমুহূর্তের অদৃষ্ট-ভাণ্ডারে কি সম্পদ, কি বিপদ জিয়াইয়া রাখিয়াছে তাহা যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতে! যদি জানিতে তবে সংসারে আর সংসারী সাজিতে পারিতে না, নিয়তিও এত পরিহাস করিবার সুযোগ পাইত না। সেইজন্যই বুঝি সৃষ্টিকুশলী বিধাতা মানুষকে কৌশলে রাখিয়া দিয়াছেন অন্ধকারে! আজ তাই সেনাপতি পরাবীন অদৃশ্য নিয়তির অনুকম্পায় সম্পুর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া বনপথে পা বাড়াইলেন। যদি ভবিতব্য জানিতে পারিতেন তবে এই সুচীভেদ্য অন্ধকারে আজরাইলের দুয়ারে তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে অগ্রসর হইতেন-এমন কথা কল্পনা করা যায় না। পরাবীন নির্বোধ নহেন, বুদ্ধিমান পুরুষ! মহামূর্খেরও ত জীবনের মায়া আছে।

সেতুর অপর পারে আঁকাবাঁকা এক পার্বত্য পথ টিহিন মালভূমির উপরে গিয়া মিশিয়াছে। একে অন্ধকার রজনী, তদুপরি দুইপার্শ্বে নিবিড় বনানী। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বন্ধুর পথে চলিতে চলিতে সৈন্যগণ পদে পদে হোচট খাইয়া একে অন্যের উপরে পড়িতে লাগিল। পাছে শত্রুপক্ষ তাহাদের গতিবিধি বুঝিতে পারে, সেই ভয়ে আলো জ্বালিয়া চলিতে তাহারা সাহস পাইল না। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাদিগকে সেই দুর্গম স্থানে পথ চলার কষ্ট আর সহ্য করিতে হইল না। পরমুহূর্তে যাহা ঘটিল তাহা বর্ণনা করিতে জড় লেখনিও বুঝি কাঁপিয়া ওঠে।

পরাবীন সৈন্যদলসহ জঙ্গলের সরু পার্বত্য পথে কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় আচম্বিতে চতুর্দিকে সহস্র মশাল এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। ভয়ে বিস্ময়ে নজ্জাসী বাহিনীর অধিকাংশ অসভ্য- বাহিনী বর্শাহস্তে অতি সন্তর্পণে

কাল্লিনীর পাদমুলে পৌঁছিল। কালবিলম্ব না করিয়া তাহারা যথাসম্ভব নিঃশব্দে নজ্জাসীর অশ্বারোহী সৈন্যদের আক্রমণ করিল।

সৈন্যদল কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার পর অধিক রাত্রে নিশ্চিন্তে সন্তাপহারী সুষুপ্তির ক্রোড়ে সুখশয্যা রচনা করিয়াছে, কেহ আর জাগিয়া নাই। এমন সময় চতুর্দিক হইতে অসংখ্য অসভ্য সৈন্যের আকস্মিক আক্রমণ। হতভম্ভ ও ভয়- ত্রাসে দিশাহারা নজ্জাসী সৈন্যগণ চিৎকার সহকারে জাগিয়া অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু সে সুযোগ আর পাইল কই! এমন করিয়া তাহাদের অন্তিমকাল যে ঘনাইয়া আসিবে কে জানিত!

মুহূর্তমধ্যে অসভ্যগণ তাঁবুতে তাঁবুতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের সুচনা করিল। সদ্যোত্থিত নজ্জাসী-বাহিনী অস্ত্রের সন্ধান করিতে না করিতে তরবারি ও বর্শার আঘাতে বন্য পশুর ন্যায় নিহত হইতে লাগিল! কে ইহাদের রক্ষা করিবে? অনেকেই নিঃশঙ্ক চিত্তে তখনও শয্যায় নিদ্রিত ছিল, সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।

সব শেষ, যুদ্ধ শেষ। নজ্জাসী-সৈন্যদলও প্রায় শেষ। কোথা হইতে কাহারা আক্রমণ করিল তাহা বুঝিতে না বুঝিতেই অধিকাংশ নজ্জাসী-বাহিনী দলে দলে বিনষ্ট হইল। অসংখ্য জ্বলন্ত শিবির নিঃসৃত পাবক-শিখা, অনন্ত ঊর্ধ্বে ধুম্রপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতে করিতে চারিদিকে বহুদূর উদ্ভাসিত করিয়াছে। সেই আলোকে অবশিষ্ট নজ্জাসী-বাহিনীর কেহ কেহ অস্ত্রের সন্ধান করিয়া আজরাঈলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কেহ পুড়িয়া মরিল, কেহ বা দুই চারিজন অসভ্য সৈনিকের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া নিজেও বর্শাবিদ্ধ হইল। পরাবীন-বাহিনীর অতি অল্প সংখ্যক সৈনিকই এই ব্যাপক হত্যা-লীলার সাক্ষ্য দিতে বাঁচিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে কাল্লিনীর প্রান্তরভূমি হতভাগ্য সৈনিকদের শোনিতপ্রবাহে নিমজ্জমান। রাশি রাশি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ এক বীভৎস নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। মুমূর্ষু সৈনিকদের করুণ গোঙানী, আহত যোদ্ধাদের কাতর আর্তনাদ, বহুদূর-প্রসারী তৎক্ষণাৎ মহানন্দে গগনবেদী চিৎকার করিতে করিতে অসভ্যগণ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল চারিদিক হইতে। অসহ্য বেদনায় পরাবীনের

মুখমণ্ডল বিবর্ণ দৃষ্টিহারা নয়নদ্বয় ঘোর তমিস্রায় যেন ভরিয়া উঠিতেছে। তথাপি ডান হস্তে তিনি অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, বাম হস্তে সজোরে জানুদেশ হইতে বর্শা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, টলিতে টলিতে বাত্যাহত বিটপীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। নিমেষমধ্যে কয়েকজন অসভ্য- সৈনিক মহোল্লাসে উগাণ্ডির জয়ধ্বনি করিতে করিতে পরাবীনকে বন্দী করিয়া বনোমধ্যে অদৃশ্য হইল।

সেনাপতি হারা সৈন্যদলে দুর্দশার আর সীমা নাই। সকল শক্তি-সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাণভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল, পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হিংস্র অসভ্যদের হস্তে বড় কেহ পরিত্রাণ পাইল না। অনন্যোপায় হইয়া মুষ্টিমেয় নজ্জাসী সৈনিক নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু খরস্রোতা পার্বত্য নদীর অপর পারে উঠা আর সম্ভব হইল না। অসংখ্য হাঙ্গর-কুম্ভীর দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছে, কাড়াকাড়ি হুটোপটি করিয়া তাহাদের গ্রাস করিতে লাগিল। অনেকেই আবার ডুবিয়া মরিল। মাত্র যে দুই চারিজন সৈন্য কোনক্রমে সাঁতরাইয়া ওপারে উঠিল, শ্রমাধিক্যে তাহারাও যেন মৃতপ্রায়।

উগাণ্ডি-বাহিনী ইঁহাতেও ক্ষান্ত হইল না। নদীতীরে বনানীর অন্তরালে অসংখ্য তরণী তাহারা পূর্বেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মহোৎসাহে এইবার নদী পার হইয়া উগাণ্ডি-সেনাপতি টরামপু আবার বিরাট বাহিনীসহ কাল্লিনীর পাদদেশে যাত্রা করিল। নজ্জাসীর অশ্বারোহী বাহিনী সেই স্থানে যে বিশ্রাম করিতেছিল- এ সংবাদ নিমকহারাম পিয়েলোর কৃপায় তাহার অবিদিত ছিল না।

রজনীর তৃতীয় যাম প্রায় অতিক্রান্ত। শব্দহীন ধরিত্রী ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত। গাছপালাগুলোও যেন ঝিমাইতে ঝিমাইতে কেমন নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই গভীর নিদ্রায় অচেতন। কেবল উপরে অনন্ত গগনতলে ছিন্ন ভিন্ন মেঘের আড়ালে দুই চারিটি নক্ষত্র তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীর নিন্দ্রালস নয়নে মাঝে মাঝে যেন মিট মিট করিয়া তাকায়। এমন সময় সেই বিরাট নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া বিপুল সৈন্যের তখন হৃদকম্প উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার সহকারে অর্ধোলঙ্গ ও কৃষ্ণকায় অসভ্য যোদ্ধা, জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া বর্শাহস্তে দানবের ন্যায়

শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরাবীনের সৈন্যদল প্রস্তুত হইবার অবকাশও পাইল না। অল্পক্ষণমধ্যে অসংখ্য আহত ও মুমূর্ষু সৈন্যের আর্তনাদে আকাশ–পাতাল ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভয়ে বনানীর পশুপক্ষীগুলোও চিৎকার করিয়া ইতস্তত ছুটিতে শুরু করিয়াছে।

পরাবীন এই অতর্কিত আক্রমণ মোটেই আশঙ্কা করেন নাই, সুতরাং প্রস্তুতও ছিলেন না। তথাপি সৈন্যদল লইয়া রাজা নজ্জাসীর জয়ধ্বনি করিতে করিতে তিনি বীরবিক্রমে অসভ্যদের প্রতিরোধ করিলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ক্ষুদ্র বেতসকুঞ্জ কতকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। বিরাট অসভ্য–বাহিনীর সম্মুখে ক্ষুদ্র পদাতিক দল কত সময় আর টিকিতে পারে। পরাবীন–বাহিনী পর্যুদস্ত হইয়া পশ্চাতে সেতুমুখে হটিতে লাগিল। কিন্তু অসভ্যগণ তবুও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে ছাড়িল না। যুদ্ধে অসংখ্য সৈনিক আহত হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। অনেকে শত্রুর বর্শাফলক বক্ষে লইয়াই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল জঙ্গলের প্রস্তর–শয্যায়। অবশিষ্ট বাহিনী কোনক্রমে পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে সেতুমুখে আসিয়া দেখে– উগাণ্ডি বাহিনী কাষ্ঠ সেতুতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে; আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। পালাইবার আর পথ নাই। সেনাপতি পরাবীন মৃত্যুপণ করিয়া সৈন্যদলসহ আবার বীরবিক্রমে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় অসভ্যদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, যোদ্ধাদের চিৎকার–হুঙ্কার, সৈন্যদের ঝটাপটি, হুড়াহুড়ি, আহতদের করুণ আর্তনাদ কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিতে চায়। ঘূর্ণায়মান তরবারি ও বর্শাফলকে মুহুর্মুহ বিদ্যুদ্দীপ্তি দেদীপ্যমান। মরণ নিশ্চিত জানিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় পরাবীন–বাহিনী অতুলনীয় বীরত্বে চারিদিকে ক্ষিপ্রগতিতে প্রত্যাঘাত করিতে করিতে অসংখ্য অসভ্য–সৈন্য সংহার করিয়া, অবশেষে সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিল।

আচম্বিতে ঝোপের আড়াল হইতে এক অসভ্য সৈনিক সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করিয়া সেনাপতি পরাবীনের জানুদেশ ভেদ করিল। প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া

চারিদিক মুখর করিয়া তুলিয়াছে। অগ্নিকুণ্ডে অর্ধদগ্ধ মনুষ্য ও অশ্ব–দেহের উৎকট দুর্গন্ধে আকাশ–বাতাস ভরপুর। কাল্লিনীর প্রান্তরবক্ষে প্রেতলোকের পৈশাচিক নৃত্য যেন মুর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আজও হাবশিগণ থিবুই জঙ্গলের সেই রোমাঞ্চকর যুদ্ধের কাহিনী ভুলে নাই। কাল্লিনীর বীভৎস বিভীষিকা, কাল্লিনী–প্রান্তরের সেই ব্যাপক নরহত্যার লোমহর্ষক ঘটনা আজও সকলে স্মরণ করিয়া ভয়ে শিহরিয়া ওঠে। আজও সকলে একবাক্যে বলিয়া থাকে–'ধিক পিয়েলো! ধিক তোমার পিতৃভক্তি।'

বিয়াল্লিশ

সমগ্র হাবশী দেশ আজ বিষাদাচ্ছন্ন। মৃত্যুর করাল-ছায়া প্রায় প্রতি গৃহে বিরাজমান; যেখানে-সেখানে ক্রন্দনের রোল, বুকফাটা করুণ হাহাকার! রাজ্যময় রটিয়াছে পিয়েলো বিদ্রোহী, কুমার পরাবীন নিহত। রাজপুরী নিরানন্দময়। শোকে-দুঃখে সকলেই সেখানে মৃহ্যমান। রাজকুমারী শামিনী এক একবার পাগলিনীর ন্যায় চিৎকার করিতে করিতে বসন-ভূষণ ছিড়িয়া ধূলায় লুটান, কখনও বা বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে গড়ান।

নজ্জাসী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া রাজদরবারে পায়চারি করিতেছেন। বিমর্ষ অমাত্যবর্গ ও সেনানায়কগণ অবনত মস্তকে নরপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান! রাজসভা নিস্তব্ধ। রাজা নজ্জাসী গর্জিয়া উঠিলেন, 'পিয়েলো বিশ্বাসঘাতক-বিদ্রোহী! আজন্ম রাজানুগ্রহে পালিত পিয়েলো আজ স্বদেশদ্রোহী! রাজদ্রোহীর চরম শাস্তি মৃত্যু! হাঁ, মৃত্যু! না-না বিদ্রোহীকে এত সহজে মারবো না, তিলে তিলে, পলে পলে হত্যা করবো। পাপিষ্ঠের ঘৃণিত দেহ শূলে বিদ্ধ করে রাজপথে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাবো। কে আছে? কে পারবে এই কাজ?'

উত্তেজিত সেনানায়কগণ অগ্রসর হইয়া নতশিরে রাজাজ্ঞাপ্রার্থী হইলেন। রাজকুমার যোফন পিতাকে অভিবাদনপূর্বক বলিলেন 'পিতঃ! আশীর্বাদ করুন' আমি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবো। এ অধমকে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিন।'

রাজা নজ্জাসী স্থিরনেত্রে যোফনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'পুত্রের উপযুক্ত কথাই বটে! কিন্তু তুমি কিশোর বালক, অশ্বারোহণে পাহাড়ে-পর্বতে ছুটাছুটি করে সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে-বড় দুরূহ কাজ রাজকুমার! তুমি আমার একমাত্র পুত্র, জীবনসর্বস্ব। তোমাকে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকবো?'

'না, বৎস! তোমাকে যেতে হবে না, নজ্জাসী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করবে, সমগ্র অসভ্য দেশ পুড়িয়ে ছারখার করবে, অসভ্যদের বন্য শৃগাল–কুকুরের ন্যায় বর্শার খোঁচায় বিদ্ধ করে মারবে।'

'হায়, হতভাগ্য পরাবীন! সামান্য একটা অসভ্য–সর্দার উগাণ্ডির হাতে বন্দী হলে? তুমি কাপুরুষ! তোমার সঙ্গে না রাজকন্যার বিয়ে দেব বলেছিলাম? ধিক্ তোমাকে!'

'যাও সেনানায়কগণ, শীঘ্র সৈন্য সমাবেশ কর। যতক্ষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পারি, যতক্ষণ উগাণ্ডি রাজ্য ধ্বংস করতে না পারি, ততক্ষণ শান্তি পাব না। বলে দাও, সর্বত্র প্রচার করে দাও পিয়েলোকে যে বন্দী করতে পারবে, প্রচুর পুরস্কার পাবে,বংশানুক্রমে রাজানুগ্রহ ভোগ করবে। যাও, এই মুহূর্তে যাত্রার আয়োজন কর।'

সেনানায়কগণ অভিবাদন করিয়া সেনানিবাসে যাত্রা করিল। এমন সময় দ্বারপাল আসিয়া রাজসমীপে প্রণত হইল। নজ্জাসী বিরক্তিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছিস দৌবারিক? আরও কিছু কি ঘটে বাকী আছে নাকি?

দ্বারপাল নিবেদন করিল, 'মহারাজ! শতাধিক উদবাস্তু মুসলমান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত। দলের অধিনায়ক আবু রায়হান রাজদর্শন অভিলাষী।'

নজ্জাসী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, 'মুসলমানগণ উপকার ভুলে নাই। এই জাতি নিমকহারাম নয়। আজ দুর্দিনে যারা ছুটে এসেছে, তারা আমার পরম বন্ধু। যা,নিয়েআয়দরবারে।'

রায়হান আসিয়া নৃপতিকে অভিবাদনপূর্বক বলিলেন, 'মহামান্য ভূপতি! অনুমতি পেলে দিলের মকসুদ আরজ করি!;

নজ্জাসী শান্তভাবে বলিলেন, "কি কথা বীরবর?"

রায়হান নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! রাজ্যের এই দুর্দিনে, রাজার বিপদে, নিশ্চেষ্ট দর্শকরূপে শুধু আর বসে থাকতে পারছি না। আমরা কাপুরুষ নই,

অকৃতজ্ঞ নই, উপকারীর প্রত্যুপকার করা আমাদের কর্তব্য, আমাদের ধর্ম। তাই আজ সকলে রাজসেবায় প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে এসেছি। পূর্বেও এ-কথা আরজ করেছিলাম মহারাজ, কিন্তু নিরাশ হয়েছিলাম! এইবার যেন হতাশ না হই-এই আমাদের প্রার্থনা।"

"কিন্তু আপনারা আমার আশ্রিত, আপনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে আমি বসে থাকতে পারি হাত-পা গুটিয়ে কাপুরুষের মত? তা' হয় না। আমি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করবো।"

"মহানুভব সম্রাট! আমরা নিশ্চেষ্ট বসে থাকবো, আর আপনি যুদ্ধযাত্রা করবেন, বেঁচে থাকতে সেই দৃশ্য ত আমরা সহ্য করতে পারবো না। মহারাজ! এই দেশের দানা-পানি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, এই দেশে আমরা লালিত পালিত, এই আমাদের দেশ। আমাদের কাতর অনুরোধ, আজ এই দুর্দিনে দেশ সেবায় যেন বঞ্চিত না হই।"

হাবশী-অধিপতি মুসলমানদের রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নিও কতকটা স্তিমিত হইয়া আসিল। আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "হে মুসলমান দলপতি। আপনার বীরত্ব-কাহিনী কিছুটা শুনেছি। আপনার রাজভক্তির পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। ভাগ্যদোষে আমার প্রধান সেনাপতি পিয়েলো বিদ্রোহী হয়ে শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। পরাবীন আজ বন্দী! হয়তো তার জীবন-দীপ চিরতরে নিভে গেছে। রাজ্যে বিচক্ষণ সেনানায়ক আর অধিক নেই। সেইদিন পিয়েলোকে বিশ্বাস করেই আমি অতিথীর সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছিলাম। আমার সে গর্ব খর্ব হয়েছে। আজ আপনারা সেচ্ছায় আমার দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, এ-ঐকান্তিকতা প্রশংসনীয় বটে। প্রশংসা করি আপনাদের ধর্মকে, যে ধর্ম আপনাদের এতটা কর্তব্যনিষ্ঠ, এতটা কৃতজ্ঞতাবোধ, এতটা দেশ-প্রেম-শিক্ষা দিয়েছে। হে বীর যুবক। এই হাবশী দেশ আপনারা স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছেন শুনে এই নিদারুণ দুঃখেও আমার অন্তর আনন্দে ভরে উঠেছে। বেশ আপনার হস্তেই এই দেশের মান-সম্ভ্রম রক্ষার ভার আজ অর্পণ করলাম। বীর রায়হান! আজ থেকে আপনি এই রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। নিজেই যুদ্ধযাত্রা করবো মনস্থ করেছিলাম, ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত সেনাপতির সন্ধান পেয়েছি। উগাণ্ডির সমুচিত শাস্তি-বিধান

করতে, স্বহস্তে বিদ্রোহী পিয়েলোকে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার দিতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি চাই–উগাণ্ডি রাজ্য ধ্বংস করতে; জঙ্গলে গিরি–গহবরে, অসভ্যদের আবাসগুলো পুড়িয়ে দিয়ে কাল্লিনীর ধ্বংসলীলার প্রতিশোধ নিতে। কুমার যোফন! সেনাপতি রায়হানকে নিয়ে সেনানিবাসে যাও, সেনানায়কদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও, সেনাবাহিনীর ভার তাঁর হাতেই ছেড়ে দিতে বল। সেনাপতি রায়হান। যাত্রার আয়োজন করুন।"

অবিলম্বে রায়হান ও সঙ্গী মুসলমানগণ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া মহামান্য নজ্জাসীর জয় ঘোষণা করিতে করিতে দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজা নজ্জাসী দরবার–গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বাহিরে রায়হানের যাত্রাপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তুমুল জয়–ধ্বনি তাঁহার কানে কি যেন এক আশার বাণী শোনাইয়া গেল। আপন মনেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "এরাই ত মানুষ! পরের জন্য যারা জীবন দিতে কুণ্ঠিত নয়, তাঁরা কখনও নিমকহারাম হতে পারে না।" অপূর্ব এদের ধর্মবিশ্বাস! যে ধর্মের জন্য মানুষ সর্ববিধ ক্লেশ, সর্ববিধ লাঞ্ছনা অম্লান বদনে সহ্য করে, নির্বাসনদণ্ড মাথা পেতে নেয়, স্বদেশের ঘর–সংসার, আত্মীয়–স্বজন চিরতরে ত্যাগ করে, সে ধর্ম কখনও মিথ্যা নয়। নিশ্চয়ই ইসলাম সত্য ধর্ম। রায়হান বীরপুরুষ, উপযুক্ত সেনাপতি। বিশ্বপ্রভুর অনুগ্রহে বিদ্রোহীদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে বিজয়ীর বেশে তিনি ফিরে আসুন! আমি রাজ্যের একাংশ যৌতুক দিয়ে রাজকুমারী শামিনীকে তাঁর হস্তেই সমর্পণ করবো। রাজকুমারীর উপযুক্ত পাত্রই বটে। তাঁর মঙ্গল হোক।

নজ্জাসী হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এখনই যে তাঁহাকে সেনানিবাসে যাত্রা করিতে হইবে! নবীন সেনাপতি এই দেশের পথঘাট, হালচাল, কিছুই অবগত নহেন। মুলকে হাবাশ ও অসভ্য উগাণ্ডির দেশ সম্বন্ধে তাঁহার ভৌগোলিক জ্ঞানও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কয়েকজন অভিজ্ঞ পথ–প্রদর্শক পাঠাইতে হইবে তাঁহার সঙ্গে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপদেশও দিতে হইবে তাঁহাকে এখনই। অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের সরবরাহও তাঁহাকে নিজে গিয়া তদারক করিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে রাণীকে এবং পুরবাসীদিগকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানাইতে না পারিলে অন্তরের জ্বালা বুঝি মিটে না। তিনি মনে মনে বলিলেন,

দুর্ভাগা পরাবীনের অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়াছে, অর্বাচীন মূঢ়তার ফলভোগ করিয়াছে। বিগত দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ করিয়া আর লাভ কি! হতভাগিনী শামিনীর জীবন নাট্যে কেনই বা বিষাদের কাল ছায়া চিরতরে নামিয়া আসিবে। ঝড়ের দাপটে যে ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে অকালে, তাহার জন্য আক্ষেপে বুক ভাসাইলে আর কি-ই-বা লাভ হইবে।

সেদিনের বেলা শেষে রাজপুরীতে নৃত্য-গীতের আসর আর বসিল না। ঘরে ঘরে স্বর্ণ-প্রদীপ উজ্জ্বল আলো আর জ্বলিয়া উঠিল না। রাজকুমারী শামিনীর সজল নয়নের কাতর চাহনি, করুণ আর্তনাদ, পুরনারীদের বিলাপধ্বনি সমগ্র রাজপুরী যেন বিষাদ সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে। সমগ্র শহর নিস্তব্ধ, শোকাচ্ছন্ন। গত যামিনীর অসংখ্য আলোকমালা-পরিশোভিত রাজধানী হঠাৎ আপন অস্তিত্ব যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে-আজ সেই সব বিচিত্র আলোর শোভা আর নাই, শহরে কর্মচাঞ্চল্য নাই, সজীবতা নাই। নগরীর উপকণ্ঠে মুসলমান-পল্লীতে মাত্র দুই-একটি ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই ক্ষীণ দীপালোকে পল্লীবাসী সকল স্ত্রী-পুরুষ একযোগে সর্ববিপদহন্তা সৃষ্টিকর্তার দরবারে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, "হে দয়াময় বিশ্বপ্রভু! দীনের বন্ধু! দয়ালু নজ্জাসীর অশান্তির আগুন তুমি নিভিয়ে দাও, তাঁর বিপদ ভঞ্জন কর। রহমানুর রহীম, বিজয়-মাল্যে তাঁকে ভূষিত কর! হে বিচার দিনের মালিক! এই রাজ্যে মুসলমানগণ শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, তোমার আরাধনায় নির্বিঘ্নে দেহমন নিয়োগ করেছে। এই দেশের মঙ্গল কর। প্রভো হে! যে রাজা তোমার প্রিয় ধর্ম ইসলামের সম্মান করেছেন, তুমি তাঁর সম্মান বাড়িয়ে দাও, তাঁকে পুরস্কৃত কর! আমিন! আমিন!!

তেতাল্লিশ

উগাণ্ডির-রাজ্যের আনন্দের বন্যা বর্ণনাতীত। যুদ্ধ-বিজয়ী অসভ্য সৈনিক ও জংলী পাহাড়ীরা পল্লীর পথে পথে ও মালভূমির উপরে নৃত্য-গীতের আসর জমাইয়া অফুরন্ত মদ্যপানে মশগুল। যুবক-যুবতীর দল বাদ্যের তালে তালে হাত ধরিয়া নাচিতেছে, গাহিতেছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক-বয়স্কারা দর্শকরূপে চারিদিকে ভিড় করিয়া মদ্যভাণ্ডগুলো একে একে নিঃশেষ করিতেছে। চারিদিকে আমোদ-আহলাদ ও উদ্দীপনার সীমা নাই, উৎসবের শেষ নাই। হইবারই কথা। থিবুই জঙ্গলে ও কাল্লিনীর প্রান্তরে যে অভাবনীয় বিজয় লাভে তাহারা সমর্থ হইয়াছে, কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। অশীতিপর বৃদ্ধেরাও এমন ঘটনা কখনও দেখে নাই বা শোনে নাই। তবে আর তাহারা আনন্দে বিহবল না হইবে কেন? ইতিপূর্বে কখনও কখনও অসভ্যগণ হাবশী-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বর্ধিষ্ণু জনপদ লুন্ঠন করিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নজ্জাসীর-বাহিনীর তাড়া খাইয়া জঙ্গলে-পাহাড়ে-পর্বতে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। সম্মুখযুদ্ধে এতবড় জয়লাভ তাহাদের ভাগ্যে আর কখনও যে ঘটে নাই।

বিচিত্র পত্রপুষ্পে সজ্জিতা অর্ধোলঙ্গা যুবতীর দল নৃত্য-গীতের আনন্দে বিভোর। আরূঢ়-যৌবনা তরুণীদের মসীনিন্দিত সুডৌল দেহে শ্বেত শুভ্র পুষ্পাভরণ, উন্নত বক্ষদেশে পুষ্প-কাঁচলি, কটিদেশে পুষ্প-মেখলা, মণিবন্ধে পুষ্প-বলয়, শিরোদেশে বিচিত্র পাখীর পালক। কত অপরূপ সে শোভা! যুবকদের পরিধানে কটিবাস, তদুপরি পত্রাভরণ। সর্দারদের কন্ঠদেশে গজ-দন্ত ও গজ-অস্থি বিনির্মিত স্থূলমাল্যে বিভূষিত।

প্রথমে যুবক-যুবতীল দল দুই পার্শ্বে মুখোমুখী নাচিল, তারপর দলে দলে হাত ধরাধরি করিয়া নানা ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে শুরু করিল গান। চারিদিকে

অসংখ্য নরনারী উপবিষ্ট। অসভ্য দর্শকমণ্ডলী সমস্বরে বাহবা দেয়, মাঝে মাঝে কাষ্ঠ–নির্মিত পেয়ালা ভরিয়া মদ্য পান করে। নৃত্যরত যুবক–যুবতীরা এক–একবার বিশ্রাম নিবার ছলে তাহাদের দলে ভিড়িয়া মনের আনন্দে সুরা পান করিয়া লয়। নৃত্যগীতের বিরাম নাই, শোরগোলেরও শেষ নাই। একদল বিশ্রাম গ্রহণ করে, আর একদল আসরে নামে। মাঝে মাঝে হৈ হল্লা নর্তকীদের কলকণ্ঠ ছাপাইয়া উঠে। উগ্র মদিরা–গন্ধ বায়ুভরে চারিদিকে ছড়ায়।

উগাণ্ডি–দরবারের আনন্দোৎসব বলিয়া শেষ করিবার নহে। বিজয়োল্লাসে অসভ্য রাজ আত্মহারা, মহানন্দে পাত্রমিত্র–সহকারে সুরাপানে সে মত্ত। তাহার ডানপার্শ্বে রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছে রাজা–নজ্জাসীর বিদ্রোহী সেনাপতি পিয়েলো। উগাণ্ডি সেনাপতি টরামপু তাহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট। সুন্দরী নর্তকীরা নাচিয়া নাচিয়া, গাহিয়া গাহিয়া, ছন্দের ঢেউ তুলিয়া বিতরণে ব্যস্ত। রাজসভা নৃত্য–গীত আর আনন্দ কোলাহলে মুখরিত। নরপতি, সেনাপতি ও অমাত্যবর্গ সকলেই সুরার আবেশে বিভোর। প্রত্যেকেরই নয়নদ্বয় ঢুলঢুলু। নর্তকীগণ মৃদুমধুর নূপুর নিক্কণে, অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিতে মদোন্মত রাজপুরুষদের নেশার ঘোর কাটাইয়া দিয়া আবার পানপাত্র ভরিয়া দিতেছে, সুমধুর কণ্ঠসঙ্গীতে মাতাইয়া তুলিয়াছে সকলের মণপ্রাণ।

অসভ্য–রাজ রাজানুগ্রহের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ আপন পানপাত্র হইতে কিঞ্চিত স্বর্ণাভ মদিরা পিয়েলোর পেয়ালায় ঢালিয়া দিয়া বলিল,"মহাবীর পিয়েলো! আপনার বীরত্বের তুলনা হয় না। আজ থেকে আপনিই এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। সেনাপতি টরামপু! বিভিন্ন দলের সর্দারগণ! তোমরা ঘোষণা করে দাও–পিয়েলো এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। মহামন্ত্রী পিয়েলো! আপনি সুচতুর রণ–কৌশলী। আপনার মন্ত্রণায় থিবুইর যুদ্ধে কাল্লিনীর রণে জয়ী হয়েছি। এইবার হাবশী দেশ জয় করবো, নজ্জাসীকে বন্দী করে কালঘরে নিক্ষেপ করবো। ক্ষুধার্ত সিংহ ব্যাঘ্রগুলো তার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে খাবে কাড়াকাড়ি করে। সে দৃশ্য আমি পুরনারীদের সঙ্গে, এই সুন্দরী নর্তকীদের সঙ্গে উপভোগ করবো, আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচবো হা হা হা! কি গো নর্তকী–রাণী শিম্পি। কেমন মজা হবে?'

শিমপি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ক্ষুদ্র একটি অভিবাদন করিল। উগাণ্ডি পিয়েলোর ডান স্কন্ধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, "মন্ত্রিবর। নীরব কেন? আপনার আরো কিছু সাহায্য কি আশা করতে পারি না?"

পিয়েলো অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হোক ও–বান্দা পিতৃ অপমান ভুলেনি। সে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

উগাণ্ডি খুশী হইয়া বলিল, "বেশ কথা, মহামন্ত্রী! আপনি। আশাতীত পুরস্কার পাবেন। আচ্ছা, বলতে পারেন, হাবশী রাজ্য বিজয়ের সম্ভাবনা কতদূর?"

পিয়েলো। মহারাজ! আমি সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত সৈন্যবাহিনী নিয়েই সরে এসেছি। রাজ্যে বিচক্ষণ সেনানায়ক আর কেউই নেই। হাবশী দেশ আক্রমণ করার এই তো সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন, বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

উগাণ্ডি। উত্তম। সেনাপতি টরাম্‌পু সৈন্যবাহিনী কি প্রস্তুত?

টরাম্‌পু অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর করিল, "জয় হোক মহারাজের। আপনার আদেশে সকলেই প্রস্তুত।"

উগাণ্ডি। তবে এই মুহূর্তে নজ্জাসী–রাজ্য আক্রমণ কর। নির্বিচারে হত্যা করে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রতি গৃহে অগ্নিসংযোগ কর। নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলায় হাবশী–দেশ ছারখার হোক! সেনাপতি! মনে পড়ে, গতকল্য কি আদেশ দিয়েছিলাম?

সেনাপতি! মহারাজ! আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। সেনাপতি পরাবীনকে বেধে এনেছি জিয়ন্ত।

উগাণ্ডি! সে কথা আমার অজানা নেই। তারপর তোমার কি কর্তব্য, তা' কি ভুলে গেছ?

সেনাপতি। ভুলিনি মহারাজ! নজ্জাসীকেও বন্দী করে হাজির করবো মহারাজের পদতলে।

উগাণ্ডি। তারপর?

সেনাপতি হতবুদ্ধি হইয়া কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "তারপর রাজ–কোষ লুণ্ঠন করে সম্পদ বৃদ্ধি করবো মহারাজের।"

উগাণ্ডি ক্রোধভরে আসন ত্যাগ করিয়া অধীরভাবে পায়চারী করিতে করিতে বলিল, "সেনাপতি। আজীবন শুধু ধনসম্পদের স্বপ্নই দেখলে। কেন? মহারাজ উগাণ্ডি যে রাশি রাশি সোনার তাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে–সে কথা কি ভুলে গেছ? ভুলে গেছ–বলেছিলাম অঙ্কশায়িনী করতে চাই রাজকুমারী শামিনীকে? যাও, শিক্ষিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে এখনই যাত্রা কর। নজ্জাসী–নন্দিনীকে সসম্মানে বন্দী করে আন।"

"মূর্খ পরাবীন! বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে চেয়েছিলে? ভেবেছিলে সুন্দরী শামিনী তোমায় প্রেম নিবেদন করবে? হাঁ হাঁ হাঁ! হতভাগা, দেখবে, চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দেখবে রাজকুমারী হাসিমুখে উগাণ্ডির পার্শ্বে এসে বসেছে। জান না কি, রমণী ভালবাসে বীরপুরুষকে, কাপুরুষকে নয়। রাজকুমারীর দুঃখ কিসের? অভাব কিসের? স্তূপীকৃত স্বর্ণ–রৌপ্য–হীরা–মানিক্য তার মনোরঞ্জন করবে। শুনেছি, রাজকুমারী শামিনী পরমাসুন্দরী। তার রূপৈশ্বর্যের কাহিনী পরাবীনের মুখেই প্রাণভরে শুনবো। দৌবারিক!"

দ্বারপাল তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করে হস্তদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া অভিবাদন–পূর্বক অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল।

উগাণ্ডি পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিয়া উৎফুল্ল–বদনে স্মিতহাস্যে আদেশ দিল, "বন্দী পরাবীন!"

দৌবারিক চলিয়া গেল। সেনাপতি টরাম্‌পু তখন সৈন্যবাহিনী লইয়া নজ্জাসী রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু পরাবীনের নাম শুনিয়া পিয়েলোর মুখমণ্ডল সহসা বড় কালো হইয়া উঠিল, মন বড় চঞ্চল। সেখান হইতে পালাইতে পারিলেই যেন সে বাঁচে।

অল্পক্ষণ পরেই পরাবীনকে উগাণ্ডির সম্মুখে আনা হইল। বন্দীর হস্তপদ দৃঢ়ভাবে লৌহ–শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু প্রহরিগণ সে বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহার কটিদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করত রাজদরবারে লইয়া আসিয়াছে। হতভাগ্যের পরিধেয় বসন রঞ্জিত। দুই প্রহরীর স্কন্ধদেশে দুই হাতে ভর করিয়া কোনক্রমে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তিনি আসিয়াছেন। দুঃখে, যন্ত্রণায়, ঘৃণায় ও লজ্জায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ।

পরাবীন রাজসভার চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ বামদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি অবাক হইয়া দেখেন–পিয়েলো উগাণ্ডির পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট। মুহূর্তমধ্যে তাঁহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, সর্বাঙ্গে উষ্ণ রক্তস্রোত বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া মস্তকে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। পরাবীনের বুঝিতে বাকী রহিল না–পিয়েলোর বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার এই দুর্ভাগ্যের কারণ, সমগ্র নজ্জাসী–বাহিনী বিনাশের মূলে, মহামান্য নজ্জাসীর অপযশের মূলে এই বিদ্রোহী পিয়েলো। ক্রোধে তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল, শরীরে যেন ফিরিয়া আসিল মত্ত হস্তীর বল। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় কি! পিয়েলো যে তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে।

পরাবীন মানসিক উত্তেজনা যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়া অসভ্য–রাজকে ধীরে ধীরে বলিলেন, ''উগাণ্ডি! জানি, তুমি আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে পূরণ করবে কি আমার একটি মাত্র প্রার্থনা?"

উগাণ্ডি হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি প্রার্থনা বীরপুংগব? প্রেয়সী শামিনীকে দেখতে চাও? ধৈর্য ধর, এই দরবারেই তার সাক্ষাত ঘটবে। শুনতে পাবে আমার সংগে তার প্রেমালাপ।"

পরাবীনের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তবু রুষ্ট ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "না, আমার উদ্দেশ্য অন্যবিধ। সেনাপতি পিয়েলোর কানে কানে রাজকুমারী শামিনীর একটা সুসংবাদ জানাবো। পূরণ করবে কি আমার আকাঙ্ক্ষা?"

পিয়েলো চমকিয়া উঠিলেন। উগাণ্ডি হাসিতে হাসিতে বলিল, ''রাজকুমারীর সুসংবাদ? শামিনীর সুসমাচার? তা আবার কানে কানে বলবে? উত্তম, আমি মহামন্ত্রীর মুখেই সে সংবাদ শুনবো। যাও, বল গিয়ে কি বলবে!" উগাণ্ডি বন্দী পরাবীনকে পিয়েলোর নিকটে লইয়া যাইতে প্রহরীদের ইঙ্গিত করিল।

পরাবীনের মনস্কামনা বুঝি পূর্ণ হয়। একটা প্রবল ঝঞ্ঝাবর্ত যেন তাঁহার মস্তিস্ক আলোড়ন করিয়া প্রবহমান। নিদারুণ রোষে ওষ্ঠাধর দংশন করিতে

করিতে তিনি প্রহরীর স্কন্ধদেশ আকর্ষণ করিয়া কয়েক পা বামদিকে অগ্রসর হইলেন। তারপর ডানদিকের প্রহরীর কাঁধে ভর করত সহসা অক্ষত পদ দ্বারা পিয়েলোর বক্ষদেশে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক! নিমকহারাম! এই নে তোর পুরস্কার!" ক্রোধে তাহার আর বাক্যস্ফূরণ হইল না। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েলো আসনসহ ভূতলে ছিটকাইয়া পড়িলেন।

বন্দীর এত আস্পর্ধা! সকলে বিস্ময়ে হতবাক। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ব্যবহারে সভাসদসগণ সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায়, প্রহরিগণ বর্শা উত্তোলন করিয়া পরাবীনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। পিয়েলোও গাত্রোত্থান করিয়া একলম্ফে তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান। উগাণ্ডি তৎক্ষণাৎ ডান হস্ত উত্তোলনপূর্বক সকলকে অস্ত্র সংবরণ করিতে নির্দেশ দিয়া, মহাক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, "রে দুরাচার দুঃসাহসী, আমারই সম্মুখে আমারই মহামন্ত্রীর অপমান! মৃতু! মৃত্যু!! মৃত্যুদণ্ডই তোর প্রাপ্য! নজ্জাসীর সঙ্গে ক্ষুধিত হিংস্র পশুর পিঞ্জরে তোকে নিক্ষেপ করবো। মহামন্ত্রী পিয়েলো! আপনি না বলেছিলেন, রাজকুমারী শামিনী তার প্রেয়সী? দুরাত্মার চোখের উপর আমি নিশিদিন শামিনীর সঙ্গে প্রেমালাপ করবো। পাপিষ্ঠ তা স্বচক্ষে দেখে জ্বলে–পুড়ে মরবে। তারপর তাকে পাঠাবো কালঘরে। প্রহরী! নিয়ে যা শয়তানটাকে বন্দীশালায়। মহামন্ত্রী! অবিলম্বে প্রেরণ করুন আপনার সৈন্যদল টরাম্‌পুর সাহায্যে। চারিদিকে সতর্ক রাখুন প্রহরীদের। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রইলাম রণক্ষেত্রের সংবাদের প্রতীক্ষায়।"

পিয়েলো বিষণ্ন বদনে তরবারি কোষবদ্ধ করিলেন, মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। যাইবার কালে শুধু দুই নয়ন হইতে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া হতভাগ্য বন্দীর অন্তরে যেন আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। বন্দী পরাবীন ওষ্ঠাধর দাঁতে চাপিয়া পিয়েলোর প্রতি কট্‌ মট্‌ করিয়া তাকাইয়া অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন, "নিমকহারাম! শয়তান! মহামন্ত্রী!"

বন্দীর হাতে–পায়ে আবার বাজে ঝনঝন লৌহশৃঙ্খল। কালবিলম্ব না করিয়া প্রহরিগণ তাহাকে পুনরায় বন্দীশালায় লইয়া চলিল।

উগাণ্ডির এত বড় আনন্দোৎসব এক নিমেষেই মাটি। ক্রোধে তাহার কদাকার মুখমণ্ডল আরও কুৎসিৎ হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রুযুগল কুঞ্চিত। নরপতির

ইঙ্গিতে পার্শ্বে দণ্ডায়মান একটা অনুচর কক্ষস্থিত নাকাড়ায় তিনবার লগুড়াঘাত করিতেই সভাসদবৃন্দ ও অনুচরবর্গ প্রত্যেকে সম্মুখে হস্তদ্বয় প্রসারণপূর্বক অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিতে হটিতে সভাস্থল ত্যাগ করিল। উগাণ্ডিও সেই মুহূর্তে বিশ্রামের আশায় নর্তকীদল সঙ্গে লইয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পা বাড়াইবে, এমন সময় শুনিল বাহিরে তুমুল কোলাহল। দৌবারিক ছুটিয়া আসিয়া অভিবাদনপূর্বক অবনত মস্তকে নিবেদন করিল, ''মহারাজ! রাজপুরোহিত হিরোমা''।

উগাণ্ডি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিল, ''রাজপুরোহিত। ওহ্, ভুলেই গেছি, যুদ্ধযাত্রার পূর্বে দেবতা হারাপ্পীর পূজো দিতে হবে।''

উগাণ্ডি পুরোহিতকে অভ্যর্থনা করিতে দ্বারদেশে যাইবে, এমন সময় হিরোমা স্বয়ং দরবারে প্রবেশ করিয়া উগাণ্ডিকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিল। কৃষ্ণকায় পুরোহিতের সুদীর্ঘ দেহ রক্তরাগে রঞ্জিত, পরিধানে ক্ষুদ্র রক্তাম্বর, গলদেশে অস্থিমাল্য, শিরোদেশে রক্তাভ পাখীর পালক, ডান হস্তে দীর্ঘাকার এক শাণিত ছুরিকা; ভীষণ-দর্শন রাজপুরোহিত দরবার-কক্ষের চারিদিকে তাকাইয়া দেখে এক কোণে শ্বেতাঙ্গী নর্তকীদল জড়সড়ভাবে দণ্ডায়মান। রাজপুরোহিত সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ''মহারাজ! ঐ গৌরাঙ্গীদের কখনও স্পর্শ করেছ?''

উগাণ্ডি ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, ''না, ধর্মাধিকরণ। আপনার নিষেধ বাক্য কখনও লঙ্ঘন করি নি।"

পুরোহিত দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, ''হাঁ, সাবধান! যেদিন তুমি বিজাতীয় নারী স্পর্শ করবে, সেদিনই দেবতার অভিশাপে সব ধ্বংস হবে। মনে আছে বলেছিলাম– তারা দেবতার ভোগ?"

উগাণ্ডি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উত্তর করিল, ''সে কথা ভুলিনি প্রভু।''

হিরোমা পুনরায় বলিল, ''আমি শুধু দেবতার আদেশের প্রতীক্ষায় আছি, আদিষ্ট হলেই একে একে এদেরে দেবসেবায় বলি দেব মন্দিরে, গৌরাঙ্গীদের দেহরক্তে দেবতার দেহ রঞ্জিত করবো। কোন আপত্তি আছে মহারাজ?''

উগাণ্ডি মাথা নাড়িয়া বলিল,''না, রাজপুরোহিত।''

''কখনও দেবতার ভোগ স্পর্শ করনি?''

''না, কখনও না।''

"তুমি শুদ্ধাচারী?"

''অনাচার কখনও করিনি, প্রভু।''

''উত্তম। চল পাহাড়ের উপরে, হারাপ্পীর মন্দিরে পূজার শেষে দেবতার অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগবে। রণদেবতার আশীর্বাদ পেলে হাবশী রাজ্য বিজয় অবশ্যম্ভাবী।''

অনতিবিলম্বে একদল পাহাড়ী পুরুষ সমস্বরে নানাবিধ দুর্বোধ্য স্তোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে রণদেবতা হারাপ্পীর বিকটাকার দারুমূর্তি স্কন্ধদেশে বহন করিয়া তারাইন পাহাড়ের শিখরদেশে যাত্রা করিল। বাহকদের কটিবাস লোহিতাভ, গলায় অস্থিপঞ্জর, শিরে রক্তবর্ণ পাখীর পালক। পশ্চাতে আর একদল যুবক এক যুদ্ধবন্দী হাবশী পুরুষের বলিষ্ঠ দেহ কাষ্ঠখণ্ডে বন্ধন করিয়া বহন করিতেছে। অপর কয়েকজন যুবকের পৃষ্ঠদেশে মদ্য-বোঝাই বড় বড় মৃদ্‌ভাণ্ড। পশ্চাতে আর একদল স্ত্রী-পুরুষ মহোৎসাহে বাজাইয়া চলিয়াছে নানাবিধ কাড়া-নাকাড়া, শিঙ্গা-মৃদঙ্গ, ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। অস্তমান রবি তারাইন পাহাড়ের শিখরদেশ শেষ রশ্মিতে রঞ্জিত করিয়া যখন ধীরে ধীরে অস্তাচলে অদৃশ্য হইবে, ঠিক সেই মুহূর্তে মদমত্ত পুরোহিত দেবতার সম্মুখে শায়িত সেই হতভাগ্য বন্দীর বক্ষদেশে সজোরে ছুরিকাঘাত করিবে। বন্দীর দেহরক্তে দেবতার সর্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া পুরোহিত প্রথমে আপন গাত্র রঞ্জিত করিবে, তারপর মহাসমারোহে রাজা উগাণ্ডির দেহ চর্চিত করিবার পালা। ইহার পর সকল অসভ্য নর-নারী কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া বলির অবশিষ্ট রক্ত আপন দেহে মাখিয়া দেবতার চারিদিকে নৃত্যগীতে মত্ত হইবে। অসভ্যদের বিশ্বাস-পূজার শেষে নরবলির তপ্ত শোণিতে দেহ সিক্ত করিলে মোক্ষলাভ সুনিশ্চিত।

মন্দিরে পূজার শেষে ভোজনের পালা। তারপর প্রাঙ্গণে মদ্যপান, নাচগান; বাহিরে কত অনাচার-ব্যভিচার। মদোন্মত্ত যুবক-যুবতীর দল দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া বনভূমি মাতাইয়া তুলে, অশ্লীল বাক্যালাপে, ঢলাঢলিতে লজ্জা-শরম সব হারাইয়া ফেলে।

অসভ্যগণ অশেষ পূণ্য লাভের আশায় পীঠস্থানে রক্ষিত বলির নরদেহ তিন দিবস তিন রাত্রি কড়া প্রহরায় রাখিয়া দেয়। তারপর মৃতদেহ দুর্গন্ধযুক্ত হইলে বনমধ্যে নিক্ষেপ করে। বলিভূক পশু-পাখীর দল তখন টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া মহোৎসবে মাতিয়া ওঠে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় উৎসব রাত্রে প্রহরীরা ঘুমাইয়া পড়িলে কিংবা মদের নেশায় ঝিমাইতে থাকিলে, জঙ্গলের ভিতর হইতে নরখাদক অসভ্যগণ চুপিসারে আসিয়া মৃতদেহ চুরি করিয়া গভীর জঙ্গলে লইয়া যায়। এই ব্যাপারে নরখাদকদের সঙ্গে পুজারীদের প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহও হয়; কিন্তু মৃতদেহের সন্ধান আর পাওয়া যায় না।

রাজা উগাণ্ডি আর বাক্যব্যয় না করিয়া অবনত মস্তকে হিরোমার পশ্চাতে যাত্রা করিলেন। রাজ-পুরোহিতের আদেশ শুনিয়া নর্তকীদের কেহ কেহ ইতিমধ্যে দরবার কক্ষেই মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। নর্তকী নেত্রী শিমৃপি দাস-দাসীদের সাহায্যে ইহাদিকে উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে রাজন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

চুয়াল্লিশ

সুফিয়া সায়ফুনকে লইয়া রোজই সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যায়। হতভাগিনী প্রায় সমস্ত অপরাহ্নটাই সমুদ্রোপকূলে বসিয়া দরিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, নয়নদ্বয় কিছুতেই যেন ফিরিতে চাহে না। হাবিলকে হারাইয়া সুফিয়ার অন্তরও হতাশায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে; সেও সায়ফুনের পার্শ্বে বসিয়া সমুদ্রের দিকে উদাস নয়নে তাকায়।

সমুদ্রের গুরুগম্ভীর গর্জনধ্বনি এই বিরহবিধূরা যুবতীদ্বয়ের প্রাণে এক অপূর্ব আবেশের সৃষ্টি করে। এক একবার ঢেউয়ের পাহাড় পাড়ে ভাঙিয়া, মর্মভেদী আর্তনাদ সহকারে চূর্ণীকৃত বারিকণাগুলো উভয়ের দেহে সিঞ্চন করিয়া যায়। আবার কোন সুদূর হইতে ঊর্মিমালা গর্বভরে মাথা উঁচু করিয়া সমগ্র দেশ যেন প্রলয়-প্লাবনে ভাসাইয়া দিতে ছুটিয়া আসে। কিন্তু পাড়ের প্রস্তর-সংঘাতে বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের সে গর্ব বুঝি নিমেষে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। তরঙ্গমালা পরাজয় স্বীকার করিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অফুরন্ত ফেনপুঞ্জ নিঃসরণ করিতে করিতে গুমরানো গোঙানীতে ফাটিয়া ধ্বসিয়া পশ্চাতে সাগরবক্ষে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। আবার বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে, আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। সায়ফুন তন্ময় হইয়া ভাবে-সাগরের ঐ বিরামহীন আক্রমণ কবে শেষ হইবে কে জানে। কিন্তু শেষ একদিন হইবেই। শুনিয়াছে সে আখেরে শ্রান্তিহীন অধ্যবসায়ের জয় অনিবার্য। প্রমত্ত মহাসমুদ্র বিশজোড়া প্লাবনে নিখিল-ভুবন একদিন ডুবাইয়া ছাড়িবে, সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া বিজয়োল্লাসে নৃত্য করিতে থাকিবে। সেই অনাগত কাল, সেই মহাপ্লাবনের বিরাট ধ্বংসলীলা নিজেই শুধু প্রত্যক্ষ করিবে, আর কোন জনপ্রাণী লক্ষ্য করিবার থাকিবে না।

সেইদিন অপরাহ্নে উভয়ে সমুদ্রতীরে একখণ্ড বড় পাথরের উপরে বসিয়া কত কথা যে ভাবিতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। উভয়ের নয়নপথে ভবিষ্যত জীবনের অস্পষ্ট অন্ধকার-ছায়া বড় নৈরাশ্যময়। উভয়েই নীরব। সায়ফুন প্রথমে

সেই নীরবতা ভাঙিয়া বলিল, "ভগ্নী সুফিয়া! আর কতকাল তোমার আশ্রয়ে এভাবে বসে বসে কাটাবো?"

সুফিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল, "আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছি। মূর্খ বেদুঈনগণ বড় হিংস্র, বড় দুরন্ত! জানি না, এই নাদান দুর্বৃত্তদের লোলুপ দৃষ্টির বাইরে আর কতদিন তোমাকে আড়াল করে রাখতে পারবো।"

সায়ফুন। মিছেমিছিই শুধু ভাবছ সুফিয়া। আমার মানসম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয়ে শঙ্কিত হয়েছ? এই হতভাগিনীর হাতে একখানা তলোয়ার দাও, দেখবে– সকলের লোলুপ দৃষ্টিই অন্ধ হয়ে যাবে। সে কথা নয়। এখানে নিশ্চেষ্ট বসে থাকলে আমার উদ্ধারের যে কোন আশাই নেই, রায়হানকেও ফিরে পাবার কোন উপায় দেখি না। তোমার উপকার জীবনে ভুলবো না সুফিয়া। অনেক কিছুই ত করেছ, আর একটু মদদ্ করবে বোন?

সুফিয়া। নিশ্চয়ই করবো। কি করতে পারি বল? কিন্তু একটি কথাই যে বারবার ভাবছি।

সায়ফুন। কি কথা সুফিয়া?

সুফিয়া। তুমি বড় নির্ভীকা তা আমি জানি কিন্তু বেদুঈনদের স্বভাব কত ক্রুর তা ত তোমার জানা নেই। আর তিন মাসের অধিক কাল তোমাকে যে আশ্রয় দিতে পারবো না, সেই কথা ভেবেই বড় উদ্বিগ্না হয়ে উঠেছি। তিন মাস পরে তুমি আমার আশ্রয় থেকে বিদায় নিলে হয়তো এই বর্বর শয়তানগুলোর কবলে পড়বে– এই আশঙ্কায় নিশিদিন যে কত অশান্তি ভোগ করছি, তা বলে আর শেষ করার নয়। আমার আব্বাও এ বিষয়ে নিরুপায়, কেননা কড়া শাসনে বিদ্রোহের আশঙ্কা যে রয়েছে পুরোপুরি।

সায়ফুন! এত ভেবে কোন ফায়দা নেই, সুফিয়া! তুমি ত আর আমার অদৃষ্ট খণ্ডাতে পারবে না? দুঃখভার সয়ে সয়ে অন্তর যার কঠিন হয়েছে, শত দুঃখেও সে আর কাতর হয় না। আমিও যে এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। আরও তিন মাস থাকতে পারবো বললে না? ভালই হলো। সেইজন্যেই তো বলছি, আমার আর একটু উপকার করবে বহিন?

সুফিয়া। কেন করবো না! কি করতে হবে বল?

সায়ফুন। ঠিক করেছি, জঙ্গলের শুকনো কাঠ কেটে একটা ভেলা তৈরী করবো। সেই ভেলায় ভেসে চলে যাব মুলকে–হাবাশ। রায়হান যে সেই দেশেই বাস করে বোন? একা একা কাঠ কাটা তো সম্ভব হবে না, তাইতেই তোমার সাহায্য চাইছি।

সুফিয়া। তুমি কি পাগল হয়েছ? ডোঙ্গায় চড়ে কখনও কি দরিয়া পার হওয়া যায়? কোথায় শুনেছ এমন আজগুবি কথা?

সায়ফুন। কেন, তুমিই না স্বচক্ষে দেখেছিলে, ঈসের জঙ্গল থেকে রায়হান ও কয়েকজন মুসলমান এক ক্ষুদ্র নৌকায় ভেসে চলেছিল?

সুফিয়া। তারা ত গিয়েছিল নৌকায়, আর তুমি কিনা এক ক্ষুদ্র ভেলায় দরিয়া পার হবার খা'ব দেখছো। সমুদ্রের প্রথম তরঙ্গাঘাতেই তা চূর্ণবিচূর্ণ হবে, আর তুমি অতল সায়রে হাবুডুবু খাবে।

সায়ফুন। ভালই হবে। কৃতকার্য হই ভাল, না হলে প্রিয়তমের সন্ধানে এই জলধিবক্ষেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করবো। পরলোকে গিয়ে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকবো। সেখানে মিলন একদিন ঘটবেই। সেই অমরলোকে তাকে একদিন আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াতেই হবে। এখানে সে ফিরে এলে দরিয়ার বুকে ঐ বুদ্বুদগুলো দেখিয়ে বলো তোমার প্রিয়া, ঐখানে ঐ সাগরবক্ষে বিশ্রাম নিয়েছে।

সুফিয়া। অত হতাশ হয়ো না, বিপদে ধৈর্য হারালে চলে না। আচ্ছা দাঁড়াও, বেশ, একটা মতলব মাথায় খেলছে, ঐ বুঝি শয়তান আবিদ এই দিকেই যেন আসছে, জঙ্গলের ধারে হয়তো মেষ চরাতে এসেছিল, পশ্চাতে দেখ নিমকহারাম কাবিলটাও রয়েছে। জান না, এই আবিদ তোমার প্রতি বড় লোভী হয়ে উঠেছে? আর ঐ কাবিল! চেন না হারামীকে? ওটা আমার হাবিলের ভাই। হাবিল নিখোঁজ হওয়ায় শয়তানটা হালে আমার দিকে নযর দিয়েছে। দাঁড়াও দেখি, লেজে খেলিয়ে এদের সাহায্য একটা নৌকা তৈয়ার করাতে পারি কিনা। তোমাকে সেই নৌকায় হাবশী মুল্লুকে পাঠাতে পারলে মন্দ হয় না।

সায়ফুন। কিন্তু মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আখেরে কাউকে বঞ্চনা করবে, আমি তা চাই না। তার চেয়ে কাঠ কেটে নিজেই একটা নৌকা তৈরি করতে শুরু করবো।

সুফিয়া কোন কিছু আর উত্তর করিল না। একটু পরেই আবিদ ও কাবিল সেখানে উপস্থিত হইলে সুফিয়া ইঙ্গিতে আবিদকে নিকটে ডাকিয়া তাহার কানে কানে কি যেন বলিয়া দিল। আবিদ হাসিতে হাসিতে সায়ফুনের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ গো সুন্দরী! আমার দিলের মক্‌সুদ পূরণ হবার আর কত দেরি? কবে আলো করবে আমার তাঁবু?"

সায়ফুনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার গোলাপী গণ্ডদ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। রাগে ওষ্ঠাধর কামড়াইতে কামড়াইতে ভ্রুযুগল কুঞ্চিত করিয়া আবিদকে সে বলিল, "তোমার হাতে কি ওটা?"

আবিদ খুশী হইয়া বলিল, "কেন, চেন না? এটা ত লাঠি। এই দিয়ে আমি মেষ তাড়াই, গাছের ছোটখাট ডালপালা ভেঙ্গে ভেড়া আর দুম্বাদের খাওয়াই। দুশমনের হামলা থেকেও নিজকে বাঁচাই।"

সায়ফুন রোষ-প্রদীপ্ত নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "এটি একবার দিতে পার আমার হাতে। এই লাঠিই বলে দেবে, আর কতদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

সুফিয়ার মনোযোগ অন্যদিকে। সে একটু দূরে কাবিলকে ডাকিয়া নিয়া তার বদ্‌খেয়ালের জন্য শাসাইতে ব্যস্ত।

আবিদ সায়ফুনের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি কি মায়াবিনী? যাদু জান নাকি? না, মূসা নবীর কেরামতি শিখেছ? তিলিস্‌মাত দেখাবে নাকি? হাঁ গো সুন্দরী, আমার লাঠি দ্বারা যাদুকাঠি তৈরি করবে বুঝি?" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে লাঠিখানি সায়ফুনের দিকে নিক্ষেপ করিল।

সায়ফুন তৎক্ষণাৎ যষ্টিখানি কুড়াইয়া লইয়া ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় আবিদকে আক্রমণ করিল, প্রহারে প্রহারে তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। প্রণয়াবেগে উল্লসিত আবিদ তখন হতভম্ব। অস্ত্রহার। হতভাগ্য বেদুঈন অসহ্য বেদনায় ভূতলে

লুটাইয়া 'প্রাণ যায়, প্রাণ যায়' বলিয়া চিৎকার শুরু করিয়াছে। উন্মত্ত সায়ফুন প্রহারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিয়া গর্জিতে লাগিল, ''হারামজাদা শয়তান, আজ তোর শাদীর সাধ চিরতরে মিটাবো।"

সুফিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া আবিদকে টানিয়া সরাইল। শিকার হাতছাড়া হওয়ায় সায়ফুন তখন ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে অধরোষ্ঠ কামড়াইতেছে। বেগতিক দেখিয়া কাবিল দশ হাত দূরে সরিয়া ভয়ে কম্পমান! আবিদের প্রণয়-নেশা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাগে নয়নযুগল রক্তবর্ণ, সেখানে প্রতিহিংসানল ধকধক করিয়া যেন জ্বলিতেছে।

সুফিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না-সায়ফুন নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে খোঁচা দিয়া জাগাইয়াছে, আর রক্ষা নাই। অসভ্য বেদুঈনরা ক্রুদ্ধ হইলে কত যে অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে, এই কুরাইশ অন্তঃপুরবাসিনী কিরূপে তাহা বুঝিবে?

সুফিয়া হাসিমুখে আবিদের হাত ধরিয়া বলিল, ''একটু আড়ালে চল! বড় একটা মজার খবর আছে। সায়ফুন যে তোমাকে আক্রমণ করলো, তার অর্থটা কি কিছু বুঝেছ?''

আবিদ গায়ের ধূলিবালি ঝাড়িতে ঝাড়িতে ক্রোধভরে উত্তর করিল, ''অর্থ আবার কি বুঝবো! রাক্ষসী ত আমাকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল! এর প্রতিশোধ না নিয়ে কি ছাড়বো ভেবেছ? আমিও রাশেদের বেটা আবিদ, হুঁ!'' রাগে আবিদ গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।

সুফিয়া বলিল, ''তুমি দেখছি একটি অপদার্থ, নিরেট রেওকুফ। আহাম্মক এও জান না, এরা কাউকে পিয়ার করলে এইভাবে প্রথমে অনুরাগ প্রকাশ করে! একেবারেই জংলি তুমি!''

নিমেষে আবিদের ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, ''ও তাই নাকি! তা' আমি কি করে জানবো? এদের আচার-ব্যাভার দেখছি বড়ই অদ্ভুত! আমি ত ভয়েই মরেছিলাম! শেষটায় বুঝি আওরতের হাতেই মারা পড়লাম। হাঁ সুফিয়া, কি বললে, মেয়েটি পিয়ার করে আমাকে?''

সুফিয়া ক্রোধের ভান করিয়া বলিল, ''তুমি বড় হাবা, সব মাটি করবে দেখছি! আমার সঙ্গে এদিকে এস ত, তোমার ঐ গর্দভটাকেও ডেকে আন। আচ্ছা সব সময় দেখি ওর ঘাড়ে ঘাড়েই চেপে বেড়াও, ব্যাপারটা কি বল ত? দু'জনে যে বড় ভাব, বড় দল বেঁধে চল। দু'জনকে কি একই ভূতে পেয়েছে নাকি?''

আবিদ খুশী হইয়া ইঙ্গিতে ডাকিতেই কাবিল উৎফুল্ল-হৃদয়ে ছুটিয়া আসিল। তারপর উভয়ে হাসিতে হাসিতে সুফিয়ার পিছু পিছু কিছুটা দূরে সরিয়া গেল।

সায়ফুন ততক্ষণে লাঠিখানি হাতে লইয়াই পুনরায় সমুদ্রতটে সেই পাথরের উপর গিয়া বসিয়াছে।

সুফিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ''একটা কাজ করতে হয় যে আবিদ? সায়ফুনের সমুদ্রে বেড়াবার বড় সাধ। একটা নৌকা না হলে ত চলে না! যেমন করেই হোক নৌকা একটা তৈরী করতেই হবে। আমারও বড় সখ চাঁদনী রাতে দরিয়ায় ভেসে ঢেউয়ের তালে তালে খেলা করি; নৌকাখানি দুলে দুলে কেমন নাচে, তা' নয়ন ভরে দেখি। বড় আমোদ হবে, না আবিদ? তোমরা দু'জনও থাকবে আমাদের সঙ্গে। পারবে না আবিদ? কাবিল, পারবে না আমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে?''

আবিদ আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, ''এই কথা! আমি তিন মাসের মধ্যে লোকজন লাগিয়ে নৌকা তৈরী করে ফেলবো। কি বল কাবিল, পারবে না?''

কাবিল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, ''আমার যে পানিতে বড় ভয় লাগে, মিয়া ভাই! নৌকায় আমি উঠতেই পারি না। কেমন ধারা যেন ভিরমি লাগে; কেবল মাথা ঘুরে।''

সুফিয়া আবার কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিল, ''তুমি ত বড় বুজদিল কাবিল। নৌকায় উঠাবার আগে প্রথমেই তোমাকে হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলবো, নইলে তোমার ভয় ভাঙবে না। আচ্ছা এই অপদার্থটাকে পেছনে পেছনে বয়ে বেড়াও কেন আবিদ? এত বড় কাপুরুষকে আমি বরদাশ্‌ত করতে পারবো না।"

আবিদ ক্রোধে কাবিলের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, ''গর্দভ! ইয়ে মোটা হয়েছিস্ শুধু? বুদ্ধি আছে এক তোলা? যা বলি শোন্। আমার

কথার অবাধ্য হবি ত মাথার খুলি উড়িয়ে দেব কিন্তু। হতভাগা! তুই না বলছিস্ শাদী করবি সুফিয়াকে? এমন করলে কখনও মেয়ে মানুষের মন পাওয়া যায়? যা, শিগ্গির গিয়ে এরশাদ, লাহাব ও তৈফুরকে ডেকে আন্! এক একজনকে এক-একটা বড় কুড়ালি নিয়ে ঐ জঙ্গলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল্। আজই বড় বড় কয়েকটা গাছ কেটে ফেলবো। চললাম আমি গাছ খুঁজতে।'' এই বলিয়া আবিদ সায়ফুনের দিকে একবার অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গুন গুন করিয়া গান করিতে করিতে বনের দিকে চলিয়া গেল। কাবিলও পল্লীর দিকে ছুটিল এরশাদ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের ডাকিয়া আনিবার জন্য।

সুফিয়া হাসিতে হাসিতে সায়ফুনের কাছে আসিয়া বলিল, ''নৌকা ঠিকই তৈরী হবে দেখো, কিন্তু মাঝি পাব কোথায়? সেই বেটা হারিস কবে যে গেছে এখনও ফিরবার নাম নেই। তাকে পেলে আমরা দুই বহিনে দাঁড় টানতাম, আর তাকে দিতাম হাল ধরতে। কি বল?''

সায়ফুন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ''না, তোমাকে সঙ্গে নেওয়া হবে না। হাবিল একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে! মুক্তিলাভ করে তোমাকে না পেলে সে যে পাগল হয়ে যাবে! আমি আমার দুঃখ লাঘব করবার অন্য উপায় ঠিক করে ফেলেছি।''

সুফিয়া প্রশ্ন করিল, ''কি উপায় বহিন?''

সায়ফুন। সে এখন বলবো না; পরে জানতে পারবে।

সুফিয়া। বেশ, তাই হবে; এইবার তাঁবুতে চল। চেয়ে দেখ, বেলা আর বেশী নেই, আর বিলম্ব করা চলে না।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই সায়ফুনের বুকে গুমরিয়া বাহির হইল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। সীমাহীন সমুদ্রের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে সে সুফিয়ার অনুগমন করিল।

পঁয়তাল্লিশ

কুলছুম তাহার স্বামীর উপদেশ ভুলে নাই। পরদিনই সে আয়াযকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলের নিভৃত অংশে মুহাজিরদের খুঁজিয়া বাহির করিল। সে অবাক হইয়া দেখে–অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে অরণ্যানীর প্রাচীরঘেরা প্রান্তরটি বড় সুন্দর। চারিদিকে জনহীন বনানীর কোলে সুনিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া–শ্যামলিমা, নির্বাসিত সন্তাপীদের অন্তরের জ্বালা দূর করিতে, চক্ষু জুড়াইতে, মন–ভুলানো বেশে কেমন সাজিয়া বসিয়াছে। কত মনোরম পরিবেশ। আত্মীয়–স্বজন এবং পার্থিব সম্পদ ছাড়িয়া সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া, আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করিবার উপযুক্ত স্থানই বটে। কুলছুমের অন্তরে আনন্দ আর ধরে না। দুঃস্থা নারী ও বালক–বালিকাদের সঙ্গে আলাপ–পরিচয় করিয়া হৃদয়ের যত স্নেহ মমতা তাহাদিগকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলকে সে আপন করিয়া তুলিল।

বৃদ্ধ আয়ায সেইখানে থাকিয়া নবাগত মুসলমানদের আহার্য সংগ্রহে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সে অঞ্চলের পথ–ঘাট তাঁহার জানাই ছিল। আল্লাহ্‌র মরজি অল্পায়াসেই নদীতটে এক খর্জুর বনের সন্ধানও পাওয়া গেল। মুহাজিরগণ সেই স্থান হইতে প্রত্যহ খর্জুর ও বুনো ফলমূল সংগ্রহ করিয়া কায়ক্লেশে কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহারা আয়াযের উপদেশক্রমে কয়েকদিনের মধ্যেই জঙ্গলের কাষ্ঠ ও খর্জুর–পত্র সংগ্রহ করিয়া মাথা গুঁজিবার মত কতকগুলো ছোট ছোট কুটীরও নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন।

মুহাজিরদের অনুরোধে পত্নী উম্মে–সালমাকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ আয়ায সেই স্থানেই বসবাস করিতে লাগিলেন। শুধু নিরাশ্রয় মুসলমানদের আহার্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; পরন্তু মক্কা শরীফের উৎপীড়িত, দুঃস্থ মুসলমানদের কানেও গোপনে গোপনে পৌঁছাইতে লাগিলেন

এই নিরাপদ বনভূমির বাসিন্দাদের সংবাদ। খবর পাইয়া সেই সকল হতভাগ্যদের অনেকেই এই জঙ্গলে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বনমধ্যে গড়িয়া উঠিল মুসলমানদের এক ক্ষুদ্র উপনিবেশ। এই স্থানে মুসলমানগণ কুরাইশদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করিলেন।

নিদারুণ অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টেই মুসলমানদের দিন কাটে। ওৎবা ও জোহরার অন্তর অনুতাপানলে পুড়িয়া দিন দিন যেন খাক হইতে শুরু করিয়াছে। তাহারা উভয়েই যে সায়ফুনের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ-এই কথা তাহাদের অন্তরে অহরহ কাঁটার ন্যায় খচখচ করে। কিছুতেই তাহারা ভুলিতে পারে না, সেই করুণ কাহিনীর অমলিন স্মৃতি।

কুলছুম রোজই তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করে সায়ফুন ও রায়হানের কথা। সেইদিন সন্ধ্যায় খেজুরের আঁটি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে নানা কথাই সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল উম্মে-সালমাকে। বৃদ্ধা উদূখলে গুঁড়াগুলো খোঁচাইয়া উলট পালট করিতে করিতে উত্তর দিতেছিলেন। কথায় কথায় হাবশী দেশের কথা উঠিল। গুঁড়াগুলো ঝাড়িতে ঝাড়িতে কুলছুম জিজ্ঞাসা করিল, ''আম্মা! সেই দেশের খোঁজ-খবর কিছুই ত পাই না। যিনি তাহার সন্ধানে গেলেন তাঁরও যে ফেরার নাম নেই!''

উম্মে সালমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ''বেটি, সে দেশ কি আর এখানে? তাছাড়া, কত ডাইনী-পিশাচ আর বাঘ-ভালুক সেই দেশের পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করে। আল্লাহ্ মেহেরবান হলেই না ফিরে আসা সম্ভব।"

কুলছুম কাজ ভুলিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ডাইনী-পিশাচ! কি বলেন আম্মা?"

''তা নয় ত কি! যে মানুষ মানুষ ধরে খায়, সে পিশাচ ছাড়া আর কি?''

''মানুষে মানুষ খায়?''

''হাঁ বেটি। হাবশী ছাড়া অন্য মানুষ চোখে পড়লে নাকি রক্ষে নেই। শুনেছি, সেই দেশের নদীর ধারে আজরাইলের পাহাড় নামে এক বিরাট পাহাড় আছে।

জংলীরা মাঝে মাঝে সেই পাহাড়ের গভীর গর্তে নরহত্যা করে ভোজের আয়োজনেমাতে।''

''পথে-ঘাটে যাকে পায় তাকেই হত্যা করে?''

''না, অসভ্য কৃষ্ণকায় মানুষ তারা বড় একটা খায় না। পরদেশী মনুষ্য নাকি দেবতার খুব প্রিয় খাদ্য। ঘটা করে দেবতার সম্মুখে তাদের বলি দিয়ে, সেই মাংস তারা ভক্ষণ করে।”

''তবে যে শুনেছি, রাজা বড় দয়ালু? সেই সব নর-রাক্ষসদের তিনি কি শায়েস্তা করতে পারেন না?”

অসভ্য রাক্ষসেরা পাহাড়ে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। খুনখারাবি তারা গোপনেই করে থাকে। রাজার কানে সেই সংবাদ বড় একটা পৌঁছে না।” এই বলিয়া উম্মে সালমা ধীরে ধীরে বর্ণনা করিতে লাগিলেন নরখাদক পাহাড়ীদের নরহত্যার কয়েকটা শোনা কাহিনী। গল্প শুনিয়া কুলছুম কাঁদকাঁদ-স্বরে বলিল, “কি হবে আম্মা! রায়হান ও সায়ফুনের দশা তবে কী হবে? আর আমার শওহর!” কুলছুম ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু পানিতে টলমল।

উম্মে সালমা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “ভয় কি মা ছবিল! আল্লাহর রহমতে তোমার খসম তাদের নিয়ে ফিরে আসবেন দেখো। আল্লাহ্‌কে ডাক। বিপদে সহায় ত তিনিই!”

কিন্তু কুলছুম অন্তরে শান্তি পায় কই। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় তাহার হৃদয় পুঞ্জীভূত, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত, মানস নেত্রে ভাসিয়া উঠিল-হাবশী-রাক্ষসেরা অসহায় রায়হান ও হতভাগ্যা সায়ফুনকে যেন ছিন্নভিন্ন করিয়া উদরস্থ করিয়াছে, শুধু তাহাদের অস্থিপঞ্জর সেই পাহাড়ের গুহাতলে পড়িয়া আল্লাহর দরবারে বুঝি ফরিয়াদ জানায়। আর তাহার স্বামী!

কুলছুম আর চিন্তা করিতে পারে না। তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, বুকের ভিতরে তুষানল যেন ঘুষে ঘুষে জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। কাজ ভুলিয়া অবনত মস্তকে সে বসিয়া রহিল বহুক্ষণ। তাহার আয়ত অক্ষি-পল্লব বাহিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরঝর ধারায় প্রবহমান।

ভুবন ঘিরিয়া রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে কোনক্রমে হাতের কাজগুলো গুছাইয়া রাখিয়া কুলছুম শয্যা গ্রহণ করিল। উম্মে–সালমা কতবার আসিয়া ডাকিলেন, " বেটি ছবিল! কিছু মুখে দে আম্মা।" কিন্তু কুলছুম উঠিল না। আয়ায গৃহে নাই, কার্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন। অগত্যা বৃদ্ধাও না খাইয়া কন্যার পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

শেষরাত্রে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিল কুলছুম। চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল– বিরাট তুষার–কিরীটিনী আজরাঈলের পাহাড়। সম্মুখে অনন্তপ্রসারী খরস্রোতা নদী সেই পাহাড়ের পাদদেশ বিধৌত করিয়া কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ নাদে প্রবহমান। পশ্চাতে বহুদূরে দিগ্বলয়ে যেন মিশিয়াছে বিশাল কৃষ্ণবনানী। কুলছুম প্রবাহিনী–বক্ষে মুগ্ধ নয়নে তাকাইয়া দেখিল–একখানি ক্ষুদ্র তরণী তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে ভিড়িল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার ভিতর হইতে এক হতভাগ্য বন্দীকে হুড়াহুড়ি করিয়া টানিয়া লইয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিল একদল অসভ্য কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। কী কদাকার তাহাদের চেহারা! সকলেই শুধু কৌপিন পরিহিত। উল্লাস–মত্ত অসভ্যগণ সাদা ধবধবে দন্তপাটি বাহির করিয়া হৈ–হুল্লোড়ে ও উদ্দাম নৃত্যে পাহাড়ের গা যেন কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। ভয়ে কুলছুমের সর্বাঙ্গ শিহরিত।

তাহার নযরে পড়িল–বন্দী পুরুষ মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দুরন্ত নরপিশাচদের কবল হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতেছে না। করালবদন অসভ্যগণ বন্দীসহ পাহাড়ের অভ্যন্তরে এক গভীর গুহাগর্ভে অবতরণ করিয়া বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিল। উজ্জ্বল আলোকে কুলছুম পরিষ্কার দেখিল, গুহার তলদেশে স্তূপীকৃত অস্থিপুঞ্জ। পিশাচেরা গুহাতল কতকটা পরিষ্কার করিয়া, সেখানে এক বিকটাকার দানবমূর্তি স্থাপন করতঃ মহোল্লাসে পূজার উপচার গুছাইয়া নরবলির আয়োজনে মত্ত। উপরে গুহামুখে এক ভীষণাকৃতি পিশাচ–পুরোহিত দণ্ডায়মান। তাহার অপলক শ্যেন দৃষ্টি পূর্বদিকে নিবদ্ধ। উষার আগমনে যেই মুহূর্তে বালারুণ দিকচক্রবাল –পটে প্রথম আলোক–রেখা আঁকিয়া পশ্চাদ্দেশে তুষার ধবল গিরি–শিখরে অজস্র হীরার ফুল–ফুটাইয়া তুলিবে, ঠিক সেই মুহূর্তে পুরোহিত দুই হস্ত উপরে উঠাইয়া নরবলির নির্দেশ

দিবে। অসভ্যদের বিশ্বাস অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নরবলি দিলে পূজারীদের মোক্ষলাভ সুনিশ্চিত।

সহসা গুহাতলে চিৎকার-ধ্বনি শুনিয়া স্বপ্নাবিষ্টা কুলছুম চকিত-নয়নে চাহিয়া দেখে, একদল কৃষ্ণকায় অসভ্য পুরুষ মুক্তি প্রয়াসী সেই শায়িত বন্দীকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া পুরোহিতের নির্দেশ-প্রতীক্ষায় উপরে গুহামুখে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। বন্দীর পার্শ্বদেশে উদ্যত কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান এক ভীষণাকার ঘাতক। পর্যাপ্ত মদ্যপানে মাতাল অসভ্যেরা চারিদিকে তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করিয়াছে। ভয়-বিহবলা কুলছুম বন্দীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে হতভাগ্য যে আর কেহই নহে- তাহারই স্বামী রাহেল! দেখিবামাত্র এক সুতীক্ষ্ণ শেল তাহার বক্ষস্থল যেন এপার-ওপারে বিদীর্ণ করিল, বুক-ফাটা করুণ আর্তনাদ সহকারে তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে সে লুটাইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ কুলছুমের চিৎকার শুনিয়া উম্মে-সালমা জাগিয়া উঠিলেন। তিনি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "আম্মা ছবিল! কি হয়েছে বেটি?"

কুলছুমের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। বৃদ্ধা দেখিলেন সদ্যোত্থিতা বিরহিণী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে থর থর কম্পমান। সর্বাঙ্গ ঘর্মাপ্লুত। বৃদ্ধার গললগ্ন হইয়া কুলছুম কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলিল, "আম্মা ! এ-কি দেখলাম? কি হবে আম্মা? কি করে যাব? ইয়া আল্লাহ!" এই বলিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া সে বাহিরে ছুটিতে উদ্যত হইল।

উম্মে সালমা তাহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "কোথায় যাবে বেটি? খা'ব দেখে ভয় পেয়েছ বুঝি? খা'ব কখনও সত্য হয়?"

"সত্য হয় না আম্মা?"

"না- না! ও- ত শুধু বদ্‌খেয়াল আর বদহজমীর ফল। মিছে কেন ভয় পাচ্ছ। কি দেখেছ বেটি?"

"আম্মা! সে দৃশ্য বর্ণনা করার সাহস আমার হয় না। অসভ্যেরা আমার শওহরকে ধরে নিয়ে যেন হত্যা করছে। আল্লাহ্ না করুন, আমার স্বামী যদি সত্যি কোন বিপদে পড়ে থাকেন! কি হবে আম্মা? কি করে যাব?"

"কেন এত ব্যাকুলা হয়েছ? আল্লাহ্‌র মরজি সে ফিরে আসবে ঠিকই।"

কিন্তু কুলছুম শান্তি পায় কই ঘরের বাহির হইয়া দেখে-রাত্রি আর নাই, অন্ধকার দূর হইয়াছে। একটু পরে সে উম্মে সালমা ওযু করিয়া নামায পড়িতে বসিল! উভয়েই রাহেলের কল্যাণ কামনা করিয়া এক মনে কত মোনাজাত করিল রহমানুর রহিম আল্লাহ্‌র দরবারে।

নামায শেষ করিয়া কুলছুম এক মুহূর্তও গৃহমধ্যে তিষ্ঠিতে পারিল না। পায়চারি করিতে করিতে সে ওৎবার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত। দেখিল-দ্বার খোলা, ওৎবা নামাযে দণ্ডায়মান। গৃহের এক প্রান্তে তহুরার সপত্নী তাহার শিশু-সন্তানদের পার্শ্বে লইয়া তখনও শায়িতা। তহুরা অসুস্থা।

যোহরা শয্যায় ছিল না। ঘরের ভিতর হইতে রাত্রির উচ্ছিষ্ট ও তরিতরকারির খোসা, জঞ্জাল প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিতে সে বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে-দ্বারদেশে কুলছুম। অবাক হইয়া সে বলিল, "ভাবী এত সকালে! কী ব্যাপার?"

কুলছুম উত্তর করিল, "ভাল ঘুম হয়নি বোন, বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি! যোহরা তাহাকে ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বলিল, "বস ভাবী, কেন এত উন্মনা হয়েছ বল? কিছু অমঙ্গল দেখেছ?"

কুলছুম স্বপ্ন বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। যোহরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আল্লাহ্‌ই মালুম, ভাইজান কোথায় আছেন। এখনও কেন যে ফিরলেন না! কে জানে, রায়হান ও সায়ফুনের অদৃষ্টেই বা কি ঘটেছে?"

নামায শেষ করিয়া ওৎবাও আসিলেন কুলছুমকে সান্ত্বনা দিতে। কুলছুম তাহাকে বলিল, "তুমি একবার যাও না ভাইজান! দরিয়ার ধারে ধারে খুঁজে দেখ না, কোন নৌকা আসে কিনা! বৃদ্ধ আয়ায কতদিন ত সন্ধান করেছেন, তাঁকে কত আর বলবো!"

যোহরাও তাহার স্বামীকে বলিল, "হাঁ কুলছুম ঠিকই বলেছে। এতদিনেও ভাইজান কেন যে ফিরলেন না! না জানি তার ভাগ্যে কি ঘটেছে! আর রায়হান ও

সায়ফুন! সায়ফুনের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা না চাইলে পাপের প্রায়শ্চিত্তও যে হবে না। তুমি যাও না।”

ওৎবা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পায় না। অনুশোচনার তীব্র দাহন তাহার অন্তরেও যে তুষানলের ন্যায় জ্বলিতেছিল। চাহিয়া দেখে, বিষণ্ন বদনা কুলছুমের দুই নয়ন বাষ্পাকুল। কোন কিছু না বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু এত দূরপথ যাইবে কিরূপে? ওৎবার যে অশ্ব নাই। অগত্যা আয়াযের ঘোটকীটি চাহিয়া আনিয়া জঙ্গলের ধারে কতক্ষণ সে চড়িতে দিল। তারপর সামান্য কিছু আহারের পর বন্ধু-বান্ধবদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিতে আর দেরি করিল না।

পল্লীর সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র প্রান্তর পার হইয়া ওৎবা নদীর পারে পারে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথ-ঘাট সে অঞ্চলে নাই। কোনক্রমে জঙ্গলের ভিতরে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পূর্বদিকে সমুদ্রের ধারে বড় রাস্তার সন্ধান মিলিবে।

সূর্য উঁকি মারিয়াছে। উপরে নীলাকাশে রবি-রশ্মির সোনালী আভায় শুভ্র মেঘের টুকরাগুলো কেমন উদ্‌ভাসিত। মনোলোভা স্নিগ্ধ সমীরণ নীলাম্বর বক্ষদেশে লুটোপুটি খাইয়া ধীরে ধীরে মরুভূমির বুকে একটানা প্রবহমান।

ছয়চল্লিশ

কাল্লিনীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পুনরায় মেদিনী কাঁপাইয়া রণ–দামামা আর কাড়া–নাকাড়া গর্জিয়া উঠিয়াছে। সেই প্রস্তর –কঙ্কর–সমাকুল পাহাড়গুলো ও তৃণ–গুল্মাচ্ছাদিত বিশাল মাঠ আবার সহস্র সহস্র অশ্বের পদাঘাতে–উৎক্ষিপ্ত ধুলি–বালিতে সমাচ্ছন্ন। নজ্জাসী– সেনাপতি রায়হান বিপুল বাহিনীসহ সে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উগাণ্ডি রাজ্য আক্রমণ করিতে পাহাড়ের উপরিভাগে যথাসম্ভব দ্রুত উপরে উঠিতে লাগিলেন!

সংবাদ পাইয়া উগাণ্ডি– সেনাপতি টরামপু সৈন্যবাহিনীসহ দ্রুত ছুটিয়া আসিলে প্রচণ্ড এক বাধার সম্মুখীন হইল কাল্লিনীর শিখরদেশে। অর্ধোলঙ্গ পাহাড়ীরা ক্ষিপ্র গতিতে বন্ধুর পাহাড় আরোহণে পারদর্শী। বর্শাহস্তে দলে দলে তাহারা কাল্লিনীর উপরে উঠিতেই পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে শিক্ষিত নজ্জাসী–বাহিনীর অজস্র বিষাক্ত বাণ বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হইয়া তাহাদিগকে বড় বিব্রত করিয়া তুলিল। সেই সব অব্যর্থ শরক্ষেপের ফলে অসভ্যগণ বেশী দূরে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অসংখ্য সৈনিক শরাঘাতে প্রাণ হারাইল, অনেকে শরবিদ্ধ অবস্থায় চিৎকার করিতে করিতে নীচে পাথরের উপরে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেনাপতি টরামপু সৈন্যদের উত্তেজিত করিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে সম্মুখে ছুটিয়া আসিল বটে, কিন্তু বিপক্ষ দলের আক্রমণ কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না।

নজ্জাসী–বাহিনী দুর্বার বেগে, বিপুল বিক্রমে, পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল অসভ্যদের উপর। উগাণ্ডির সৈন্যগণ সেই দুর্দম আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না; দলে দলে তাহারা করুণ আর্তনাদ করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় লুটাইতে লাগিল পাথরে পাথরে পাহাড়ের কোলে। উপায়ান্তর না দেখিয়া সেনাপতি টরামপু অবশিষ্ট সৈনিকদিগকে পশ্চাদপসরণ করিতে নির্দেশ দিল।

দেখিতে দেখিতে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অসভ্য-বাহিনী সরু পথ বাহিয়া নিম্নে হটিতে শুরু করিয়াছে; কিন্তু নজ্জাসী-বাহিনী শুধু তীর নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, পরন্তু উপর হইতে পশ্চাদপসরণকারী শত্রুদলের পৃষ্ঠদেশে বর্শা নিক্ষেপ করিয়া বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড নীচে গড়াইয়া ফেলিয়া, শত্রু সংহার করিতে লাগিল। স্তূপীকৃত আহত সৈনিকদের করুণ আর্তনাদে কাল্লিনীর পাদদেশ মুখরিত, বিক্ষিপ্ত মৃতদেহে প্রস্তর-সমাকীর্ণ বনভূমি ও পার্বত্যদেশ প্রায় ভরপুর।

কিয়দ্দূরে পর্যবেক্ষণরত রায়হান অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লক্ষ্য করিলেন, অদূরে টিলার উপরে এক দুঃসাহসী যোদ্ধা বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করিতে করিতে বড় অস্থির চিত্তে সৈন্য চালনায় ব্যস্ত। বেশ-ভূষার বৈচিত্র্যে ও হাবভাবে তাহাকে অসভ্য বাহিনীর অধিনায়ক বলিয়াই মনে হইল। রায়হান বুঝিতে পারিলেন, এ-ই তবে অসভ্য- সেনাপতি। টরামপু! এ সুযোগ তো হেলায় হারাইলে চলে না। তৎক্ষণাৎ তিনি বামে ঘুরিয়া সেনাপতির বক্ষে বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিলেন। অব্যর্থ নিশানা! নিমেষমধ্যে শরবিদ্ধ হইয়া মর্মভেদী আর্তনাদ সহকারে টরাম্পু বৃক্ষতলে পতিত হইল এক পাথরের উপর। তৎক্ষণাৎ এক দেহরক্ষী সৈনিক আহত সেনাপতির বক্ষস্থল বিদ্ধ তীর টানিয়া বাহির করিলে বাম হস্তে সে ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিল। তাহার সর্বাঙ্গ তখন বেদনায় জর্জরিত। কোনক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া টরাম্পু টলিতে টলিতে ডান হস্ত নাড়িয়া সৈনিকদিগকে নিম্নদেশে পলায়ন করিতে ইঙ্গিত করিল। কিন্তু অধিকক্ষণ সে দাঁড়াইতে পারিল না-কাঁপিতে কাঁপিতে মূলহীন বিটপীর ন্যায় আবার লুটাইয়া পড়িল ভূতলে। কাল্লিনীর প্রস্তর -গাত্রেই রচিত হইল অসভ্য- সেনাপতির অন্তিম শয্যা।

সেনাপতির পতনে ভয়ার্ত সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল এদিকে ওদিকে। বনানীর অন্তরালে অনেকে গা-ঢাকা দিয়া, অনেকে পশ্চাতে হটিয়া, প্রাণপণ ছুটিল রাজধানীর অভিমুখে। কিন্তু রায়হান-বাহিনী এত সহজে তাহাদের নিষ্কৃতি দিল না। বজ্রনির্ঘোষে চিৎকার করিতে করিতে বনভূমি কাঁপাইয়া চতুর্দিকে পলায়মান অসভ্য সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, সুতীক্ষ্ণ বাণে ভেদ করিল অনেকেরই পৃষ্ঠদেশ। বর্শা নিক্ষেপ করিয়া তলোয়ার ঘুরাইয়া তাহার অসংখ্য উগাণ্ডি সৈন্যের অবলীলা সাঙ্গ করিল।

প্রধান সেনাপতি আবূ রায়হানের পরিচালনাধীনে আবূ তোরাব, খালেদ, আব্দুর রহমান, আবু আবিদ প্রমুখ শতাধিক মুসলমান এক- একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর অধিনায়ক। ইহাদের প্রত্যেকেই এক একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা। স্বদেশের মরুভূমির বুকে, পার্বত্য-প্রদেশে, বহুবার যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই সৈন্য চালনা বড় নিখুঁত, নির্ভুল। তাঁহাদের রণ- কৌশলে হতভম্ব ও হতবল অসভ্য-বাহিনী একেবারে পর্যুদস্ত; মৃত্যুবিভীষিকায় ইহাদের অন্তর শিহরিত।

অকুতোভয় মুসলমান সেনানায়কদের সাহস ও রণকৌশল দেখিয়া নজ্জাসী-বাহিনীর বিস্ময়ের ও শ্রদ্ধার অবধি নাই। অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁহাদের আদেশ পালন করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

রায়হানের আদেশে সেনানায়কগণ এইবার সৈন্যবাহিনীসহ, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ও গিরিগহবরে অসভ্যদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন! ছত্রভঙ্গ অসভ্য-সৈনিকগণ নজ্জাসী বাহিনীর সংঘবদ্ধ আক্রমণ সহ্য করিবে কিরূপে! বাত্যাহত পাদপের ন্যায় তাহারা ভূতলে গড়াইতে লাগিল, দলে দলে, কাতারে কাতারে।

অশ্বারোহী নজ্জাসী-বাহিনী দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে আক্রমণ করিতে করিতে পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, পাহাড়-জঙ্গল ডিঙাইয়া শত্রু সংহার করিতে করিতে, ক্রমে তারাইন পাহাড়ের পাদদেশে উপনীত হইল। উপরে টিহিন মালভূমিতেই রাজা উগাণ্ডির রাজপুরী ও সেনানিবাস।

রায়হান অন্যান্য সেনানায়কদের তারাইন পাহাড়ের উত্তর দিক হইতে আক্রমণ করিতে নির্দেশ দিবেন, এমন সময় দেখিলেন-পূর্ব দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে একদল পদাতিক বাহিনী। বেশ-ভূষায় ও আকারে-প্রকারে ইহাদিগকে পার্বত্য সৈন্য বলিয়া মনে হইল না। রায়হান একদল সৈন্যসহ তারাইন পাহাড়ের পাদদেশে ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইলেন, কয়েক দল সৈন্য তখন অপরদিকে অসভ্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত। উপযুক্ত পদাতিক বাহিনী আরও নিকটে আসিলে রায়হান ও সেনানায়কগণ দেখিয়া অবাক-অগ্রবর্তী অশ্বারোহী পরিচালকটি আর কেহ নহে- রাজা নজ্জাসীরই বিদ্রোহী সেনাপতি পিয়েলো!

পশ্চাতে রাজা নজ্জাসীরই সৈন্যবাহিনী। রায়হান সেনানায়কদের অপেক্ষা করিতে আদেশ দিলেন, বিপক্ষ দল প্রথমে আক্রমণ না করিলে তাহাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন।

পিয়েলো অধীনস্থ সেনানায়কদের আক্রমণ করিতে নির্দেশ দিবামাত্র তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইলেন নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ। রায়হান-বাহিনী তথাপি নিশ্চল। তাহারা নিকটে আসিলে সেনাপতি রায়হান তখন বিপক্ষ দলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, কে তোমরা? কাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছো? দেখছো না, এ মহামান্য নজ্জাসীর বাহিনী? তোমাদেরও ত মনে হয় রাজা নজ্জাসীর অন্নেই প্রতিপালিত। তবে কোন্ সাহসে আজ অস্ত্র ধারণ করেছ অন্নদাতার বিরুদ্ধে? শোননি, তোমাদের সেনাপতি রাজদ্রোহী হয়ে উগাণ্ডির আশ্রয় নিয়েছে? শোননি, পিয়েলো বিশ্বাসঘাতক? তোমরাও কি জগতে বিশ্বাসঘাতক বলে পরিচিত হতে চাও? সাবধান! মৃত্যুর হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও, যদি স্বদেশে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ফিরতে চাও, তবে এই মুহূর্তে অস্ত্র ত্যাগ করে মহামান্য নজ্জাসীর নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হও; নতুবা চরম শাস্তি অনিবার্য।”

রায়হানের এই বজ্রগম্ভীর ঘোষণা-বাণী শুনিয়া বিরুদ্ধ দলের সেনানায়ক ও সৈনিকদের চমক ভাঙ্গিল। তাহারা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে যে রাজা নজ্জাসীরই ক্রশ-লাঞ্ছিত সবুজ পতাকা স্বর্ণখচিত দণ্ডে উড্ডীয়মান। তবে কাহার বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ। তবে কি সেনাপতি পিয়েলো সত্য-সত্যই বিদ্রোহী হইয়াছেন? সেনানায়কদের কেহ কেহ নজ্জাসী-সেনাপতি রায়হানকে চিনিতে পারিয়া রাজা নজ্জাসীর জয় ঘোষণা করিতে করিতে অসি কোষবদ্ধ করিলেন, সৈন্যবাহিনীকেও আদেশ দিলেন অস্ত্র সংবরণ করিতে। কয়েকজন সেনানায়ক রায়হানের নিকটে ছুটিয়া গিয়া অবনত মস্তকে অভিবাদনপূর্বক আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেন।

রায়হান তাহাদিগকে সেনাপতি পিয়েলোর বিদ্রোহের কাহিনী, সেনাপতি পরাবীনের বন্দীদশার কথা, সব খুলিয়া বলিতেই সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল। সেনানায়ক নোলো নিবেদন করিলেন, “হে মহাবল নজ্জাসী সেনাপতি! আমাদের

অপরাধ মার্জনা করুন। তিন দিবস আমরা শাম্‌পুনী পাহাড়ের নিকটে ছাউনি ফেলে কাটিয়েছি, যুদ্ধবার্তা কিছুতেই জানি না। এক্ষণে বুঝেছি বিদ্রোহী পিয়েলো আমাদের ভ্রান্ত পথে চালিত করেছেন। মাননীয় সেনাপতি! আমরা রাজভক্ত সৈনিক, বিদ্রোহী নই, নিমকহারামও নই।"

বারংবার কড়া আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সৈন্যগণ নজ্জাসী–বাহিনী আক্রমণ করে না, পরন্তু কয়েকজন সেনানায়ক বিপক্ষীয় সেনাপতির নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছে–ইহা দেখিয়া হতভম্ব পিয়েলো পলায়ন করিবার উপক্রম। রায়হান ইহা লক্ষ্য করিয়া সেনানায়ক নোলোকে আদেশ দিলেন, "ঐ দেখুন, বিশ্বাসঘাতক পিয়েলো বুঝি পলায়ন করছে! আপনারা এই মুহূর্তে তাকে বন্দী করে রাজভক্তের পরিচয় দিন।"

আদেশ পাইবামাত্র পিয়েলোর সৈন্যদলই পিয়েলোর পশ্চাদ্ধাবন করিল। রায়হান সেনানায়ক আবূ তোরাবকে আদেশ দিলেন –"এক দল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এখনই তাহাদের সাহায্যার্থে দ্রুত অগ্রসর হোন।"

পিয়েলো প্রাণভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উগাণ্ডির রাজধানী অভিমুখে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন, কিন্তু কতদূর আর পালাইবেন? অল্পক্ষণ মধ্যেই অশ্বারোহী সৈনিকদের লইয়া আবূ তোরাব তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে নোলোর সৈন্যগণও আসিয়া পড়িল। একা পিয়েলো বাধা দিবেন কয়জনকে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহারই আজ্ঞাবাহী সৈন্যগণ তাঁহারই হস্তপদ লৌহ–শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া মহামান্য নজ্জাসীর জয় ঘোষণা করিতে করিতে সেনাপতি রায়হানের নিকটে লইয়া চলিল।

হায় অদৃষ্ট! ক্ষণকাল পূর্বেও যিনি ছিলেন এক বিরাট সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক, যে বাহিনীর প্রতিটি সেনানায়ক, প্রতিটি সৈন্য তাঁহারই অঙ্গুলী হেলনে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইত না, তাহারাই তাঁহাকে নানাভাবে অপমানিত ও বিদ্রূপ–বাক্যে জর্জরিত করিয়া বন্দীভাবে লইয়া আসিয়াছে। কাল যিনি উগাণ্ডির মহামন্ত্রী সাজিয়া স্বপ্ন- সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই দুই চোখে আজ নামিয়া আসিয়াছে বিরামহীন অশ্রুধারা। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস।

রায়হান সৈন্যদলের রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনায়াসে বিনা বাধায় নজ্জাসীর এই শত্রুকে যে বন্দী করিতে পারিয়াছেন, সেই

দয়াময় আল্লাহর দরবারে তাঁহার শোকর গুজারির আর অন্ত নাই। বন্দী পিয়েলোকে উপযুক্ত প্রহরাধীনে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সৈন্যবাহিনীকে তিনি পাহাড়ের গা বাহিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিলেন। অসভ্যগণ আবার যাহাতে সংঘবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য পিয়েলোর সৈন্যবাহিনীকে তিনি আবূ তোরাবের নেতৃত্বে পাহাড়ের চারিদিকে প্রহরায় নিযুক্ত রাখিলেন।

প্রস্তর ও জঙ্গলময় পাহাড়ের গা বাহিয়া সৈন্যদল অতি কষ্টে উপরে উঠিতে লাগিল। ঘোটকের পদাঘাতে অসংখ্য উপলখণ্ড ছিটকাইয়া নিম্নদিকে পড়িতেছে। মাঝে মাঝে কোন কোন ঘোটকের পদস্খলন হইতেছে। জঙ্গল ভেদ করিয়া, প্রস্তরময় বন্ধুর পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া দ্রুত উপরে উঠা কি যে দুরূহ ব্যাপার!

কিন্তু এ কি! কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই পাহাড়ের উপরে দৃষ্টিগোচর হইল এক বিরাট অসভ্য বাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে অসভ্যগণ বিকট চিৎকার সহকারে উপর হইতে তীর নিক্ষেপ শুরু করিল, অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডও নিম্নে গড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। নজ্জাসী বাহিনীও প্রত্যুত্তরে সুতীক্ষ্ণ বাণ বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষণ করিল বটে কিন্তু বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত অসভ্যদের কিছুতেই হটাইতে পারিল না। তাহারা জঙ্গলের আড়াল হইতে অলক্ষ্যে তীর ছুঁড়িয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল সমস্ত নজ্জাসী–বাহিনীকে। দেখিতে দেখিতে বহু নজ্জাসী– সৈনিক শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইল।

না, অশ্বারোহী সৈন্যদলের খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠা একেবারেই অসম্ভব; অপেক্ষাকৃত বন–বিরল সমতল ভূমির সন্ধান না পাইলে রাজধানীর নিকটবর্তী হওয়াই দুষ্কর। রায়হান সৈন্যদিগকে অসভ্যদের অগ্রগতি যথাশক্তি রোধ করিতে আদেশ দিয়া নিজে কয়েকজন অনুচরসহ একবার চারিদিকটা পর্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইলেন।

পাহাড়ের গা ঘেষিয়া রায়হান ছুটিতে লাগিলেন সোজা পূর্বদিকে, কেননা পিয়েলো অশ্বপৃষ্ঠে সেই দিকেই যে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, হয়তো বা সেইদিকে অপেক্ষাকৃত সমভূমি, নয়তো বা কোন গুপ্ত পথের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্বদিকে পাহাড়ের পান্তদেশে উপনীত হইয়া রায়হান কোন নূতন পথের সন্ধান পাইলেন না বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন- সেই পথে অদূরে টিহিন মালভূমির উপরে উঠা কতটা সহজসাধ্য। সে স্থানে পার্বত্য ভূমির চড়াই অনেকটা কম; মালভূমিও অপেক্ষাকৃত সমতল। উপরিভাগ জঙ্গলে আবৃত থাকায় বনান্তরালে অলক্ষ্যে উপরে উঠাও সুবিধাজনক! রায়হান সৈন্যদের যথাসম্ভব নিঃশব্দে ছুটিয়া আসিয়া সেইদিকেই অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন।

সেনাপতির নির্দেশে সম্মুখবর্তী এক ক্ষুদ্র বাহিনী উগাণ্ডির সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিল, বাকী সকলে পশ্চাদ্দেশ হইতে হটিয়া নির্দিষ্ট পথে মালভূমির উপরে উঠিতে লাগিল। পাহাড়ীরা জঙ্গলের আড়ালে ইহাদের গতিবিধি ততটা লক্ষ্য করিতে পারিল না। বিরাট নজ্জাসী বাহিনী ক্রমে বিনা বাধায় মালভূমির উপরিভাগে উঠিয়া উগাণ্ডির রাজধানী আক্রমণ করিতে ছুটিল।

এইবার রাজধানীর প্রবেশদ্বারে শুরু হইল তুমুল যুদ্ধ। চারিদিক হইতে সমগ্র রাজধানীতেই চলিয়াছে রায়হানের সৈন্যদের দুর্বার আক্রমণ। সুশিক্ষিত মুসলমান ও নজ্জাসী-বাহিনীর সম্মুখে অসভ্যগণ কতক্ষণ আর টিকিতে পারে! বর্শা ও তরবারির আঘাতে মর্মস্পর্শী আর্তনাদ করিতে করিতে দলে দলে তাহারা ধূলায় লুটায়।

নজ্জাসী বাহিনী রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখযুদ্ধে উগাণ্ডির সৈন্যদল ও অসভ্য অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করিতে লাগিল, প্রতি গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দোযখ-দৃশ্যের সূচনা করিল। চারিদিকে তখন কেবল চিৎকার হাহাকার, ছুটাছুটি-হুটোপুটি।

সহস্র সহস্র খণ্ডিত নরদেহের পৈশাচিক দৃশ্য যুদ্ধরত নজ্জাসী- সৈনিকদের আরও নিষ্ঠুর, আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদেরও অনেকে আহত বা নিহত হইয়া ভূতলশায়ী; কিন্তু সেইদিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ কোথায়! বিজয়-গর্বে গর্বিত নজ্জাসী -বাহিনী মহাবিক্রমে অসভ্যদের আক্রমণ করিয়া, নির্বিচারে ব্যাপক নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইল।

প্রতি গৃহ অনল-কুণ্ডে নিমজ্জিত। সমগ্র রাজধানী ধুম্রপুঞ্জে আচ্ছন্ন। আহত ও আতঙ্কগ্রস্ত নরনারীর করুণ চিৎকার, যুদ্ধরত নজ্জাসী-বাহিনীর বজ্রহুঙ্কার ও

মহারাজা নজ্জাসীর বিপুল জয়ধ্বনি চতুর্দিকে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া প্রলয়–বিষাণ যেন বাজিয়া উঠিয়াছে।

রায়হান আহত সৈন্যিকদের শুশ্রূষার জন্য গিরিতলে পিয়েলোর সৈন্যদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। স্ত্রীলোক, শিশু বেসামরিক অধিবাসীদের হত্যা করিতে নিষেধ করিয়া সেনানায়কদের নিকটে তিনি সংবাদ পাঠাইলেন।

পঙ্গপালের ন্যায় সমগ্র রাজধানীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে দুর্দান্ত রায়হান বাহিনী। ক্রমে তাহারা রাজপুরীর নিকটবর্তী হইলে সমগ্র উগাণ্ডি–বাহিনী পশ্চাতে হটিয়া রাজবাটীর চারিদিকে অবস্থিত সারি সারি কাষ্ঠনির্মিত কুঠিরগুলোর সম্মুখে ব্যূহ রচনা করিল।

কুটিরগুলোর চতুর্দিকে উন্মুক্ত মাঠ। চারিদিক হইতেই নজ্জাসী–বাহিনী আক্রমণ চালাইয়াছে দুর্বার বেগে। অসভ্য পুরুষেরা তখন তীর–ধনুক ও বর্শা লইয়া প্রাণপণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত। স্ত্রীলোকেরাও বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের সাহায্যে রত; কিন্তু অধিকক্ষণ তাহারা টিকিতে পারিল কই। মৃত্যু–ভয়হীন নজ্জাসী–বাহিনী ঝড়ের বেগে অসভ্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সেই সব কুটিরগুলোতেও অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল চারিধারে। উপায়ান্তর না দেখিয়া অসভ্যগণ তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল পশ্চিমের গভীর অরণ্যে। সেনাপতি রায়হানের আদেশে সৈন্যদল পলায়নপর অসভ্যদের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া রাজপুরীর প্রবেশদ্বারে ধাবিত হইল।

হতবল উগাণ্ডি দেখিয়া মর্মাহত হইল–তাহার দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী দলে দলে নিহত হইতেছে, অবশিষ্ট বাহিনী ভয়ে ছত্রভঙ্গ; চারিদিকেই মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনায়মান। হতাশ নয়নে চারিদিকে সে তাকাইয়া দেখে– সেনাপতি টরাম্‌পু নাই, মহামন্ত্রী পিয়েলো নাই, বিচক্ষণ সেনানায়কদের কেহই বুঝি বাঁচিয়া নাই, রাজপুরোহিত হিরোমারও কোন সন্ধান মিলে না।

এইবার দুঃখে, অনুশোচনায় ক্ষিপ্তপ্রায় অসভ্য–রাজ আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে অসিহস্তে রাজপুরীর বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ছত্রভঙ্গ সৈন্যবাহিনী লক্ষ্য করিল–উগাণ্ডি স্বয়ং উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তাহারা আবার দলবদ্ধ হইয়া রাজার পার্শ্বে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু অসংখ্য নজ্জাসী–সৈন্য–বাহিনীর বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় অসভ্য– সৈন্য কতক্ষণ যুঝিতে পারে।

অনেকেই রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। উগাণ্ডি অসহায়! উপায়ান্তর না দেখিয়া সে রাজান্তঃপুরে পালাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু নজ্জাসী বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করিবে কিরূপে। তৎক্ষণাৎ রায়হান কয়েকজন সৈনিক লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার উপর ফাঁস নিক্ষেপ করিলেন। অসভ্য –রাজ ফাঁসে আটকাইয়া ভূতলে পতিত হইল, আর উঠিবার অবকাশ পাইল না। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য উগাণ্ডির উপরে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হস্তপদ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া ফেলিল!

চারিদিকে তখন অযুতকণ্ঠে মহারাজ নজ্জাসীর জয়ধ্বনি। বাঁধ ভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় সৈন্যদল প্রবল বেগে উগাণ্ডির রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে শুরু করিয়াছে। আব্দুর রহমান, আবূ আব্বাস, আবূ তাহের প্রমুখ বীরযোদ্ধাগণ গৃহ হইতে গৃহাভ্যন্তরে সন্ধান করিয়া অসভ্যদের বন্দী করিতে লাগিলেন। যাহারা বাধাদান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তাহারা আর নিষ্কৃতি পাইল না। সৈন্যগণ দলে দলে অসভ্যদের যথেচ্ছা আক্রমণ করিয়া রাজবাটীতে অগ্নিসংযোগ করিল।

সেনাপতি রায়হান একদল সৈন্যসহ রাজান্তপুরের দক্ষিণদিকে ছুটিতেছিলেন, এমন সময় নিকটে এক রুদ্ধদ্বার–গৃহে বহু লোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অনুমান করিলেন, গৃহমধ্যে অসভ্যগণ লুকায়িত। তিনি ডান হস্তে বর্শা উদ্যত করিয়া পদাঘাতে দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অবাক হইয়া দেখিলেন– অসভ্য নহে, এক কোণে একদল সুন্দরী যুবতী প্রাণভয়ে কম্পমান।

অকস্মাৎ গৃহদ্বারে অস্ত্রধারী অশ্বারোহীদের দেখিয়া রমণিগণ মৃত্যুভয়ে একে অপরকে জড়াইয়া ধরিয়া বুক–ফাটা চিৎকার শুরু করিল। রায়হান অস্ত্র সংবরণ করিয়া ভাবিলেন, অসভ্য কৃষ্ণ অধিবাসীদের দেশে এই সুন্দরী যুবতিগণ কোথা হইতে আসিল? এমন সময় যুবতীদের একজন ক্রন্দন করিতে করিতে করজোড়ে নিবেদন করিল," ওগো বিজয়ী বীর! আমাদের হত্যা করবেন না। আমরা পরদেশী বন্দিনী। অসভ্য রাজ আমাদের ক্রয় করে নিয়ে এসেছে বহুদিন। তদবধি তার নর্তকীরূপে মহাদুঃখে আমরা দিনাতিপাত করছি।"

সেনাপতি রায়হান যুবতীদের অভয় দিয়া বলিলেন, "আমার সৈন্যগণ স্ত্রীলোক এবং শিশুদের হত্যা করে হস্ত কলঙ্কিত করে না। বিশেষতঃ তোমরা বিদেশিনী। কে তোমরা ?"

আশ্বাসবাণী শুনিয়া যুবতীদের মৃতপ্রায় দেহে যেন প্রাণ সঞ্চার হইল। প্রথমোক্ত যুবতী ব্যস্ত হইয়া উত্তর করিল, " আমি শিম্‌পী। এইটি লায়লা, ইনি অন্নাবিলি, এই ইলিন, এ শাহানা, এইটি–'

রায়হান বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, " কোথায় তোমাদের দেশ? এখানেই বা এলে কিরূপে।"

শিম্‌পী উত্তর করিল, "বড় দুঃখের কথা সেনাপতি। আমার জন্মভূমি সিরিয়ায় একদিন নির্জন নদীতীরে মেষশাবক নিয়ে খেলা করছিলাম একাকিনী; এমন সময় একখানা বৃহদাকার নৌকা কূলে ভিড়ছে দেখে, কে এসেছে জানবার জন্য নিকটে গেলাম। অমনি নৌকার ভিতর থেকে এক ভীষণ–দর্শন পুরুষ এক লম্ফে বের হয়ে আমাকে জোর করে উঠিয়ে ফেললো নৌকায়। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বলিষ্ঠ পুরুষ আমার হাত পা বেঁধে এক খণ্ড বস্ত্র ঠেসে দিল মুখগহবরে। অন্যান্য দস্যুগণ ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে নৌকা। সজল নয়নে দেখলাম, আমি একা নই, আমার মত এই সব হতভাগিনীরাও পড়ে রয়েছে সেই নৌকার পাটাতনের তলায়; নিকটে কয়েকজন বলিষ্ঠ পুরুষ মুক্ত তরবারি হস্তে উপবিষ্ট।" শিম্‌পী এক মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তারপর–

সেনাপতি বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার কাহিনী বড় মর্মান্তিক, পরে শুনবো সব। তোমাদের বন্দী ও বন্দিনী আরও আছে কি?"

শিম্‌পী উত্তর করিল, "অনেক অনেক। চলুন, আপনাকে দেখিয়ে দেব।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে সকলের আগে আগে কিয়দ্দূর গিয়া এক গোপন কক্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইল।

সকলেই দেখিলেন কক্ষের দ্বারে দুইজন প্রহরী তখনও দণ্ডায়মান। সেনাপতি রায়হান ও সৈন্যদলকে দেখিয়া তাহারা পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেই তৎক্ষণাৎ বর্শা বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইল।

শিম্‌পী বলিল, " এই ঘরে ভূগর্ভে যাবার এক সংকীর্ণ পথ রয়েছে; সেখানে কত কঙ্কালসার বন্দী মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে আছে দেখবেন!"

অকস্মাৎ মহারাজা নজ্জাসীর প্রবল জয়ধ্বনিতে কর্ণপটহ যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। রায়হান পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিলেন, উগাণ্ডির কাষ্ঠনির্মিত সেনানির্বাস গগনচুম্বী অনল-প্রবাহে নিমজ্জমান। সেই অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া ধূসর ও পিঙ্গল-বর্ণ ধুম্রকুণ্ডলী বহু উর্ধ্বে উঠিয়া অনন্ত শূন্যে মিলাইতেছে। পশ্চিমে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন, অবশিষ্ট উগাণ্ডির -সৈনিক ও অসংখ্য নরনারী প্রাণভয়ে বনানীর দিকে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান। এমন সময় হঠাৎ শ্রুতিগোচর হইল ভূর্গভস্থ বন্দীদের করুণ আর্তনাদ। রায়হান তৎক্ষণাৎ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে সংকীর্ণ পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ভূগর্ভে। তাঁহার উদ্যত হস্তে সুতীক্ষ্ণ বর্শা, কোমরে কোষবদ্ধ তরবারি। কয়েকজন সৈনিক বর্শাহস্তে তাঁহার অনুগমন করিল।

অন্ধকার পাতালপুরী! দুর্গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ! তন্মধ্যে মরণোন্মুখ বন্দীদের শুধু কাতর আর্তনাদ! ক্ষীণ আলোক-রশ্মিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ ও কঙ্কালসার মুমূর্ষুদের বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখিয়া রায়হান শিহরিয়া উঠিলেন। এই অন্ধকার কক্ষে কোথা হইতে আলোক বিকিরণ হইতেছে প্রথমে তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু অদূরে বন্দীশালার অপর প্রকোষ্ঠে হঠাৎ মর্মভেদী চিৎকারধ্বনি শুনিয়া সেই দিকে ঘাড় ফিরাইতেই একটা আলোর শিখা দৃষ্টিগোচর হইল। সেনাপতি সঙ্গিগণসহ দ্রুতপদে সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন।

রায়হান সেই প্রকোষ্ঠের দুয়ারে দাঁড়াইয়া যাহা লক্ষ্য করিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক পার্শ্বে মস্তকবিহীন মনুষ্যদেহের স্তূপ; কক্ষমধ্যে রক্তস্রোত। অদূরে এক উগাণ্ডি-সৈনিক মশাল হস্তে দণ্ডায়মান। তাহার বেশভূষায় কিছুটা বৈচিত্র্য রহিয়াছে। মশালধারীর নিকটে দুইজন বলিষ্ঠ অসভ্য সৈন্য এক বন্দীর পৃষ্ঠদেশ ও জানুদ্বয় চাপিয়া ধরিয়াছে, অপর একজন ভীষণ-দর্শন ঘাতক উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাহার গ্রীবাদেশে আঘাত করিতে উদ্যত। বন্দী আর্তনাদ করিয়া নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছে। এক মুহূর্ত পরেই তাহার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িবে। রায়হানের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ঘাতকের

পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। অব্যর্থ বর্শা। মহূর্তমধ্যে ঘাতক আর্তনাদ করিয়া বন্দীর পার্শ্বদেশে লুটাইয়া পড়িল। যে দুইজন সৈনিক বন্দীকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, ঘাতকের অবস্থা দেখিয়া তাহারা ভয়বিহবল-চিত্তে আঁতকাইয়া দরওয়াজার দিকে চাহিবামাত্র সেনাপতির সঙ্গী -সৈনিকদের নিক্ষিপ্ত বর্শা তিনজনেরই বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া ফেলিল। তিনিজনই ধরাশায়ী হইল। মশাল অদূরে রক্তার্দ্র ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া নির্বাণোন্মুখ হইবার উপক্রম।

রায়হানের আদেশে এক সৈনিক তাড়াতাড়ি মশাল কুড়াইয়া লইল। সেনাপতি ক্ষিপ্রহস্তে বন্দীর বন্ধনদশা মোচন করিতে ব্যস্ত। কক্ষতলের রক্তস্রোতে তাহার মুখমণ্ডল ও পরিধেয় বসন রক্তাপ্লুত।

রায়হান চারিদিকে উগাণ্ডির-সৈনিকদের আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; স্তূপীকৃত মৃতদেহগুলোর সম্মুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাও অসম্ভব । নিহত মশালধারীর পালক-ভূষিত জমকালো শিরোভূষণ লক্ষ্য করিয়া তিনি দুইজন সৈনিককে আদেশ দিলেন "বাইরে নিয়ে যাও এই পাপিষ্ঠের মৃতদেহ।"

অন্যান্য সৈনিকদের তিনি আদেশ দিলেন, "মশাল ধরে বন্দীশালার প্রতিটি কক্ষ খুঁজে খুঁজে জীবন্ত বন্দীদের উপরে নিয়ে এস অতি সাবধানে।" এই বলিয়া রায়হান সদ্যমুক্ত মৃতপ্রায় বন্দীকে নিজ স্কন্ধদেশে উঠাইয়া সেই দোযখ হইতে বাহির হইলেন।

উপরে উঠিয়া রায়হান হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বন্দীর মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি বিস্ময়ে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "এ কি! এ যে সেনাপতি পরাবীন! আল্লাহ্ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন পরাবীন? ইয়া আল্লাহ্ ! তোমার হাজার শোকর।" এই বলিয়া তিনি মাটিতে বসিয়া পরাবীনের মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার স্কন্ধদেশের ঘর্ষণে পরাবীনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল অনেকটা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল। একবার তিনি সযত্নে মুখখানি মুছাইয়া দিলেন।

পরাবীনের দুই নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বিশ্বপতির মহিমা অপার! আমার প্রাণরক্ষা করিতেই বুঝি তিনি আপনাকে যীশুরূপে পাঠিয়েছিলেন। আপনার ঋণ এ-জীবনে শোধ করবার নয়। একটু পানি, উহ্!"

শিম্‌পী পানি অনিতে ছুটিল, রায়হান কয়েকজন সৈনিককেও তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। এমন সময় বন্দীশালার সেই নিহত মশালধারীকে দুইজন সৈনিক ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল উপরে। রায়হান মৃতদেহের প্রতি পরাবীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার! বলতে পারেন, কে এই পাপিষ্ঠ?"

পরাবীন মস্তক উত্তোলন করতঃ মৃতদেহটা একবার দেখিয়া বলিলেন, "এই ত পাপিষ্ঠ উগাণ্ডির পুত্র। দুরাত্মা তিনজন অনুচরসহ সহসা কারাগারে ঢুকে আমার সন্ধান করতে থাকে; চিনতে না পেরে একদিক থেকে টেনে এনে হত্যা করতে শুরু করে বন্দী সৈন্যদের। কতক্ষণ পরেই অসভ্যগণ খুঁজে বের করে আমাকে। তারপর ত যা ঘটেছে নিজেই জানেন।"

রায়হান বুঝিলেন, পিতা বন্দী হইয়াছে শুনিয়া এই পাষণ্ড প্রতিহিংসা নিবৃত্তি করিতে বন্দীশালায় ঢুকিয়াছিল। নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় সে হত্যা করিয়াছে অসহায় বন্দীদের। বীর-পুরুষ বটে! উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে। এমন সময় শিম্‌পী ছুটিয়া আসিল।

পরাবীন ঢক ঢক্ করিয়া অনেকটা পানি গিলিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই রায়হান, আপনি কিভাবে এলেন, কিছুই ত বুঝতে পারছি না! কোথায় সেই বিশ্বাসঘাতক পিয়েলো? আহা! শয়তানের স্তুতিবাক্যে ভুলে মহামান্য নজ্জাসীর বিশ্বাস হারালাম, তাঁহার স্নেহ-মমতা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলাম! মৃত্যুই আমার শ্রেয়! আহা! কেন বাঁচলাম। কেন আমাকে বাঁচালেন।"

রায়হান তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "এত অধীর হবেন না, সবই আল্লাহ্‌র মরজি। তাঁরই অনুগ্রহে পিয়েলো ধরা পড়েছে, উগাণ্ডিও বন্দী। আপনি সুস্থ হোন, যুদ্ধবার্তা পরে শুনবেন। আমাকে যেতে হয় এখনই। সৈন্যগণ ক্ষিপ্ত হয়ে অকারণ-নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। তাদের ক্ষান্ত করতে হবে।" এই বলিয়া সেনাপতি স্থানান্তরে গমনের উদ্যোগ করিলেন।

শিম্‌পী নিকটে আসিয়া বলিল, "সেনাপতি! দেখে এলাম উগাণ্ডির কোষাগারের নিকটেই আগুন লেগেছে। শীঘ্রই সেই ধনভাণ্ডার পুড়ে ছাই হবে। আপনি সে-ধনরত্ন সব তুলে নিন।"

সেনাপতি উত্তর করিলেন, "বেশ চল, সে ধনাগার দেখিয়ে দাও। সেই সব ধনরত্ন মহারাজ নজ্জাসীরই প্রাপ্য।"

ইতিমধ্যে সৈন্যগণ ভূগর্ভের সেই কঙ্কালসার বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া, একে একে উপরে লইয়া আসিয়াছে। সদ্যমুক্ত পরাবীন ও অন্যান্য বন্দীদের পরিচর্যায় ও শিম্‌পীর সঙ্গিনীদের পাহারার জন্য এক ক্ষুদ্র বাহিনীকে নিযুক্ত করিয়া রায়হান একদল সৈন্যসহ শিম্‌পীর সঙ্গে ধনাগারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

অধিক দূরে যাইতে হইল না। কয়েকটি প্রজ্বলিত কুটির অতিক্রম করতঃ সেনাপতি কোষাগারের নিকটে গিয়া দেখিলেন–দ্বারদেশে কোন প্রহরী নাই, সকলেই প্রাণভয়ে পালাইয়াছে। তাঁহার সৈন্যবাহিনী চারিদিকে প্রায় প্রতি গৃহেই অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। রাজকোষের পশ্চাদ্ভাগেও আগুন।

রায়হান ধনাগারের অর্গল ভাঙ্গিয়া বিশ্বস্ত একদল অনুচরসহ ভিতরে ঢুকিলেন; কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিয়া রাশি রাশি স্বর্ণ- রৌপ্য ও প্রচুর মণি-মুক্তা আহরণ করিলেন। সমস্ত ধনরত্ন কুড়াইয়া সেনাপতি যখন বাহিরে আসিলেন তখন রাজকোষ প্রায় অগ্নিগর্ভে নিমজ্জমান।

সমগ্র রাজধানীই পাহাড়ীশূন্য। চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা সহস্র রসনা বিস্তার করিয়া উগাণ্ডির রাজপুরী গ্রাস করিতে উদ্যত। রায়হান লক্ষ্য করিলেন, কিয়দ্দূরে এক উচ্চ গৃহের ছাদে বহু নারী ও শিশু সমবেত হইয়া চিৎকার করিতেছে। কী করুণ আর্তনাদ! নিম্নে অনল-প্রবাহ সমগ্র গৃহটি গ্রাস করিতে উদ্যত। অসহায়া রমণী ও শিশুগণ এক একবার ধূম্রপুঞ্জে আচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হয়, আবার বায়ুভরে ধূম্ররাশি উড়িয়া গেলে দৃষ্টিগোচর হয়। শিম্‌পী সেই দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "হায়! হায়! ঐ বুঝি ছেলেমেয়েসহ হতভাগ্য রানীর দল! উহ্, কী ভীষণ! কী হবে সেনাপতি! কে ওদের বাঁচাবে?"

রায়হান তাহাদিগকে উদ্ধার করার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। তবুও সেই দিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় দেখিলেন সমস্ত গৃহখানাই ভাঙ্গিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। নারী ও শিশুগণ মর্মভেদী চিৎকার করিয়া সেই অগিকুণ্ডে চিরতরে অদৃশ্য হইল। এ-দৃশ্য দেখিয়া রায়হানের অন্তর বিষাদে

ভারাক্রান্ত। শিম্পী "হায়! হায় কি হ'ল কি হ'ল!" বলিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে হস্ততালুতে চোখ-মুখ ঢাকিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল।

সব শেষ! নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ রাজপুরীতে রাজা ছাড়া রাজবংশের কেহই আর বাঁচিয়া নাই।

রায়হান সেনানায়কদের নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ রাজপুরীর বাহিরে প্রান্তরে সমবেত হইতে সংবাদ পাঠাইলেন। কতক্ষণ পরেই যুদ্ধশ্রান্ত বিভিন্ন সৈন্যদল সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তখনও রাজধানীর চারিদিক হইতে ছত্রভঙ্গ- সৈন্য ও স্ত্রী-পুরুষ নাগরিকগণ আপন আপন সন্তান-সন্ততি পৃষ্ঠে বহন করিয়া পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে ছুটিতেছে। এমন সময় শিম্পী ভয়ার্ত-কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "সেনাপতি! সর্বনাশ! ঐ দেখুন, কাল-ঘরেও আগুন। নরমাংসে লালিত-পালিত হিংস্র পশুগুলো হয়তো এই দিকেই ছুটে আসবে! কী হবে সেনাপতি?"

সেনাপতি অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, এদিকে এলে পশুদেরও রক্ষা নেই। তথাপি যাতে তারা কাছে না আসে সেই ব্যবস্থাই করছি।"

রায়হান বন্দীশালার ভারপ্রাপ্ত সেনানায়ককে বলিলেন, "আবূ আব্বাস! উগাণ্ডির নর্তকীদল ও মুক্ত-বন্দীদের নিয়ে আপনার সৈন্য- বাহিনীসহ নিম্নে তারাইন পাহাড়ের পাদদেশে এখনই যাত্রা করুন। সেখানে সেনানায়ক আবূ তোরাব বন্দী পিয়েলোকে প্রহরায় রেখে অপেক্ষা করছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হউন। সেনানায়ক আবদুর রহমান উগাণ্ডি ও অন্যান্য বন্দীদের নিয়ে আপনাকেও যে যেতে হয় সেইখানেই। সাবধান! কড়া পাহারার যেন ব্যবস্থা থাকে। আমি অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীসহ শীঘ্রই মিলিত হবো আপনাদের সঙ্গে।"

সেনানায়কগণ বন্দীদের লইয়া রাজা নজ্জাসী ও সেনাপতি রায়হানের জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সেনাপতি এইবার সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন, "উগাণ্ডির এই বন্দীশালায় অগ্নিসংযোগ কর, আগুনের ভয়ে কাল-ঘরের বন্য পশুগুলো যেন এদিকে আসতে আর সাহস না পায়।"

সৈন্যগণ সেনাপতির আদেশ পালন করিল। দেখিতে দেখিতে সেই পাপময় পাতালপুরী পাবক-শিখা- বেষ্টিত দোযখে যেন ডুবিয়া গেল। ততক্ষণে পশ্চিমের প্রজ্বলিত কাল-ঘরও ভূমিসাৎ হইয়াছে। অর্ধদগ্ধ বন্য পশুগুলো চারিদিকে অগ্নিশিখা দেখিয়া প্রাণভয়ে ছুটিতে শুরু করিয়াছে পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে। পথিমধ্যে ইহারা কত অসভ্য নরনারীর প্রাণ সংহার করিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! হিংস্র পশুগুলো অবশেষে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা পাইল কিনা কে জানে!

উগাণ্ডির রাজধানী আজ মহাশ্মশান! গত নিশীথে যে স্থানে সে সুরাপানে মত্ত হইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন ছিল, আজ সেখানে রাজা নাই, প্রজা নাই, নর্তকী নাই-রাজপুরীর চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল চারিদিকে সর্বগ্রাসী অনল-প্রবাহ দোযখের বীভৎস দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কালের কি বিচিত্র লীলা!

সেই মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া বিজয়ী সেনাপতি রায়হান সগর্বে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলেন, সম্মুখে শুধু শ্রেণীবদ্ধ বাহিনী ছাড়া কোথাও কোন জীবিত মনুষ্যের চিহ্নমাত্রও নাই। চারিদিকে প্রান্তরে অসংখ্য মৃতদেহ স্তূপীকৃত। অর্ধদগ্ধ মৃতদেহের উৎকট দুর্গন্ধে সেই প্রেতরাজ্যে আর তিষ্ঠানো যে অসম্ভব! সহসা নিকটে টিলার উপরে পত্র-বিহীন এক উচ্চ বৃক্ষ সেনাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আদেশ দেওয়ামাত্র দুই সৈনিক পুরুষ সেই বৃক্ষে আরোহণ করতঃ উপরে উড়াইয়া দিল হাবশী অধিপতির ক্রুশলাঞ্ছিত সবুজ পতাকা। বিজয়- বৈজয়ন্তী বায়ুভরে নাচিয়া উঠিল মহোল্লাসে।

সেনাপতি রায়হানের আদেশে সমগ্র বাহিনী সমবেত হইল সেই টিলার পাদদেশে। অযুতকণ্ঠে উচ্চারিত হইল 'আল্লাহু আক্‌বার' ধ্বনি! পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মুসলমান সৈন্যদের অন্তর উদ্বেল, নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত। উপরে সবুজ পতাকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহারা মহোল্লাসে বারবার জয়ধ্বনি দিতে লাগিল মহারাজ নজ্জাসীর। সে-ধ্বনি চারিদিকে পাহাড়ে-জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হইয়া মিশিতে লাগিল অনন্ত শূন্যে।

বিজয়-গর্বে, স্বদেশের গরিমায় ও অনুপম পুলকে সৈন্যদের অন্তর আজ ভরপুর; পরিশ্রান্ত ও আহত সৈনিকগণ সকল দুঃখ, সকল বেদনা ভুলিয়া উড্ডীয়মান জয়ধ্বজের প্রতি অপলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল। প্রবল দেনাত্মবোধ সৈনিকদের অন্তরে আজ বড় উদগ্রভাবে জাগ্রত। জাতীয় পতাকা এত সুন্দর, এত গাম্ভীর্যপূর্ণ জীবনে কখনও বুঝি তাহারা দেখে নাই! সেই পতাকায় প্রীতিপূর্ণ নয়নের অপলক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় সেনাপতি রায়হানের চক্ষুদ্বয় অশ্রুকণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ যেন মহাপ্রভুর দরবারে শুকরিয়া জানাইবার ভাষা তিনি খুঁজিয়া পান না। অদৃশ্য বিশ্বপতির উদ্দেশ্যে তাঁহার মস্তক আপনিই নত হইয়া আসিল।

সাতচল্লিশ

প্রায় মাসাধিক কাল বহু খোঁজাখুঁজি ও কষ্ট ভোগ করিয়া হারিস অবশেষে এক অপরাহ্নে আল-আদিব গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌছিল! সে দেখিয়া অবাক-চতুর্দিকে বালুকাময় প্রান্তরের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে প্রস্তরময় কাল পাহাড়গুলো পরম গাম্ভীর্য-সহকারে বহু দূরাবধি যেন বিস্তৃত। সেইসব বৃক্ষলতাবিহীন পাহাড় শ্রেণীর শেষ নাই যেন কোন দিকে। হারিসের পৃষ্ঠদেশে একটি কাপড়ের পুটুলিতে দুইখানি বস্ত্র, সামান্য খাদ্যদ্রব্য, পানির ক্ষুদ্র ভাণ্ড ও দফখানি বাঁধা।

সম্মুখের কয়েক প্রস্তরময় উচ্চ টিলা পার হইয়া সেই গ্রামে পৌঁছিতে হইবে। হারিস এক টিলার উপরে উঠিয়া দেখিল, নিম্নদেশে পাহাড়ের ছায়ায় কয়েকজন রাখল বালক খেলায় মশ্‌গুল। তাহাদের দুম্বাগুলো বালুকা ও প্রস্তরময় প্রান্তরে ছাড়াছাড়া কাঁটাগুল্মের সন্ধানে এখানে ওখানে দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সে মেষপালকদের নিকটে গিয়া তাহাদের ডাকিল; কিন্তু কেহ বড় একটা গ্রাহ্য করিল না, খেলা ছাড়িয়া কেহ উঠিলই না।

হারিস অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এক বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিল। তারপর রাখাল বালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে দফ্ বাজাইয়া ধীরে ধীরে গান ধরিল সুমধুর সুরে।

বালকের দল তখন খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল একে একে গায়কের পার্শ্বে। গানের বিষয়বস্তু প্রাচীন আরবের এক যুদ্ধের কাহিনী। অল্পক্ষণের মধ্যেই গানের তালে তালে গীতি-মুগ্ধ বালকগণ দুই হাতে তালি বাজাইয়া নাচিতে শুরু করিল মহানন্দে। নিস্তব্ধ পার্বত্য-প্রদেশ গানের সুর ও বালকদের নৃত্য-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

গানের শেষে বালক-দলপতি আক্‌রাম বলিল, "বাঃ! বড় চমৎকার গান ত! এ গান কোথায় শিখেছ গায়ক?"

হারিস উত্তর করিল, "এ গান আমি এক বেদুঈন যুবকের নিকটে শিখেছিলাম। বড় সুন্দন সে গাইতো।"

আক্‌রাম বিরক্ত হইয়া বলিল, "দূর দূর! মিছে কথা। বেটারা চুরি-ডাকাতি করে খায়, তা আবার গান! কই, আমাদের গ্রামে যে বেদুঈনটাকে বন্দী করে এনেছিল, সে ত আদৌ গাইতে পারতো না।"

হারিস। বন্দী বেচারা ত প্রাণের দায়েই অস্থির, গান গাইবে কখন? কে সেই হতভাগ্য? কোথায় আছে সে?

আক্‌রাম। কি নাম তার বলতে পারি না। প্রায় মাস ছয়েক আগে বন্দী হয়েছিল এক যুদ্ধে-বিশ-পঁচিশ বছরের তাগড়া যোয়ান, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন। ওই যে কালো গ্রামখানা দেখছো না, সেই হাইফা গ্রামের শরাব-ব্যবসায়ী ছায়াদ খরিদ করে নিয়েছে তাকে! আর একখানা গান গাও না মুসাফির!

হারিসের বাদ্যযন্ত্রে আবার শুরু হইল রুনুঝুনু ঝঙ্কার। এইবার সে গাহিতে লাগিল এক পল্লী-সঙ্গীত। গানের মর্মার্থ-কে একজন প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে হারাইয়া শোকে মুহ্যমান। সে জানিতে পারিয়াছে, অপর গ্রামের এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক সেই যুবতীর অপহারক। হঠাৎ একদিন সেই হতাশ- প্রেমিক ঘোড়ায় চড়িয়া খুঁজিতে খুঁজিতে প্রেমিকাকে আবিষ্কার করিল এক ঝর্ণার ধারে। মহানন্দে ছুটিয়া গিয়া তাহার দুই হস্ত আকর্ষণ করিতেই যুবক দেখিয়া অবাক- প্রেয়সীর সর্বাঙ্গে যে বসন-ভূষণের পারিপাট্য নব-বিবাহিতার লক্ষণ। যুবতীর সঙ্গিনীদের কেহ কেহ যুবককে চিনিতে পারিয়া বিদ্রুপবানে জর্জরিত করিল। সীমাহীন আনন্দে আত্মহারা যুবতী তখন চেতনা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল ভূতলে।

যুবক বহুকষ্টে যুবতীর চেতনা সঞ্চার করিতেই শুরু হইল উভয়ের যত দুঃখের কাহিনী, বিরহ-জ্বালায় কত মর্ম- বেদনার কথা। বিরামহীন নয়নজলে উভয়ের কপোলদেশ যে ভাসিয়া গিয়াছে। যুবতীর দুই-একজন সঙ্গিনী এ-দৃশ্য দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, আবার দুই-একজন তখনি যুবতীর স্বামীকে সে-সংবাদটা জানাইতে ছুটিল।

স্বামী ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল অসিহস্তে। সেই ঝর্ণার ধারেই আরম্ভ হইল ভয়ানক যুদ্ধ। যুবতীর স্বামী আহত হইয়া মাটিতে পড়িতেই প্রেমিক যুবক- যুবতীকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া একেবারে চম্পট।

গানে গানে, ললিত ছন্দে, সুরের মূর্ছনায় হারিস গাহিতে লাগিল সেই অপূর্ব কাহিনী। বালকগণ তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। মেষপালগুলো চরিতে চরিতে কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে সেদ্দিকে লক্ষ্য নাই কাহারও।

গান থামিল অনেকক্ষণ পর! হারিস বলিল, "এইবার আমাকে উঠতে হয়। যেতে হবে বহুদূর, বেলা যে শেষ হয়ে যায়!"

গায়কের সম্মুখে উপবিষ্ট আরিফ নামক একটি ছোট ছেলে হারিসের হাঁটুতে ধরিয়া বড় মিনতির সুরে বলিল, "কোথায় যাবে চাচা? চল না আমাদের গ্রামে! রাত্রে আরও গান গাইবে!" এই বলিয়া গীতিমুগ্ধ বালক মুক্তার ন্যায় ধবল দন্তপাটি বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

দুই-তিনজন বয়স্ক বালক সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "ঐ ত দেখা যায় পাহাড়ের কোলে আল-জবিল! ঐ যে উঁচু গাছটা দেখছো না, সেইখানেই ত আমাদের ঘর, যাবে ভাই, আমাদের গ্রামে?"

"হাঁ, যাব বৈ কি। কিন্তু কোন্ গাছটা বললে? ঐ যে দূরের কাল পাহাড়ের নীচে খেজুর গাছ?"

সকলে আবার সমস্বরে চেঁচাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "না, না, সেথায় নয়। ঐ হোথা। সাবধান! ওদিকে যেন যেয়ো না।"

হারিস বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ভাই? ওখানে যেতে এত নিষেধ করছো কেন?"

আক্‌রাম বলিল, "ঐ বাড়ীর মালিক আরফান। তার ভাই রায়হানের মৃত্যুর পর সে আর গান-বাজনা পছন্দ করে না। আবার শুনছি, সে নাকি মুসলমান হয়েছে। সেইজন্য ত গ্রামের সকলে তাকে একঘরে করেছে। প্রকাশ্যে বাড়ী হতে সে বের হতেই পারে না। সেখানে গেলে গ্রামের লোকে সন্দেহ করে তোমাকেও কিন্তু আক্রমণ করতে পারে।"

হারিস বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রায়হান! কোন্ রায়হান? কোথায় ছিল তার নিবাস?"

আক্‌রাম। ঐ আল-জবিলেই বাড়ী। বড় যোয়ান মরদ, বড় যোদ্ধা ছিল। আশপাশ কয় গ্রামে এমন বীরপুরুষ কেউ ছিল না কিন্তু হ'লে কি হয়, শেষটায় যে তার মতিভ্রম ঘটেছিল।

হারিস। কি হয়েছিল তার?

আক্‌রাম। স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিল! তাইতেই সকলে মিলে মেরে ফেলে তাকে। আহা! বড় ভাল লোক ছিল বেচারা। আমাদের কত আদর করতো, তীর-ধনুক তৈরী করে দিত, যুদ্ধ শিখাতো; তার দাপটে আমাদের গ্রাম কেউ আক্রমণ করতে সাহস পেত না।

রায়হানের মৃত্যু-সংবাদ হারিসকে বড় ব্যথিত করিল। সে চিনিতে পারিল, এই সেই রায়হান যাহার সন্ধানে সে বাহির হইয়াছে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি ঠিকই জান রায়হান বেঁচে নেই?"

সকলে একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল, 'হাঁ হাঁ, ঠিকই জানি, মারা গেছে। এমন ভাল লোকের সম্বন্ধে মিছে বলবো কোন্ দুঃখে?"

হারিস। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামে রায়হান কয়জন ছিল?

আক্‌রাম। আরে সেই একজনই। সর্দার শোহেলীর মেয়ের সঙ্গে তার শাদীর কথা হয়েছিল, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করায় তাদের হাতেই প্রাণ হারায় শেষটায়।

হারিসের আর কোন সন্দেহ রহিল না। এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

হারিসকে বড় বিচলিত দেখিয়া আক্‌রাম প্রশ্ন করিল, "কেন এত জিজ্ঞেস করছো? তুমি তাকে চিনতে নাকি?"

হারিস উত্তর করিল, "না, শুনেছি তাঁর কথা।" এই বলিয়া বিষণ্ন বদনে গাত্রোত্থান করিয়া হাইফাভিমুখে সে যাত্রা করিল। ভাবিল, আল-জবিলে গিয়া আর লাভ কি? আমার প্রাণদাত্রীর বাঞ্ছিত পুরুষের সন্ধান ত ইহজগতে আর পাইবার নহে। হায়, কি প্রকারে এই দুঃসংবাদ সেই মাতৃতুল্য রমণীকে জানাইব, তাহার সকল আশা-ভরসা, সকল উদ্যম নিমেষে যেন উবিয়া গেল।

গ্রামে রায়হানের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ব্যাপারটা যেমনই বেদনাদায়ক তেমনই কৌতূহলজনকও বটে।

শোহেলী যখন জানিতে পারিলেন, কন্যা সায়ফুনের সাহায্যেই রায়হান পলায়ন করিয়াছে তখন নিজের মান-সম্ভ্রম, পরিবারের প্রতিপত্তি ও ইজ্জত নষ্ট হইবার ভয়ে প্রচার করিয়া দিলেন-রায়হানকে হত্যা করা হইয়াছে। মুখে মুখে খবর রটিল-নিশাকালে রায়হান ঈসের জঙ্গলে ধরা পড়িয়া প্রাণ হারায়। কেহই এই সংবাদ অবিশ্বাস করে নাই।

রায়হানের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ভ্রাতা আরফান ও ভ্রাতৃবধূ হালিমা বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় আল্লাহ্‌র রহমত আরফানের উপরও নাযিল হয়। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইলে তিনিও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার অনুগতা ভার্যা হালিমাও স্বামীর সঙ্গে ইসলাম কবুল করিয়া ধন্য হইলেন।

সেই অবধি তাঁহাদের নিগ্রহের আর শেষ নাই। সম্প্রতি আরফান প্রাণভয়ে সস্ত্রীক কোন জঙ্গলে আশ্রয় লইবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় একদিন গোপনে সংবাদ পাইলেন, মদীনার মুসলমানগণ আলা-হযরতের নির্দেশে মক্কা-অভিযানে প্রস্তুত হইতেছেন। ঠিক সেইদিনই হারিস রাখাল বালকদের সঙ্গে পূর্বোক্ত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

হারিস চলিয়া গেলে রাখাল বালকগণ মেষপালগুলোকে তাড়াইয়া আনিয়া গ্রামে ফিরিবার আয়োজনে ব্যস্ত, এমন সময় একজন অশ্বারোহী তাহাদের নিকটে আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। বালকগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিল-তাঁহাদেরই গ্রামের মল্লযোদ্ধা আবূ মূসা। আবূ মূসা এদিক-ওদিক তাকাইয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আকরাম! একটু পূর্বেই না একজন ঘোড়সওয়ার এইদিকে এসেছিল? তার পৃষ্ঠদেশে দফ্ বাঁধা? দেখেছ তাকে?"

বালকগণ একসঙ্গে উত্তর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "ঐ হাইফার দিকে গেছে। এই একটু আগেই যে গেল।"

আকরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কেন চাচা! কী হয়েছে! কী করেছে? লোকটা কিন্তু ভাল গাইতে পারে।"

আবূ মূসা অবিলম্বে হাইফার দিকে অশ্ব ছুটাইলেন, আকরামের কথার কোন উত্তর দিলেন না। পশ্চিমে গতায়ূ রবির আরক্ত দেখে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি জোরে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিতে লাগিলেন।

আটচল্লিশ

মুলকে-হাবাশে আজ আনন্দের সীমা নাই। রাজা নজ্জাসী দূতমুখে বিজয়-বার্তা শ্রবণ করিয়াই উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন রাজধানীর সর্বত্র। নাগরিকদের পরিচ্ছন্ন বাসভবনগুলো পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া অপরূপ শোভায় শোভিত। জমকালো বেশভূষায় ভূষিত প্রজাবৃন্দ হাটে-ঘাটে, মজলিসে-মহফিলে, নানাবিধ ক্রীড়াস্থলে ও নৃত্যগীতের আসরে আনন্দোৎসবে মত্ত। যে নগরী মাত্র দুই দিবস পূর্বে বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত ছিল, আজ সেখানে কী আনন্দের বন্যা! মানুষ এমন করিয়াই বুঝি অতীতকে ভুলিয়া যায়! এমন করিয়া অতীতের দুঃখ ভুলিতে পারে বলিয়াই বুঝি মানুষ বাঁচিয়া থাকে।

রাজান্তঃপুরের উৎসব অবর্ণনীয়। সেখানে নৃত্যগীতে, অফুরন্ত সুরাপানে আজ সকলেই গা ঢালিয়া দিয়াছে। দাসদাসীরা আশাতীত পুরস্কার পাইয়া মহাখুশী। বিচিত্র সাজ-সজ্জা পরিধান করিয়া তাহারাও রাজপুরীর একাংশে আপন আপন আবাসে সুরাপান করিতে করিতে নৃত্যগীতে মশ্‌গুল। এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোৎসবে একমাত্র শামিনীর অন্তরই নিরানন্দময়। সখিগণ কয়েকবারই তাঁহাকে উৎসবে লইয়া যাইতে নিরাশ হইয়াছে।

রাজকুমারী গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান। বাহিরে নৃত্যগীত-মুখরিত রাজপুরীর দৃশ্য তাঁহার অন্তস্থল হইতে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলিয়া বাহির করিল। কেননা, রাজা যুদ্ধজয় করিয়া মান-সম্ভ্রম সব ফিরিয়া পাইয়াছেন; কেবলমাত্র শামিনীই যে তাঁর প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন। রাজপুরীর বহির্দ্বার কত বিচিত্র পত্রপুষ্পে সজ্জিত। সেই সজ্জিত তোরণপথে যে সর্বজনবরেণ্য বীর বিজয়ীর বেশে আজ প্রবেশ করিবেন, তিনি তাঁহার পরাবীন নহেন! হায় অদৃষ্ট! রাজকন্যার দুই চোখে অশ্রুধারা, অন্তরে উচ্ছলিত বিরহ-ব্যথা। ডানদিকে নয়ন ফিরাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, কিয়দ্দূরে নফরমহলে দাস-দাসীরা স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া মহোল্লাসে প্রেম নিবেদন করিতেছে নৃত্যগীতের মাধ্যমে। শামিনী সেখানে আর

তিলমাত্রও দাঁড়াইতে পারিলেন না, বাতায়ন ছাড়িয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন উপুড় হইয়া। অশ্রুবন্যায় উপাধান ভাসিতে লাগিল।

নজ্জাসী গির্জায় কৃতজ্ঞতাসূচক প্রার্থনা শেষ করিয়া মুক্তহস্তে দান–খয়রাত করিতে ব্যস্ত, এমন সময় নগরের বাহিরে সামরিক বাদ্যধ্বনি ছাপাইয়া অযুতকণ্ঠে কয়েকবার উচ্চারিত হইল মহামান্য নজ্জাসীর জয়ধ্বনি। রাজকুমার যোফন বিজয়ী সেনাপতি রাযহানকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে পূর্বেই যাত্রা করিয়াছিলেন। এইবার স্বয়ং নজ্জাসী অমাত্যবর্গ–সমভিব্যাহারে বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন পত্রপুষ্পে সজ্জিত রাজপুরীর তোরণে।

দেখিতে দেখিতে সেনাপতি রায়হান পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান পুরবাসীদের শ্রদ্ধা–কৃতজ্ঞতার দান অসংখ্য পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে রাজপুরীর নিকটবর্তী হইলেন। রাজকুমার যোফন তাঁহার পার্শ্বদেশে। পশ্চাতে বিরাট অশ্বারোহী বাহিনীতে মুহুর্মুহু রাজা নজ্জাসীর জয়ধ্বনি।

সুসজ্জিত তোরণে সেনাপতি রায়হান অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া রাজা নজ্জাসীকে অভিবাদন করিলেন। নরপতি হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে রায়হানকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'হে বিজয়ী মুসলমান বীর! আপনাকে ও মুসলমান সেনানায়কদের অশেষ ধন্যবাদ। আজ আমরা আপনাদের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আপনারা হাবশী রাজ্যের গৌরব বর্ধন করেছেন! পরম করুণাময় আপনাদের মঙ্গল করুন! আসুন! রাজদরবারে শ্রবণ করবো আপনাদের সব বীরত্ব–কাহিনী। হে রণশ্রান্ত বীর– সৈনিকগণ! তোমাদেরও অজস্র ধন্যবাদ। যাও বিশ্রাম কর গিয়ে তাঁবুতে। রাজভক্তি ও বীরত্বের পুরস্কার অবশ্যই তোমরা লাভ করবে।"

সিংহদ্বারে আনন্দ– কোলাহল শুনিয়া রাজকুমারী শামিনী প্রাসাদ–অলিন্দে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, যে যুদ্ধ–বিজয়ী বীরপুরুষকে তাঁহার পিতা আলিঙ্গন করিয়া সম্মানিত করিলেন, তিনি পরাবীন নহেন–রায়হান! শামিনী দুই হস্তে সজল চক্ষুদ্বয় আবৃত করিলেন, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

মহামান্য নজ্জাসী অমাত্যবর্গসহ সেনাপতি রায়হানকে লইয়া দরবারগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র পুনরায় চতুর্দিকে উত্থিত হইল তুমুল জয়ধ্বনি!

রাজদরবার অপরূপ সাজে সজ্জিত। মহামূল্য বসন–ভূষণ ও মুকুট পরিহিত হাবশী–অধিপতি নজ্জাসী মণিমানিক্য–খচিত সুবর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সেনাপতি রায়হানকে ডানপার্শ্বে এক কারুকার্যময় রজত আসনে বসাইলেন। জমকালো–পোশাক–পরিহিত অমাত্যবর্গ, হাবশী মুসলমান সেনানায়কবৃন্দ যথোপযুক্ত আসনে সমাসীন। দাসদাসীগণ রাজাদেশের প্রতীক্ষায় পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান। পার্শ্বদেশে এক সুসজ্জিত কক্ষে চাকচিক্যময় উজ্জ্বল বসন–ভূষণ পরিহিতা সুন্দরী নর্তকীর দল উতলা হইয়া রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষায় শুধু প্রহর গণিতেছে। কেউ কেউ বিন্যস্ত কেশগুচ্ছ মনোমত না হওয়ায় আবার খুলিয়া বিন্যাসে ব্যস্ত, কেউ কেউ বসন–ভূষণ পরিপাট্যে আবার মনোনিবেশ করিয়াছে, কেউ কাঞ্চনী কণ্ঠহার কাঞ্চনপ্রভ কাঁচলির তলদেশ হইতে টানিয়া বক্ষোপরি উঠায়; কেউ ঘাড় ফিরাইয়া সুগঠিত নিতম্বোপরি রজত– মেখলা স্থাপন করে; কেউ হাসিতে হাসিতে উজ্জ্বল মুকুরের সম্মুখে বসিয়া হিরন্ময় কর্ণকুণ্ডল নাড়িতে নাড়িতে সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুম–বিনিন্দিত মুখমণ্ডল প্রসাধনে ব্যস্ত; দুই–একটি চঞ্চলা চন্দ্রমুখী রূপৈশ্বর্যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দীপ্তিমান করিয়া এখানে–ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুন্দরীদের স্বর্ণাভরণ–বিচ্ছুরিত পীতাভা বিদ্যুল্লতার ন্যায় চাকচিক্যময়।' মনোহারিণী যুবতীদের মৃদু–পদক্ষেপজনিত সুমধুর নূপুর নিক্কন মাঝে মাঝে দরবার–কক্ষ হইতেও শ্রুতিগোচর হয়।

রাজদরবারের চারিপার্শ্বস্থ গবাক্ষগুলো উন্মুক্ত। পশ্চিমের বাতায়ন পথে অস্তপ্রায় রবির সোনালী আভা, সিংহাসনের উপরিস্থিত কিংখাবের চাঁদোয়ায় লুটাইয়া, রঙ–বেরঙের বেলোয়াড়ী ঝাড়গুলোর দোদুল্যমান স্ফটিক–লহরে গড়াইয়া পড়িয়া, নৃপতি ও সভাসদবর্গের চাকচিক্যময় বসন–ভূষণে ও আসনে লুটোপুটি খাইয়া, দরবার–কক্ষে রাশি রাশি হীরার ফুল যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

কক্ষতল আবৃত মূল্যবান ইরানী কার্পেটে। চারিদিকে প্রাচীরগাত্রে সুনিপুণ–শিল্পী–অঙ্কিত কুমারী মরিয়মের ছবি, যিশুর শেষ ভোজ ও ক্রুশে দেহত্যাগের চিত্রপট প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত। দরবারকক্ষের একপার্শ্বে যিশু–ক্রোড়ে মরিয়ম ও অপর পার্শ্বে প্রার্থনারত খ্রীস্টের মর্মর মূর্তি। মন্দানিল প্রবাহে নানাবিধ গন্ধদ্রব্যের সুরভিতে রাজদরবার আমোদিত।

রাজা নজ্জাসী অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর যে এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই পরিপুর্ণ অভিব্যক্তি বুঝি তাঁহার চোখে-মুখে। রাজসভার নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া তিনি প্রসন্ন-বদনে বলিলেন, "মুসলমানগণ বীরপুরুষ বটে! ইতিহাসে এই জাতির বীরত্ব-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। হে বিজয়ী সেনাপতি রায়হান! হাবশী-অধিপতি বীরত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে কখনও কুণ্ঠিত নয়। উগাণ্ডির বিজিত-রাজ্য দান করলাম আপনাকেই। মুসলমান জাতির সঙ্গে চির-সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হতে আমি রাজকন্যা শামিনীকেও অর্পণ করতে ইচ্ছুক আপনার হস্তে। আপনি বীরপুরুষ, শামিনীর উপযুক্ত পাত্রই বটে।"

দরবারে তুমুল হর্ষধ্বনি, সভাসদগণ উৎফুল্ল। নজ্জাসীর ঘোষণাবাণী শুনিয়া রায়হান আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হে মহামান্য নরপতি! কোন প্রকার পুরস্কারের প্রত্যাশায় যুদ্ধযাত্রা করিনি, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। বিপদ-আপদে মানুষের সাহায্য করা আমাদের ধর্ম, বিশেষত আপনি আমাদের আশ্রয়দাতা-সম্রাট।"

রাজা নজ্জাসী পুলকিত হইয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, "সেনাপতি! বীরের ন্যায্য সম্মানদান আমারও কর্তব্য, আমারও ধর্ম।"

রায়হান পুনরায় বিনম্রবচনে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আপানার ন্যায় মহদন্তঃকরণ ধরাতলে দুর্লভ! আপনার অমূল্য দানে ধন্য হওয়া এ দীনের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু অধম সে অনুগ্রহ লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমার পক্ষে সে মূল্যবান পুরস্কার গ্রহণ করা যে অসম্ভব মহীপাল। আপনি হয়ত অবগত নহেন, সেনাপতি পরাবীনকেও উদ্ধার করে এনেছি! শুনেছি তিনি নাকি রাজকন্যার প্রণয়প্রার্থী। তিনিই উপযুক্ত পাত্র। আমার প্রার্থনা -রাজকুমারীকে তাঁর হস্তেই সমর্পণ করুন, উগাণ্ডি-রাজ্যে তিনিই আপনার প্রতিভূ হউন। ঐ বুঝি আসছেন পরাবীন।"

পরাবীন সেই সময় অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজা নজ্জাসীকে অভিবাদন করিলেন।

বিস্ময়-বিমূঢ় হাবশী নরপতি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করতঃ আনন্দাতিশয্যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আরে, পরাবীন যে! বেঁচে রয়েছ বাছা! আহা, কী আনন্দ! প্রভো দয়াময়! অপার তোমার মহিমা! অসীম তোমার করুণা! পরাবীন, বন্দী হয়েছিলে কিভাবে? মুক্তি পেলে কি করে?"

পরাবীন উত্তর করিলেন, "মহারাজ! পিয়েলোর বিশ্বাসঘাতকতায় বন্দী হয়েছিলাম। সেনাপতি রায়হান আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছেন।"

বন্দী পিয়েলো ও উগাণ্ডিকে ততক্ষণে রাজ-দরবারে আনা হইয়াছে। তাদের দেখিয়া নজ্জাসী কুপিতকণ্ঠে কারাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন, "এই পাপিষ্ঠদের লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ কর! বিদ্রোহীদের এমন শাস্তিই দান করবো, যা স্মরণ করে অনন্তকাল মানুষ শিউরে উঠবে আতঙ্কে।"

তারপর তিনি পরাবীনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যাও পরাবীন, অন্তঃপুরে গিয়ে বিশ্রাম লও! দূরদর্শিতার অভাবে পিয়েলোর কুমন্ত্রণায় বিপথগামী হয়েছিলে, তার প্রতিফলও ভোগ করেছ। আপন প্রাণ ফিরে পেয়েছ বটে, কিন্তু প্রমাণ করেছ-অর্বাচীন যুবক সেনাপতি পদের একান্তই অযোগ্য। মহাবীর রায়হানই এই রাজ্যের সুযোগ্য সেনাপতি। যাও পরাবীন! বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হওগে।"

পরাবীন বিষণ্ন বদনে রাজান্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। এই নিদারুণ দুঃখ কেবলই তাঁহার মনোমধ্যে গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল-'হায়! অদৃষ্ট দোষে আজ আমি মহারাজের কৃপার ভিখারী মাত্র, আর রায়হান বীর সেনাপতি! বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই যে ছিল সহস্র গুণে শ্রেয়!"

পরাবীন রাজপুরীতে প্রবেশ করিবামাত্র পুরনারিগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হারানিধি ফিরিয়া পাওয়ায় তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহার আগমন-সংবাদ ছড়াইয়া পড়িবামাত্র সমগ্র রাজপুরী আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজকুমারী শামিনী পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ওগো, বেঁচে আছ তুমি? প্রভু যিশুর নিকট কত প্রার্থনাই না করেছিলাম! এত রোগা হয়ে গেছ? ওহ! কত কথাই ত বলার আছে আমার, কত

কথাই যে শোনার আছে! চল, ঘরে চল!" এই বলিয়া শামিনী পরাবীনের হাত ধরিয়া তাঁহাকে আপন মহলে লইয়া চলিলেন।

এদিকে সেনানায়ক আবদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে রাজদরবারে আনা হইয়াছে উগাণ্ডির ধনাগারের সমস্ত ধনরত্ন, টাকাকড়ি। সেনাপতি রায়হান নজ্জাসীর সম্মুখে ধনভাণ্ডারগুলোর আবরণ উন্মোচন করিলেন।

নজ্জাসী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অসভ্য উগাণ্ডির এত সম্পদ! এত অর্থ সে সঞ্চয় করেছিল! সেনাপতি! এ-ধন আপনার অর্জিত, সুতরাং আপনারই প্রাপ্য। আপনিই এ-সব গ্রহণ করুন!"

সেনাপতি উত্তর করিলেন, "মহারাজ! উগাণ্ডি-রাজ্যের যিনি অধীশ্বর, এ-ধন তাঁরই। এ-ধন সে রাজ্যের কল্যাণে ব্যয় করুন, অসভ্যদের মনুষ্য-পদবাচ্যে অভিহিত করুন, এই আমার প্রার্থনা।"

নজ্জাসী গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "উত্তম, সে কার্যের ভার আপনিই গ্রহণ করুন; আমি দরবারে সর্বসমক্ষে যা ঘোষণা করেছি, তা' অন্যথা হবার নয়। পরাবীন ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু আমার কথার ব্যত্যয় নেই। স্থির করেছি- রাজকুমারী শামিনীকে সমর্পণ করবো আপনার হস্তেই।"

রায়হান পুনরায় আরজ করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার অতি নগণ্য খাদেম মাত্র-এই দুর্লভ পুরস্কারের যোগ্য মোটেই নই। আমার অনুরোধ, রাজকুমারীকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করুন।"

নরপতি ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "সেনাপতি রায়হান! নজ্জাসীর দান উপেক্ষার বস্তু নয়। আপনি যুদ্ধ-শ্রমে ক্লান্ত; অন্তর ভাবাবেগে পূর্ণ। আজ রাজপুরীতেই বিশ্রাম গ্রহণ করুন, কাল প্রভাতে স্থিরচিত্তে মতামত প্রকাশ করবেন। তখনই শ্রবণ করবো যুদ্ধবার্তারও পূর্ণ বিবরণ।

রায়হান দোলায়মান চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, নজ্জাসীকে তাঁহার জীবন-কাহিনীর গোপন অংশটুকু প্রকাশ করিয়া বলিবেন কিনা-তিনি সেই পল্লী-যুবতী

সায়ফুনকে ভালবাসেন; তাঁহার হৃদয়রাজ্যে আর কাহারও প্রবেশ ত সম্ভব নহে! অবশেষে এই কথা সবিনয়ে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়াই সমীচীন মনে করিলেন– তাঁহার পক্ষে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ অসম্ভব। এমন সময় দেখিলেন, রাজা প্রধানমন্ত্রীর হস্তে অতিথিসেবার ভারার্পণ করিয়া রাজসভা ত্যাগ করিতেছেন। আর কোন কথা বলিবার সুযোগ মিলিল না।

অল্পক্ষণ পরেই মন্ত্রীবর সসম্মানে রায়হানকে লইয়া গেলেন এক সুসজ্জিত মনোরম গৃহে। তিনি জানিলেন, অদূরে অপর গৃহে অন্যান্য সেনানায়কদেরও বিশ্রামের ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক। সেনাপতি দেখিয়া অবাক– রাজোচিত সেবায় তাহার শ্রান্তি দূর করিতে এরই মধ্যে এক দল দাসদাসী সুমিষ্ট আহার্য ও পানীয় লইয়া উপস্থিত।

সূর্য অস্ত গেল। দেখিতে দেখিতে চর্তুদিকে অগণিত বাসবভন অসংখ্য দীপমালায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সমগ্র নগরী এক মনোরম আলোক–সজ্জায় উদ্ভাসিত। রায়হান লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার বিশ্রাম কক্ষেও আলোর মেলা। চারিদিকে মূল্যবান বিলাস–সামগ্রীর ছড়াছড়ি। কুসুম–কুঙ্কুম–কস্তুরী –চন্দন–নিঃসৃত সুমধুর গন্ধরসের সুবাস, ধূপ–ধূনার উগ্র সুরভি মনপ্রাণ যে মাতাইয়া তুলিয়াছে!

সেই বাসগৃহের মেঝেতেও মনোরম ইরানী কার্পেট। এক পার্শ্বে পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা। সুদৃশ্য মখমলে আচ্ছাদিত আরাম কেদারাগুলো তুলতুলে তাকিয়ায় সুসজ্জিত। এখানে ওখানে ফুলদানিগুলোতে সদ্য–আহরিত কত রং –বেরং–এর ফুলের সমাবেশ। চারিদিকে ঘরের দেয়ালে বাইবেলে উল্লিখিত ঘটনাবলী সুনিপুণ চিত্রকরের তুলির আঁচড়ে যেন জীবন্ত। চোখ ফেরান দায়। উত্তম বেশ–ভূষা পরিহিত কৃষ্ণকায় দাসদাসিগণ সেবার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। উন্মুক্ত গবাক্ষপথে রায়হান চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে কাষ্ঠনির্মিত কারুকার্যময় বিরাট এক গির্জার সুউচ্চ চূড়া সুনীল আকাশে যেন মিশিয়াছে। গির্জার চারিদিকে সুরম্য উচ্চ প্রাসাদগুলো নানা রঙের উজ্জ্বল আলোকে সুশোভিত দূরে উচ্চ–নীচ পাহাড়গুলোর উপরে গাছপালাগুলো নিশীথিনীর বুকে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত। এমন সময় শোনা গেল– বাহিরে মুসলমান সেনানিবাসে উদাত্ত সুরে সুমধুর আযান–ধ্বনি। সেনাপতি রায়হান অবিলম্বে কক্ষসংলগ্ন স্নানাগারেপ্রবেশ করিয়া যোদ্ধৃবেশ পরিত্যাগ করত সর্বাগ্রে নামাযের আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।

ঊনপঞ্চাশ

রায়হান যুদ্ধের বিশদ বিবরণ শোনাইতে শোনাইতে রাজা নজ্জাসী ও রাজকুমার যোফনের সঙ্গে ষোড়শোপচারে নৈশভোজন সমাপ্ত করিয়া অধিক রাত্রে সুসজ্জিত শয়নকক্ষে গেলেন বিশ্রামের আশায়।। ভোজনকক্ষে পিতার আদেশে শামিনীও উপস্থিত ছিলেন বটে কিন্তু আহারে তাঁহার কোন উৎসাহ ছিল না। রাজকুমারীর বিমর্ষ ভাব, কাতর চাহনি ও মলিন মুখশ্রী রায়হানের প্রাণে বড় বাজিয়াছিল। শয়নকক্ষে এক আরাম কেদারায় গা এলাইয়া দিতেই বারবার তাঁহার মানসপটে উদয় হইতে লাগিল সেই করুণ দৃশ্য। সেই সঙ্গে জীবনের বহু খুঁটিনাটি ঘটনা এবং সামান্য ব্যাপারও গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়া মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিলঃ

'একদা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হাতে আঘাত পাইয়া বাড়ী ফিরিলে সায়ফুন তাঁহার ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিয়াছিল ওড়নার আঁচল ছিঁড়িয়া, পরে স্বেচ্ছায় নিজের হাত খানিকটা কাটিয়া যন্ত্রণায় শয্যাশায়িনী হইয়াছিল। এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চঞ্চলা কিশোরী দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, 'হাত কাটলে কেমন যে কষ্ট হয়, তাই ত দেখছিলাম।'

মনে পড়ে, কত নিশীথে নিজে অভুক্তা থাকিয়া সায়ফুন নিজের আহার্য ভাবী হালিমার হাতে চুপি চুপি দিয়া আসিত। বলিত, "বাড়ীতে মেহমানদারি ছিল, তোমাদের ফেলে একা একা খাই কি করে ভাবী!" আরো স্মরণ হয় কত দিনের কত কথা, কত ঘটনা।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। রাজপুরীতে জনসমাগম আর নাই। চারিদিকের আনন্দ-কোলাহলও অনেকটা মন্দীভূত। রায়হান বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, রাজপথে নৃত্যগীত তখনও চলিতেছে, কিন্তু দর্শকমণ্ডলীর ভিড় যেন আর ততটা নাই। অদূরে এক নৃত্যরত গায়ক নর্তকী গায়িকার হস্ত ধারণ পূর্বক প্রেম নিবেদনে মশগুল। গায়িকা কিন্তু ঘৃণাভরে হাত ছিনাইয়া লইয়া অপর এক

বিরহ-কাতর যুবকের প্রতি বারবার কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। দৃশ্যটি রায়হানের চক্ষে ভাল ঠেকিল না। উঠিয়া গবাক্ষ -পাট বন্ধ করিবামাত্র কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করতঃ দুই হাত উপরে উঠাইয়া তাঁহাকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিল।

রায়হান ঘাড় ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "কে ও?"

রমণী উত্তর করিল, "অধীনা সেবিকা রাজকুমারী শামিনীর এক পরিচারিকা। রাজকন্যা এখনই সেনাপতির সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক।"

সেনাপতি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "রাজকুমারী শামিনী!"

"হ্যাঁ, শামিনী।" এই বলিয়া আলুথালু বেশে রাজকুমারী স্বয়ং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবতীর বসন-ভূষণের পারিপাট্য নাই। মলিন বেশে, রুক্ষ কেশে, দেহ-সৌন্দর্য স্তিমিত- যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পুর্ণিমার নিস্প্রভ চাঁদ। তাঁহার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে বিকট বিদ্বেষ-ছাপ পরিস্ফুট, ক্রোধভরে ওষ্ঠদ্বয় মৃদু কম্পমান। মৃদু-মন্দ অনিল-হিল্লোলে রাজকুমারীর কর্ণমূলে দোলায়মান কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ পুষ্পদলবত গণ্ডদ্বয় চুম্বন করিয়া বংশী-সুর-মুগ্ধ ফণিনীর ন্যায় মাথা নাড়িয়া নাচিতেছে। রায়হান স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শামিনী রায়হানের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুপিত কণ্ঠে বলিলেন, " সেনাপতি! আমার সর্বনাশ সাধন করতে এসেছেন অর্থলোভে আর রাজ্যলোভে? আপনি এত নীচ?"

রায়হান এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে আরও বিস্মিত হইলেন। হাসিমুখে বলিলেন, "রাজকুমারী! ভুল বুঝেছেন· ও সব লোভ আমার মোটেই নেই। আপনার অনিষ্ট-চিন্তা আমি কল্পনাও করি না।" শামিনী ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর ন্যায় গ্রীবা নাড়িয়া স্ফীতকণ্ঠে বলিলেন, "মিথ্যে কথা! আপনি রাজ্যলোভে, অর্থলোভে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক! আমি পরাবীনকে ভালবাসি, আপনাকে নয়- এই কথাটাই জানাতে এসেছি।"

সেনাপতি স্মিতমুখে বলিলেন, "সে কথা ত আমার অজানা নেই সুন্দরী! আপনার মনস্কামনা সিদ্ধির পথে আমি কোন বাধাই সৃষ্টি করতে চাই না

রাজকুমারী! অদৃষ্টে সুখ না থাকলে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়ে কি করবো! অর্ধেকে আমি সন্তুষ্ট নই, আমি চাই পূর্ণ রাজত্ব। যা'কে আমি ভালবাসি, তাঁর অন্তররাজ্যই আমার কাম্য। অন্য কোন রাজ্য আমি চাই না।"

নিমেষে শামিনীর ক্রোধানল যেন অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তিনি? কার হৃদয়রাজ্য আপনি কামনা করেন? তিনি কি নর্তকী শিম্পী, না অন্নাবিলি?"

সেনাপতি হাসিয়া বলিলেন, "না, তারা কেউ নয়, রাজকন্যা শামিনীও নন।"

রাজকুমারী ওষ্ঠদ্বয় অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁতে চাপিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না; যাকে লাভ করার জন্যে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যাকে হেলায় ঠেলতে পারেন, তাকে দেখার বড় সাধ হয়।"

রায়হান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি বড় দুঃখিত, আপনার সে সাধ পূর্ণ হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়; কোথায় রয়েছেন তিনি জানি না; বেঁচে আছেন কিনা, তা'ও বলতে পারি না।"

রাজকন্যা রূঢ়স্বরে বলিলেন, "পরিহাস করছেন? রাজকুমারী শামিনী কি পরিহাসের পাত্রী?"

রায়হান গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না, পরিহাস নয়, যা সত্য, তা'ই শুধু বলছি।"

রাজকুমারী বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আমার বাঞ্ছিত মিলনপথে আপনি সত্য সত্যই কোন বাধা সৃষ্টি করবেন না?"

রায়হান গৃহমধ্যে পায়চারি করিতে করিতে বলিলেন, "না রাজকন্যা ! কোন বাধাই সৃষ্টি করতে চাই না। মহাবীর পরাবীনের সঙ্গে আপনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন– এই আমার কামনা!" শামিনী এইবার ক্রুরস্বরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সেনাপতি! দুর্ভাগ্যক্রমে পরাবীন যুদ্ধজয়ে বঞ্চিত হয়েছেন, তাতেই কি বিদ্রূপ করছেন?"

"মোটেই না।"

"আচ্ছা, আমার একটি উপকার করবেন?"

"কি করতে হবে বলুন!?

"আপনি সম্মত হলে, কথা দিলে, বলবো। করবেন উপকার?"

"কেন করবো না? আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আপনার পরাবীনকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছি, আর আপনার একটা অনুরোধ রাখবো না! আপনি সুখী হোন-এই আমার দিলের বাসনা। বলুন, কি করতে হবে?"

"আপনাকে চলে যেতে হবে এ-দেশ ছেড়ে। আপনি এ-রাজ্যে থাকলে পরাবীনের মান সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সবই নষ্ট হয়ে যাবে। আমিও শান্তি পাব না অন্তরে!"

অকস্মাৎ রায়হানের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। রাজকুমারীর এবংবিধ অদ্ভুত প্রস্তাব তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। বিস্ময়বিমূঢ় নয়নে রাজকন্যার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "এ দেশই ছেড়ে চলে যেতে হবে? আমি চলে গেলেই কি সুখী হবেন আপনি?"

শামিনী নিরুত্তর। অপলক নেত্রে তিনি সেনাপতির মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছেন। রায়হান মনে মনে ভাবিলেন," কোথায় বা যাব, কোথায় আবার আশ্রয় পাব! আজ আমার সায়ফুন নিকটে নেই, কে আমাকে পথের সন্ধান দেবে?" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শামিনীকে বলিলেন, "বেশ আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি চলে যাব শীঘ্রই এদেশ ছেড়ে। আরও কিছু বলবার আছে রাজকুমারী?"

"না, তবে কালই এ- দেশ ত্যাগ করবেন।"

"কালই যেতে হবে?"

"হাঁ, কালই। আর এক কথা। আমার পিতা এ-বিষয়ে ঘূণাক্ষরেও যেন কিছু জানতে না পারেন। বলুন, কথা রাখবেন?"

রায়হান কতক্ষণ নীরব থাকিয়া বিষণ্ন বদনে বলিলেন, "বেশ, তাই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার সুখের পথে কন্টক হয়ে থাকবো না।"

"কথার কোন নড়চড় হবে না, আশা করি।"

"রাজকুমারী। মুসলমান কখনো ওয়াদা খেলাফ করে না।" কথাগুলো রাজকন্যার অন্তরে কেমন যেন দাগ কাটিয়া দিল। হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিতে পা

বাড়াইয়াও দ্বারদেশে একবার না থামিয়া তিনি পারিলেন না। বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে সেনাপতির দিকে আর একবার তাকাইয়া দেখিলেন–কত সুন্দর। যুবক কত সুপুরুষ। শৌর্য–বীর্যেও পরাবীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। রাজকুমারী আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াইলেন না। বাহিরে পরিচারিকা অপেক্ষা করিতেছিল; তাহাকে লইয়া ত্রস্তপদে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রায়হান হেলান কাষ্ঠাসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন–আশ্চর্য এই নারী–চরিত্র! মরিতে মরিতে পরাবীন বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তথাপি রমণীর অন্তরে কৃতজ্ঞতার বাষ্পটুকুও নাই, মুখে ধন্যবাদের আভাসটুকুও নাই; প্রতিদানে আমাকেই কিনা এই দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে চিরতরে! আহ্, কোথায়ই বা যাই! এ বিরাট বিশ্বে না জানি আবার কোথায় আশ্রয় মিলিবে!

কতক্ষণ যে তিনি তন্ময় হইয়া আকাশ–পাতাল ভাবিলেন খেয়ালই নাই। হুঁশ হইল, যখন পার্শ্ববর্তী গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল তিনটা। রায়হানের ঘুম চলিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ, শয্যায় শুইবার প্রবৃত্তিই যেন হয় না। কক্ষমধ্যে বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় ক্রমেই যেন গরম অনুভূত হইতেছে। উঠিয়া গবাক্ষপাট খুলিয়া দিতেই শীতল সমীরণ তাঁহার সর্বাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। দেখিলেন, অসংখ্য দীপমালায় সমুজ্জ্বল নগরী নিদ্রার আবেশে যেন মোহাচ্ছন্ন। উপরে সুনীল গগনে নক্ষত্রগুলোও যেন মিট মিট করিয়া ঝিমাইতেছে। রাজপথে উৎসব আর নাই। সেই নাট্যাভিনয়ও যেন শেষ হইয়া গিয়াছে বহুক্ষণ। কোথাও জন মানবের চিহ্নমাত্র নাই। কেবল এখানে ওখানে দুই চারিটা ছন্নছাড়া খেঁকী কুকুর খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অবনত মস্তকে। রায়হান ফিরিয়া আসিয়া আবার আরাম কেদারায় উপবেশন করিলেন। অর্ধশায়িত অবস্থায় কত কথাই তিনি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন–সায়ফূনের কথা, রাহেলের কথা, শোহেলীর কথা। তাঁহার মানসনেত্রে সহস্র যোজন পথের ওপারে, স্বদেশের গিরিমালা, স্বদেশের মরুভূমি, পাহাড়ের কোলে মেষপাল, উষ্ট্রযুথ, পার্বত্য ঝর্ণা ও নহরগুলি যেন মুর্ত হইয়া উঠিল। সর্বোপরি সায়ফুনের ইন্দুবিনিন্দিত মুখখানি অন্তরে উঁকি মারিয়া উঠিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে কখন তিনি ঘুমের আবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন টেরও পাইলেন না।

পঞ্চাশ

ঘুম ভাঙ্গিলে রায়হান দেখিলেন, বেলা বেশ উপরে উঠিয়াছে, কিন্তু শয়নকক্ষের আলো তেমনই জ্বলিতেছে। বুঝিলেন, সারাটা রাত্রি তাঁহার কাষ্ঠাসনেই কাটিয়া গিয়াছে, দাসদাসিগণ কেহই সাহস করিয়া ডাকিয়া দেয় নাই।

প্রকোষ্ঠের অপর পার্শ্বে দগ্ধফেননিভ কোমল শয্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই রায়হানের মুখে যে হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহা পূলকে নয়, নৈরাশ্যে। বুঝিলেন, রাজসুখ যাহার অদৃষ্টে নাই, এই সুখশয্যা তাহার সহিবে কেন? দাসদাসীদের মুখে যখন সংবাদ পাইলেন–দরবারে উপস্থিত হইতে দুই দুইবার রাজা নজ্জাসী তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তখন তাঁহার লজ্জার আর অবধি নাই।

খানাপিনা শেষ করিয়া রায়হান তাড়াতাড়ি ছুটিলেন রাজদরবারে। দেখিলেন, দরবার কক্ষ জমজমাট, সৌম্য দর্শন ও প্রশান্ত মহীপাল উজ্জ্বল বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। নরপতি প্রফুল্ল, সভাসদগণ উৎফুল্ল। রাজসভা জাঁকজমকে ও সাজসজ্জায় সমুজ্জ্বল। রায়হান দরবারে প্রবেশ করিতেই সভাসদগণ মহারাজ নজ্জাসী ও রায়হানের জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রায়হান অভিবাদনপূর্বক মহীপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র রাজা সহাস্যবদনে তাঁহাকে সেনাপতির নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতে বলিয়া, সকলের অবগতির জন্য সমর কাহিনী পুনরায় আনুপূর্বিক বর্ণনা করিতে আদেশ দিলেন।

সেনাপতি যুদ্ধজয় কাহিনী বর্ণনা করিলেন আদ্যোপান্ত। সে কাহিনী শ্রবণ করিয়া সভাসদগণ একবাক্যে সেনাপতি ও মুসলমান সেনানায়কদের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। রাজা নজ্জাসী স্মিতহাস্যে পরম উৎফুল্ল–হৃদয়ে রায়হানকে বলিলেন, সেনাপতি! আপনাকে পুরস্কৃত করার ইচ্ছা পূর্বেই ব্যক্ত করেছি। আপনি মনস্থির করে এসেছেন নিশ্চয়ই?"

রায়হান বিনম্র বচনে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমার তিনটি প্রার্থনা আছে, অনুমতি পেলে আরজ করি।"

নজ্জাসী সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, " সেনাপতি! আপনার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকবে না। বলুন, বলুন; আপনার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে।"

" মহারাজের আশ্বাসবাণী শুনে কৃতার্থ হয়েছি। আমার প্রথম প্রার্থনা– উগাণ্ডির বন্দিনী যে কয়টি হতভাগী নর্তকীকে উদ্ধার করে এনেছি, তাদের মুক্তি দিয়ে স্বদেশে ফেরার সুযোগ দিন।

"তুচ্ছ কথা। সবাই তারা মুক্ত, সকলেই স্বাধীন। আজই তাদের স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা হবে। আর কি প্রার্থনা বীরবর?"

" মহারাজ! আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা –রাজকুমারী শামিনী ও কুমার পরাবীনকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করুন। উগাণ্ডির বিজিত রাজ্য যৌতুকস্বরূপ তাঁহাদেরই দান করুন।"

চোখের উপর কোন কিছু অঘটন সংঘটিত হইতে দেখিলে মানুষ যতটা বিস্মিত হয়, ততোধিক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রাজা নজ্জাসী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নিরাশ্রয় পথের ভিখারী অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা এমন ভাবে উপেক্ষা করিবে, নজ্জাসী স্বপ্নেও ভাবেন নাই। রাজানুগ্রহ কেহ কোনদিন এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, তাহা তাঁহার কল্পনারও অগোচর। নজ্জাসীর মুখমণ্ডল বিষাদ–কালিমালিপ্ত, কণ্ঠে নিঃসীম জড়তা। হতাশ হৃদয়ে তিনি বলিলেন, " হে বিজয়ী বীর! আমার প্রস্তাব এমন রূঢ়ভাবে যে কেউ কখনো উপেক্ষা করতে পারে, তা' স্বপ্নাতীত।"

রায়হান বিনম্র বচনে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! এ দীনের অপরাধ মার্জনা করুন। শুনেছি, রাজকুমারী শামিনী ও পরাবীন উভয়েই উভয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। আপনি এঁদের মিলনপথে কোন বাধাই সৃষ্টি করবেন না।, এই আমার একান্ত অনুরোধ।"

নজ্জাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, " হে বীর মুসলমান! আপনি মহৎ, আপনার ধর্ম মহান। অপরের সুখের জন্য কেউ কখনো রাজ্য ও রাজকন্যা উপেক্ষা

করেছে শুনিনি। যে ধর্ম মানুষকে পার্থিব সম্পদে এতটা নির্লোভ, এতটা নিস্পৃহ করে তুলে মানুষকে এতটা মহত্ত্বের ছাঁচে গড়ে তুলে, সে ধর্ম নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, সে ধর্ম আমার নমস্য। সেনাপতি! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক আরও কিছু প্রার্থনা আছে?"

"মহারাজ! আর একটি মাত্র আরজ। বিশেষ কোন কারণে আমাকে আজই যাত্রা করতে হবে স্বদেশে। এখনই যে আমাকে যাত্রার আয়োজন দেখতে হয়। শুধুমাত্র আপনার অনুজ্ঞা প্রার্থী।"

নজ্জাসী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বিস্ময়ে, বিষাদে বহুক্ষণ তাঁহার বাক্য নিঃসরণ হইল না। রাজসভা নিস্তব্ধ। কেহই বুঝিতে পারিলেন না, হঠাৎ এমন কি ঘটিল, যাহাতে তাঁহাকে বিপদসঙ্কুল স্বদেশে আজই যাত্রা করিতে হইবে। নজ্জাসী কতক্ষণ পরে বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কোন অঘটন ঘটেছে কি? সেনাপতি কি কারো আচরণে ব্যথিত?"

রায়হান উত্তর করিলেন, "না মহারাজ! আপনার রাজ্যে সকলেই আমরা পরম সুখে বাস করছি। এ সুখ জীবনে ভুলবার নয়। মুসলমানগণ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, চিরবাধিত।"

রাজা নজ্জাসী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সেনাপতি! কথা দিয়েছি আপানার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকবে না; কিন্তু আপনার মুখে এত সব অদ্ভুত প্রস্তাব শুনবো, কখনো তা কল্পনাও করিনি। আপনি এভাবে বিদায় নিলে আমার অন্তর যে নিদারুণ ব্যথায় ভেঙ্গে পড়বে, তা' আপনাকে বুঝাবো কিরূপে! কেন? কি কারণে আপনি হাবশী- দেশ ত্যাগ করবেন?"

রায়হান অধোবদনে নিরুত্তর।

মহারাজ নজ্জাসী কতক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, এ দেশ ত্যাগের রহস্য প্রকাশ করতে আপনি অনিচ্ছুক। কিন্তু আমি যে নিরুপায়! বেশ! আপনার শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হোক! কিন্তু আপনাকে স্বদেশের বিপদের মাঝে ফিরিয়ে দিতে মন যে কিছুতেই সায় দেয় না, বীরবর! কবে ফিরে আসবেন আবার।"

রায়হান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিনম্র বচনে বলিলেন, 'মহারাজ! ফিরে আসা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। এ দেশকে সত্যই ভালবেসেছিলাম স্বদেশের মত। আজ ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে খুবই। মহারাজ! আমার কাতর প্রার্থনা -আমাকে মার্জনা করুন! এখনই আমাকে রাজসভা ত্যাগ করতে অনুমতি দিন। মহাপরাক্রম মহীপাল। আপনার জয় হোক! মহান আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! আমার স্বদেশের পাহাড়-পর্বত, দিগন্তব্যাপী মরুভূমি, আমার ভগ্ন কুটীর আজ আমাকে আকুলভাবে আহ্বান করছে। মহামান্য অধিপতি! আমার বিদায় সালাম গ্রহণ করুন। মাননীয় সভাসদগণ! বিদায় আরজ:

রায়হান যথারীতি অভিবাদনপূর্বক দরবার-কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা নির্বাক, বহুক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূরণ হইল না। সভাসদগণও স্তব্ধ হইয়া অবনত মস্তকে উপবিষ্ট, কাহারও মুখে কথা নাই। সেনাপতির আকস্মিক বিদায়ে নজ্জাসী বড় ব্যথিতই হইলেন। বিষণ্ন বদনে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, "সমুদ্রে গমনোপযোগী এক বৃহৎ জলযানে সেনাপতির যাত্রার আয়োজন করুন। উগাণ্ডির নর্তকী দলটিকেও তৎসঙ্গে যেন পাঠাবার ব্যবস্থা হয়।"

রাজা বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন অন্তঃপুরে। চারিদিকের সমস্ত জাঁকজমক, সমস্ত আমোদ-প্রমোদ তাঁহার চোখে যেন মলিন, অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে এক নিমেষে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাতে রাজ্যময় এই বিরাট উৎসব তাঁহার দিকে বুঝি বা ভ্রূকুটি করিয়া বিদ্রূপ করিতেছে।

আর বিলম্ব করা চলে না। এইবার বন্ধুদের নিকটে বিদায় লইয়া যাত্রার আয়োজন করিতে রায়হান মুসলমান-পল্লীতে রওয়ানা হইলেন।

❂ ❂ ❂ ❂

পল্লী বড় নীরব। রাজ্যসুদ্ধ উৎসবের ছোঁয়া এখানে লাগে নাই দেখিয়া রায়হান বড় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। চারিদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। দেখিলেন, সেনানায়ক আব্দুর রহমান, জাফর, আবু তোরাব প্রমুখ বীর বিমর্ষ বদনে একত্রে বসিয়া কি যেন আলাপ-আলোচনায় রত। বড় উদাসীনভাবে তাঁহারা রায়হানকে অভ্যর্থনা করিলেন। ব্যাপার কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বন্ধুগণ তাঁহার

কৃতিত্বে, তাঁহার রাজসম্মানলাভে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবেন, তা' কি কখনও সম্ভব!

রায়হান আবদুর রহমানের স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপনপূর্বক ভাবাবেগজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, " বন্ধুবর! কেন এত বিরূপ হয়েছ? ভেবেছ কি, পদমর্যাদা লাভ করে তোমাদের ঊর্ধ্বে উঠেছি? চেয়ে দেখ, রাজদত্ত বেশভূষা আর রাজসম্ম পান চিরতরে ত্যাগ করে এসেছি। আর আমি নজ্জাসী সেনাপতি নই। আজই আমাকে যাত্রা করতে হবে স্বদেশে। বিদায় নিতে এলাম তোমাদের কাছ থেকে।"

সকলে একসঙ্গে জিজ্ঞাসু নেত্রে রায়হানের মুখের প্রতি তাকাইলেন। তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি নাই। আব্দুর রহমান প্রশ্ন করিলেন, " স্বদেশে যাত্রা করবে কেন! খবর কিছু শুনেছ নাকি?"

রায়হান আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "খবর! কিসের খবর ভাইজান?"

আব্দুর রহমান আবেগভরা কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, 'রায়হান। তোমার সৌভাগ্যে আমরা দুঃখিত হব ভেবেছ? তোমার রাজসম্মান, তোমার বীরত্ব আমাদের গৌরব কি সহস্র গুণ বাড়িয়ে দেয়নি? এ কি বললে- তোমার গৌরবে দুঃখিত হব? রায়হান, তোমার দুর্ভাগ্যে আমরা সকলে কত যে ব্যথিত, তা' বলে শেষ করার নয়। দেশ থেকে আজ রাহেল এসেছে। তাকে যেন ভুল বুঝো না। সে আর তোমার শত্রু নয়, অবিশ্বাসী কাফের নয়। অতীত জীবনের কলঙ্কময় কাহিনী স্মরণ করে আজও রাহেল কত অনুতাপানলে জ্বলে পুড়ে মরছে। কিন্তু যা হয়ে গেছে তা' ত শত আক্ষেপেও আর ফেরার নয় ভাই! ধৈর্য ধর, ঘরে চল।"

অকস্মাৎ রায়হানের মাথার উপর যেন বজ্রপাত হইল! কি এক দুঃসংবাদ শুনিবার আশঙ্কায় তাঁহার অন্তর দুরু দুরু কম্পমান। কাতর কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর ভাই আব্দুর রহমান?"

আব্দুর রহমান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি যে বলি ভাই! সে দুঃসংবাদ জানাতে আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে। কিন্তু না বললেও ত নয়- সায়ফুন নিরুদ্দেশ। তোমার পশ্চাতে নাকি ঈসের জঙ্গলে সে প্রবেশ করেছিল।

রাহেল অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, কিন্তু সন্ধান পায় নি। রায়হান! তুমি ত জান শোকে কাতর হওয়া বীরপুরুষের ধর্ম নয়। ধৈর্য ধর, আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর তোমার অন্তরকে সোপর্দ কর।"

রায়হানের আপাদমস্তকে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ, কণ্ঠতালু শুকাইয়া কাঠ। ক্ষীণ আর্তনাদ সহকারে তিনি বলিলেন, "কী, সায়ফুন নিরুদ্দেশ। বেঁচে নেই সায়ফুন!" সঙ্গে সঙ্গে রায়হান ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম। যে মহাবীর মাত্র তিন দিবস পূর্বে দানবের ন্যায় পাহাড়ে-পর্বতে ছুটাছুটি করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসংখ্য অসভ্য-শত্রু নিপাত করিয়া উগাণ্ডি রাজ্য ছারখার করিয়া আসিয়াছেন, সেই বীরপুংগব এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র সমস্ত সাহস, সমস্ত শক্তি এক নিমেষে যেন হারাইয়া ফেলিলেন।

অতীতের দুষ্কর্মের জন্য রাহেলের কত যে লজ্জা আর অনুশোচনা, কত না ক্ষমা-প্রার্থনা। রায়হানের সম্মুখীন হইতে সে সাহস পায় না। আব্দুর রহমান তাহার হাত ধরিয়া রায়হানের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "মুসলমান ক্ষমা করতে জানে, ক্ষমার মহত্ত্ব কখনো সে ভুলে না। তুমি তাকে মার্জনা কর রায়হান।"

রাহেল অবনত মস্তকে রায়হানের হাত দুইটি ধরিয়া ছলছল নয়নে বলিল, "রায়হান ভাই! তোমার আর সায়ফুনের দুর্ভাগ্যের মূলে এই অধম গুনাহগার! যদি পার এই অবোধ ভাইকে ক্ষমা কর রায়হান! নয়তো যে শাস্তি খুশী আমায় দাও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক!"

রায়হান সজল নয়নে রাহেলকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই! সবই আমার অদৃষ্টের লিখন। মহান আল্লাহ্ তোমায় মার্জনা করুন! আমার সায়ফুন নেই, দুনিয়াতে কি আশায় বেঁচে থাকবো বলতে পার?"

রায়হান আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, অশ্রুকণায় দুই চোখ টলমল।

রাহেল নানাভাবে রায়হানকে সান্ত্বনা দান করিয়া অন্তরে আশার আলো ফুটাইয়া তুলিতে কোন চেষ্টারই কসুর করিল না। জাফর, আব্দুর রহমান, আবু তোরাব, আবু আব্দুল্লাহ্ প্রমুখ বীরও নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে রায়হানকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাহেল-প্রমুখাৎ সায়ফুনের মর্মান্তিক কাহিনী শ্রবণে রায়হানের অন্তর যেন দুঃসহ বেদনায় নিষ্পিষ্ট-শেলবিদ্ধ। নিদারুণ মর্ম-যাতনায় কাল্লিনী যুদ্ধজয়ী সেই বিরাট পুরুষ মুষড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নপথে অঝোরে নামিয়া আসিল বাঁধন হারা অশ্রুধারা।

একান্ন

অপরাহ্নে রাজা নজ্জাসীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ; একখানি ছোট নৌকায় নীল নদের শাখা-প্রশাখা বাহিয়া লোহিত সাগরে নামিতে হইবে। সাগর-সঙ্গমে একখানা সমুদ্রগামী জলযান তাঁহাদেরই প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। সেই পোতেই সমুদ্র পাড়ি দিবার ব্যবস্থা।

রায়হান ব্যথা -ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বন্ধুদের নিকটে বিদায় লইয়া অবিলম্বে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিল রাহেল। আত্মীয়-স্বজন মদীনায় আশ্রয় লইয়াছে শুনিয়া, আবুল বাশার ও আবু সালেহ্ নামক দুইজন মুসলমান যুবকও মদীনায় যাইতে মনস্থ করিয়া রায়হানের সঙ্গী হইলেন। আব্দুর রহমান, জাফর ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব তাঁহাদিগকে নদীতীরে পৌঁছাইয়া দিতে সঙ্গে চলিলেন নির্বাক, বিষণ্ন বদনে। রাজা নজ্জাসীর আদেশে পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল লইয়া কয়েকজন ভৃত্য ও মাঝি-মাল্লা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া পূর্বাহ্নেই সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল অপর এক নৌকায়।

রায়হান বিমর্ষ বদনে নদীতীরে পৌছিয়া শুনিলেন, শিমপী ও তাহার সঙ্গিনীগণ অপর এক নৌকায় উপবিষ্টা। তাহারাও যাত্রার জন্য প্রস্তুত। ভাটার এখনো কিঞ্চিত বিলম্ব, ভাটা লাগিলেই নৌকা ছাড়া হইবে।

রায়হানকে দেখিবামাত্র শিম্পী নৌকার বাহিরে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, " সেনাপতি সাহেব! আপনার অনুগ্রহে আমরা মুক্তি পেয়েছি। আপনার দয়ায় আমাদের ঘৃণিত জীবনের অবসান ঘটেছে। এ উপকার কেউ ভুলবো না। আপনার মঙ্গল হোক! কিন্তু ভবিষ্যৎ ভেবে সকলেই যে বড় চিন্তাকুল হয়েছি। মাতাপিতা আর আত্মীয়-স্বজন যদি আমাদের গ্রহণ না করেন। যদি আমাদের হত্যা করে ফেলেন?" রায়হান আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হত্যা করবে! কি

বলছো! কেন তোমাদের গ্রহণ করবেন না? তোমাদের অপরাধ?" শিম্পী উত্তর করিল, "প্রায় বৎসরকাল আমরা উগাণ্ডির রাজপুরীতে বাস করেছি-এই ত আমাদের অপরাধ।"

রায়হান বলিলেন, "কিন্তু সে অপরাধ ত তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত নয়। দৈব-দুর্বিপাকে দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে প্রাণভয়ে তোমাদের নর্তকী-বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল; সে জন্য কি তোমাদের মাতাপিতা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করবে? হত্যা করবে?" কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন, "না, অসম্ভব কিছুই ত নয়। তোমাদের সন্দেহ একেবারে অমূলকও নয়। যে দেশে পুরুষ নারীদের মেষপালের ন্যায় বিক্রয় করে, মাটিতে জীবন্ত প্রোথিত করে, সে দেশে কিছুই ত অসম্ভব নয়! নারী জাতি বড় দুর্ভাগা। কিরূপে যে তোমাদের সাহায্য করবো, বুঝতে পারছি না।"

শিম্পী পুনরায় ডাকিল, "সেনাপতি সাহেব!"

রায়হান বাধা দিয়া বলিলেন, "শিম্পী! আমি আর সেনাপতি নই। তোমরা আমার ভগ্নীস্থানীয়া। আমাকে ভাই বলেই গ্রহণ কর।"

আনন্দাতিশয্যে শিম্পীর দুই চক্ষু ছল্‌ছল্‌, তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা পরিমাপ করে কার সাধ্য। নৌকাভ্যন্তরে উপবিষ্টা অন্যান্য আরোহিগণও হর্ষোৎফুল্লা। শিম্পী করজোড়ে মিনতির সুরে বলিল, "এই অবহেলিতা, লাঞ্ছিতাদের ভগিনীর মর্যাদা যখন দিয়েছেন, তখন আর উপেক্ষা করলে চলবে না। সম্মুখে ঘোর অন্ধকার। সে আঁধারে পথ চলবো কিরূপে? হে দয়ালু বীর! আপনি আমাদের প্রাণরক্ষা করেছেন, এক্ষণে বেঁচে থাকার পথ নির্দেশ করুন। আপনাকে একে একে আমরা সকলেই শোনাব আমাদের দুঃখময় কাহিনী। চলুন আমাদের নৌকায়। ভাটার এখনও খানিকটা বিলম্ব।"

রায়হান বিষণ্ন বদনে বলিলেন, "শিম্পী! তোমাদের কাহিনী শোনার অবকাশ এখন নেই, তবে সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে রাখা ভাল। কোথায় তোমাদের পাঠাতে হবে বল? কোথায় যাবে ঠিক করেছ?"

শিম্‌পী কাতরভাবে বলিল, "ওগো দয়ালু উদ্ধারকর্তা! আমরা স্থির করেছি পবিত্র ইসলামের শান্তিময় ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হবো। তা'হলে আখেরে হয়ত নাজাত মিলবে, মুসলমান সমাজেও আশ্রয় পাব। ফিরে যেতে ইচ্ছুক নই আমরা কেউ সেই স্বদেশের প্রতিকূল পরিবেশে। জানি, সেখানে গেলে পরিত্রাণ পাব না। পুরুষের পাপময় ভোগবিলাসের সামগ্রী হয়ে বেঁচে থাকতেও চাই না; বাঁচতে চাই সম্ভ্রান্ত মহিলার ইজ্জত নিয়ে। আপনার ন্যায় হৃদয়বান মানুষের সাহায্য না পেলে তা' ত সম্ভব নয়। ওগো মহাপ্রাণ! বিশ্বাস করুন, উগাণ্ডির রাজপুরীতে আমাদের দেহ কলুষিত হয়নি। নানা ছলে নানা কৌশলে আমরা নারীর পরম সম্পদ সতীত্ব-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন রেখেছি। রাজ-পুরোহিতের নিষেধক্রমে কেউ আমাদের দেহ কখনো স্পর্শ করতে সাহসী হয়নি। কিন্তু কে আমাদের কাহিনী বিশ্বাস করবে? চলুন ভাইজান নৌকায়, আমাদের দুঃখের কথা কিছু শোনাব।"

রায়হান নৌকায় উঠিতে যাইবেন, এমন সময় পশ্চাতে জনকোলাহল শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখেন, কিয়দ্দূরে রক্ষীপরিবৃত এক মনোরম শিবিকা হইতে এক পরমাসুন্দরী যুবতী বাহির হইয়া নদীতীরে টিলার উপরে উঠিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন এই নৌকার দিকেই নিবদ্ধ। রায়হান আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিলেন- রাজকুমারী শামিনী! শিম্‌পীকে বলিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর বোন, কি হেতু রাজকুমারী এসেছেন আমি একবার দেখে আসি।" এই বলিয়া তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

টিলার নিকটে আসিয়া রায়হান শামিনীকে বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী! আপনি এখানে? আপনার কোন খেদমতে লাগতে পারি কি?"

বিমর্ষবদনা শামিনী রায়হানকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আসুন, এই টিলার উপরে উঠে খানিক বিশ্রাম করুন! আপনাকে কয়েকটি কথা নিবেদন করবো বলেই এসেছি!" রাজকুমরী রক্ষিগণকে ইঙ্গিতে একটু দূরে অপেক্ষা করিতে নির্দেশ দিলেন।

রায়হান টিলায় উঠিতেই রাজকুমারী দুই পা বাড়াইয়া তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণপূর্বক কাতরভাবে বলিলেন, "অন্যায় করেছি জনাব! বড় অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি; ভাবাবেগে জ্ঞান-বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার অপরাধ মার্জনা করুন!"

রায়হান ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া বলিলেন, "ও কি বলছেন রাজকুমারী? অন্যায় ত কিছু করেন নি!"

রাজকুমারী আবেগভরা কণ্ঠে বলিলেন, "আমি স্নেহময় পিতার আদেশ অমান্য করে বড় ভুল করেছি, তাঁর অন্তরে বড় নির্মম আঘাত হেনেছি, আপনার সঙ্গেও কম রূঢ় ব্যবহার করিনি! এক্ষণে বুঝতে পেরেছি, আপনি মহাপ্রাণ ফেরেশতা, নতুবা মানুষের পক্ষে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার লোভ সংবরণ সম্ভব নয়। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, ফিরে চলুন; আমার পিতার ইচ্ছাই পূর্ণ করুন।"

রায়হান শামিনীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "রাজকুমারী! আপনি পরাবীনকে ভালবাসেন, পরাবীনও আপনাকে অন্তর দিয়ে চান- এ-কথা আমি জানি। তাই আমার প্রার্থনা-উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখী হোন! দোয়া করুন, আপনাদের মিলনের পুণ্যালোকে আমাদের মিলন-পথও উজ্জ্বল হোক!"

শামিনী শান্তভাবে বলিলেন, "শিম্পী আপনার প্রণয়িনী নয় পূর্বেই বলেছেন, তবে কে সেই ভাগ্যবতী? নর্তকী লায়লা?"

রায়হান হাসিয়া বলিলেন, "না এরা আমার ভগিনী, বড় দুঃখিনী। এদের পরিচয় আমিও কিছুই জানি না। আজ বিদায় বেলায় শুনবেন কি তাদের করুণ কাহিনী?"

রাজকন্যার মৌন ভাব লক্ষ্য করিয়া রায়হান নৌকার পার্শ্বে দণ্ডায়মান শিম্পী ও তাহার সঙ্গিনীদের ইঙ্গিতেডাকিলেন।

শামিনী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তবে এ দেশ থেকে কেন এদের নিয়ে যান আপনার সঙ্গে?"

"এরা বড় নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা। পবিত্র ইসলাম এদের মানুষের মর্যাদা দান করবে-সেই ভরসায়ই তারা স্বেচ্ছায় চলেছে আমার সঙ্গে মদীনায়।"

"আমার পিতার মুখে ইসলামের খুব সুখ্যাতি শুনেছি। তিনি দিন দিনই ইসলাম ধর্মে বড় আকৃষ্ট হয়ে উঠছেন।"

"আশার কথা। মহান আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ করুন।"

"আপনি এদেশ ছেড়ে সত্যি চলে যাবেন, তা কখনো কল্পনা করিনি। ফিরে চলুন। আপনার কোন আপত্তিই আজ শুনবো না।" এমন সময় শিম্পী, লায়লা ও তাহাদের সঙ্গিনিগণ টিলার উপরে উঠিয়া রাজকন্যাকে অভিবাদন করিল।

রায়হান বলিলেন, "রাজকুমারী! আমায় মার্জনা করুন। প্রিয়ার জীবনাশঙ্কায় আমি বড়ই মর্মপীড়িত। প্রাণপণ খুঁজে দেখবো সে বেঁচে আছে কি না। আর চেয়ে দেখুন এই হতভাগীদের দিকে। এদের জীবন-পথে আশার আলো জ্বেলে না দিলে পথ চলবে কিরূপে?"

শামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা লায়লা, কোথায় যাবে? কোথায় তোমার দেশ?"

লায়লা উত্তর করিল, "রাজকুমারী! কোথায় যাব জানি না, এতদিন ত পাষাণ দেবতার পূজা করে কেবল দুর্ভাগ্যের অভিশাপই কুড়িয়ে পেয়েছি। এবার এই নর-দেবতার আশ্রয় পেয়ে স্বপ্ন দেখছি অনাগত সুখের। শুনবেন কি রাজকুমারী আমার দুঃখের কাহিনী?"

শামিনী মাথা ঝোঁকাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

লায়লা আরম্ভ করিল, "ইয়েমেন দেশে আমার পৈতৃক বাসভূমি। আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি পিতা রেগেমেগে আগুন হয়ে উঠেছিলেন। শুনেছি, তদবধি আমার হতভাগিনী জননীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অবধি ছিল না। একদিন পিতা রাগ করে আমাকে ও মাতাকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে নির্বাসন দিলেন এক গভীর জঙ্গলে। আমি তখন সবেমাত্র এক মাসের শিশু। আমাদের বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবার জন্য পিতার পায়ে ধরে জননী নাকি কেঁদে জারজার হয়েছিলেন; কিন্তু নিষ্ঠুর পিতার মন তবু গলেনি। উপরন্তু তিনি শাসিয়ে গেলেন-আমাদের হত্যা করবেন গ্রামে ফিরলে। আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম এই ছিল মায়ের অপরাধ। এতে নাকি পিতার অপযশ হয়েছিল।"

শামিনী বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "পিতা এত নিষ্ঠুর! এত কঠোর! জঙ্গলে বেঁচে রইলে কি করে?"

লায়লা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মাতা আমাকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন পাহাড়ের এক গুহায়। আমাকে পিঠে বেঁধে সাবধানে জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনতেন ফলমূল আর ঝর্ণা থেকে পানি। রাত্রিতে গুহামুখে আগুন জ্বেলে ভিতরে শয়ন করতেন শুকনা পাতার উপর।" লায়লা একটু থামিয়া ভাবাবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইল।

শামিনী বলিল, "তোমার কাহিনী বড় করুণ। কতদিন সেই পাহাড়ে বাস করলে? কেনই বা লোকালয়ে ফিরে এলে না?"

লায়লা উত্তর করিল,"বার বৎসর সেই জঙ্গলে বাস করেছিলাম। মাতাকে প্রায়ই বলতাম গ্রামে গিয়ে বাস করতে, কিন্তু তিনি কান দিতেন না সে কথায়, আমার পিতার আদেশ কখনও তিনি অমান্য করেন নি।"

"রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে মাতা আমাকে দেশের কত গল্প শোনাতেন। আমার পিতার কথা বলতেন। মায়ের বিশ্বাস ছিল, হয়তো আমার পিতা অনুতপ্ত হয়ে আবার একদিন আমাদের ফিরিয়ে নেবেন। এত দুঃখেও আম্মাকে কোনদিন তাঁর দোষারোপ করতে শুনিনি। তিনি শুধু অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে রাতদিন চোখের পানি মুছতেন।

"সেই বছর লু-হাওয়া ছিল যেন আগুনের ফুলকি। গাছপালাগুলো প্রায় পুড়ে গেছিল। জঙ্গলে ফলমূল পাওয়া ভার। সামান্য খর্জুর যা ফলেছিল, তা'ও ফুরিয়ে গেল। আহার্য আর মিলে না। সারা দিনের চেষ্টায় দু-চার টুকরা খেজুর পাওয়া গেলে মা সেগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলতেন, 'নে, এই কয়টা খেয়ে পানি খা।' কাতর চোখে মার দিকে চেয়ে বলতাম, 'শুধু আমি খাব, তুমি?' আম্মা মিছেমিছি বলতেন, 'আমি ত গাছের তলায়ই কুড়িয়ে খেয়েছি! তুই খা।' তাঁর মুখ দেখেই বুঝতাম কথাগুলো মিথ্যা। দিনের পর দিন অনাহারে অর্ধাহারে মায়ের শরীর ক্রমে জীর্ণশীর্ণ হলো; তবু আমার নিষ্ঠুর পিতা এলেন না, একটিবার খবরও নিলেন না।

"ক্রমে আমি পদার্পণ করলাম দ্বাদশ বর্ষে। এইবার আমার কপাল ভাঙলো, আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় দিনগুলো ঘনিয়ে এল।" লায়লা একটু থামিয়া চক্ষু মুছিল। শামিনী ও অন্যান্য রমণীদের নির্নিমেষ দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ।

লায়লা আবার বলিতে লাগিল, "একদিন প্রভাতে আম্মার সঙ্গে ঝর্ণায় গেলাম পানি আনতে। প্রভাত রবির সোনালী কিরণে প্রস্তরাঘাতে উৎক্ষিপ্ত পানির কণাগুলো কেমন মুক্তাবিন্দুর ন্যায় চকচক করছে। সে দৃশ্য আমি দেখছিলাম অবাক হয়ে। অকস্মাৎ শুনি, মায়ের বুকফাটা চিৎকার! ফিরে দেখি, মশকটা ভেসে ছুটেছে স্রোতের টানে, মাতা আর্তনাদ করে টলতে টলতে ঢলে পড়ার উপক্রম পানির ধারে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মাতাকে ধরে লক্ষ্য করলাম, তার স্কন্ধদেশে বিদ্ধ এক বিষাক্ত তীর। আমি ভয়ে চিৎকার করে দুই হাতে টেনে বের করি সেই বিষাক্ত তীর। মাতার সর্বাঙ্গ তখন রুধির ধারায় আপ্লুত।"

এ-কাহিনী শুনিবামাত্র শামিনী ও লায়লার সঙ্গিনীরা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। লায়লা আর বলিতে পারিল না, দুই চোখ ছাপাইয়া বড় বড় অশ্রুফোঁটা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল গণ্ডদ্বয় বাহিয়া।

একটু সুস্থির হইয়া লায়লা পুনরায় আরম্ভ করিল, "আম্মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে দেখি কি, পাহাড়ের উপর থেকে এক ভীমদর্শন শিকারী দলবলসহ নেমে আসছে নীচে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম! মাতাকে নিয়ে ছুটতে চেষ্টা করলাম গুহার দিকে, পারলাম না। আম্মা অজ্ঞান হয়ে ঝর্ণার ধারে এক পাথরের উপর যে লুটিয়ে পড়লেন, আর উঠলেন না। ইতিমধ্যে সেই নিষ্ঠুর শিকারী ছুটে এসে আমাকে টেনে তুলল মায়ের বক্ষদেশ থেকে। মনে পড়ে আমি চিৎকার করে হাত ছিনিয়ে নিয়ে মাতার মৃতদেহ আঁকড়ে ধরেছিলাম। কিন্তু পাষণ্ড ছাড়লো না আমাকে, পাথরের উপরে টানতে টানতে নিয়ে চললো আমাকে তার বাড়ীর দিকে।" লায়লা দুই চক্ষু মুছিল। শ্রোতৃবর্গও বসনাঞ্চলে আপন আপন চক্ষু মুছিতে লাগিল।

কিঞ্চিত সুস্থ হইয়া লায়লা বলিল, "শিকারীটা বাড়ীতে পৌছে তখনই আমাকে কাজে লাগাল দাসীদের সঙ্গে। কিন্তু লোকালয়ে মন টিকলো না কিছুতেই। আজন্ম নীবর বনমধ্যে একমাত্র মাতার ক্রোড়ে যে লালিত-পালিত, মনুষ্য সমাজ তার ভাল লাগবে কেন? লোকালয়ের কোলাহল, মানব ও দাসদাসীদের শাসন-উৎপীড়ন আমাকে বড় অতিষ্ঠ করে তুললে। কাজ ভুলে কেবলই সজলনয়নে তাকিয়ে থাকতাম সেই পাহাড়ের দিকে। আমার মনশ্চক্ষু

শৈশবের আবাসগৃহ সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করে খুঁজে মরতো আম্মাকে, সেই বনের পার্শ্বে খর্জুর বৃক্ষগুলোর গলদেশে খর্জুর-স্তবকের সন্ধান করে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে, থামতো এসে অবশেষে সেই ঝর্ণার ধারে মাতার মৃতদেহের পার্শ্বে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে কেবলই ভাবতাম। অকস্মাৎ দাসদাসীদের শাসনে চৈতন্যোদয় হত, আবার শুরু করতাম কাজ, কিন্তু প্রাণ আমার ঘুরে মরতো সেই পাহাড়ে পাহাড়ে।"

রাজকুমারী শামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন সেই বন্দীদশায় ছিলে? উগাণ্ডি-রাজ্যেই বা কিরূপে এলে?"

লায়লা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,"প্রায় বৎসরকাল কাটিয়েছিলাম এভাবে। লোকালয় ক্রমে আমার চিত্ত আকর্ষণ করতে লাগলো বটে, কিন্তু মাতার কথা ভুলতে পারলাম না। বাঁদীরা হামেশা সঙ্গে থাকায় সেই ঝর্ণার দিকে যাওয়ারও কোন সুযোগ পেতাম না। অবশেষে সেই সুযোগ পেয়েছিলাম এক দুপুর বেলায়।

"সেইদিন দাসদাসীগণ কি পরবের মেলা দেখতে গেছিল অপর গ্রামে। ঘরে পানি ছিল না। বলা বাহুল্য, আমিই অলক্ষ্যে পানি সব ফেলে দিয়েছিলাম বাইরে। অগত্যা গৃহকর্ত্রী আমাকে একাই ঝর্ণায় যাবার জন্য আদেশ দিলেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটলাম মশক নিয়ে। বন্দী হওয়ার পর এই প্রকার স্বাধীনতা আর কখনও পাইনি। গৃহকর্ত্রী আমাকে পেছন থেকে ডেকে বারবার সাবধান করে দিলেন তাড়াতাড়ি ফিরতে। আমি শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে দ্রুতপদে ছুটলাম।

"যে ঝর্ণায় রোজ পানি তুলতাম, সেটা দক্ষিণে ছেড়ে চললাম উত্তরে; ক্রমে পৌঁছলাম এসে আমার দ্বাদশ বর্ষের আবাস-ভূমিতে, সেই পাহাড়ের পাদদেশে। প্রাণটা ভরে উঠল আনন্দে। এক দৌড়েই পৌঁছলাম গিয়ে সেই ঝর্ণার ধারে; এদিক-ওদিক খুঁজে দেখি, মাতার মৃতদেহের চিহ্নমাত্রও নেই। ঝর্ণার পানি সেই পূর্বের ন্যায়ই প্রস্তরে প্রস্তরে আঘাত করে চারিদিকে ছিটিয়ে, বয়ে চলেছে ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ নাদে। আমার জননী যে প্রস্তরখণ্ডে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন তা'ও দেখি

যথাস্থানেই রয়েছে। পাথরখানা আঁকড়ে ধরে মাতাকে ডেকে বিলাপ করে কত কাঁদলাম। শীতল পাষাণ আমার বক্ষ শীতল করলো বটে, কিন্তু অন্তরের জ্বালা দূর করতে পারলো না। যে পাথরখানায় বসে ঝর্ণাধারায় রৌদ্রের খেলা দেখতাম, তা'ও চোখে পড়লো; চারপাশের গাছপালাও তেমনই আছে, শুধু আমার মা নেই। 'আম্মা আম্মা' বলে কত যে ডেকেছিলাম, কিন্তু কোথায় আম্মা! একবার মনে হলো, হয়তো আম্মা মরেন নি, অচেতন হয়ে পড়েছিলেন– আমি বুঝতে পারিনি। হয়তো তিনি গুহামধ্যেই বাস করছেন এখনো।

"আম্মা আম্মা ডেকে, ছুটলাম সেই পাহাড়ের দিকে, প্রবেশ করলাম গুহার মধ্যে। কিন্তু হায়! কোন সাড়া পেলাম না। গুহাতল নিস্তব্ধ। বড় ভয়ই হলো। দেখি, আমাদের সেই পত্র-শয্যাটির কেমন যেন বিশৃঙ্খল অবস্থা। আমার অশ্রুফোঁটায় সে-শয্যা ভিজে গেল। আম্মার সেই বিছানায় একবার বসবো ভাবছি, এমন সময় দেখি কি, পাতার ভিতরে কয়েকটা পশুশাবক মৃদু আর্তনাদ করে নড়ছে। নেকড়ে বাঘের বাচ্চা! তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম বাইরে। পাহাড়ে পাহাড়ে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম মাতার সন্ধানে, আগে মায়ের সঙ্গে যেখানে যেখানে ঘুরে বেড়াতাম, সেখানে সেখানে বসে কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করলাম।

"বেলা পড়ে এল। বড় বিলম্ব হয়ে গেছে, তবু সেই পাহাড়-এলাকা ছেড়ে আসতে মন কিছুতেই চায় না। কিন্তু আম্মাকে হারিয়ে একাকিনী বনমধ্যে থাকতেও আর সাহস পেলাম না। গৃহকর্ত্রীর বেত্রাঘাতের ভয়ে উঠে পড়লাম। আবার সেই ঝর্ণার ধারে এসে আম্মার শেষ শয্যার পার্শ্বে বসে সেই প্রস্তরখণ্ড আঁকড়ে ধরে কত যে কেঁদেছিলাম। বড় ইচ্ছে হয়েছিল, মাতার ন্যায় আমার পৃষ্ঠদেশে কেউ যদি বিষাক্ত তীর বিদ্ধ করতো। যদি সেই প্রস্তরখণ্ডের উপরে আম্মার ন্যায় মুষড়ে পড়ে মরতে পারতাম। সূর্য নেমে গেল পাহাড়ের নীচে, গাছপালার কাল ছায়ায় ঝর্ণার পানি কালো হয়ে উঠলো। উঠে পড়লাম। সেই ঝর্ণায়ই মশক ভরে ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে চললাম। ঘাড় ফিরিয়ে সে মায়া-নির্ঝর কতবার যে দেখেছিলাম তার অন্ত নেই।

"কিয়দ্দূর এসে পথিমধ্যে সাক্ষাত পেলাম এক পৌঢ় আরববাসীর। সেই বিজনে মানুষ দেখে আমি ত ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক। সেই ব্যক্তিই প্রথমে

আমাকে সম্বোধন করে বললো, 'এত বড় মশক নিয়ে কি চলতে পারবে? ওটা আমায় দাও! যাবে কোথায়?'

"আমি অঙ্গুলিনির্দেশে মনিবের গ্রামখানি দেখিয়ে দিলাম। ভাবলাম, পরের বোঝা নিজের কাঁধে বহন করবার লোকও তা'হলে জগতে রয়েছে। মশকটি তার হাতে তুলে দিয়ে, চললাম আমি পিছু পিছু, মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে।

"কিছুদূর এসে সেই পৌঢ় ব্যক্তি আমার গন্তব্য পথ ছেড়ে মোড় ফিরলো অন্যদিকে, আমি আপত্তি উঠিয়ে তার সঙ্গে যেতে অমত করলাম। পাষণ্ড তৎক্ষণাৎ মশকটি ভূতলে নিক্ষেপ করে, আমাকে বলপূর্বক স্কন্ধদেশে ফেলে, জোরে ছুটতে লাগল পাহাড়ের দিকে।

"পাপিষ্ঠ আমার হাত-পা ধরে, মুখে রুমাল গোঁজে পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে, আমাকে এনে নৌকায় উঠালে এক পার্বত্য নদীর কিনারে। সেই নৌকায়ই শিম্‌পী ও এই সঙ্গিনীদের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত।"

এমন সময় নৌকার কর্ণধার রায়হানের নিকটে আসিয়া অভিবাদনপূর্বক বলিল, "হুযুর! নদীতে ভাটা লেগেছে, আর ত বিলম্ব করা চলে না।"

রায়হান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাঝিদিগকে প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিলেন। শামিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারী! এই কাহিনী শুনে হয়তো আমার প্রতি আপনার সন্দেহ দূর হবে। এক্ষণে ত বুঝতে পেরেছেন, এই হতভাগিনীদের জীবন কত দুঃখময়? বাঁচার অধিকার এদের দিতে হবে। এবার উঠতে হয়। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! বহু ক্লেশে এত পথ অতিক্রম করে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনাকে ধন্যবাদ।"

রায়হান নৌকাভিমুখে যাত্রা করিতেই শিম্‌পীও সঙ্গিনীদের লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। রাজকুমারী শামিনী দণ্ডায়মান হইয়া নির্বাক নিষ্পলক নেত্রে রায়হানের দিকে শুধু তাকাইয়া রহিলেন।

নদীতীরে প্রতীক্ষমান আব্দুর রহমান ও অন্যান্য বন্ধুদের আলিঙ্গন করিয়া রায়হান বিদায় লইলেন, চারিদিকে নজ্জাসী-রাজ্যে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে মুল্‌কে-হাবাশের নিকটে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রায়হান আবেগভরা কণ্ঠে আব্দুর রহমান ও অন্যান্য মুসলমানদের বলিলেন, "বন্ধুগণ! যতদিন না স্বদেশে ফেরার আহবান আপনাদের কানে পৌঁছে ততদিন ধৈর্য ধরে থাকুন, বিশ্বস্তভাবে মহানুভব নজ্জাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করুন, এই আমার অনুরোধ।" তারপর আর একবার বন্ধুদের আলিঙ্গন করিয়া, সালাম জানাইয়া, তিনি সজলনয়নে রাহেল ও অন্যান্য সঙ্গীদের লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

তটদেশে দণ্ডায়মান বন্ধুগণ নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। শিম্পী ও তাহার সঙ্গিনীরা অন্য নৌকায় উপবিষ্টা। মাঝিগণ দরিয়ার প্রভুকে স্মরণ করিয়া দুই নৌকাই একসঙ্গে ছাড়িয়া দিল।

নদীতীর ঘেঁষিয়া নৌকা চলিতেছে লোহিত সাগরের স্রোতের টানে। তীর হইতে বন্ধুগণ হাত উঠাইয়া রায়হান ও তাঁহার সঙ্গীদের শেষ বিদায় জ্ঞাপন করিলেন। রায়হানও ছইয়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া শেষ বিদায় জানাইলেন প্রবাসী বন্ধুদের।

রায়হান অবাক হইয়া দেখিলেন, শামিনী ঠিক তেমনই টিলার উপর হইতে তাকাইয়া রহিয়াছেন একদৃষ্টে। একটু পরেই কে একজন অশ্বারোহী যেন ছুটিয়া আসিলেন শামিনীর পার্শ্বে। যুবক অবতরণ করিয়া শামিনীর নিকটে আসিতেই রাজকুমারী তাঁহার হাত ধরিয়া যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন নৌকার দিকে। রায়হান চিনিতে পারিলেন--পরাবীন! পরাবীন বুঝি তাঁহার সঙ্গে শেষ সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন দৃশ্য তাঁহার অন্তর এক অপূর্ব আনন্দে ভরিয়া তুলিল। ইচ্ছা হইল- একবার যদি পরাবীনের নিকটে শেষ বিদায় লইয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু উপায় নাই, স্রোতের উজান ঠেলিয়া নৌকাখানির কূলে ফিরিয়া যাওয়া বড় সহজ নহে।

পরমূহূর্তে রায়হান লক্ষ্য করিলেন, পরাবীন পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া নদীর কিনারে কিনারে ছুটিয়া আসিতেছেন, রাজকুমারী শামিনী তেমনই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন সেই টিলার উপরে। কিন্তু তটদেশের প্রস্তরময় পাহাড় ও অরণ্যানীর দুর্গম বেষ্টনী ভেদ করিয়া বেশীদূর তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। রায়হান নৌকা ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তীব্র ভাটার টানে তরণী তীরবেগে ছুটিয়াছে।

নৌকার উপর হইতেই তিনি হাত তুলিয়া পরাবীনের নিকট হইতে শেষ বিদায় নিতে চাহিলেন, কিন্তু পরাবীন ততক্ষণে জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

রায়হানের বাষ্পাকুল নয়নপথে নদীর কাল পানি, তটস্থ পাহাড়-বনানী, উপরে নিঃসীম আকাশ–সবই যে একাকার। নদীতটে সারিবদ্ধ অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ, আবলুস ও মেহ্গনির গভীর অরণ্য, নদীতে ছোট ছোট ডিঙিতে অর্ধোলঙ্গ কৃষ্ণকায় পুরুষদের মাছ ধরিবার কোলাহল– কিছুই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। তাঁহার ঝাপ্‌সা উদাস দৃষ্টি মিছামিছিই শুধু খুঁজিয়া মরিতেছে তটদেশে দন্ডায়মান শামিনী,পরাবীন ও বন্ধুদের; উদ্বেলিত অন্তরে উঁকি মারিয়া উঠিয়াছে– দরিয়ার ওপারে বহুদূর দেশে বিপন্ন সায়ফুনের করুণ মুখচ্ছবি। বর্তমান ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব–কোলাহলে তাঁহার অন্তর আজ দলিত–মথিত।

প্রবল জলস্রোতে নৌকাখানি তীরবেগে ছুটিয়াছে। দেখিতে দেখিতে নদীর বাঁক ঘুরিয়া তরণী পাহাড়ের পশ্চাতে দ্রুত অদৃশ্য হইল।

বাহান্ন

হারিস রায়হানের মৃত্যুর কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিল–রায়হান ত বাঁচিয়া নাই, কাজেই তাঁহার সন্ধান করা বৃথা, হাবিলকেই খুঁজিতে হইবে। মনে হয়, ছেলেরা যে বলিয়াছিল, সুরা- ব্যবসায়ী ছায়াদ এক বেদুঈনকে কিনিয়া লইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই হাবিল। হারিস ছায়াদের শরাবখানার সন্ধানে যাত্রা করিল।

সূর্য অস্তমিত। পল্লীর প্রতি গৃহে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই সময় তাপদগ্ধা ও কর্মক্লান্তা গৃহিণীরা রন্ধন শেষে বাহিরে কঙ্করবালির উপরে খাটিয়ায় বসিয়া শরীর জুড়াইতে নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় মত্ত। উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ ও বালির তাপ ধীরে ধীরে যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। যুবতীরা কাজকর্ম সারিয়া বেশ-ভূষার পারিপাট্যে ব্যস্ত। যুবকেরা পশুগুলো খোঁয়াড়ে তুলিয়া সাজগোজে মশগুল, মন যে তাহাদের পড়িয়া রহিয়াছে মদ্যশালায় নৃত্যগীতের আসরে।

পল্লীর প্রান্তদেশে ছায়াদের মদ্যশালা। অপরিসর গৃহখানা কাষ্ঠনির্মিত, ছাদের ডালপালার উপরে মাটির আবরণ, পশ্চাতে গৃহসংলগ্ন খর্জুর বাগানে আড়াআড়ি স্থাপিত কয়েকটি কাষ্ঠমঞ্চ। দিবাভাগে মদ্যপায়িগণ সেখানে বাগানের ছায়ায় আসর জমায়। কয়েকটি শূন্য মদ্যভাণ্ড সেস্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গৃহের সম্মুখেও দুই-চারিটা শূন্য ভাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। অদূরে গৃহচত্বরে দৃষ্টিগোচর হয় আরও কয়েকটি কাষ্ঠমঞ্চ, নিশাকালে সেগুলো ব্যবহৃত হয়। ঘরের কাঁচা মেঝেতে পাতা আছে কয়েকটি খর্জুর পত্রের চাটাই; দেয়ালে আরও কতগুলো ঝুলান। একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ গৃহের কোণে মিটিমিটি জ্বলিয়া আঁধারের সঙ্গে যুঝিতেছে, তাহারই ক্ষীণালোকে বসিয়া কয়েকজন সুরাপায়ী নেশার ঝোঁকে কত গালাগালি করিতেছে, চেঁচামেচি করিতেছে, অসংলগ্ন কথাবার্তা কহিয়া মাটির পানপাত্রে মদিরা ঢালিতেছে–নিজে খাইতেছে, অপরকেও বিলাইতেছে। সুরা ব্যবসায়ী ছায়াদ

একটু দুরে একটি চাটাইয়ে বসিয়া সম্মুখের ডালা তোলা বাক্স হইতে লেনদেনে ব্যস্ত। যে এক যুবতী পরিচারিকা মদ্য পরিবেশনে মশগুল তাহারই দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঠাট্টা-মস্করায় রত রহিয়াছে কয়েকটি মদ্যপায়ী যুবক। বাহিরে এক বলিষ্ঠ ভৃত্য আলো জ্বালিতেছে। কেননা একটু পরেই যে সেখানে নাচগানের আসর বসিবে। এমন সময় হারিস গৃহদ্বারে আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল। ভৃত্য তাহাকে কাষ্ঠমঞ্চে বসিতে বলিয়া অশ্বটিকে ঘরের পিছনে বাঁধিতে লইয়া চলিল।

হারিস মঞ্চোপরি উপবেশন করিয়া চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিল। যে ভৃত্যটি তাহার অশ্ব বাঁধিতে গেল, তাহাকে বেদুঈন বলিয়া মনে হইল না। হতাশ হইয়া সে মনে মনে ভাবিল, তবে কি রাখাল বালকগণ মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে!

সুরা-ব্যবসায়ীর আদেশে তরুণী পরিচারিকাটি হারিসের সম্মুখে আসিয়া খেদমতের আরজ করিল। হারিস তন্বী যুবতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিল, ইহার সাহায্যে উদ্দেশ্য সফল হয় কিনা দেখা যাক। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "আপাতত এক পেয়ালা ঠাণ্ডা পানি পেলেই বড় খুশী হব। তোমার মনিবকে জিজ্ঞাসা কর, রাত্রিটা এখানে কাটাতে পারবো কিনা। আমি একজন দক্ষিণ দেশীয় চারণ কবি। আহারাদি ও বিশ্রামের ব্যয় অবশ্যই বহু করবো। উপরন্তু, তোমার বকশীশ।"

বাঁদী হারিসের বাদ্যযন্ত্রটার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনি দফ বাজিয়ে গান করেন বুঝি? ভালই হ'ল। একটু পরেই এখানে গানের আসর বসবে, আপনাকে কিন্তু গাইতে হবে।" এই বলিয়া স্মিত হাস্যে হারিসের প্রতি আড়নয়নে সে তাকাইল। হারিস শুধু একটু হাসিয়া লক্ষ্য করিল, যুবতী ষোড়শী, কিন্তু বড় ক্ষীণাঙ্গী, যেন আহারে বঞ্চিতা। কঠোর পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি তাহার দেহ-সৌন্দর্য যেন নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। পরিধানের ময়লা ইযার, কোর্তা ও ওড়নাখানি অসংখ্য তালিযুক্ত; দুর্ভাগ্যের নিপীড়ন-ছাপ সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। হারিস তাহার মুখমণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল- মানুষ কত স্বার্থপর, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লয়, অন্যের দুঃখের প্রতি একবার ফিরিয়াও তাকায় না।

হারিসের অপলক দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া পরিচারিকা ভাবিল, গায়ক তাহাকে দেখিয়া বুঝি মজিয়াছে—বিমুগ্ধ নয়নে যেন মোহের অঞ্জন, বিদগ্ধচিত্তে বুঝি বিরহানল। সলজ্জ হাসি হাসিয়া সে পরিধেয় জীর্ণ বসন সামলাইতে সামলাইতে গৃহাভ্যন্তরে পানি আনিতে ছুটিল।

এমন সময় সেই গৃহের দ্বারে আর একজন অশ্বারোহীর আবির্ভাব ঘটিল। পূর্বোক্ত ভৃত্য আরোহীকে সালাম করিয়া অশ্ববল্গা ধারণ করিলে, ঘোড়সওয়ার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কয়েকবার হারিসের প্রতি আড়নয়নে তাকাইলেন, তারপর অবতরণপূর্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

আগন্তুক গৃহস্বামীর কানে কানে কি যেন বলিবামাত্র তিনি পরিচারিকাকে নিকটে ডাকিয়া চুপি চুপি কি সব জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর অভ্যাগত বন্ধুটির সাথে মৃদু কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। হারিস বাহির হইতে তাহাদের কথার্বাতা কিছুই শুনিতে পাইলেন না।

কতক্ষণ পরেই সেই ব্যক্তি বাহিরে আসিয়া আর একবার হারিসের সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই পরিচারিকা এক বাটি পানি লইয়া আসিলে হারিস উহা পান করিযা বাটিটা ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "ঐ লোকটি আমার দিকে অমন কেন কটমট করে চেয়ে দেখছিল? চেন তাকে?"

বাঁদী হাসিয়া উত্তর করিল, "তা আর চিনি না! ঐ অপর গ্রামের সর্দার আবূ মূসা—কুরাইশ—দলপতি আবূ সুফিয়ানের আত্মীয়।"

হারিস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "এত কি আলাপ করছিলেন?"

যুবতী হারিসের নিকটে আসিয়া কানের কাছে ফিস ফিস করিয়া বলিল, "বলবেন না যেন—আপনার খোঁজ নিয়ে গেলেন। তিনি আপনাকে মদিনার মুসলমানদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছিলেন।"

"তারপর?"

আমি বললাম, "ইনি একজন পরদেশী গায়ক, পেটের দায়ে গান করাই তার ব্যবসা। ঠিক বলেছি না?"

হারিস মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, "হাঁ হাঁ, ঠিকই বলেছো। তুমি দেখছি বেশ বুদ্ধিমতী। আচ্ছা, দাস–দাসী ত আর কাউকে দেখছি না? তোমার মনিব কি তেমন দৌলতমন্দ নন?"

বাঁদী বিস্ময়ের সুরে উত্তর করিল, 'কি যে বলেন জনাব। বাড়ীতে আরও দুইটি ক্রীতদাস আছে না– একটি মক্‌কাবাসী আর একটি বেদুঈন। তা' ছাড়া আর একটি বাঁদীও ত রয়েছে।"

গৃহস্বামী হয়তো দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সবই শুনিয়াছিলেন। অকস্মাৎ এক লম্ফে তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া পরিচারিকার কেশগুচ্ছ আকর্ষণপূর্বক বলিলেন, "হামারযাদী! খুব যে প্রেমালাপ জুড়ে দিয়েছিস্! কাজ নেই ঘরে? খদ্দেররা কে কি চায় দেখতে হবে না?" এই বলিয়া গলাধাক্কা দিয়া তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে ঢুকাইয়া দিলেন। তারপর হারিসের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কোমল সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনাব! এখানে কি প্রয়োজনে এসেছেন?"

হারিস উত্তর করিল, "গান–বাজনার চর্চা করাই আমার পেশা, সেজন্যই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। তা'ছাড়া কয়েকটা উট কেনার ইচ্ছাও আছে। শুনেছি এদিকে নাকি ভাল ভাল উট বড় সুবিধেয় বিক্রি হয়, একটু ঘুরে –ফিরে দেখবো। আমার ও ঘোটকের থাকা খাওয়া বাবত উপযুক্ত অর্থ দিতে আমি প্রস্তুত। আশ্রয় মিলবে কি? এই নিন।" এই বলিয়া হারিস কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিল।

ছায়াদ মনে মনে ভাবিলেন, লোকটা শাঁসালো। হাসিমুখে বলিলেন, "বেশ ত যত দিন ইচ্ছা থাকুন না। এ গরীব খানা নিজের বলেই জানবেন জনাব।" এই বলিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভৃত্যকে বহির্বাটিতে অতিথির শয্যার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন।

মদ্যশালার নিকটেই ছায়াদের বাসগৃহ। পরিচারিকা মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গৃহস্বামী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "হারামযাদী, এখনও দাঁড়িয়ে? যা, শীগগির গিয়ে মেহমানের খানাপিনার আয়োজন কর।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। পরিচারিকাও হারিসের প্রতি আর একবার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্তর্বাটীর দিকে পা বাড়াইল। একটু পরেই ছায়াদ উঠিলেন। দাসদাসী উভয়েই চলিয়া গিয়াছে, কাজেই কোমর কষিয়া, আস্তিন গুটাইয়া মদ্য

ভাণ্ডগুলো নিজেই তিনি সাজাইতে লাগিলেন। হারিস কতক্ষণ তহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মনে মনে ভাবিল, লোকটা বড় অর্থ-পিশাচ-বড় নিষ্ঠুর।

বাহিরে ততক্ষণে তিন-চারিটা মশাল জ্বালান হইয়াছে। সেখানে সুরাপায়িগণ দলে দলে আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। মঞ্চোপরি অপরিচিত হারিসকে উপবিষ্ট দেখিয়া কেউ কেউ তাহার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইল, কেউ কেউ বসিয়া পড়িল মদ্যভাণ্ড লইয়া; কে একজন হারিসের দফখানি তুলিয়া এদিক- ওদিক চাহিয়া বাজাইতে শুরু করিয়াছে। হারিস সেই দিকে তাকাইতেই সে তাড়াতাড়ি দফখানি মঞ্চের উপরে রাখিয়া দিয়া নিঃশব্দে ভিড়িয়া পড়িল গৃহমধ্যে মদের আড্ডায়।

অল্পক্ষণ পরে সেই বাঁদী আসিয়া হারিসকে বহির্বাটীর নির্দিষ্ট গৃহে লইয়া গেল। ঘরখানা ছোট। একপার্শ্বে একখানি মাত্র অপরিসর খাটিয়া, তদুপরি সামান্য বিছানা। খাটিয়ার পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। উৎক্ষিপ্ত ধূলি-বালি হইতে বুঝা যায়, গৃহতল সদ্য ঝাঁট দিয়া বহুদিনের জঞ্জাল পরিষ্কার করা হইয়াছে। পরিচারিকা হারিসকে ভিতরে বসাইয়া আহার্য ও পানীয় আনিতে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

হারিস খাটিয়ায় বসিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহিরে তাকাইয়া দেখে, চারিদিকে জমাট অন্ধকার। মদ্যশালার মশালগুলো সেই অন্ধকারের সঙ্গে যেন যুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাহিরে সুরাপায়ীদের শোরগোল রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এমন সময় বাঁদী আর একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে আহার্য লইয়া গৃহে ঢুকিল। হারিস অবাক হইয়া দেখে, ভৃত্যটি তরুণ- সুপুরুষ, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন। কিন্তু মুখখানা বড় মলিন, চোখে -মুখে হতাশার ভাব, ঠিক যেন বন্যসিংহ বিপাকে পড়িয়া নির্জীব হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল, এ-ই হয়তো সেই বেদুঈন যুবক-সুফিয়ার প্রণয়ী; বুকের ভিতরটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। যুবকটির সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু ভাবিয়া দেখে, পরিচারিকার সম্মুখে তাহা সুবিধা হইবে না; কেননা গৃহস্বামীর সন্দেহ হইলে আর নিস্তার নাই।

হারিস হাত মুখ ধুইয়া দস্তরখানে বসিল বটে, কিন্তু আহারে প্রবৃত্তি হইল না; মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। পরিচারিকা তাহার উদাসীন ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, " কি হলো মুসাফির? হাত যে উঠে না! খাওয়ার বুঝি রুচি হয় না?"

হারিস উত্তর করিল, "সামান্য নিমকের যে প্রয়োজন।"

বাঁদী হাসিয়া বলিল, "কেন রুটিতে নুন নেই ভেবেছেন? না খেয়েই বুঝলেন? গণন জানেন?"

হারিস সহাস্যবদনে বলিল, "এসব জানলে কি আর ভাবনা ছিল। আহারের পূর্বে সামান্য নিমক মুখে দেওয়া আমার অভ্যাস কিনা!"

বাঁদী নুন আনিতে ভিতরে চলিল। হারিস এমন একটা সুযোগের প্রতীক্ষাই করিতেছিল। নুনের ছুতা একটা ভাঁওতা মাত্র। চারিদিকে একবার চাহিয়া ভৃত্যকে ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটি কি ভাই?"

ভৃত্য অতিথির সহানুভূতিব্যঞ্জক সম্ভাষণে প্রীত হইয়া উত্তর করিল, "আমার নাম হাবিল, আমি বেদুঈন। কেন জিজ্ঞেস করছো?"

হারিসের অন্তর পুলকে নাচিয়া উঠিল—এই তো সেই লোক, যাহাকে সে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চাপা সুরে বলিল, "যুবক ! আমি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করতে এসেছি। সুফিয়াকে চেন?"

হাবিলের আপদমস্তকে পুলক-শিহরণ, অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরপুর। নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া সে বিস্ময়ের সুরে বলিল, "সুফিয়াকে চিনবো না!" তাহার মর্মস্থল হইতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস হৃদয় নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। পরক্ষণেই বিরক্তির সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করছো? কে তুমি?" আনন্দাতিশয্যে তাহার চোখে মুখে যে বিমল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল অকস্মাৎ তাহা যেন নিভিয়া গেল।

হারিস এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। বলিল, "সুফিয়া তোমার মুক্তির জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। সুযোগ মত আমার সঙ্গে সাক্ষাত করো, সব কথা খুলে বলবো। খুব সাবধান! কেউ যেন বিন্দুমাত্রও টের না পায়। কিন্তু হঠাৎ তুমি এমন বিমর্ষ হয়ে উঠলে যে?" হাবিল গম্ভীরভাবে বলিল, "না, সুফিয়া বিশ্বাসঘাতিনী, আমাকে ভুলে রায়হান নামক এক কুরাইশ যুবকের প্রতি আসক্ত হয়েছে। এই

বাড়ীর পরিচারিকা নার্গিসকেই আমি শাদী করবো। নার্গিসও ভালবাসে আমাকে। সুযোগ পেলেই তাকে নিয়ে পালিয়ে যাব।"

হারিস বিস্মিত হইয়া বলিল, "একি বলছো হাবিল! সুফিয়া তোমার জন্য জীবন দিতে বসেছে, আর তুমি কিনা ভাবছো- সে তোমায় ভুলেছে? কোন্ রায়হানের কথা বলছো? সেই পলাতক রায়হান, যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?"

হাবিল উত্তর করিল, "হাঁ, হাঁ সেই রায়হান!"

হারিস বিরক্তিভরে বলিল, "তুমি একটা আস্ত বেওকুফ। সে-রায়হান ত কবে মারা গিয়াছে। শুননি কুরাইশগণ তাকে মেরে ফেলেছে? তুমি ভুল বুঝেছ হাবিল। সুফিয়া রায়হানকে কখনো ভালবাসেনি, তোমাকেই সে অন্তর দিয়ে চায়। রায়হানকে যে পিয়ার করতো সে আর এক দুঃখিনী।"

হাবিলের হৃদয়-গগন হইতে একখণ্ড কাল মেঘ যেন আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। সুফিয়ার প্রেমের আলেখ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে পুনরায় ভাসিয়া উঠিতেছে তাহার বেদনাহত মানসপটে। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সে জিজ্ঞাসা করিল, " কি বললে? রায়হান মারা গেছে! সুফিয়া তাকে ভালবাসেনি?"

হারিস উত্তর করিল," কখ্খনো না। সুফিয়া তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই জানেনা।"

হাবিল অধীর হইয়া বলিল, "ওহ, বড় ভুল করেছি; ভুল বুঝেছি। আমি যাব, সুফিয়ার কাছে ফিরে যাব।"

এমন সময় নুন লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল পরিচারিকা নার্গিস। নার্গিস তাহাদের কথোপকথনের শেষাংশ হয়ত শুনিয়াছিল। ভ্রূ উঁচাইয়া হাবিলকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে বলছো?"

বিরক্তি সহকারে হাবিল উত্তর দিল, "সব কথাতেই যেন ফোড়ন দিস্‌নে নার্গিস! ভাল হবে না বলছি!"

হারিস আগ্রহভরে নুন লইয়া বলিল, "এই যে বাইরে গান-বাজনা হচ্ছে না, সেইখানে নাকি! আমিও দু' একটা গান গাব কিনা, তা শুনবে বলছে।"

নার্গিস কিছুই বলিল না, অতিথির প্রতি শুধু একটা সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ হাবিলকে লইয়া অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়াইল।

হারিস চাহিয়া দেখে, যুবতীর গতিছন্দ বড় লীলায়িত, বড় চঞ্চল। নামটি বেশ–নার্গিস। ভাসা ভাসা, টানা–টানা চোখ দুইটি নামের সার্থকতা আনিয়া দিয়াছে। তাহার বড় ভাল লাগিল। ভাবিল, আহা! এমন সুন্দর কুসুম- কোরকটি এমনি নিভৃতে ফুটিয়া অবজ্ঞায়, অবহেলায় ঝরিয়া পড়িবে! কিন্তু পরক্ষণেই ভয় হইল, নার্গিস তাহার কথাগুলি যদি শুনিয়া থাকে! নারীর আড়িপাতা স্বভাব যাইবে কোথায়? যদি সে মনিব–পত্নীকে বলিয়া দেয়।

হারিস আহারাদি শেষ করিয়া বসিল। বাহিরে তখন শুরু হইয়াছে মত্ত সুরাপায়ীদের একটানা নৃত্য–গীত কোলাহল! সে ভাবিতে লাগিল,হাবিলকে এই সুন্দরী পরিচারিকার কবল হইতে ছিনাইয়া নিতে আসিয়াছি, কিন্তু বঞ্চিতা নার্গিসের কি উপায় হইবে? এমন সময় গৃহমধ্যে আবার নার্গিসের আর্বিভাব। দুর্ভাবনায় হারিস অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নার্গিস থালাবাটিগুলো কুড়াইয়া লইতে লইতে বলিল,"মুসাফির! কে আপনি জানি না। ভয় হয়, আমার ক্ষীণ আশার টিমটিমে দীপটি নিভিয়ে দিতেই যেন এসেছেন। জীবনে দুঃখ হয়তো পান নি, তাই দুঃখিনীর দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালাও বুঝেন না।"

হারিসের বুকের ভিতরটায় মোচড় দিয়া উঠিল। ভাবিল, মনে মনে যে ভয় পাইয়াছিলাম, তাহাই সত্যে পরিণত হইল; হয়তো নার্গিস সব কথাই শুনিয়াছে। তাহার মস্তকে চঞ্চল রুধির–ধারা তোলপাড় করিয়া কপালে স্বেদবিন্দু ঠেলিয়া বাহির করিল। জড়িত–কণ্ঠে সে বলিল, "নার্গিস! আমাকে মাফ কর। আচ্ছা, সত্যই কি তুমি এই বেদুঈন যুবককে ভালবাস? তাকে পেলে সত্যই কি সুখী হবে ভেবেছ?"

নার্গিস উত্তর করিল, "সুখী হয়তো হব না। ভদ্র বংশীয়া কুরাইশ কন্যা এক বেদুঈনকে হয়তো ভালবাসতে পারবে না, কিন্তু উপায় কি জনাব? তার হাত ধরেই আমাকে যে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। কোথায় আমার জন্য গুনী-মানী আর ধনী শওহর পাওয়া যাবে বলুন? কোন্ রহমদিল আশরাফ এই ঘৃণিতা বাঁদীকে শাদী করতে এগিয়ে আসবে হুযুর?"

নার্গিস নয়ন-কোণের দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিয়া মুসাফিরের অন্তর যেন এপার-ওপার বিদ্ধ করিয়া দিল। হারিস বলিল, "নার্গিস! মনে হয় তোমার জীবন-কাহিনী বড় মর্মস্পর্শী, শুনতে ইচ্ছে হয়। বলবে কি?"

নার্গিস থালাবাটিগুলো রুমালে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "সে শোনার সখ বড় লোকদের একটা বিলাস মাত্র। শুনিয়ে আমার লাভ কিছুই হবে না, বরং পুরনো ব্যথা মনে পড়লে দুঃখের পসরা আরও বোঝাই হয়ে উঠবে। শুধু জেনে রাখুন, ক্রীতদাসীর গর্ভে আমার জন্ম হয়নি, সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশেই জন্ম। দুর্ভাগ্যবশত পিতার কোপানলে পড়ে দাসত্ব জীবন লাভ করেছি। আহা, যদি ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হতো!"

হারিস জিজ্ঞাসা করিল, "কি লাভ হতো সুন্দরী?"

নার্গিস উত্তর করিল, "তা হ'লে মানুষের অধিকার পেয়ে মানুষের মতই বাঁচতে পারতাম, পুরুষের কেনা- বেচার সামগ্রী হয়ে, ভোগের পদার্থ হয়ে থাকতে হতো না।" এই বলিয়া নার্গিস হারিসের প্রতি আর একবার কটাক্ষপাত করিয়া থালাবাটিসহ উঠিয়া পড়িল।

হারিস বলিল, "ঠিকই বলেছ নার্গিস, ঠিকই বুঝেছ। আমিও ইসলামে বিশ্বাসী, ইসলামকে আমিও অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা করি।"

নার্গিসের চক্ষে পুঞ্জীভূত বিস্ময়। অবাক হইয়া সে অতিথির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বলিল, "সাবধান! আপনি মুসলমান-একথা জানাজানি হ'লে কিন্তু রক্ষা থাকবে না; দেশে ফিরে বউ-বাচ্চার মুখ আর দেখতে হবে না।"

"বউ-বাচ্চার ভাবনা আমার নেই বটে, তবে মায়া আছে পৈতৃক প্রাণটার জন্যে। ওটাকে হারাতে চাইনে বিঘোরে বিপাকে!"

"কেন, ঘর-সংসার করেন নি বুঝি?"

"ঘর একটা আছে বটে, তবে সংসার এখনো করিনি।" "কেন, আপনার দেশে মেয়েমানুষ নেই বুঝি? না-কি পুরুষ মানুষ সাবালক হয় বুড়ো বয়সে? কোন্‌টা সত্য?"

"দুই-ই অসত্য। তবে ইসলামে বিশ্বাসী স্ত্রীলোক কেন, পুরুষও আর একটি নেই আমার দেশে। সুন্দরী! সেজন্যই ত মনটা আমার ঝাঁপিয়ে পড়েছে তোমার দিকে।"

"ঠাট্টা করছেন, অবলা পেয়ে, অসহায়া দেখে?"

ঠিক সেই সময় মদ্যশালার ভৃত্য আসিয়া হারিসকে বলিল, "হুযুর আমার মনিব আপনাকে দু-একটি গান গাইতে দাওয়াত করেছেন। মেহেরবানী করে আসরে আসুন।"

হারিস দফ্ লইয়া শরাবখানায় যাত্রা করিল। নার্গিস তখন গৃহের অপর দ্বারপথে বাহির হইয়া ধীর-পদক্ষেপে অন্তঃপুরে পা বাড়ায়। তাহার হৃদয়ে কি যেন এক অস্বস্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

তিপ্পান্ন

কোনক্রমে নির্দিষ্ট কর্ম শেষ করিয়া হাবিল আপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। আজ তাহার মনের আগুন কিছুতেই যে চাপা দিতে পারে না। গৃহকোণে একখানা খেজুর পাতার ছেঁড়া চাটাই এবং চাটাইয়ের উপরে নেকড়া-বোঝাই একটা ময়লা বালিশই তাহার শয্যা। শয্যায় বসিয়া অনেকক্ষণ সে কাঁদিল। কেন কাঁদিল তাহা বলা বোধ হয় সহজ নয়। মনে হয় উন্মুক্ত গগনতলে সেই সুদূর বেদুঈন-পল্লীর ক্ষুদ্র তাঁবুটির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই তাহার মনে পড়িয়াছিল, হয়তো বা চঞ্চলা সুফিয়ার ফুল্ল-কুসুম সদৃশ মুখখানিই অন্তরে বারবার উঁকি মারিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বালিশটা আঁকড়াইয়া গৃহতলে জীর্ণ শয্যায় শুইয়া পড়িল।

যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা হাবিলের মাথায় আসিয়া ভিড় করিয়াছে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ছিন্নভিন্ন হারানো স্মৃতি, সুফিয়ার সঙ্গে মেলামেশার ঘটনাবলী, একে একে ছবির ন্যায় তাহার মানসপটে উদয় হইতে লাগিল। মনে পড়ে, সেই দিনের কথা- যে দিন মানজলির প্রেম দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, ঘর-সংসার পাতিবে। মনে পড়ে হাবিল নিজের তাঁবুটি তৈয়ার করিবার কালে সুফিয়া আপন হাতে তার খুঁটিগুলো বসাইয়া চামড়ার ছাউনিটা ঠিক করিয়া দিয়াছিল; আরো কত কথা! কত ঘটনা! ভাবিতে ভাবিতে পরিশ্রান্ত হাবিল কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বপ্ন দেখিল হাবিল-বড় বিচিত্র স্বপ্ন! তাঁবুর ভিতরে সে যেন সুফিয়ার সঙ্গে আলাপে মত্ত। এমন সময় এক প্রলয়ঙ্কর ঝড় তাঁবুসমেত উভয়কে যেন উড়াইয়া লইয়া গেল-কোন অচিন দেশে, কোন্ সুদূরে। হাবিল এক পাহাড়ের চূড়ায় নিক্ষিপ্ত হইয়া দেখে; নিকটে আর একটি পাহাড়ে তাহারই প্রাণপ্রতিম সুফিয়া এক প্রস্তরখণ্ডে অধোবদনে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। সে ছুটিতে ছুটিতে

সুফিয়ার নিকটে গিয়া বলিল, "সুফিয়া! আমি এসেছি! চেয়ে দেখ, আমি এসেছি! এবার আর তোমার কাছছাড়া হব না। শত ঝঞ্ঝা, শত বজ্রপাত আমাদের আর দূরে সরাতে পারবে না। কাছে এস সুফিয়া, কাছে এস!"

ঠিক সেই সময় নার্গিস হাবিলের সন্ধান করিতে আসিয়া শোনে, হাবিল স্বপ্নঘোরে কাহাকে যেন কাছে আসিতে ডাকিতেছে। স্বপ্নাবিষ্ট হাবিলের অসম্বদ্ধ কথাগুলো শুনিয়া সে ভাবে, হয়তো তাহাকেই সে খুঁজিতেছে। তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া সে ডাকিল, "হাবিল! আমাকে ডাক্‌ছ? উঠ! চেয়ে দেখ, আমি এসেছি!"

নার্গিসের ডাকাডাকিতে হাবিলের ঘুম ভাঙিল, কিন্তু স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটে নাই! বিভ্রান্ত ও হতভম্ব হাবিল চেঁচাইয়া উঠিল, "কে? সুফিয়া এসেছ? সুফিয়া?"

নার্গিস অবাক হইয়া শুনে, কে এক সুফিয়াকে যেন সে খুঁজিতেছে। বলিল, "কাকে খুঁজছো, হাবিল? কে সেই সুফিয়া? আমি নার্গিস।"

হাবিলের ভুল ভাঙিল। সম্মুখে নার্গিসকে দেখিয়া নিদারুণ হতাশায় তাহার অন্তর গভীর অন্ধকারে যেন নিমজ্জমান। অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিয়া সে বলিল, "ওহ্! তুমি নার্গিস?" চারিদিকে চাহিয়া দেখে- সেই পাহাড় নাই, সম্মুখে সে সুফিয়া নাই, ঝড়-বৃষ্টির চিহ্নমাত্রও নাই, নিজে জীর্ণ শয্যায় ভূতলশায়ী, নিকটে দাঁড়াইয়া পরিচারিকা নার্গিস। নার্গিস তাহার এমন মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় হাবিলের বড় দুঃখ হইল। বহুদিন পরে সে আজ দেখিয়াছিল সুফিয়াকে। দেখিয়াছিল, বিরহিণী অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া তাহারই জন্য কত যে কাঁদিয়াছিল!

হাবিল ক্ষেপিয়া উঠিল। মহাক্রোধে চিৎকার করিয়া সে নার্গিসকে বলিল, "কেন তুমি ডাকলে আমাকে? কেন আমার ঘুম ভাঙালে?"

নার্গিস শান্তভাবে বলিল, "হাবিল! বলবে আমাকে, সুফিয়া কে? বড় করুণ স্বরে প্রেমভরে যে ডেকেছিলে তাকে! কে সে?"

হাবিল উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'তা' জেনে তোমার লাভ? সে আমার প্রেয়সী-আমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী। হতভাগী। কেন আমায় ডাকলে? কেন আমার ঘুম ভাঙালে?"

নার্গিস কর্কশ স্বরে বলিল, "তবে যে বলেছিলে, তোমার হৃদয়-রাজ্যে আর কারো স্থান নেই! তুমি না বলেছিলে, আমাকে ভালবাস? কপট, ভণ্ড, মুনাফিক!" এই বলিয়া নার্গিস ত্রস্তপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হাবিল গান শুনিতে যাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে সে আসিয়াছিল, আর জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিল না।

হাবিলও পরিত্রাণ পাইল। ছেঁড়া নেকড়া আর খেজুর পাতা- বোঝাই ময়লা বালিশটা আবার শিয়রে দিয়া স্বপন-স্মৃতির ছিন্ন রেশটুকু সে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল।

বাহির্বাটীতে তখন নৃত্য-গীতের তুমুল কোলাহল। সেখানে শরাবখানার মদ্যভাণ্ডগুলিও একের পর এক শূন্য হইতেছে। রজনীর তৃতীয় যাম প্রায় অতিক্রান্ত। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহকর্ত্রী ও তদীয় কন্যা জুলায়খার সঙ্গে নার্গিস আসরের এক প্রান্তে আসিয়া বসিল।

গৃহকর্ত্রী প্রৌঢ়া। তাঁহার স্থূলদেহে বিগত যৌবনের বিলুপ্ত শ্রীর নমুনা-নিশানা এখনও কতকটা বিদ্যমান। কন্যা জুলায়খা পরিপূর্ণ যুবতী, পরমাসুন্দরী। তাহার চোখ-মুখের বিমল দীপ্তি, তন্বাঙ্গের অনুপম গঠন- সৌন্দর্য, সুমধুর কণ্ঠস্বর, স্বর্গীয় সুষমার অভিব্যক্তি। জুলায়খা কুমারী।

আসর ভাঙিবার উপক্রম। নর্তক-নর্তকীরা পরিশ্রান্ত। দর্শকমণ্ডলী তথাপি নাচের নেশায় বিভোর। গৃহস্বামী তখন হারিসকে একখানা গান গাহিতে অনুরোধ করিয়া উপবিষ্ট দর্শকমণ্ডলীকে তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন।

হারিস কি গান গাহিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। ইহুদী ও খ্রীস্টান গায়কদের নিকট হইতে অনেক ধর্মোপদেশমূলক গান সে শিখিয়াছিল। একবার ভাবিল, তাহারই একখানি গাহিবে, কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সে বাসনা ত্যাগ করিল। শেষে ইরান-রাজকুমার ইয়াজদ্জর্দ ও সিরিয়া-রাজকুমারী শাহানারার প্রেমোপাখ্যান বর্ণনা করিয়া একখানা গান সে ধরিল। বাজিয়া উঠিল দফ্। গানে গানে সে বর্ণনা করিল-প্রেমমুগ্ধ রাজকুমার বিপন্না

রাজকুমারীকে উদ্ধার করিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী পাণিপ্রার্থী দস্যু তৈফুরের কবল হইতে তাঁহাকে ছিনাইয়া নিতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ বাধিল পাহাড়ে-প্রান্তরে। অপূর্ব ললিত-ছন্দে গাঁথা সে-কাহিনী অপরূপ সুর-মাধুর্যে সে বর্ণনা করিল। হর্ষোৎফুল্ল শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখে-মুখে তখন বিপুল উত্তেজনা, অসীম উদ্দীপনা।

গায়ক তারপর গাহিল-হতভাগ্য রাজকুমার ইয়াজদ্‌জর্দের বন্দী-কাহিনী, বন্দীর দুঃখ-দুর্দশা-আরও কত কথা।

শ্রোতৃবর্গের মুখমণ্ডল তখন নৈরাশ্যের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন। সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনার আবাহনে, গানের তালে তালে, সকলের অন্তর যেন নিঃসীম অন্তরীক্ষে পাখা মেলিয়া, বিদেশীর সেই লৌহ-কারার আনাচে-কানাচে বন্দী বীরের সন্ধানে ঘুরিয়া, কত হয়রান পেরেশান। সভাস্থলে গায়কের গান ও বাদ্য-ধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নাই, কোলাহল নাই।

তারপর আসিল আকাঙ্ক্ষিত মিলনের সুবর্ণ সুযোগ। গায়ক শুরু করিল মিলনের পালা। চতুরা রাজকন্যার কৌশলে, এক প্রহরীর সহায়তায় ইয়াজদ্‌জর্দ উন্মাদের ছদ্মবেশে বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিয়া, আবার বিপুল বাহিনীসহ প্রচণ্ড আক্রমণ করিলেন সিরিয়া রাজকুমারীর নির্দেশিত পথে। ভাগ্য এইবার সুপ্রসন্ন। ইয়াজদ্‌জর্দ বিজয়মাল্যে ভূষিত হইলেন। তৈফুর পরাস্ত হইয়া পলায় করিলেন এলবুর্জ পর্বতের গহন অরণ্যে। মিলনে আর বাঁধা নাই, প্রেমের পথে আর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ইয়াজদ্‌জর্দ রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীকে উদ্ধার করিলেন। সৈন্য-সামন্ত লইয়া বিপুল আড়ম্বর সহকারে উভয়ে অশ্বারোহণে পাশাপাশি যাত্রা করিলেন মুল্‌কে ইরান। শ্রোতৃবর্গের আনন্দ আর ধরে না।

গান শেষ। শতমুখে গায়কের স্তুতিবাদ। চারিদিকে ঘন ঘন করতালি। রব উঠিল-সে অঞ্চলে এমন গান কেহ নাকি আর কখনও শুনে নাই। নর্তক-নর্তকীদল এই নবাগত গায়কের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গৃহকর্ত্রীও আগাইয়া আসিলেন কন্যা জুলায়খা ও বাঁদী নার্গিসকে সঙ্গে লইয়া। জুলায়খা দেখিলেন, গায়ক বেশ সুন্দর সুপুরুষ। যুবতীর উদাস অন্তর

স্বতঃউৎসারিত আনন্দ-ধারায় ভরিয়া উঠিয়াছে, কণ্ঠদেশ স্বতঃস্ফূর্ত হইল, "আহা কি সুন্দর! কি সুমধুর তার সুর! কি চমৎকার গান!"

নার্গিস জুলায়খার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চোখে-মুখে অগাধ বিস্ময়, নয়নতারায় কামনার বহ্নিশিখা। জ্বালাময়ী হিংসানলে নার্গিসের অন্তর কি জানি পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। কেন পুড়িল, কে বলিবে? সে মনে মনে শুধু আফসোস করিতে লাগিল-"আহা! ছোট বিবিকে কেন নিয়ে এলাম গান শোনাতে! পোড়ারমুখী রাক্ষসী কেমন দেখ না তাকিয়ে রয়েছে হাঁ করে।"

গৃহকর্ত্রী কন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন। দুরন্ত যৌবন মানুষের চোখে কত রঙীন নেশার ফাঁদ পাতিয়া দেয়, ইহা তিনি জানিতেন, জানিতেন বলিয়াই কন্যাকে লইয়া অবিলম্বে আসর ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

আসর ভাঙ্গিল। হারিস প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। গৃহস্বামী হিসাব নিকাশ করিয়া, মাল-সামান গুছাইয়া, সঞ্চিত অর্থগুলো সব কুড়াইয়া লইয়া সকলের শেষে প্রবেশ করিলেন অন্তঃপুরে।

গৃহিণী স্বামীর আহার্য আগলাইয়া বসিয়াছিলেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত রোজই তাহাকে স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু আজ প্রতীক্ষমান স্বামী ঘরে ফিরিলেন বহু বিলম্বে। আহারাদি শেষ করিয়া উভয়ে যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন তখন রাত্রি ভোর-ভোর।

সেই গানের শেষে শয্যাশায়ী গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী, জুলায়খা-নার্গিস এবং মদোন্মত্ত পুরুষদের মনোমধ্যে যে ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য কল্পনার মখমল-কোমল পক্ষপুটে সওয়ার হইয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসিলে মন্দ হয় কি!

শোনা যায়, গৃহস্বামী মনে মনে বলিতেছেন-'মুসাফিরটার গলার বহর আছে বটে। ওহ্ ভিড় হয়েছিল খুব; আজ আর এক ফোঁটাও পড়ে নেই। ভাগ্যিস লোকটা এসেছিল। কোনক্রমে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কিছুদিন এখানে রাখতেই হবে। গান শোনার জন্য দশ গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করবে। শরাবের পয়সায়

একবার তাদের দেখিয়ে দেব, ও-পাড়ার ওসমান বড়, কি এই ছায়াদ বড়।' ঈদৃশ চিন্তা করিতে করিতে ছায়াদ ধীরে ধীরে নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়িলেন।

গৃহকর্ত্রী পাশ ফিরিয়া মনে মনে ভাবিলেন-হাঁ মরদ ছেলে বটে! দেখতে যেমন গলাটিও তেমন। কে জানে কার ফরযন্দ, কি-ই বা তার বংশ পরিচয়! শাদী হয়েছে কিনা কে বলবে? আমার জুলায়খার পাশে কিন্তু মানাতো বেশ।'

বিবি পার্শ্বে শায়িত নীরব স্বামীকে মৃদু ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "ওগো শুন্‌ছ, ঘুমুলে নাকি?"

তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বামী অস্ফুট সুরে উত্তর করিলেন, "হু!"

বিবি আবার বলিলেন, "মেয়ের বয়স হল যে, শাদীর কথা ভাবছ কিছু?"

স্বামী তন্দ্রাঘোরে উত্তর করিলেন, "হু, কাল সকালেই আনতে হবে দুই পিপে, বাকী নেই এক ফোঁটাও।"

"কি সব বকছ?"

"হু, সব খতম। স-অ-ব-অনেক টাকা?"

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার মাথ্‌থা আর মুণ্ডু! কেবল টাকা আর টাকা! মরণও হয় না।"

স্বামী ঘুমের ঘোরে একবার 'হু' করিয়া বিবিকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিবি বিরক্তিভরে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অপরপক্ষে জুলায়খা শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আহা মরি-কী দেখলাম! কী শোনলাম। কী মনোহর তার রূপ! কী মন-মাতানো সুর! গায়কের সাথে গোপনে দুটো কথা যদি বলা যেত। শুধু এক নযর তাকে যদি আবার দেখতে পেতাম! হারামজাদী নার্গিসটা ঘুমালো নাকি! শতেক খোয়ারীর ঘুমিয়ে আর আশ মেটেনা!'

জুলায়খা শয্যোপরি কাত হইয়া শুইয়া নীচে ভূমিতলে শায়িতা নার্গিসের দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন, সে বাহুযুগলে মুখ লুকাইয়া জড়সড়ভাবে শুইয়া রহিয়াছে, চক্ষুকোণ হইতে নাসিকা বাহিয়া এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িবার

উপক্রম। জুলায়খা মনে মনে ভাবিলেন, হতভাগিনীর মনে আবার ঘুণ ধরলো নাকি। বলেছি ত হাবিলের সঙ্গে তার বিয়ে দেব। তবে আবার দুঃখ কিসের? না, রাত বুঝি আর পোহাবে না।'

তৈলাভাবে প্রদীপের আয়ু শেষ। অন্ধকারে বিছানায় পড়িয়া জুলায়খা ছটফট করিতে লাগিলেন।

নার্গিস ঘুমায় নাই। বদনে প্রতিফলিত সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব-মথিত মনের প্রতিচ্ছায়া লুকাইবার জন্য বাহুযুগলে মুখ ঢাকিয়া সে শুইয়াছিল। মনে মনে ভাবিল, 'না, সে অদৃষ্ট আমার নাই। আমি যে নিন্দিতা বন্দিনী-ক্রীতদাসী। ওগো খেয়ালী সৃষ্টিকর্তা, কোন্ পাপে আমি এমন দুর্ভাগ্যে নিপীড়িতা? কোন্ দোষে হরণ করলে আমার স্বাধীনতা? প্রভো হে, বলে দেবে কোন্ পূণ্যবলে আমার এই প্রভুকন্যা দুগ্ধ ফেননিভ কোমল-শয্যার অধিকারিণী? আর কোন্ পাপে এই হতভাগী নার্গিস ধূলি-মলিন ছিন্ন-কন্থা অবলম্বিনী? বলবে আমায় কোন্ সুকৃতির ফলে এই ভাগ্যবতী জুলায়খা চর্ব্য- চোষ্য-লেহ্য-পেয় ও মূল্যবান বসন-ভূষণের অধিকারিণী? আর আমার কপালে কেন শুধু পোড়া রুটি ও জীর্ণ বসন? হে অদৃষ্ট রচয়িতা বিধাতা। তুমি বড় রঙ্গাভিলাষী। অপরকে কাঁদায়ে তুমি হাস। ভেবেছিলাম, অগত্যা সংসার--সাগরে হাবিলকে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিন্তু সে আশাও বুঝি নির্মূল হলো। হতভাগা ঘুমের ঘোরেও কোন এক সুফিয়াকে যেন ডাকে। না! সুখ আমার কপালে নেই।

'নারী যদি নারীর অন্তর বুঝতে পারে, তবে আমি ঠিকই বুঝেছি এই জুলায়খা বিবি গায়ককে দেখে মজেছে; গায়কের গান শুনে পাগল হয়েছে। কেন হে পাথরের ঠাকুর! যদি এই জুলায়খা বিবি মেহমানকে ভালবাসতে পারে, আমিই বা পারবো না কেন? কেন, আমিও কি কম সুন্দরী? আমাকে উত্তমরূপে গোসল করিয়ে, কেশগুচ্ছ সুগন্ধি তৈলে চর্চিত করে, শুভ্র কুসুমে কবরীটি বেধে দাও, সুরভি প্রসাধনে অঙ্গসৌষ্ঠব ফুটিয়ে তুলে, শুধু দুফোঁটা বসরাই আতরে আর দু'চোখে কাল মিশমিশে সুরমায়, আমার ইন্দুবদন সাজিয়ে দাও; তারপর মূল্যবান

বসন–ভূষণে ভূষিত করে আমাকে বসিয়ে দাও পালঙ্কের কোমল শয্যায়। দেখো যত লায়লা, যত শিরি, যত জুলায়খা, যত ইরানী সুন্দরীরা আমাকে দেখে জ্বলে মরবে হিংসায়; দেখো–কত মজনু, কত ফরহাদ, কত ইউসুফ আমাকে দেখে আপন প্রেয়সীকে ভুলবে। তবে বলতে পার–কী আমার অপরাধ? হায় হায়! ভুলেই গেছি, পোড়া কপাল আমার। ভুলেই গেছি–জুলায়খা রাজকন্যা, আর আমি যে ভিখারিণী–ক্রীতদাসী। হলামই বা ভিখারিণী ক্রীতদাসী! ভিখারিণী কি ভালবাসতে পারে না? সে কি দয়িতের দ্বারে ভালবাসার অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়াতে জানে না? বিবি বোধ হয় ঘুমিয়েছেন। একবার উঠে দেখি। রাত্রি যেন পোহায়ে আসছে। মেহমানের ঘরে বোধ হয় পানি নেই, সুরাহীটায় পানি ভরে দিয়ে আসতে হয়।'

নার্গিস নিঃসাড়ে উঠিয়া দরজার ফাঁকে বাহিরে তাকাইল। দেখিয়া বিরক্তি আর ধরে না–অন্ধকার দূর হয় নাই। জুলায়খার ঘুম ছুটিয়া গিয়াছিল বহুক্ষণ। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান নার্গিসকে দেখিয়া সে খাঁকার দিতেই নার্গিস তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আবার ভূমি শয্যায় আশ্রয় লইল।

হারিস বিছানায় শুইয়া মনে মনে ভাবে, 'হায় অদৃষ্ট! হাবিলকে উদ্ধার করতে এসে বন্দী হলাম নিজেই? মজে গেলাম নার্গিসকে দেখে! ধিক্ আমাকে! ধিক্ আমার প্রেম! আহা, মেয়েটি বড় দুঃখিনী, বড় সুন্দরী; কি নাক! কি চোখ! এ সোনার প্রতিমা বিধাতা আপন হাতে গড়ে, না–জানি কি আক্রোশে, কি অপরাধে, ধূলায় ফেলে দিল হেলায়! না, বাসনাগ্নি ক্রমেই যেন প্রবল হয়ে উঠছে, যে গুরুদায়িত্ব পালন করতে এসেছি, তা'ও বুঝি পণ্ড হয়। না, পালাতে হবে, কালই আমাকে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। হাবিলের মুক্তির জন্য অন্য উপায় সন্ধান করবো।'

গৃহে ফিরিয়া নেশাগ্রস্ত পুরুষগণ শয্যায় প্রেয়সী–প্রণয়িনীদের বাহুপাশে বন্ধন করিয়া মনে মনে ভাবে, 'আহা! সংসার কতই না সুখের, কতই না সুন্দর! এ দুর্দিনের জিন্দেগী যদি পঞ্চমকারের সাধনায় না কাটাই, তবে ত আমার মনুষ্যজন্মই বৃথা। হে বিলাসিনী রূপ–রঙ্গিনী! হে অপ্সরা–সুন্দরী তোমাকে ছেড়ে স্বর্গসুখও আমি চাই না। তোমার মায়া আমি কাটাতে পারবো না।'

না, এ দৃশ্য বড় দৃষ্টিকটু। কল্পনার পক্ষ সংবরণ করিয়া ত্বরায় এই স্থান হইতে পলায়ন করাই বিধেয়।

কোন মায়াবিনীর মায়াকাঠির পরশে সমস্ত জীব-জগৎ বুঝি অচেতন, অসাড়! নিশীথিনীর ক্রোড়ে গাছপালাগুলিও যেন স্তব্ধ নিথর হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান। যে দুই-চারিজন নরনারী তখনও জাগিয়াছিল, তাহারাও ক্রমে সুষুপ্তির অঞ্চলতলে লুটাইয়া পড়িল।

চুয়ান্ন

হারিস প্রভাতে উঠিয়াই গৃহস্বামীর নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিল। অতিথি এত তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে শুনিয়া ছায়াদের বিস্ময়ের আর অবধি নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মুসাফিরকে অন্তত কিছুদিন বাড়ীতে রাখিতে পারিলে শরাবখানার আড্ডাটি ভালভাবে জমাইয়া তুলিতে পারিবেন, কিন্তু সে আশা যে ভেস্তেই যায়। হাত কচলাইয়া কাচুমাচু সুরে তিনি বলিলেন, "আপনি মেহমান, মুসাফির–আমার মাথার তাজ; এ গুনাহগার বান্দা দু'দিনও আপনার খিদমত করতে পারলো না, আর চলে যাবেন এখনি? না, সে হয় না জনাব! কম্-সে-কম মাসেক কাল ত থাকুন!" এই বলিয়া তিনি উচ্চৈস্বরে মদ্যশালার নফরকে ডাকিতে লাগিলেন।

ডাক শুনিয়া এক ভৃত্য ছুটিয়া আসিতেই ছায়াদ বিষম ক্রোধে তাহার গণ্ডদেশে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া হুঙ্কার করিলেন, "হারামজাদা বজ্জাত, এখনো কেন মেহ্মানের নাশতা-পানি দেওয়া হয়নি? হারামজাদী নার্গিসকে আমি দুরস্ত করবো পিটিয়ে। মাগীকে বল্ শিগগির নাশ্তা দিতে দহ্লিজে।"

চাকরটা গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেল। হারিস স্তম্ভিত হইয়া ভাবেঃ কই, বেলা তো মোটেই উঠে নি! আর এ চাকরটারই বা দোষ কি? সে ত শরাবখানার কাজেই মশ্গুল।

ছায়াদ হারিসের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অপূর্ব মুখভঙ্গী সহকারে বলিলেন, "বিলকুল নাদান! এ বেটারা বুঝবে কিবা মেহমানের কদর! গুস্তাখি মাফ করবেন জনাব!"

হারিস বলিল, "আপনি অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন মেহেরবান! নাহক বিরূপ হয়েছেন গোলাম-বাঁদীদের উপর।"

গৃহস্বামী বলিলেন, "আপনি মুসাফির, এদের মন-মেজাজ কিছুই জানেন না জনাব। এ বেটাদের দিনে দু'চারবার আচ্ছা করে ঠেঙানী না দিলে শরীর চাঙ্গা হয় না, ভাল কাজও পাওয়া যায় না।"

এমন সময় নার্গিস এক হস্তে খানার রেকাবি ও অপর হস্তে পানির বাটি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহস্বামী রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "কমবখ্ত কমিনা! কেন এত দেরি?"

নার্গিস থালাবাটি নামাইয়া রাখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ছায়াদ এক লম্ফে আসন ত্যাগ করিয়া পরিচারিকার কেশগুচ্ছ আকর্ষণপূর্বক প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন।

হারিস তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল, "আপনি এতটা বাড়াবাড়ি করলে আমাকে দেখছি নাশতা-পানি না খেয়েই চলে যেতে হবে জনাব।" এই বলিয়া সে সত্য সত্যই দফ্খানি লইয়া উঠিয়া পড়িল।

আচম্বিতে ছায়াদ শান্ত ভাব ধারণ করিয়া অতিথিকে হাত ধরিয়া বসাইলেন। তারপর কত ইনাইয়া বিনাইয়া নানা প্রসঙ্গে কথা বলিয়া তাহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। নার্গিস চলিয়া গেল।

আহার করিতে করিতে হারিস বলিল, "ভাল নফর পাওয়া বড় দুষ্কর বটে, আমি কত খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি। কেউ আছে নাকি এদিকে আপনার সন্ধানে?"

ছায়াদ উত্তর করিল, "কোথায়? আমি নিজেই যে আরো দু'টা খুঁজছি। বড় বিবি ত খাটুনি বাড়িলেই ভিরমি যায় কিনা!"

হারিসের অন্তর হইতে হাবিলকে ক্রয় করিবার আশা আপাতত নির্মূল করিতে হইল। ইতিকর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া তাহার দুশ্চিন্তার অবধি নাই।

গৃহস্বামী পুনরায় বলিলেন, "আপনি না উট কিনবেন বলেছিলেন? শুনেছি এই পাশের গ্রাম আল-জবিলে গোটা দুই বিক্রি হবে। একবার দেখে আসুন না।"

হারিস উত্তর করিল, "হাঁ, সেই দিকেই যাব। ও পথেই দেশে ফিরবো।"

ছায়াদ। এত তাড়াতাড়িই দেশে ফিরবেন? বলেন কি! কিছু দিন ত থাকুন এখানে, আমি আপনাকে খুব সুবিধেয় কিনে দেব উট।

হারিস। না, থাকা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। আপনার আতিথেয়তায় প্রীত হয়েছি খুবই, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

তথাপি গৃহস্বামী হারিসকে ছাড়িতে চাইলেন না। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ফিরিয়া আসিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তিনি আপন কাজে চলিয়া গেলেন।

হারিস ফিরিয়া আসিবে না ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামী রুষ্ট হইবেন ভাবিয়া মুখে আর কিছুই বলিল না। হাবিলকে ক্রয় করিবার কোন আশা নাই দেখিয়া অগত্যা সে আল-জবিলে গিয়া রায়হানের সঠিক খবর লইতে মনস্থ করিল। অন্তত একটা কাজ ত করা দরকার।

আহারান্তে হারিস দফ্‌খানি লইয়া বাহির হইবে-এমন সময় পিছন হইতে সুমিষ্ট সুরে কে ডাকিল, "মুসাফির!"

হারিস পশ্চাতে তাকাইয়া দেখে-পিছনে দাঁড়াইয়া সজল-নয়না নার্গিস। তাহার চোখে-মুখে একটা নিদারুণ নৈরাশ্যের ভাব পরিস্ফুট। নার্গিস আর দুই পা অগ্রসর হইয়া হারিসের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চলে যাচ্ছেন সত্যি সত্যি?"

হারিস কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না, শুধু যুবতীর প্রতি অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নার্গিস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আর বুঝি আসবেন না?"

নার্গিসের মধুর কণ্ঠস্বর বড় মর্মস্পর্শী। যুবতীর তীক্ষ্ণ কটাক্ষবাণ হারিসের অন্তর যেন এপার-ওপার বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উত্তর করিল, "নার্গিস! বড় ভাল লাগে তোমাকে, সত্যই ভালবাসি তোমায়; কিন্তু থাকার যে উপায় নেই আমার।"

নার্গিস দুই চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "ভালবাসেন? সেই জন্যেই বুঝি পালিয়ে যাচ্ছেন?"

হারিস উত্তর করিল, "সম্মুখে মহান কর্তব্য; থাকার যে আর উপায়ই নেই। তুমি আমায় ক্ষমা কর নার্গিস।" এই বলিয়া সে কালবিলম্ব না করিয়া সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নার্গিস দুয়ারে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ অতিথির প্রতি জলভরা নয়নে তাকাইয়া রহিল। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "বিধাতাই যে আমার প্রতি নিষ্ঠুর মানুষই বা কঠোর হবে না কেন?"

✪ ✪ ✪ ✪

নার্গিসের মুখে অতিথির প্রস্থান-সংবাদ শুনিয়া জুলায়খা ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা। নার্গিসের কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করিয়া তিনি তাহাকে প্রহার করিতে করিতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "হারামজাদী কমিনা। তুই নিশ্চয়ই মেহমানকে কিছু কটু কথা বলেছিস, কষ্ট দিয়েছিস, নইলে এত সকাল সকাল তার চলে যাবার কেন এত তাড়া? আমার সৌভাগ্য দেখে কেন তোর চোখ টাটায়? তোকে খুন করে অন্তরের জ্বালা মেটাব!"

নার্গিস যতই নিজকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে চাহে, জুলায়খা ততই তাহাকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে। তাহার আর্তনাদে গোলাম-বাঁদীরা ছুটিয়া আসিয়াছে, গুহকর্ত্রীও আসিলেন। নার্গিসের অপরাধটা কি জানিয়া মাতাও কন্যার সুরে সুর মিলাইয়া নিরপরাধ বেচারীকে আরও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

দুনিয়ার রীতি বুঝি ইহাই। যে নিরপরাধ-নির্দোষ, শাস্তির বহর বুঝি কখনও কখনও তাহাকেও সহ্য করিতে হয়। ব্যথাভারে জীবন যাহার ভারাক্রান্ত, দুঃখে যাহার জীবন গড়া, দুর্ভাগ্যের ভ্রূকুটি তাহাকেও বুঝি মাঝে মাঝে সহিতে হয়। জুলায়খা বাঁদীকে প্রহারে প্রহারে আধমরা করিয়া, তর্জন-গর্জন করিতে করিতে আপন কক্ষে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

কর্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে আপন কার্যে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন কই। তাঁহার স্বপ্নসৌধ এমনভাবে এক নিমেষে ভাঙিয়া চুরমার হইবে, ইহা যে তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ঘরের তৈজসপত্র অকারণে খটখট ঘটঘট করিয়া, আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইলেন। অবশেষে প্রতিজ্ঞা

করিয়া বসিলেন, "না, ভিখারীর হাতে মেয়ে আমি দেব না। থাকলোই–বা রূপ–গুণ, কিন্তু সঙ্গতি কোথায়? গীত–বাদ্য যার একমাত্র উপজীবিকা, সে পাত্র আমার জুলায়খার নয়।"

নার্গিসের পেলব দেহ বাত্যাহত মাধবীর ন্যায় পড়িয়া রহিল ভূতলে। কণ্ঠে চীৎকার নাই, মুখে ভাষা নাই। অভাগিনী শুধু দুই নয়নের অশ্রুধারায় কপোল ভিজাইয়া ভাসাইয়া দিল ভূমিতল।

বিবিরা চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া অন্যগৃহ হইতে সালেহা নাম্নী এক পরিচারিকা এদিক–ওদিক চাহিয়া ছুটিয়া আসিল নার্গিসের নিকটে। সালেহা তাহাকে সযত্নে উঠাইয়া চুপিসারে লইয়া গেল নিজের কুটিরে।

স্বহস্তে নার্গিসের ব্যথাতুর দেহ মালিশ করিতে করিতে সালেহা বলিল, "ভগ্নি! দুঃখ যার জীবন–সাথী, দুঃখ তাকে সইতেই হবে। জানি না, এ নিষ্ঠুর দেশে কোন্ পাপে মেয়েরা কেনা–বেচার সামগ্রী হয়ে জন্মে। অভাগিনী নারীর দুঃখে কারো হৃদয় কি বিচলিত হয় না? কারো প্রাণ কি কাঁদে না? মনে হয়, পাষাণ দেবতার অন্তর নেই, থাকলেও তা পাষাণেই তৈরী; দুঃখিনীর দুঃখ তা স্পর্শও করে না।"

গৃহতলে শায়িতা নার্গিস চক্ষু মুছিয়া বলিল, "হাঁ বহিন! ঠিকই বলেছ, আমাদের দুর্ভাগ্যের অমানিশা এ জীবনে পোহাবে না, মুক্তির সন্ধান বুঝি আর পাব না; শৈশবে যে সব জননী আপন কন্যা–সন্তানকে এই সব লাঞ্ছনা–গঞ্জনার হাত থেকে রক্ষা করতে সূতিকাগারেই গলা টিপে মারে, তারা বড় দয়াবতী বীরাঙ্গনা, তারা আমার নমস্যা।"

এমন সময় গৃহদ্বারে ছায়াপাত হইল এক মনুষ্যদেহের। সালেহা ঘাড় ফিরাইয়া দেখে, প্রভুকন্যা জুলায়খা প্রসারিত হস্তদ্বয়ে গৃহদ্বারের দুই পার্শ্বের খুঁটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আলুলায়িত কেশে দণ্ডায়মান যেন মূর্তিমতী রাক্ষসী। বজ্রহুঙ্কারে তিনি ডাকিলেন, "সাহেলা! এইদিকে আয়!" এই বলিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।

সালেহা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মনিব-কন্যার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে জুলায়খা তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, " ও ঘরে কি করছিলি হতভাগী?"

সালেহা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না বিবি! কিছুই না, নার্গিসের গায়ে ব্যথাটা বড্ড বেশী কিনা, তাই হাত-পাগুলো একটু মালিশ করে দিয়েছি; নইলে ঝরনা থেকে পানি আনবে কি করে?"

জুলায়খা কঠোর স্বরে বলিলেন, "দেখ, সারাদিন সারারাত হারামজাদীকে খেতে দিবি না কিচ্ছু; এক ফোঁটা পানিও না। মাগীর গুমর ভাঙবো। সেই গায়ক-মুসাফির গেল কোথায় দেখে আয়। যেমন করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনবি। নইলে কিন্তু তোর কপালেও দুর্ভোগ।"

সাহেলা হুকুম তামিল করিতে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল, এমন সময় গৃহকর্ত্রী দ্বারদেশে আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, "যাচ্ছিস কোথায় হারামজাদী।"

ভয়ে সাহেলার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে। ভীতা-উৎকণ্ঠিতা নারী ভূতগ্রস্তের ন্যায় নির্বাক নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।

গৃহকর্ত্রী গম্ভীর স্বরে পুনরায় হাঁকিলেন, "না, যেতে হবে না, আমার স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে। নাম-গোত্র-পরিচয়হীন মানুষের আমার প্রয়োজন নেই; কোথাকার কমিন-কমজাত কে জানে? গান গেয়ে ভিক্ষাবৃত্তিই যার একমাত্র উপজীবিকা, সে যেন এই বাড়ীতে ফিরে আর না আসে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সালেহার মাথার উপর দুই হুকুম। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া বাঁদী গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া জুলায়খার প্রতি চক্ষু ঠারিয়া জানিতে চাহিল- এখন উপায়?

জুলায়খা আম্মাকে শোনাইয়া শোনাইয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিলেন, "মরণ হয় না তোর হতভাগীঃ শুনিস্ নি রাতের আসরে তাকে গান গেতে আব্বা বলে গেছেন বারবার। তাইতেই না ডেকে আনতে বললাম! নইলে আমার কি এত দায়! কিন্তু তাই বলে কি যেতে হবে এক্ষণি। কাপড় কাচতে হবে না, আমার চুল বাঁধতে হবে না!"

হতভম্ব সালেহা ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতা দৃষ্টির আড়াল হইতেই জুলায়খা তাহাকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া পুনরায় শাসাইয়া বলিলেন, "এখনই যা, নইলে কোথায় চলে যাবে লোকটা, খুঁজে পাবিনে!"

সালেহা বুঝিল, কন্যার আদেশই শিরোধার্য। অবিলম্বে সে গৃহকর্ত্রীর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া মেহমানের সন্ধানে গুটি গুটি যাত্রা করিল।

পঞ্চান্ন

পাহাড়ের অদূরে বালুকাময় প্রান্তরে সেই আল-জবিল গ্রাম। গ্রামে খর্জুর-বন ঘেরা আরফানের বাড়ীখানি বড় ছোট। হারিস রায়হানের খবর লইতে সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখে-বাড়ী যেন জনমানবহীন, অথচ প্রতি গৃহের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর গৃহস্বামী ভয়ে ভয়ে বাহিরে আসিয়া অতিথির পরিচয় লইলেন; তারপর তাহাকে পরম সমাদরে ঘরে নিয়া বসাইলেন।

হারিস মুগ্ধনেত্রে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে-বাড়ীখানি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সর্বত্র এক নিষ্কলুষ পবিত্রতার ছায়া যেন বিরাজমান। গৃহমধ্যে আসবাবপত্র অতি সামান্যই, গৃহতলেই শয্যার ব্যবস্থা। বাড়ীতে কোন দাস-দাসী সে দেখিতে পাইল না।

আদর -আপ্যায়নে প্রীত হইয়া হারিস গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা জনাব! জানতে পারি কি আপনারা এমনভাবে দ্বাররুদ্ধ করে বসেছিলেন কেন?"

আরফান হাসিয়া বলিলেন, "গুস্তাখি মাফ করবেন জনাব। আমরা আপনাকে অবিশ্বাসী জালেম কুরাইশদের কোন অনুচর ভেবে ভয় পেয়েছিলাম। শুনুন আমাদের দুঃখের কাহিনী।" এই বলিয়া তিনি নিজের উপর, অন্যান্য মুসলমানদের উপর এবং প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উপর কুরাইশদের যে সব উৎপীড়ন-নিপীড়ন ঘটিয়াছিল, তাহা একে একে বর্ণনা করিলেন। বক্তার চোখে দরবিগলিত অশ্রু,কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়। সে অত্যাচার-কাহিনী হারিসের নয়নযুগলও অশ্রুধারায় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরেও উকি মারিয়া উঠিল সত্যের অনাবিল আলো।

তারপর কথায় কথায় উঠিল রায়হানের কাহিনী। আরফান ঈসের জঙ্গলে ভ্রাতার নিধন-বার্তা লোকমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই সজল নয়নে বর্ণনা করিলেন আদ্যোপান্ত।

হারিসের অন্তর হইতে রায়হানকে ফিরিয়া পাইবার আশা একেবারে বিলুপ্ত হইল। কাজেই সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন সে আর দেখিল না। মিছামিছি ভাইয়ের জ্বালা বাড়াইয়া লাভটা কি!

আহারের আয়োজন অতি সামান্যই–মাত্র দুই খণ্ড রুটি ও কিছু খর্জুর। একজন যুবক সে আহার্য আনিয়া অতিথির সম্মুখে হাযির করিল।

মেহমান খানা খাইতে বসিল, মেজবানও আসিলেন। গৃহস্বামীর আদেশে সেই যুবকও তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। হারিস যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এর পরিচয় জানতে পারি কি জনাব?"

আরফান বলিলেন, "এ হাবিব। আগে আমার ক্রীতদাস ছিল; সে–ও ইসলাম কবুল করেছে। মুক্তি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেতে চায় না কোথাও।"

ক্রীতদাসকে এক সঙ্গে একাসনে বসাইয়া, একই আহার্য গ্রহণ করিতে পারে, এমন প্রভু জগতে আছে বলিয়া হারিস জানিত না। তাহার অন্তর বিস্ময়ে, পূলকে ভরিয়া উঠিল; কেবলই মনে হইতে লাগিল– যে ধর্ম মানুষকে এমন উদার ছাঁচে গড়িতে পারে, এমন মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, সে ধর্ম নিশ্চয়ই সত্য ধর্ম।

আহারাদির পর আরফান ও হাবিব একসঙ্গে যোহরের নামাযে দণ্ডায়মান হইলেন। হারিসের চক্ষে সে দৃশ্য বড় মধুর লাগিল। ধর্মের শাশ্বত দ্যুতি উদ্ভাসিত করিল তাহার অজ্ঞানান্ধ অন্তর। সেও তাহাদের সঙ্গে নামাযে যোগদান করিয়া, মনে–প্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করিল। এক নিমেষে তাহার অন্তর হইতে ধুইয়া মুছিয়া উবিয়া গেল সকল সংশয়, সকল অবিশ্বাস, সকল কুসংস্কার।

নামাযের পর হারিস বলিল, "ভাই আরফান সাহেব! ইসলামের বিমল জ্যোতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি আর অবিশ্বাসী নই; অধমকে সত্য ধর্মে দীক্ষিত করুন।"

আরফান আনন্দাতিশয্যে হারিসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মারহাবা! মারহাবা! বল ভাই, মুখেও বল তবে–'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।"

হারিস এই মুক্তি বাণী উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইল। আরফান তাহাকে আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)–এর মহিমা শোনাইলেন, আখেরাতের কথা বলিলেন। তারপর শিক্ষা দিলেন, "এই নশ্বর জগতে একমাত্র সুকৃতি অবিনশ্বর। রঙীন ধরিত্রী এক বিরাট রঙ্গমঞ্চ বিশেষ–কত আসিতেছে, কত যাইতেছে; কেহ হাসে। কেহ কাঁদে। নাচিয়া গাহিয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া, একে একে সকলে চির–বুভুক্ষু ধরণীর অতৃপ্ত জঠরানলে আত্মাহুতি দিতেছে। কিন্তু ইহাই শেষ নহে, মৃত্যুর ওপারেও পড়িয়া রহিয়াছে বিরাট জগত; অনন্ত অফুরন্ত জীবন শুরু হইবে মৃত্যুর পর। সে জীবনের আর শেষ নাই, সে জগতের বিলয় নাই। সেই বিরাট অনাগত জীবনের বিপদসংকুল যাত্রাপথের উপযুক্ত পাথেয় এই জগতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। আল্লাহ্ ও রসুলের হুকুম পালন, সৎকর্মে পুণ্য সঞ্চয়– সেই পথের পাথেয়। সময় থাকিতে সে পাথেয় অর্জন কর; তুমি অজ্ঞ পথিক, কখন তোমার যাত্রা শেষ হইবে জান না। সেইজন্যই বলি সুসময়ে পুণ্যার্জন কর। আজ করিব, কাল করিব বলিলে, হয়তো আর করাই হইবে না।

"বন্ধু! চলিতে চলিতে কখন মরণ–সায়রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার টেরও পাইবে না। বলিয়াছি, মৃত্যু তোমাকে পরজগতের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিবে। ইহলোকের শেষপ্রান্তে শুরু হইবে পরলোকের যাত্রা। সে যাত্রা অন্তহীন, বিরামহীন। বন্ধু! মৃত্যুর ওপারে সেই অনন্ত জগতের দ্বারদেশে খোলা রহিয়াছে দুই পথ। একটি শুচি–শুভ্র আলোক–বিকশিত কুসুমাস্তীর্ণ পুণ্যের পথ। সেই পথে চলিতে চলিতে কত নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী সার্থক করিবে তোমার দুই নয়ন, মনপ্রাণ ভরিয়া তুলিবে অপূর্ব আনন্দে; কুসুম–সুরভি তোমাকে আকুল করিবে। দেখিবে, চারিদিকে কেবল বিচিত্র ফল–ফুলের মেলা, আনন্দের খেলা –অভাব নাই, দৈন্য নাই; চারিদিকেই প্রাচুর্য। রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই–অনন্ত জীবন, অনন্ত যৌবন। কত বিচিত্র বেশে, বিচিত্র রাগে, উৎফুল্ল যুবক–যুবতীর দল নাচিয়া গাহিয়া তোমাকে দলে ভিড়াইয়া লইবে, চারিদিক ভরিয়া তুলিবে উচ্ছ্বসিত কলহাস্যে। সম্মুখে দেখিবে বিরাট আনন্দময় জগত। তুমি সেখানে মুক্ত, স্বাধীন; যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই পাইবে। সেই হিংসা–দ্বেষহীন, কলুষহীন অমর জগত কেবল সৃষ্টিকর্তার স্তুতিগানে ভরপুর; জিন, ইনসান ও ফিরিশ্‌তারা

অহরহ বিশ্ব-স্রষ্টার বন্দনায় মশ্‌গুল। সেই জগতই মানুষের কাম্য, সেই পথই আমাদের চলার পথ।

আর একপথ আছে পাপীর পথ। চারিদিকে শুধু বিভীষিকাময় অন্ধকার। বড় বন্ধুর পথ! স্থানে স্থানে কন্টকাকীর্ণ গিরিসংকট, স্থানে স্থানে প্রস্তরসংকুল। সমগ্র জগত পুঁতিগন্ধে বীভৎস। সম্মুখে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের আকুল আর্তনাদ পাপীদের অন্তরাত্মা কাঁপাইয়া তুলিবে। ভয়ে তাহারা পিছাইয়া আসিবে, চলিতে পারিবে না। পশ্চাতে অসংখ্য কালান্তক মূর্তি অগ্নিময় লৌহশলাকা দ্বারা তাহাদের প্রহার করিতে থাকিবে; অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িবে, কিন্তু মরিবে না; মরণ আর আসিবে না! অসংখ্য বিষধর সর্প, বিষধর কীটপতঙ্গ তাহাদের দংশন করিয়া জর্জরিত করিবে, প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে- বাহির হইবে না। ভীষণাকার প্রহরিগণ সকলকে টানিয়া আনিয়া নিক্ষেপ করিবে তলহীন বিশালগর্ভে, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে। সে দৃশ্য বড় মর্মান্তিক-বড় হৃদয়বিদারক! লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের কাতর আর্তনাদ, ব্যাকুল মিনতি প্রহরিগণ গ্রাহ্যই করিবে না। পিপাসায় ছাতি ফাটিবে। পাষাণ-হৃদয় প্রহরিগণ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত পানি পান করিতে দিবে। পাপিগণ তাহা পিযুষ ভাবিয়া ব্যাগ্রভাবে হাত বাড়াইবে- জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে, তবুও প্রাণ বাহির হইবে না। বন্ধু! সে পথ চলার পথ নহে, সে পথ সর্বদা বর্জনীয়। সর্বদা সেই পথের পাথেয় সংগ্রহে বিরত থাকিবে। আল্লাহ্‌র আদেশ অবহেলা, রসূলের উপদেশ উপেক্ষা, হিংসা-দ্বেষ, ক্রোধ- লোভ, ব্যভিচার-অত্যাচার প্রভৃতি সর্ববিধ পাপাচার সেই পথের পাথেয়।"

হারিস তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। পাপ-পুণ্যের এত কথা ইতিপূর্বে কখনও ত শোনে নই। পাপের ভয়াবহ পরিণাম ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল, কাঁদিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে আরফান মেহ্‌মানের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে অপর গৃহে গমন করিলেন। হাবিব রৌদ্রে ছড়ান খেজুরের আঁটিগুলো তুলিয়া ভাঙিবার মনস্থ করিল। এমন সময় আঙ্গিনায় এক দীর্ঘাকৃতি নারীমূর্তির আবির্ভাব।

হাবিব যুবতীকে দেখিবামাত্র নিকটে আসিয়া বলিল, "আরে সালেহা যে! তুমি এ বাড়ীতে! এখানে কেউ ত আসে না! কি মনে করে প্রিয়তমে?" হাবিব সালেহাকে ভালবাসিত, কৈশরাবধিই উভয়ের প্রণয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যের অশনিপাতে বন্দী হইয়াছিল দুইজনই।

সালেহা হাসিয়া বলিল, "এসেছি পিরিতির জ্বালায়। কেন, ভুলে গেছ নাকি পুরনো কথা?"

"সে সব মধুর স্মৃতি কি ভোলা যায় প্রিয়ে? আমি আযাদী পেয়েছি বটে, কিন্তু তুমি যে বন্দিনী। মিলন কি করে সম্ভব হবে বল? তা ছাড়া আমি যে মুসলমান। আর কি তুমি পিয়ার করবে আমাকে?"

"কেন, সালেহা বুঝি মুসলমান হতে জানে না! শুধু জালিমের ঘরে বন্দিনী, তাইতেই না! থাক সে কথা। এখন ত আর প্রেমের জ্বালায় আসিনি, এসেছি প্রাণের ভয়ে। একজন মুসাফিরকে দেখেছ এদিকে? গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান মরদ, পিঠে দফ্। বাইরে যে তার ঘোড়া দেখে এলাম।"

হাবিব আরফানের ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "ব্যাপার কি গো সুন্দরী, নয়া মাশুক নাকি?"

''কেন, হিংসে হচ্ছে বুঝি? পুরুষ মানুষের স্বভাবই ত এই। নিজে যত খুশি প্রেম কর দোষ নাই; আমরা একটু এদিক-ওদিক চাইলেই সর্বনাশ!" এই বলিয়া স্মিতহাস্যে তাহার দিকে আড়চোখে চাহিয়া ধীরে ধীরে সে পা বাড়াইল আরফানের ঘরের দিকে। হাবিব ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

হারিস ছায়াদের বাড়ীতে দুই একবার দেখিয়াছিল এই শীর্ণা যুবতীকে। এইবার দেখিবামাত্র চিনিল-বাঁদী সালেহা। মুসাফিরকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল, "জনাব! গাঁ-ময় আপনাকে কত যে খুঁজেছি। আপনি দুঃখিনী নার্গিসের কপালে আগুন জ্বালিয়ে এসেছেন, ফিরে না গেলে বেচারী যে প্রাণে বাঁচে না। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এক্ষণি! চলুন, আমার মনিবের বাড়ী!"

হারিসের মনে পড়িল, সে বাড়ী থেকে তাহার বিদায়কালে নার্গিসের কাতর চাহনি। বেচারা মনে মনে বড় অস্বস্তিই বোধ করিতে লাগিল। বুঝিল, নার্গিস তাহাকে ভালবাসে, সে চলিয়া আসায় বিরহবিধূরা যুবতী হয়তো বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায়। বলিল, " বোন সালেহা! আমি তো তাকে বলে

এসেছি–কর্তব্যের আহ্বানে আমাকে যেতে হবে, অন্যত্র ফেরার আর উপায় নেই।”

সালেহা উত্তর করিল, ‘‘জনাব! উপায় আপনাকে করতেই হবে; নতুবা অভাগিনী যে প্রাণে বাঁচে না।”

হারিস বলিল, “বুঝেছি, সে আমাকে ভালবাসে; কিন্তু শাদী করা ত সম্ভব নয় সালেহা। আমি মুসাফির, বের হয়েছি কাজের তাড়ায়, তার সঙ্গে মিলনের সুযোগ কোথায়! বিশেষত সে বন্দিনী।”

সালেহা বিরক্তির সুরে বলিল, ‘ছাই বুঝেছেন, একটু আসুন এদিকে।” এই বলিয়া সে হারিসকে একটু আড়ালে গিয়া বলিল, “জনাব! নার্গিসের কথা বলছি না। আপনার যে খুশ–নসীব! গৃহস্বামীর কন্যা জুলায়খা আপনাকে ভালবাসেন। তিনিই ত পাঠিয়েছেন আমাকে, আপনাকে খুঁজে নিয়ে যেতে? এবার বুঝেছেন?”

হারিস বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া বলিল, “জুলায়খা ভালবাসে আমাকে! তবে যে বললে নার্গিস মরতে বসেছে?”

সালেহা উত্তর করিল, “হাঁ, ঠিকই বলছি, তবে প্রেমের জ্বালায় নয়– দেহের যন্ত্রণায়। হতভাগীর প্রেমের জ্বালা আছে কিনা জানি না, কিন্তু প্রহারের ব্যথায় বেচারী আজ অচেতন, আধমরা!” সালেহা নার্গিসের দুর্ভাগ্যের কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনাকরিল।

হারিস আর স্থির থাকিতে পারিল না। নিরীহ, নিরপরাধা নারীর দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার অন্তর বেদনায় জর্জর। ভাবিয়া দেখিল, আরফানের যে অবস্থা তাহাতে তাঁহার সাহায্যে হাবিলকে উদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব। তাহার মুক্তির অন্য উপায় খুঁজিতে হইবে, সর্বোপরি নার্গিসের বিপদে সাহায্য করা আশু প্রয়োজন। অবিলম্বে সে আরফানের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ছায়াদের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

যাইবার কালে সালেহা হাবিবের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,“সন্দেহটা কেটেছে সাহেব? বাঁদী হয়েছি বলে অত যেন ছোট মনে করো না। সালেহা একবার যাকে ভালবেসেছে ওমরভর তাকে ভুলতে পারবে না।” হাবিব লজ্জায় অধোবদন হইল।

ছাপ্পান্ন

সেই রাত্রেও ছায়াদের শরাবখানায় নৃত্যগীতের আসর বেশ জমজমাট। পানোন্মত্ত নরনারিগণ এক অপূর্ব আনন্দ-লহরীতে নিমগ্ন। গায়ক হারিসেরও ডাক পড়িয়াছে মদ্যশালায়। শত আপত্তি উথাপন করিয়াও গৃহস্বামীর অনুরোধ-উপরোধ কিছুতেই সে এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু কি গান গাহিবে সে? তাহার প্রাণে অনুশোচনার যে বহ্নিশিখা আরফানের বাড়ীতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অশ্লীল প্রেম-সঙ্গীত গাহিবার প্রবৃত্তি যেন একেবারেই দমাইয়া দিয়াছে। অথচ সেই সব প্রণয়-গীতিই যে আসরের লোকদের একমাত্র কাম্য।

অধিক রাত্রে গৃহস্বামীর অনুরোধে হারিস একখানা প্রাচীন সঙ্গীত শুরু করিল। বড় করুণ গীতিকা। গানে গানে দুঃখী জনের ব্যথার কাহিনী সে বর্ণনা করিল, পাপ-পুণ্যের পরিণাম গাহিয়া ছন্দ-গাঁথায় ফুটাইয়া তুলিল দোযখের বিভীষিকা। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল গ্রামবাসীদের ভোগলিপ্সু অন্তরে সে গান কোন সাড়া দিল না। লম্পট যুবকদের লালসাপ্রবণ হৃদয়ে সে গান বড় বেসুরো ঠেকিল। রসভঙ্গ হওয়ায় সভায় শুরু হইল তুমুল শোরগোল। সুরামত্ত নর-নারীদের কেহ কেহ গায়ককে বিদ্রুপ করিয়া গালাগালি দিতে লাগিল অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায়, কেহ কেহ তাহাকে মদিনার মুসলমানদের গুপ্তচর ভাবিয়া সঠিক পরিচয় লইতে আগাইয়া আসিল।

কিন্তু সে গান নার্গিস, সালেহা ও অন্যান্য কয়েকজন নির্যাতিত নর-নারীর অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। গান শুনিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল তাহাদের গণ্ড বাহিয়া। নিকটে জুলায়খা ও ছায়াদ-পত্নী উপবিষ্টা। সে গান কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে সঞ্চার করিল নিদারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা। বিরক্তিভরে ভ্রুকুটি করিয়া উভয়ে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। জুলায়খা মনে মনে ভাবিলেন, 'লোকটা বাতুল, আস্ত গর্দভ, গণ্ডমূর্খ, মিছামিছিই কাঁচের চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম। কালই ইহাকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইতে হইবে।'

উত্তেজিত কণ্ঠের বিদ্রূপ–ধ্বনির মধ্যে শেষ হইল হারিসের গান। শ্রোতৃবর্গ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নর্তকিগণ আবার নাচগান শুরু করিয়া ভাঙা আসর জমাইয়া তুলিতে ব্যস্ত, এমন সময় অশ্বারোহণে আবূ মূসা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কয়েকজন সঙ্গীসহ সভাস্থলে ছুটিয়া আসিলেন। এই অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আবূ মূসা ও তাঁহার সঙ্গীদের যোদ্ধৃবেশে দেখিয়া সকলে অবাক, কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

আবূ মূসা বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'বন্ধুগণ! নাচ–গান বন্ধ কর! সম্মুখে ঘোর বিপদ! বছরের পর বছর ধরে আমরা মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার–অবিচার চালিয়ে আসছি, আজ বুঝি তার ফল ভোগ করতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মদিনা থেকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে এসেছেন মাত্র দিনের পথ–মার উজ্জাহরানের প্রান্তর ভূমিতে মুসলমান সৈন্যগণ গতরাত্রে ছাউনি ফেলেছিল। এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই মক্কার কাছাকাছি এসে পৌছেছে। গতরাত্রে আবু সুফিয়ান স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, সেই ময়দানে প্রজ্বলিত রয়েছে সহস্র সহস্র অগ্নিকুণ্ড। তোমরা অবিলম্বে প্রস্তুত হও যুদ্ধের জন্য। আমি শুনে আসি দলপতি আবূ সুফিয়ানের কি হুকুম। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তোমরা কিন্তু এই স্থানেই অপেক্ষা করবে।' এই বলিয়া আবূ মূসা সদলবলে ছুটিলেন আবূ সুফিয়ানের গৃহে।

অকস্মাৎ এক প্রবল ঝঞ্ঝাবর্ত সমস্ত সৃষ্টি যেন আলোড়ন করিয়া তুলিল। নিমেষমধ্যে যুবকগণ যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইতে দিগ্‌বিদিকে ছুটিল। চারিদিকে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা, প্রবল উদ্দীপনা। সকলের অন্তর নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলের মুখেই এক কথা–আর বুঝি রক্ষা নাই, এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ মুসলমানগণ আজ কড়ায়–কড়ায় আদায় করিয়া লইবে। দেখিতে দেখিতে নারী ও শিশুদের ক্রন্দনরোলে সমগ্র পল্লী ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

নাচের আসর যেন পিশাচের তাণ্ডবনৃত্যে লণ্ডভণ্ড। পুরুষগণ পানপাত্রগুলো দূরে নিক্ষেপ করিয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিল, সুন্দরী বাইজীদের প্রতি একবার কেহ তাকাইয়াও দেখিল না। নর্তকিগণ আপন আপন প্রেমিক পুরুষদের হাত ধরিয়া বড় করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল, 'ওগো, কী হবে! কোথায় পালাই!

বেরসিক মুসলমানেরা আমাদের ত মেরেই ফেলবে! কোথায় আশ্রয় নেব? বল না কোথায় যাব?'

কিন্তু পুরুষদের সে মিনতি শুনিবার অবকাশ কই? সকলেই তখন আপন আপন প্রাণ লইয়া ছুটাছুটিতে ব্যস্ত। তাহারা ক্রন্দনশীলা প্রেয়সীদের হাত ছাড়াইয়া, ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পালাইবার পথ করিয়া লইল।

দেখিতে দেখিতে পল্লীর যুবক- প্রৌঢ় সকলেই নানাবিধ রণসাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে সমবেত হইল শরাবখানার চত্বরে। পার্শ্ববর্তী আল-জবিল গ্রামের যোদ্ধারাও ইতিমধ্যে বর্শা ও তরবারি হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত। সমগ্র মক্কা মোয়াজ্জমায় ও চারিদিকের গ্রামগুলোতে কেবল সাজ সাজ রব। দেখিতে দেখিতে অশ্বের হ্রেষারবে, ক্ষুরধ্বনিতে এবং সৈনিকদের হুঙ্কারে, নিস্তব্ধ নৈশ গগন মুখরিত হইয়া উঠিল। ধাবমান সৈনিকদের হস্তে প্রজ্বলিত মশালগুলো যেন অগণিত পুচ্ছতারকার ন্যায় প্রতিভাত।

কতক্ষণ পরে আবু মূসা পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া আসিলে সৈনিকগণ তাহাকে ঘিরিয়া লইল। আবূ মূসা উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'বন্ধুগণ! যুদ্ধ করা বৃথা, মুসলমানগণ সংখ্যায় অগণিত। কার সাধ্য তাদের গতিরোধ করে! ক্ষান্ত হোন।'

হাইফা গ্রামের দলপতি আবূ তালহা ক্রোধে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আবূ মূসা! তুমি না বীর-যোদ্ধা! তোমার মুখে এ-কথা! কাপুরুষের ন্যায় মরবো? কেন, আমরা কি যুদ্ধ করতে জানি না? বাহুবলে আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করবো, স্বধর্ম রক্ষা করবো। কেন তুমি বারণ করছো যুদ্ধ করতে? আজীবন কঠোর হস্তে মুসলমানদের দলন করে আজ কিনা আত্মসমর্পণ করবো বিনাযুদ্ধে।'

হাম্মাদ নামক এক যুবক চিৎকার করিয়া উঠিল, 'আবূ মূসা! ভুলে গেছ, ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের আমরা কিভাবে হত্যা করেছিলাম? ভুলে গেছ, বীরাঙ্গনা হিন্দা কিভাবে মুসলমান হামজার বুক চিরে কলিজা খেয়েছিল চিবিয়ে? কিভাবে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে, মালার ন্যায় গলায় জড়ায়ে নৃত্য করেছিল বিজয়িনীর বেশে'।

আবূ তালহা ও সমবেত যোদ্ধাদের নিবৃত্ত করিতে আবূ মূসা বলিলেন, 'বন্ধুগণ! শান্ত হোন, ধৈর্য ধরুন, অনর্থক উত্তেজিত হয়ে বিপদ ডেকে আনবেন না।

মুসলমানগণ সংখ্যায় আজ নগণ্য নয়। রাত্রে মুসলমান শিবিরে অগণিত মশাল দেখে সেনাপতি আবূ সুফিয়ান বুঝেছেন, লক্ষ লক্ষ সৈন্য মক্কার দ্বারদেশে এসে পৌঁছেছে। সেনাপতি লাভ–ক্ষতি বেশ ভালভাবেই খতিয়ে দেখেছেন। অগ্র–পশ্চাৎ ভেবেই তিনি আদেশ দিয়েছেন– অবিলম্বে অস্ত্র ত্যাগ করে বন্ধ করতে হবে অনর্থক লোকক্ষয়।'

আবূ সুফিয়ান যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন শুনিয়া জনতার মর্মযাতনার অবধি নাই। সকলের নৈরাশ্যপূর্ণ অন্তরের নিদারুণ অসন্তোষ মৃদু গুঞ্জনের সুরে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। আবূ তালহা হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ' সেনাপতি কেন যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক?'

আবূ মূসা উত্তরে বলিলেন, 'তিনি নাকি আল–আমিনের প্রতিশ্রুতি লাভ করেছেন– যাঁরা আবূ সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবেন, অথবা আপন আপন গৃহে দ্বার রুদ্ধ করে বসে থাকবেন, কিংবা পবিত্র কাবা গৃহে প্রবেশ করবেন, তারা নিশ্চয়ই রক্ষা পাবেন। আপনারা তাঁর হুকুম–মাফিক কাজ করুন। আর এক কথা– জেনে রাখুন, স্বয়ং আবূ সুফিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন মনস্থ করেছেন।

অনেকে সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, 'কী! আবূ সুফিয়ান ইসলাম কবুল করবেন! আমাদের দলপতি হবেন মুসলমান!' বিস্ময়ে তাহাদের আর বাক্য নিঃসরণ হয় না।

আবূ মূসা বলিলেন, 'হাঁ, তিনি বুঝতে পেরেছেন, দীর্ঘ বিশ বছর যে ধর্মকে জগতের বুক থেকে মুছে দেবার শত চেষ্টা করেও আমরা সফলকাম হইনি। অশেষ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে–ধর্ম উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করেছে, নিশ্চয়ই তা' সত্য ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রেরিত নবী। তিনি বিশ্বাস করেন, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলে হযরত আমাদের দীর্ঘকালের দুশমনি ভুলে যাবেন বিলকুল; তাছাড়া আবূ সুফিয়ান হযরতের সীমাহীন মহানুভবতা ও অতুলনীয় ক্ষমাগুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি চান, আপনারা তাঁর উপদেশ পালন করুন। আমাকে এখনই ছুটতে হবে চারিদিকে দলপতির এই আদেশগুলো প্রচার করতে।' এই বলিয়া আবূ মূসা পুনরায় অশ্বারোহণে ছুটিলেন।

চারিদিকে প্রথমে প্রবল উত্তেজনা, পরে নৈরাশ্যের হাহাকার। বহু বাদানুবাদের পর অবশেষে সকলে মানিয়া লইল, সেনাপতি আবূ সুফিয়ানের আদেশ-উপদেশ। তারপর শুরু হইল পলায়নের পালা। যে যেদিকে পারিল ছুটিল। সৈন্যগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ দৌড়াইল আবূ সুফিয়ানের গৃহাভিমুখে আত্মীয়-পরিজনসহ। কেহ ছুটিল কাবা শরীফে। বাকী সকলে অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া, হযরতের দয়ার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আপন আপন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করত ভিতরে বসিয়া রহিল সন্তান-সন্ততিসহ।

চতুর্দিকে তখন নিদারুণ বিশৃঙ্খলা। আতঙ্কগ্রস্ত নরনারীর দল দিশাহারা হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সকলের অন্তরেই স্থির বিশ্বাস- কাহারও আজ রক্ষা নাই, জীবনের শেষ দিন বুঝি ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হারিস চিন্তা করিয়া দেখিল, হাবিল ও নার্গিসকে লইয়া পালাইবার ইহাই ত সুবর্ণ সুযোগ; কিন্তু কোথায় তাহাদের সন্ধান মিলিবে? কে জানে তাহারা নিজেরাই হয়তো বা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছে।

হারিস দফ্‌খানি লইবার ছলনায় তাহার থাকিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, ঘরে আলো নাই; অন্ধকারে হাতড়াইয়া দফ্‌খানি খুঁজিতে খুঁজিতে সে গৃহকোণে এক মনুষ্যদেহ স্পর্শ করিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল, কে ও?'

কম্পিত স্বরে উত্তর আসিল, 'আমি নার্গিস। কে আপনি? মুসাফির?'

হারিসের প্রাণ পুলকে ভরিয়া উঠিল। চুপি চুপি বলিল, 'আরে নার্গিস এসেছ? বড় ভাল হয়েছে। তুমি কি একা?'

নার্গিস। না, সালেহাও সঙ্গে আছে। কি করি, কোথায় যাই, কিছুই ত বুঝতে পারছি না। আজ বুঝি প্রাণটাই যাবে বেঘোরে।

হারিস। নার্গিস! পালাবার এমন সুযোগ আর পাবে না। গ্রহণ করবে কি এ সুযোগ? যাবে কি আমার স ঙ্গে?

নার্গিস। আমরা ত যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি, জনাব বসে রয়েছি শুধু আপনার প্রতীক্ষায়। কিন্তু যাব কোন চুলোয়?

হারিস। তুমি ত যাবে আমারই সঙ্গে, কিন্তু সালেহা?

সালেহা। দয়া করে সামনের ঐ পাহাড় দু'টা যদি পার করে দেন, তবে যাব আল–জবিলে। সেখানে আরফানের বাড়ীতে গিয়ে আমার হাবিবের আশ্রয় নেব।

হারিস। তবে এক কাজ কর! তাড়াতাড়ি তোমরা হাবিলকে খুঁজে বের করে আন। জলদি যাও। বিলম্বে কিন্তু পণ্ড হবে সব।

নার্গিস ও সালেহা কালবিলম্ব না করিয়া হাবিলের খোঁজে বাহির হইল। কতক্ষণ পরে হারিস দফ্‌খানি পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া পালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেই গৃহমধ্যে এক কালো ছায়ার আবির্ভাব হইল। সে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে ও? হাবিল?'

নারীকণ্ঠের ফিসফিস স্বরে উত্তর আসিল, 'না না, আমরাই দু'জন।'

'হাবিল কোথায়?'

নার্গিস উৎকন্ঠার সুরে উত্তর করিল, 'অনেক খোঁজাখুঁজির পর নির্বোধকে আবিষ্কার করেছি এক খেজুর গাছের মাথায়।'

'এখানে আনলে না?'

'না, ধরা পড়ার ভয়ে আনি নি, চারদিকেই যে মানুষের ছুটাছুটি, হৈ–হল্লা আর চেঁচামেচি! লুকিয়ে রেখেছি সেই খেজুর বাগানেই এবার চলুন।'

অবিলম্বে তিনজন একই সঙ্গে যাত্রা করিল হাবিলের সন্ধানে।

ছোট খেজুর বাগান– তলদেশে ছাড়াছাড়া আঙুর ও জাফরানের ঝোঁপ। নার্গিসের ডাক শুনিয়া হাবিল এক খেজুর গাছের মাথায় ডালপালার ভিতর হইতে তরতর করিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

হারিস বলিল, 'কি হাবিল! আমি তোমাকে খুঁজে মরছি এখানে– ওখানে, আর তুমি কিনা বসে রয়েছ আসমানে!'

হাবিল গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, 'সাধ করে কি গাছে উঠেছিলাম? পালাচ্ছিলাম ত এই পথে, এমন সময় দেখি কিনা মনিব মশাল নিয়ে ছুটে আসছে

এ দিকেই। নিকটে কোন জঙ্গল ছিল না, ধরা পড়ার ভয়ে সম্মুখে যে গাছটা পেলাম, তারই মাথায় উঠে পড়লাম সড়সড় করে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম চারদিক থেকে পাতার খোঁচায়। এই সুযোগে কতকগুলো কাঠপিঁপড়েও কামড়ে দিয়েছে বেশ করে। এই দেখ না, সর্বাঙ্গ লালে লাল, একেবারে ফুলে উঠেছে; আর এগুলো সব কাঁটার খোঁচা।'

হাবিলের বিপদের কথা শুনিয়া এই দুঃসময়েও নার্গিস ও সালেহা মুখে কাপড় গুজিয়া হাসিতে লাগিল। হাবিল কট্‌মট করিয়া চাহিয়া বলিল, 'তোমাদের বুঝি খুশী লাগছে খুব?'

নার্গিস হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ভাগ্যিস্ আমি এসেছিলাম এদিকে, নইলে ত তোমাকে পোকা-মাকড়েই খেত! আমিই তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি।'

'আমার সঙ্গে এই পথে এস।' এই বলিয়া হারিস ঘুরিয়া সম্মুখে পা বাড়াইতে যাইবে, এমন সময় পশ্চাতে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'থাম, শয়তান! আর এক পা অগ্রসর হবি ত এখনই কতল করবো সবাইকে! নিমকহারাম মুনাফিক! মুসাফিরের বেশে চুরি করতে এসেছিলে আমার এই গোলাম-বাঁদীদের? সুযোগ নিয়েছিলে আমাদের এই দুর্দিনের?'

সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখে-গৃহস্বামী ছায়াদ উন্মুক্ত তরবারি সম্মুখে দণ্ডায়মান-যেন মূর্তিমান আজরাঈল। তাঁহার দুই চোখ হইতে আগুন যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম। ভয়ে প্রত্যেকের গলা শুকাইয়া কাঠ; পাগুলো যেন পুঁতিয়া গিয়াছে মাটিতে। নার্গিস ও সালেহা থরথর কম্পমান। কাপড়ের পুঁটলিগুলো তাহাদের হাত হইতে আচম্বিতে খসিয়া পড়িয়াছে ভূতলে।

হারিসের মুখে ভাষা নাই। হাবিল সাহসে ভর করিয়া উত্তর দিল, 'দুশমন এসেছে খবর পেয়ে আমরা প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম এই বাগানে। কোথাও ত পালাই নি।'

ছায়াদ গর্জন করিয়া উঠিলেন, 'মিথ্যে কথা! আশ্রয় নেবার জায়গা এটা নয়। আয় আমার সঙ্গে, নিমকহারামের দল! সাবধান! এক পা এদিক-ওদিক যাবি ত

এখনই সকলকে হত্যা করবো।” এই বলিয়া সকলকে আগে বাড়িতে নির্দেশ দিয়া ছায়াদ তাহাদের পিছনে পিছনে তলোয়ার উঁচাইয়া বাড়ীর দিকে পা বাড়াইলেন।

নিদারুণ ভয় ও হতাশায় প্রত্যেকের অন্তরাত্মা দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পালাইবার উপক্রম। নিঃশব্দে, অবনত মস্তকে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় সকলে ছায়াদের আগে আগে চলিল।

বহির্বাটিতে পৌঁছিয়া গৃহস্বামী সকলকে মদ্যশালার এক কামরায় আবদ্ধ করিলেন। শক্ত কাষ্ঠনির্মিত অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। কক্ষমধ্যস্থ মদ্য ও পচা ময়লা-জঞ্জালের দুর্গন্ধে বন্দীদের দম বুঝি আটকাইয়া যায়।

কঠিন কাষ্ঠদ্বার সশব্দে বাহির হইতে উত্তমরূপে বন্ধ করিতে করিতে ক্রোধান্ধ ছায়াদ চিৎকার করিয়া বলিলেন, “নিমকহারাম মুসাফির! হারামি নফর-নফরানী! রাতটুকু তোরা এই প্রাসাদে উপভোগ কর। প্রত্যূষেই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার মিলবে। আমি স্বহস্তে সকলের শিরশ্ছেদ করে অন্তরের জ্বালা মেটাব! নিমক হারামীর মজা কার বুঝাব!”

এই বলিয়া ছায়াদ রাগে তর্জন গর্জন করিতে করিতে ত্রস্তপদে অন্তর্বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

ক্রোধোন্মত্ত গৃহস্বামীর কঠোর দণ্ডাজ্ঞা শুনিবামাত্র নার্গিস ও সালেহা চিৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

হারিসের অন্তর নিদারুণ নৈরাশ্য ও অনুশোচনায় দলিত-মথিত। দুই হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া সে আকুলভাবে দয়াময় আল্লাহ্‌র করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

বেদুঈন হাবিল অন্ধকার কারাকক্ষের প্রাচীর হাতড়াইয়া দ্বার ঠেলিয়া, মুক্তির উপায় খুঁজিতে ব্যস্ত, দেয়ালের কাঠের টুকরাগুলো ভাঙিবার ব্যর্থ চেষ্টাও করিয়াছে কয়েকবার। দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া সে হারিস, নার্গিস ও সালেহাকে অনেক গালাগালি করিল। তাহার এই দুর্ভাগ্যের জন্য তাহাদের সকলকেই সে দায়ী করিল একে একে। অবশেষে বিষণ্ন ও অবসন্ন হাবিল হতাশ-হৃদয়ে কক্ষতলে বসিয়া পড়িল। সেই পুতিগন্ধময় অপরিসর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অসহায় চারিটি নরনারী ক্ষণে ক্ষণে কেবলই অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া হা-হুতাশ করিতে করিতে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

সাতান্ন

সুখের নিশি পোহায়, যথাসময়ে দুর্ভাগ্য রজনীও প্রভাত হইয়া আসে। সময় কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। কেহ সুখে থাকুক বা দুঃখে থাকুক, কালের কিছুই আসে যায় না। সে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে কাজ করিয়া যাইবে ঠিক হুকুম মাফিক। কেহ পার্থিব সুখ-সম্পদ ও অফুরন্ত আনন্দের অধিকারী হইয়া যদি ভাবিয়া থাকে-এ সুখ তাহার চিরস্থায়ী, তবে সে নির্বোধ। কেহ দুঃখী। দুঃখের জ্বালা সহিতে না পারিয়া অদৃষ্টকে যদি ধিক্‌কার দিতে দিতে মনে মনে ভাবে, তাহার যাতনার অমানিশা আর বুঝি পোহাইবে না, তবে সেও মহামূর্খ। কাল তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া শুধু হাসিবে। হাসিতে হাসিতে অঙ্গুলি-হেলনে ভাগ্যচক্র কখন যে ঘুরাইয়া দিবে, তাহা সে টেরও পাইবে না।

দুর্ভাগ্যের পীড়নে ও অনুশোচনার বৃশ্চিক-দংশনে অস্থির হইয়া হারিস, হাবিল ও তাহাদের সঙ্গিনিগণ মনে মনে ভাবিল, "আহা! এই আমাদের শেষ রজনী। এ রজনী যদি অনন্তকাল দীর্ঘ হইত! যদি এ আর না পোহাইত!"

কিন্তু রজনী প্রভাত হইল। ক্রমে প্রভাত-আলোর রজত-ধবল ঋজু-রেখা কাষ্ঠ-প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে কারাকক্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। সকলে ভাবিয়া অস্থির-এইবার গৃহস্বামী তলোয়ার হস্তে বন্দীশালার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে, একে একে সকলকে টানিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিবে। ঐ যে বাহিরে কাহার পদধবনি শোনা যায়! ঐ বুঝি আসিল! দেয়ালের গা ঘেঁষিয়া সকলে আধমরা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর বেদনাময় প্রতীক্ষায়। প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ড ও পদদ্বয় তখন থর থর কম্পমান।

আহা! বাঁচা গেল, মনুষ্য নয়। বেড়ার ফাঁক দিয়া তারা দেখিতে পায়, একটা উষ্ট্র শরাবখানার গা ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইতেছে সোজা উত্তরে। সকলে আপাতত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

হারিস চাহিয়া দেখে, হাবিল আবার দেয়ালের কাষ্ঠখণ্ড ভাঙিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে–হস্তদ্বয় রক্তাক্ত; কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। সে বলিল, "হাবিল! বৃথা কেন কষ্ট করে মরছো? আজরাঈল পিছনে দাঁড়িয়ে তোমার কাণ্ড দেখে কেবল হাসছে। এ সময়ে একবার দয়াময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।"

হাবিল ক্ষেপিয়া উঠিল। উন্মত্তের ন্যায় এক লম্ফে সে হারিসের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রহারে প্রহারে আধমরা করিয়া বলিল, "তুই–ই যত সব অনিষ্টের মুল। আমি একা একা ঠিক পালাতে পারতাম। কেন মিছে আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলি? কেনই বা তুই বাগানে এসেছিলি? আজ মরার আগে তোকে খুন করে মনের খেদ মেটাব।"

হারিস বাঁধা দিল না। আজ আর তাহার কৈফিয়ত দিবার কিছু নাই। ভাগ্য বিরূপ হইলে পরম বন্ধুও যে শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। হারিসের স্থূল দেহের উপর হাবিল অন্তরের যত জ্বালা মিটাইতে লাগিল। নার্গিস ও সালেহা শেষে অতি কষ্টে হাবিলকে টানিয়া সরায়।

হারিস হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "ভাই হাবিল! মৃত্যুর হাত থেকে কারো আজ পরিত্রাণ নাই। অদৃষ্টলিপি কেউ আমরা খণ্ডাতে পারব না। মিছেমিছি কেন পণ্ডশ্রম করলে? আজরাঈল প্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে, শুধু নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায়! এই রে, এই এল বুঝি! ইয়া আল্লাহ্! ইয়া সাত্তার! ইয়া রহমান!"

সত্য সত্যই মদ্যশালার বাহিরে দেখা গেল লোক সমাগম। বন্দীদের হৃৎপিণ্ড তখন দ্রুত ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফাটিবার উপক্রম। প্রত্যেকের আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত, সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক যেন প্রবহমান। কাষ্ঠপ্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া নারীযুগল করুণ আর্তনাদ সহকারে বাত্যাহত পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

জনতার শোরগোল ছাপাইয়া যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ সকলের শ্রুতিগোচর হইল, তাহা গৃহস্বামী ছায়াদের। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি গর্জন করিতেছেন, "সেই গায়ক মুসাফির! যাকে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। নিমকহারাম উট কেনার ছল করে

সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। গত রাতের অস্বস্তির সুযোগে পালাচ্ছিল আমার নফর ও দুই বাঁদীকে নিয়ে।"

কে একজন বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই সে মদীনার গুপ্তচর, নইলে জানলো কি করে মুসলমানদের হামলার খবর? ওই নফর ও মাগী দুইটা তারই অনুচর। এরা আমাদের দুশমন। সাজা দিতে হবে সব ক'টাকে।"

সকলে সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "এখনই সব ক'টার গর্দান লও, শয়তানগুলোকে সাবাড় কর।"

ছায়াদ কুপিত স্বরে পুনরায় বলিলেন, "দুশমন ঘরের দুয়ারে। আজ আর কেউ হয়তো রক্ষা পাব না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে চল সব ক'টাকে কতল করে মক্কা অভিযানের প্রতিশোধ নিই।"

সকলে "বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা কর, নিমকহারামদের কতল কর" – চিৎকার করিতে করিতে উদ্যত অসিহস্তে মদ্যশালার দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইল। সেই চিৎকার শুনিয়া কারাকক্ষে বন্দিনী, ভূলুণ্ঠিতা নার্গিস ও সালেহা চেতনা হারাইবার উপক্রম। হাবিল পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতে বকিতে মাথার কেশগুচ্ছ কেবল টানিয়া ছিঁড়িতেছে বারবার। হারিস দিশাহারা হইয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল, "ইয়া আল্লাহ্, তুমি রক্ষা কর! মা'বুদ! তুমি রক্ষা করা!"

ঠিক সেই মুহূর্তে আবূ মুসা অশ্বপৃষ্ঠে কোথা হইতে যেন ছুটিয়া আসিলেন। শরাবখানার সম্মুখে উদ্যত অসিহস্তে এক উন্মত্ত জনতা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, মুসলমান সৈন্যদের আক্রমণ করিতে তাহারা বুঝি প্রস্তুত হইতেছে। আবূ মূসা সকলকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হে কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধের দল! তোমাদের কি দলপতি আবূ সুফিয়ানের হুকুমগুলো শোনাই নি? তোমাদের কি অস্ত্র ত্যাগ করে গৃহমধ্যে আশ্রয় নিতে বলি নি? কোন্ সাহসে তবে বের হয়ে এসেছ? পারবে কি অগণতি মুসলমান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে? শোননি, মুসলমানগণ পঙ্গপালের ন্যায় মক্কা নগরীতে ছড়িয়ে পড়েছে? ঐ শোন, 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি? এখনই যে তারা এ দিকেই আসবে। শোননি, আঁ–হযরত (সঃ) কা'বা মন্দিরে প্রবেশ করে সবগুলো দেবদেবীর মূর্তি টুকরো টুকরো করেছেন? শোননি' দলে দলে কুরাইশগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন? ধর্ম গ্রহণে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, জোর–জুলুম নেই, পীড়াপীড়ি নেই। যদি তোমরা মনে প্রাণে

ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে থাক, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝে থাক, তবে তোমরাও ইসলাম কবুল করতে পার–হযরতের এই উপদেশ। ইসলাম গ্রহণ না করলেও তোমরা আলা–হযরত (সঃ)–এর দয়া, হযরতের ক্ষমা, হযরতের ন্যায়বিচার হ'তে কিছুমাত্র বঞ্চিত হবে না। ঐ বুঝি সব এসে পড়েছে! ঐ শোন, 'আল্লাহু আক্‌বর' ধ্বনি। শিগগির পালাও! পালাও বলছি!"

আবূ মূসা এই বলিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। ছায়াদ ও তাহার সঙ্গিগণ তখন পালাইবার পথ পায় না। মৃত্যুভয়ে সকলে দিশাহারা হইয়া স্ত্রী–পুত্রাদিসহ আপন আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। হঠাৎ চারিদিকে সমস্বরে 'আল্লাহ্ আক্‌বর' ধ্বনি শুনিয়া হারিসের মুর্দা দিল যেন জিন্দা হইয়া উঠিল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নার্গিস ও সালেহাকে টানিয়া তুলিতে তুলিতে সে বলিল, "নার্গিস! ভয় নেই আর। সালেহা! ভয় করো না আর। ঐ বুঝি আল্লাহ্‌র রহমত পৌঁছেছে, ঐ শোন, মুসলমানগণ মক্কা–পাক জয় করেছেন। ওঠ, অল্লাহর গুণগান কর, শোকর গুজারী কর। দেখ্‌লে, আল্লাহ্‌র অপার মহিমা? দেখলে, মিথ্যার ধ্বংস আর সত্যের জয়? ভাই হাবিল! আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে এখনো কি অবিশ্বাস করতে পার? প্রিয়তমা নার্গিস! ভগ্নী সালেহা! আমি ত ইসলাম গ্রহণ করেছি অনেক আগেই। তোমাদের কি এখন আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাস জন্মেছে? আখেরাতের ভয় হয়েছে? কি ভাই হাবিল! কি বল তুমি?"

নার্গিস বলিল, "আমি ত জনাব বহু পূর্বেই ইসলামে ঈমান এনেছি। কিন্তু এতদিন তা প্রকাশ করার সাহস পাইনি। আজ প্রকাশ্যে মনে প্রাণে ইসলাম কবুল করে ধন্য হলাম।"

সালেহা বলিল, "জনাব! আমিও মুসলমান, আমারও সে একই কথা। শুধু আমার কেন, অধিকাংশ মক্‌কাবাসীরই এটিই প্রাণের কথা। শুনেছি, আঁ–হযরত প্রথম ইসলাম প্রচার করার কালে কত যে কষ্ট সহ্য করেছিলেন। কত লাঞ্ছনা–গঞ্জনা মাথা পেতে নিয়েছিলেন! সত্যের সন্ধান না পেলে, কেউ কোনদিন কি এত লাঞ্ছনা–গঞ্জনা অম্লান বদনে সহ্য করে প্রতিদানে প্রাণহন্তা শত্রুকে এত মহানুভবতা এত উদারতা দেখাতে পারেন?"

হাবিল আনন্দ–গদগদ–চিত্তে বলিতে লাগিল, "ভাই মুসাফির! আপনার প্রতি বড় অন্যায় ব্যবহার করেছি। মার্জনা করুন। সত্যের আলো আজ আমার অন্তরেও প্রবেশ করেছে! আমিও ইসলামে বিশ্বাসী।"

আনন্দ–বিহবল হারিস চেঁচাইয়া উঠিল, "ভাই হাবিল! ভগিনী সালেহা! প্রিয়তমা নার্গিস! এস আমরা আজ এক সঙ্গে গাই আল্লাহ্ ও রসূলের না'ত। চল, সবে মিলে প্রচার করি আল্লাহ্‌র অপার মহিমা।'

হারিস কুরাইশ–হস্তে মরু–দুলাল মুহাম্মদ (সঃ)–এর নির্যাতন কাহিনী গানে গানে বর্ণনা করিতে লাগিল। সে গানের ধুয়া ধরিল হাবিল, নার্গিস ও সালেহা। বড় করুণ গীতিকা! গাহিতে গাহিতে সকলের নয়নে অঝোরে বহিল অশ্রুধারার প্লাবন।

ততক্ষণে মুসলমান সৈন্যগণ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে বীর বিক্রমে হাইফার নির্জন পল্লীতে প্রবেশ করিয়াছেন। বিনা রক্তপাতে তাঁহারা মক্কা মোয়াজ্জমা অধিকার করিয়া ক্রমে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন শহরের উপকণ্ঠে।

মুসলমান সৈন্যগণ পল্লীতে অগ্রসর হইতে হইতে ছায়াদের শরাবখানার ভিতরে আল্লাহ্ ও রসূলের না'ত শুনিয়া পরম আশ্চর্য বোধ করিলেন। এ দৃশ্য যে কল্পনাতীত! সেনানায়ক অশ্ববেগ সংহত করিয়া ডাকিলেন, "কে তোমরা ভিতরে? মুসলমান? যে–ই হও না কেন, বাহিরে এস নির্ভয়ে!"

কারাকক্ষ হইতে হারিস উত্তর করিল, "আমি জনাব মেহেরবান! আমরা মুসলমান, কুরাইশগণ আমাদের বন্দী করে রেখেছে। দয়া করে অধমদের প্রাণ রক্ষা করুন!"

সেনানায়ক সৈন্যদের সাহায্যে কারাকক্ষের দ্বার ভাঙিয়া বন্দীদের বাহিরে আনিলেন। সকলে চাহিয়া দেখেন–কয়েদীরা অশ্রুধারায় স্নাত, অন্তরের কালিমা ধুইয়া মুছিয়া বুঝি পরিষ্কার।

সেনানায়ক হাবিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইলেন। কতক্ষণ তাহার কোন বাক্য নিঃসরণই হইল না। দুই পা অগ্রসর হইয়া

তিনি হাবিলের স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপনপূর্বক চকিত স্বরে বলিলেন, "আরে কে ও ? হাবিল। তুমি কি কর এখানে?"

হাবিল মুখ তুলিয়া প্রশ্নকর্তাকে দেখিবামাত্র বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চিৎকার করিয়া উঠিল, "আরে ভাইজান যে! আপনি! আপনি এঁদের সেনাপতি!" এই বলিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে সে লুটাইয়া পড়িল। সেনানায়ক তাহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া মহানন্দে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'ভাই হাবিল! তুমি এখানে কিরূপে এলে বন্দী হয়েছিলে?"

হাবিল দুই চোখ মুছিয়া বলিল, "হাঁ ভাই! সেই যে কুরাইশদের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল, তাতেই বন্দী হয়েছিলাম। না জানি সুফিয়ার দশা কি হয়েছে! এই গায়ক হারিস আমাকে আযাদ করতে এসে বন্দী হয়েছে। এই দু'জন বন্দিনীও বড় নির্যাতিতা। আমাদের কি মুক্তি দেবেন ভাইজান? আমি ফিরে যাব সুফিয়ার কাছে।"

সেনানায়ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ ভাই! আল্লাহ্‌র রহমতে মুক্তি পাবে। কিন্তু যাবে কোথায়? তোমাদের অগ্নিদগ্ধ পল্লীর হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি। সে পল্লী কি আর আছে ভেবেছ?"

হারিস দুই পা অগ্রসর হইয়া সালাম করত বিনীত সুরে বলিল, "আপনি আমাদের প্রাণরক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে শান্তিদান করুন, সুখী করুন! আমি নিয়ে যাব হাবিলকে তাদের পল্লীতে।"

"শান্তি! সুখ! সে আমার অদৃষ্টের লেখা নয়। থাক সে কথা। কোথায় তাদের নতুন পল্লী?"

"দরিয়ার কিনারে ঈসের জঙ্গলের ধারে। সেখানে তার প্রেয়সী আধমরা হয়ে দিন কাটাচ্ছে তারই প্রতীক্ষায়।"

ঈসের জঙ্গল! সেই ঈসের জঙ্গল! সুফিয়া কি সেইখানেই থাকে? চল আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। এখানে আমার কর্তব্য শেষ। সেই জঙ্গলে যাব বলেই এসেছিলাম, কিন্তু মদীনা মনোয়ারায় পৌছেই দেখি এই যুদ্ধের আয়োজন। এখানে তোমরা খানিক অপেক্ষা কর, আমি বিদায় নিয়ে আসি সিপাহসালারকে বলে।"

এই বলিয়া তিনি সৈন্যদের শান্তভাবে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলেন।

নার্গিস ও সালেহা এইবার শুরু করিল কানাকানি। হারিস হাবিলের স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, "হাবিল! কে এই সেনানায়ক?"

হাবিল কাঁধের উপর হইতে হারিসের হাতখানি অবজ্ঞার সহিত ঠেলিয়া দিয়া গর্বভরে উত্তর করিল, "আপনি চিনবেন কিরূপে? ইনি রায়হান, আমার প্রেয়সী সুফিয়ার ভাই। দেখলেন ত কেমন বীর-পুরুষ!"

রায়হানের নাম শুনিবামাত্র হারিসের বুকের ভিতরে যেন ছুটিয়া গেল বিদ্যুৎ-প্রবাহ, আনন্দে মুখমণ্ডল তাহার সমুজ্জ্বল। কিন্তু তখন তখনই আবার উহা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। নিরাশ হইয়া সে ভাবিতে লাগিল—হাবিলের প্রেয়সীর ভাই? তবে ত ইনিও বেদুঈন। আর কুরাইশ আরফানের মুখে নিজ কানেই ত শুনে এসেছি- তাঁর ভাই রায়হান ইন্‌তিকাল করেছেন বহুদিন। কাজেই সে রায়হান ত হতেই পারে না।

হাবিলের আনন্দ আর ধরে না। সঙ্গীদের সে অভয় দান করিল, সিপাহীদের নিকটে গিয়া বুক ফুলাইয়া বলিল, "সেনানায়ক যে আমারই বড় কুটুম হে, আমার সুফিয়ার ভাই!" সৈন্যগণ ভয়ে ভয়ে সালাম জানাইল।

তারপর সে নার্গিসের নিকটে গিয়া বলিল, "নার্গিস! এবার তুই পথ দেখ্‌। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে হারিসের গলায়ই ঝুলে পড়। আমি চললাম সুফিয়ার সন্ধানে।" এই বলিয়া সে মনের আনন্দে শিষ দিতে দিতে পরিধেয় বসন ও কেশধাম ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিপাটি করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই রায়হান অপর একজন সেনানায়ককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সৈন্যদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "বন্ধুগণ! আমার স্থানে ইনি নিযুক্ত হয়েছেন আপনাদের রিসাল্‌দার, আমি আপাতত চললাম অন্যত্র। তারপর সদ্যমুক্ত নারীদের তিনি বলিলেন, "তোমরা এখন এই রিসাল্‌দার কাফুরের গৃহেই আশ্রয় পাবে। কয়দিন পরে আমি ফিরে এসে তোমাদের যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।"

অবিলম্বে আরও দুইটি অশ্ব আনা হইল। হারিস ও হাবিলকে সঙ্গে লইয়া রায়হান ঈসের বনাভিমুখে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

হারিস স্নেহভরে নার্গিসকে বলিল, 'নার্গিস! আমি আবার ফিরে আসবো এখানে এঁদের সঙ্গেই! তুমি নিশ্চিন্তে কিছুকাল অপেক্ষা কর রিসাল্‌দার কাফুরের গৃহে।' এই বলিয়া সে রোরুদ্যমান নার্গিসের প্রতি কাতর নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্বে আরোহণ করিল।

সেই মুহূর্তে আরও একজন অশ্বারোহী আসিল। রায়হান উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'আরে রাহেল এসেছ? তোমাকে ভাই কত যে খুঁজেছি! এখানকার কাজ ত প্রায় শেষই হয়েছে! সিপাহ্‌সালারের মুখে শুনে এসেছি মক্‌কা-বিজয় সমাপ্ত। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন বা কি? চল যাই এখনই ঈসের জঙ্গলে।'

রাহেল প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল।' বলিল। 'হাঁ, চলুন যাত্রা করি এখনই। পথ দীর্ঘ। বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তর, প্রস্তরময় পাহাড় মালভূমি পার হয়ে যেতে হবে একেবারে লোহিত সাগরের তটদেশে। কবে যে পৌছা যাবে কে জানে। এ দু'জন বুঝি সঙ্গী হবেন আমাদের?

রায়হান উত্তর করিলেন, 'হাঁ, এরাই আমাদের পথপ্রদর্শক। এই হাবিলকে ফিরিয়ে দেব তার প্রিয়জনের নিকটে, পরে এসে ও মেয়ে দু'টির মুক্তির ব্যবস্থা করবো। ঐ যুবক ঈসের জঙ্গলে যাবার সোজা পথের সন্ধান জানে।'

রাহেল হাবিলকে চিনিতে পারিল না। হারিসকে দেখিবামাত্র ভাসাভাসা মনে পড়িল কোথায় যেন তাহাকে দেখিয়াছে, মুখখানা কেমন চেনাচেনা। আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটিল কই; সায়ফুনের খোঁজে বাহির হইবার অদম্য আগ্রহে রায়হান অশ্বে কশাঘাত করিতে উদ্যত। হারিস কিন্তু রাহেলকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। পূর্বস্মৃতি স্মরণ হওয়ায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল নিদারুণ বিতৃষ্ণায়। মনে মনে ভাবিল এই লোকটিই তাহার উদ্ধারকর্ত্রীর পরম শত্রু, কিছুতেই তাহাকে সেই দয়াবতী রমণীর সন্ধান দেওয়া হইবে না। বাড়াবাড়ি করিলে ছলে-বলে বেদুঈন পল্লীতে নিয়া উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হারিস বুঝিতে পারিল না ঈসের জঙ্গলে সেনানায়ক রায়হানের কি প্রয়োজন। তাঁহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিতেও সে সাহস পাইল না; কেননা হাবিলের মুখে সে শুনিয়াছিল, সেনানায়ক তাহারই একজন আত্মীয়। কাজেই তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার উদ্ধারকর্তা একজন বেদুঈন; বদমেজাজী বেদুঈনকে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলিয়া উত্যক্ত করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। হাবিলকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াও কোন কিছু সদুত্তর সে পায় নাই। মুক্তির আনন্দে তাহার মেজাজ বুঝি বিগড়াইয়া গিয়াছে। কাজেই নির্বাক তাহাদের পিছু নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

আর বিলম্ব না করিয়া সকলে একসঙ্গে অশ্বে কশাঘাত করিলেন। অশ্বত্রয় তীরবেগে ছুটিল পাশাপাশি। কিন্তু হারিস অশ্ব চালনায় পটু নহে। শত চেষ্টা করিয়াও সে রাহেল ও রায়হানের সঙ্গে যাইতে পারিল না।, পশ্চাতে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানে পড়িয়া শুধু প্রাণপণ তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

অশ্ব-পদাঘাতে মরু--কান্তার ধূলিবালিতে ধূসরিত, প্রভাত-সূর্যের ঝলমল হাসিতে, উজ্জ্বল আলোকে সমগ্র প্রান্তর তখন উদ্ভাসিত।

কাফুরের সৈন্যগণ ছায়াদের শরাবখানায় প্রবেশ করিয়া মদ্যভাণ্ডগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিলেন। চিরতরে বিলুপ্ত হইল মদ্যশালা। সৈন্যগণ মহোল্লাসে 'আল্লাহু-আক্‌বার' ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন বিজয় অভিযানে।

সেই বিজয়-দিবস-অষ্টম হিজরীর ১০ই রমযান, ইসলামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। অনুতপ্ত নরনারী দলে দলে সাফা পাহাড়ে আলা হযরত (সঃ)-এর নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে ছুটিলেন। অবিশ্বাসী কুরাইশগণ দীর্ঘকাল যাবত হযরতের উপরে যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে আজ তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

দয়ার অবতার রসূলে আকরাম (সঃ) সকলকে সর্বান্তকরণে মার্জনা করিয়া জগতে ক্ষমার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। তাঁহার উদারতা ও মহানুভবতা দেখিয়া পরম শত্রুগণও শ্রদ্ধাবনত মস্তকে মুগ্ধচিত্তে হযরতের চারিপার্শ্বে সমবেত হইল।

অসংখ্য নরনারী আল্লাহ্‌র মহিমা, ইসলামের সৌন্দর্য, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া স্বেচ্ছায় পরম ভক্তিভরে ইসলামে ঈমান আনিলেন। সমবেত কণ্ঠের তকবির–ধ্বনিতে চারিদিকের আকাশ–বাতাস মুখরিত।

মিথ্যার বিনাশ ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল, অযুত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল আল্লাহ্ ও রসূলের মহিমা। পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত অসংখ্য নরনারী নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইল।

দেখিতে দেখিতে পল্লীর যুবক– প্রৌঢ় সকলেই নানাবিধ রণসাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে সমবেত হইল শরাবখানার চত্বরে। পার্শ্ববর্তী আল–জবিল গ্রামের যোদ্ধারাও ইতিমধ্যে বর্শা ও তরবারি হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত। সমগ্র মক্‌কা মোয়াজ্জমায় ও চারিদিকের গ্রামগুলোতে কেবল সাজ সাজ রব। দেখিতে দেখিতে অশ্বের হ্রেষারবে, ক্ষুরধ্বনিতে এবং সৈনিকদের হুঙ্কারে, নিস্তব্ধ নৈশ গগন মুখরিত হইয়া উঠিল। ধাবমান সৈনিকদের হস্তে প্রজ্বলিত মশালগুলো যেন অগণিত পুচ্ছতারকার ন্যায় প্রতিভাত।

কতক্ষণ পরে আবু মূসা পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া আসিলে সৈনিকগণ তাহাকে ঘিরিয়া লইল। আবূ মূসা উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'বন্ধুগণ! যুদ্ধ করা বৃথা, মুসলমানগণ সংখ্যায় অগণিত। কার সাধ্য তাদের গতিরোধ করে! ক্ষান্ত হোন।'

আটান্ন

আলোর পাশেই অন্ধকার, সুখের পাশেই দুঃখ। ধনী চর্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোগ করিতে করিতে পেটে অরুচি ধরায়, কিন্তু একবারও চাহিয়া দেখে না-ঐ পাশের কুঁড়েঘরেই হতভাগ্য ভিখারীটা সামান্য পোড়া রুটিও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া পেটের জ্বালায় অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করে মরে। যে ভোগ-লিপ্সু বিলাসী নৃত্য-গীতে, আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া সংসারে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করে, সে একবার খবরও নেয় না- বিরহ-যন্ত্রণায় অধীরা তাহারই এক প্রতিবেশিনী প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হইয়া মুহুর্মুহু অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। ইহাই বুঝি জগতের নিয়ম। এ-দৃশ্য সকলের কাছেই সুপরিচিত। সুফিয়ার বেদুঈন-পল্লীতেও এ দৃশ্য সকলের চোখে পড়িবে।

পূর্ণিমা রাত। বেদুঈন-পল্লীর একাংশে আনন্দের আর সীমা নাই। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ময় পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইতেই পল্লীতে বিবাহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। সেই দিবাভাগেই আবিদ বর সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছে সজ্জিত এক সামিয়ানার নীচে। তাহার তাঁবুতে পাড়ার ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীদের ভিড় কত। বেদুঈনের পক্ষে এক অভিজাত-বংশীয়া কুরাইশ-ললনার পাণিগ্রহণ কি কম সৌভাগ্যের কথা! ভাগ্যক্রমে ঘটনাচক্রেই না এই অঘটন সংঘটিত হইতে চলিয়াছে।

শুধু শিরিনার মুখেই হাসি নাই। সে আশা করিয়াছিল, আবিদকে বিবাহ করিয়া সুখের সংসার পাতিবে। কিন্তু কুরাইশ-অতিথিনী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার সকল সাধে বাধ সাধিয়াছে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, 'নিকাহ্ হয় হোক, মাগীকে বিষ খাইয়ে মারব।'

পল্লীর অপর প্রান্তে সুফিয়ার তাঁবু বড় নিরানন্দময়। নিদারুণ মর্ম-বেদনায় সুফিয়া একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! বিষণ্ন বদনে তাঁবুর এক কোণে সে উপবিষ্টা,

সম্মুখে নতশিরে বসিয়া সায়ফুন। এখন কি করিবে, সায়ফুনও আকাশ-পাতাল ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। বেদুঈন-সর্দার তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল- ছয় মাস কাল পল্লীতে সে থাকিতে পারিবে। আজ সন্ধ্যায়ই ছয় মাস অন্তর হইয়া যাইবে; আর বেদুঈন-পল্লীতে থাকিবার উপায় নাই। ভাবিল, রায়হানের সন্ধান আর পাওয়া গেল না, এ জীবনে তাঁহার সঙ্গে মিলন বুঝি আর ঘটিল না। প্রিয়তমকে হারাইয়া এ অভিশপ্ত জীবন বাঁচাইয়া রাখিয়াই বা লাভ কি। এদিকে বেদুঈন-যুবক আবিদ ক্ষুধার্ত কুকুরের ন্যায় ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাঁবু হইতে সায়ফুন বাহির হইলেই সে দলবলসহ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া নিবে। তা'ছাড়া সুফিয়াই ত মতলব হাসিল করিবার জন্য আবিদকে বিবাহের লোভ দেখাইয়াছিল। এখন উপায়!

উপায় একটা সায়ফুন ও সুফিয়া ঠিক করিয়াছিল; কিন্তু হতাশহৃদয়া সায়ফুন তাহা অবলম্বন করিবার শক্তিসাহস যেন হারাইয়া বসিয়াছে। সময় যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, সীমাহীন মনোবেদনায় ও নৈরাশ্যের পুঞ্জীভূত হাহাকারে তাহার অন্তর ততই নিষ্পেষিত হইতে লাগিল; তবু তাহাকে সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে- মরিয়া হইয়া সমুদ্র পাড়ি দিয়া রায়হানের সন্ধান করিতেই হইবে! সুফিয়া জানিত, আবিদের অনেক লোক-বল আছে, সহায় সম্পদ আছে। সায়ফুনকে বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া তাহার পক্ষে এমন কিছুই অসাধ্য-সাধন নহে। কাজেই কৌশলে কার্যোদ্ধার করিতে সে মনস্থ করিয়াছিল।

সুফিয়া আবিদকে বিবাহের আশা দিয়া একখানি সমুদ্রগামী জলযান যে তৈয়ার করিতে বলিয়াছিল, আবিদ তাহা ভুলে নাই। প্রেমের নেশা মানুষকে অসাধ্য-সাধনে প্ররোচিত করে, মানুষের বুকে অসীম সাহস জাগাইয়া তোলে। সে-নেশায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই আবিদ অনেক লোকজন খাটাইয়া, বহু ক্লেশে এক বিরাট নৌকা গড়িয়া, সাজ-সরঞ্জাম পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। সুফিয়া পিতার সাহায্যে লোকচক্ষুর অগোচরে সেই নৌকার পাটাতনের তলায় খাদ্য ও পানীয় তুলিয়া রাখিতে ভুলে নাই। সে মনস্থ করিয়াছিল সায়ফুনকে তাহাতে রায়হানের সন্ধানে হাবশী দেশেই পাঠাইয়া দিবে।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। সায়ফুন অনেকক্ষণ সুফিয়ার গললগ্ন হইয়া কাঁদিল, কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। অবশেষে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিল, 'ভগিনী! আর

বিলম্ব কেন, হতভাগিনীকে জন্মের মত বিদায় দাও। এ–জীবনে তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। বড় ভয় হয় যদি তাঁকে খুঁজে না পাই!'

সুফিয়া মনকে এতক্ষণ কঠোর শাসনে বাঁধিয়াছিল, কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিল না। সায়ফুনকে বিদায় দিতে হইবে ভাবিয়া বিচ্ছেদ–যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। চোখের পানি মুছিতে মুছিতে সে বলিল, 'এত অস্থির হয়ো না বোন, এত কাতর হয়ো না। তুমি চলে যাবে বলে আমার অন্তর পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কিন্তু উপায় নেই, পলায়ন ছাড়া আর যে গত্যন্তর নেই। আমার আব্বা বিদ্রোহের ভয়ে আবিদকে শাসন করতেও পারছেন না। তোমার দুঃখে তিনিও ত কম দুঃখিত নন।'

সায়ফুন শোকাকুল চিত্তে পুনরায় বলিল, 'সে বিশাল অরণ্যময় দেশে কোথায় তাকে খুঁজে পাব, কি করেই বা লোহিত সাগর একাকিনী পার হব। আজ শক্তি–সাহস সব কিছুই যে হারিয়ে বসেছি।'

সুফিয়া বসনাঞ্চলে অশ্রু মুছিল। তারপর তাঁবুর চারিদিকে একবার দেখিয়া আসিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, ' শোন বোন, অনতিদূরে আল– সালেমে এক বেদুঈন পল্লী আছে। আমার দুলাভাই কায়েস সেই পল্লীর সর্দার। আব্বা গোপনে গোপনে কায়েসের সাহায্যে কয়েকজন বিশ্বাসী নাবিক ও দুইজন বাঁদী নৌকায় এনে রেখেছেন। তারা লুকিয়ে রয়েছে পাটাতনের নীচে; আমার ডাক শুনলেই বের হয়ে আসবে। তারাই তোমাকে হাবশী মুল্লুকে নিয়ে যাবে। ভয় নেই, যাও, সেখানে অন্যান্য মুসলমানের দেখা পাবে, রায়হানকেও খুঁজে পাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সন্ধান না পেলে আবার এদের সঙ্গেই সালেমে ফিরে এসো। আমার ভগিনী তোমাকে আদর–যত্ন করে তাঁবুতে রাখবেন।

আশার আলোকে সায়ফুনের মুখমণ্ডল এইবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরপুর, ভাবাবেগে মুখে ভাষা নাই। সমুদ্র–ভ্রমণের যে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য সুফিয়া সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহা শ্রবণমাত্রই এই অসভ্য নগণ্য বেদুঈন–কন্যার প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক নত হইয়া আসিল। ইচ্ছা হইল, যাইবার কালে একবার সুফিয়ার পদতলে লুটাইয়া ভক্তিভরে তাহার কদমবুছি করিয়া লয়। পাশাপাশি নিজের অভিজাত–বংশীয় পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়–স্বজনের

দুর্ব্যবহারের কথা তাহার আজ নূতন করিয়া মনে পড়িল। অন্তর ভরিয়া উঠিল সীমাহীন বেদনায়।

সায়ফুন চোখের পানি মুছিতে বলিল, 'ভগিনী! তোমাকে বিপদে ফেলে চলে যেতে মন যে চায় না। তুমি একা ফিরে এলে, শয়তান আবিদ কি আমার কথা জিজ্ঞেস করবে না? কি উত্তর দেবে?

'সে উত্তর শুনে কাজ নেই বোন, খামাখা মনে কষ্ট পাবে।'

'না বহিন! মনকে এবার শক্ত করে বেঁধেছি, কোন দুঃখই আর অন্তরে বাজবে না। নিজেকে বাঁচাবার কি উপায় ঠিক করেছ বল। নতুবা তোমাকে বিপদে ফেলে আমি এক পা-ও নড়বো না।'

'পাগল হয়েছ? শোন, বলবো– সায়ফুন খেলার ছলে দরিয়ার বুকে ভেসে ভেসে, চলে গেছে কোথায় কোন্ অচিন দেশে, হয়তো বা সাগরের অথই পানিতে তলিয়েই গেছে।'

'সুফিয়া! হয়তো তা'ই হবে। রায়হানকে না পেলে এ ছারমুখ আর দেখাবো না।'

'এমন অলক্ষুণে কথা কখনও কি মুখে আনতে হয়! যাও, প্রস্তুত হও, উড়নিখানি মাথার উপরে বেশ করে টেনে দিয়ে মুখখানা ঢেকে নাও ভাল করে, কেউ যেন চিনতে না পারে। আর কিন্তু বিলম্ব করলে চলবে না। বেলা যে শেষ হয়ে এল। আমি একবার দেখে আসি, জংলী শয়তানগুলো কে কোথায় রয়েছে।' এই বলিয়া সুফিয়া বাহিরে আসিয়া পল্লীর অপর প্রান্তে আবিদের তাঁবুর দিকে দ্রুতপদে ছুটিল।

সায়ফুনের সঙ্গে লইবার কিছুই ছিল না। রায়হানের প্রদত্ত সেই আংটিটি সে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল সুফিয়ার পেটারায়। আজ বহুদিন পর তাহা খুলিয়া আনিয়া বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল। সেই ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্নটি দেখিবামাত্র বিরহিণীর মর্মস্থল দগ্ধ করিতে অসংখ্য পাবকশিখা যেন হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল– সে অগ্নির শেষ নাই, নির্বাণ নাই।

অস্থিরচিত্তে পায়চারি করিতে করিতে সায়ফুন তাঁবুর দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে ক্রীড়ারত অবশিষ্ট বালক-বালিকাদের চিৎকার-ধ্বনি ও

অদূরে পল্লীপ্রান্তে আনন্দোৎফুল্ল নর-নারীদের প্রমোদ-কোলাহল তাহার কর্ণকুহরে যেন প্রবেশ করিল না। উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে বাহিরে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রায়হানের ধ্যানে সে নিমগ্না, এমন সময় নিকটে বিস্ময়-ব্যাকুল কণ্ঠে উচ্চারিত হইল 'আরে! আরে! কে ও, সায়ফুন?'

বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র সায়ফুনের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে-সম্মুখে তাহারই জালেম ভ্রাতা ওৎবা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে একদৃষ্টে। সে তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিয়া তাঁবুর ভিতরে লুকাইল। আগন্তুক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁবুর দ্বারদেশে অগ্রসর হইতে হইতে জড়িত কণ্ঠে বলিল, 'সায়ফুন! তুই এখানে এই বেদুঈন পল্লীতে! এখানে এলি কিরূপে বহিন? আল্লাহ তোকে কি করে বাঁচিয়েছেন।

ওৎবার মুখে আল্লাহর নাম শুনিয়া সায়ফুনের বিস্ময় চরমে উঠিল। তাহার বাক্য নিঃসরণ হয় না। সে ভাবিয়া পায় না, কোথা হইতে তিনি এত দূরে তাহার সন্ধানে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিরূপেই বা তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল আল্লাহ্‌র নাম। যুবতী আড়াল হইতে একদৃষ্টে ভ্রাতার দিকে তাকাইয়া রহিল। দৃষ্টি ফিরিতে চাহে না।

সীমাহীন বিস্ময়ে ওৎবাও নির্বাক। আর এক পা অগ্রসর হইয়া কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, 'ভগিনী সায়ফুন! পালাচ্ছিস! কত যে তোকে খুঁজে বেড়িয়েছি দেশে দেশে, বনে বনে! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই নাদান ভাইটিকে ক্ষমা কর বহিন!'

সায়ফুন বুঝিতে পারিল ওৎবা আর অবিশ্বাসী কাফের নহে। বিপুল বিস্ময়ে ও অনির্বচনীয় আনন্দে তাহার সর্বাঙ্গ তখন রোমাঞ্চিত, অন্তর সীমাহীন পুলকভারে উল্লসিত। ধীরে ধীরে এক পা দুই পা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া সে বলিল, 'ভাইজান! তুমি মুসলমান?

দুর্ভাগা ভগিনীর জীর্ণ বেশ ও শীর্ণ দেহ লক্ষ্য করিয়া ওৎবার অন্তর অসহ্য বেদনায় অভিভূত, উচ্ছ্বসিত আবেগে কি বলিতে সে উদ্যত হইল- এমন সময় সায়ফুন তাহাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া অস্ফুট স্বরে অতি ব্যাকুলভাবে

বলিল, 'ভাইজান! আমি বন্দিনী, শিগগির পালাও; বেদুঈনদের হাতে ধরা পড়লে কিন্তু নিস্তার পাবে না। যাও, পালাও! ওৎবা অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় মুছিতে মুছিতে উত্তর করিল, 'না, তা হয় না, প্রাণ গেলেও যাব না।' এমন সময় কে একজন পশ্চাদ্দেশ হইতে গুটি গুটি আসিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'কে তুমি সওয়ার? কেন এসেছ এখানে?'

ওৎবা ঘাড় ফিরাইয়া দেখে, পশ্চাতে এক ভীষণ-দর্শন বেদুঈন। সায়ফুন তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিল-সর্দার আনসার! অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাঁবুর ভিতরে দুই পা পিছাইয়া গেল।

ওৎবা সাহসে ভর করিয়া অবিচল কণ্ঠে উত্তর করিল, 'আমি মুসাফির, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, পথশ্রমে শ্রান্ত।'

সর্দার তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সায়ফুনকে জিজ্ঞাসা করিল, বেটি! মেহমানকে তাড়াচ্ছ! কোথায় সুফিয়া? তাকে কেন ডেকে দাও না?'

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সায়ফুন উত্তর করিল, 'এইমাত্র সে পল্লীতে গেছে কি কাজে, এখনই আসবে।'

'তবে তুমিই এর খানাপিনার ইনতেজাম কর।' এই বলিয়া সে পুনরায় ওৎবার দিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপন তাঁবুর দিকে চলিয়া গেল।

ওৎবা অশ্বটিকে তাঁবুর পশ্চাতে বাঁধিয়া নিজে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল। ধরা পড়িতে পড়িতে ভ্রাতা বাঁচিয়া গেল দেখিয়া সায়ফুনের অন্তর আনন্দে বিভোর। ভাইটিকে বসিতে দিয়া কিছু খাদ্য ও পানীয় আনিতে সে তাঁবুর ভিতরে ছুটিল।

ওৎবা বাহিরে তাকাইয়া দেখে, নিকটে আর কেহই নাই, সর্দার হস্তস্থিত বর্শাটা অদূরে অপর এক তাঁবুর বাহিরে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ভগ্নীকে উদ্ধার করিবার এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা সহসা তাঁহার অন্তরে উদয় হইতেই মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সায়ফুন কিছু খাদ্য ও পানীয় লইয়া ভ্রাতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সেগুলো তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, 'ভাইজান! আগে কিছু খেয়ে সুস্থ হও। তারপর বল, এত দূরে এলে কিরূপে!'

ওৎবা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সত্য সত্যই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। আহার্যগুলো আগ্রহভরে হাত বাড়াইয়া লইয়া সে বলিল, 'সায়ফুন! আমার কথা পরে হবে। তুই কিরূপে এখানে বন্দী হয়ে এলি, তাই বল। এই বেদুঈন পল্লীতে আশ্রয়ের সন্ধান করায় এক যুবক এই তাঁবু দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ওখানে যাও- শাদীর আয়োজন, খানাপিনা মিলবে।' কিন্তু কই শাদী?'

সায়ফুনের অন্তরে নির্বানোন্মুখ আগুন আবার যেন জ্বলিয়া উঠিল। অশ্রুধারা কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ওড়নার অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিল, 'ভাইজান! দুঃখিনীর কপাল এবার ভাল করেই ভেঙেছে-শাদী নাকি আমারই! এক বেদুঈন আমাকে আজ জোর করেই বিয়ে করার আয়োজনে মেতেছে।

ওৎবার হাত হইতে রুটির টুকরাগুলো খসিয়া ভূতলে পতিত হইল। কতক্ষণ কোন কথাই সে বলিতে পারিল না, শুধু ব্যথাতুর ভগিনীর মলিন মুখমণ্ডলে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল। হতভম্ব ওৎবা অস্ফুট স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'কী! এত বড় আর্স্পধা! কুরাইশকন্যার অপমান!' পরক্ষণেই সে বুঝিতে পারিল, স্বদেশ হইতে দূরে এই দুর্দান্ত বেদুঈনদের আবাসভূমিতে তাঁহার শৌর্য-বীর্য কতটা নিষ্ফল। কিন্তু চোখের উপর বেদুঈনগণ তাঁহার ভগিনীকে জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া বিবাহ দিবে, প্রাণ থাকিতে সে ইহা সহ্য করিবে কিরূপে?

কতক্ষণ চিন্তা করিয়া ওৎবা ভগিনীকে দৃঢ়স্বরে বলিল, সায়ফুন! প্রাণ থাকতে এ দৃশ্য সহ্য করতে পারবো না। তুই এক কাজ কর্। আমার বেশে, আমার ঘোড়ায় চড়ে এখনই পলায়ন কর। যা, শিগগির জামাকাপড় বদল করে আয়।'

সায়ফুনের বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা নাই। বিস্ফারিত নয়নে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি বলছো ভাইজান! কোথায় পালাবো? তুমি যাও, এইটুকু মুখে দিয়ে শিগ্গির পালাও, নতুবা ধরা পড়বে। সুফিয়া এখনই যে ফিরে আসবে! ভুলে গেছ- হাবিলকে তোমরা বন্দী করেছিলে? এরা সেই হাবিলেরই আত্মীয়-স্বজন। যাও, পালাও!' তাহার চোখে-মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা।

ওৎবা দৃঢ়স্বরে বলিল, 'সায়ফুন! প্রাণ থাকতে তোর অপমান সহ্য করতে পারবো না। বিশ্বাস কর, সেই অবিশ্বাসী জালিম ওৎবার মৃত্যু ঘটেছে, তার

মৃতদেহে তোর ভাই ওৎবার প্রাণসঞ্চার হয়েছে। পালা সায়ফুন! এই নে আমার পাগড়ি, আমার জোব্বা। তোর ওড়না, তোর সালোয়ার খুলে দে আমাকে। এই নে তলোয়ার।' এই বলিয়া সে নিজের পোশাক ও তরবারি ভগিনীর সম্মুখে খুলিয়া দিল।

এই অদ্ভুত প্রস্তাবে সায়ফুনের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সুফিয়া বহু কষ্টে তাহাকে মুল্‌কে হাবাশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, কিন্তু যাত্রার ঠিক পূর্বক্ষণে কোথা হইতে তাহার ভ্রাতা আসিয়া এমনভাবে সবকিছু বানচাল করিতে চায়, ইহা সে পছন্দ করিল না।

সায়ফুন অস্থির হইয়া বলিল, 'না ভাইজান! তা' হয় না। তুমি পালাতে পারবে না। বেদুঈনেরা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। 'এখনই সর্দার–কন্যা সুফিয়া ফিরে এসে আমাকে দরিয়ায় নিয়ে যাবে। আমার পালাবার ব্যবস্থা সে ঠিক করে রেখেছে। আমি এখনই দরিয়ায় গিয়ে নৌকায় যাত্রা করবো মুল্‌কে হাবাশ্‌।'

ওৎবা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, 'মুল্‌কে হাবাশ! কি বলছিস্‌! সে দেশ কি আর এখানে! একেবারে যে সীমাহীন দরিয়ার ওপারে! ও দেশে কত পাহাড়–পর্বত, কত অসভ্য মানুষ, কত হিংস্র পশু। সে দেশে যাওয়া পুরুষের পক্ষেই দুঃসাধ্য। আর তুই কিনা যাবি সেই দেশে! তাও আবার একাকিনী! সায়ফুন! ভেবেছিস্‌ কি আমি বসে রয়েছি নিশ্চিন্ত? হাবশী দেশেও ত রায়হানের সন্ধানে লোক পাঠিয়েছি অনেক দিন; হয়তো সে ফিরবে আজকাল। তারই আগমন–আশায় সমুদ্রের ধারে ধারে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে এই বেদুঈন–পল্লীতে এসেছি। যা, এক্ষুণি পালা! দরিয়ার কিনারে কিনারে চলে যাবি সোজা উত্তরে। দেখবি, কিছুদূরেই বনমধ্যে আমাদের পল্লী। শিগ্‌গির যা, বেশ পরিবর্তন করে আয়!'

'কি বলছো? তোমাদের পল্লী! মুসলমান পল্লী?'

'হাঁ, কেন মিছেমিছি সময় নষ্ট করে উভয়ের বিপদ ডেকে আনছিস্‌? তুই না গেলে আমি এক পা–ও নড়বো না।'

'তোমার কী উপায় হবে ভাইজান? সুফিয়াও তো তোমাকে দেখলেই জ্বলে উঠবে। হাবিলকে সে ভুলতে পারে না মুহূর্তের জন্যেও।'

'উপায় একটা হবেই, তুই ত যা!'

'কিন্তু বল না কি উপায়?'

'তুইনা বল্‌লি সর্দার-কন্যা তোকে নিয়ে এখনই পালাবে দরিয়ায়? তোর বদলে আমিই যাব তার সঙ্গে।'

'কিন্তু--'

'আবার কিন্তু কি! যা বলছি!'

সায়ফুন কতক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে ভ্রাতার পীড়াপীড়িতে বেশ পরিবর্তন করিতে লাগিল পর্দার অন্তরালে। ওৎবা শুধু চক্ষুদ্বয় অনাবৃত রাখিয়া শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল বস্ত্রখণ্ডে উত্তমরূপে বাঁধিল। তারপর সায়ফুনের পরিত্যক্ত বসন পরিধান করিয়া নব যুবতীর বেশ ধারণ করিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সায়ফুনও নবীন যুবকের বেশে ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। দুই চোখ খোলা রাখিয়া মুখমণ্ডল ও নিবিড় কেশদাম উষ্ণীষ-বস্ত্রে সে উত্তমরূপে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ওৎবা উৎফুল্ল-হৃদয়ে সায়ফুনের হস্তে আপন তরবারি দিয়া তাহাকে তাঁবুর বাহিরে অশ্বারোহণ করিতে ইঙ্গিত করিল।

বিদায় বেলায় সায়ফুন সুফিয়ার সঙ্গে একবার শেষ দেখা করিয়া যাইতে পারিল না, সেই দুঃখে তাহার অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল; কিন্তু আর বিলম্ব করিবারও উপায় নাই; সুফিয়া ফিরিয়া আসিলে ভ্রাতার যে প্রাণসংশয় হইবে। অগত্যা সে তাঁবুর বাহিরে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জোরে কশাঘাত করিল।

ওৎবা সায়ফুনের ওড়নায় অবগুণ্ঠন রচনা করিয়া খাটিয়ার এক প্রান্তে উপবেশন করিল। প্রান্তরে ভগ্নীর দ্রুতগামী অশ্বের পদশব্দ শুনিতে শুনিতে তার বুকের ভিতরটায় যেন ঝড় বহিয়াছে। পর্দার ফাঁকে কিয়দ্দুরে অপর তাঁবুর দিকে সে তাকাইয়া দেখে- সর্দার আনসার বাহিরে সেই অশ্বারোহীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আবার প্রবেশ করিতেছে তাঁবুর ভিতরে। প্রতি মুহূর্তে বিপদাশঙ্কায় ওৎবার ভয়াতুর দেহ যেন অসাড় অনড়, সর্বাঙ্গে ঘর্মধারা ফিনকি দিয়া বাহির হইয়া প্লাবন বহাইতেছে। এক মনে কাতরভাবে সে মহান আল্লাহ্‌কে ডাকিতে লাগিল।

উনষাট

সুফিয়া আবিদের তাঁবুর নিকটে পৌঁছিয়া দেখে, সেখানে যে মহা–ধুমধাম--নাচ–গানের আয়োজন। পুরুষগণ মদ্যপান করিতে করিতে নেশার ঝোঁকে বাহ্‌বা দিতেছে, মাঝে মাঝে রসালাপে প্রবৃত্ত হইয়া নিকটে নৃত্যশীলা যুবতীদের উৎফুল্ল বদনে হাসির লহরী সৃষ্টি করিতেছে, নিজেরাও খুব হাসিতেছে। সুফিয়া লক্ষ্য করিল–হাসিনা, জরিনা, মায়মুনা সকলেই সে নাচ–গানে যোগদান করিয়াছে, কেবল শিরিনার সন্ধান নাই। মদোন্মত্ত বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত আবিদ অপরূপ সাজে নওশাহ সাজিয়া আসরের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। তাহার মুখ–ভরা হাসি, বুক--ভরা আশা।

নিকটে এক তাঁবুতে আত্মীয়া রমণীরা রুটি সেঁকিতে এবং নানাবিধ আহার্য প্রস্তুত করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। সুফিয়াকে দেখিবামাত্র সকলে তাহাকে ঘিরিয়া লইয়া কনে সায়ফুনের রূপ–গুণ ও কুল–মান সম্বন্ধে কত কি যে প্রশ্ন করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার কেহ তাহাকে রুটি সেঁকিতে বলিল, কেহ বা কিছু আহার করিতে পীড়াপীড়ি করিল। ব্যাপার দেখিয়া সুফিয়ার মুখে হাসি আর ধরে না। কোনমতে হাসি চাপিয়া তাহাদিগকে যথোচিত উত্তরদানে সে সন্তুষ্ট করিল। দশজনের অনুরোধে অল্প কিছু মুখে না দিয়াও পারিল না।

আবিদ সুফিয়াকে দেখিবামাত্র মহানন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'সুফিয়া! কনে নিয়ে এসেছ?'

সুফিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'চোখের মাথা খেয়েছ? তোমাকে ত দেখি বাহাত্তুরে ধরেছে, তবে আর নিকাহর সাধ কেন শুনি? দেখছো না, বেলা সবে গড়িয়েছে? শাদী হবে সেই রাত্রে, আর এখনই কনে নিয়ে আসব ঢ্যাং ঢ্যাং করে? হু, বড় সস্তায় পেয়েছ কিনা! কাঠখড় ত আর পোড়াতে হয়নি!'

আবিদ অপ্রস্তুত হইল। থতমত খাইয়া সে বলিল, 'তা বেশ, তা বেশ! তুমি যখন এর পিছনে রয়েছ, আমার আর ভাবনা কিসের?'

সুফিয়া দুই হাত কোমরে রাখিয়া বলিল, 'আচ্ছা, শাদী ত করবে বুঝলাম, কিন্তু বিবিকে ভালবাসবে ত প্রাণ ঢেলে?'

'তা আর বাসবো না? এমন সোনার চাঁদকে কে আর ভাল না বাসে বল? তার বিরহে দিল আমার ফানাহ্ ফানাহ্ হয়ে গেছে সুফিয়া!'

'কেন শিরিনা সুন্দরী কম ছিল কিসে? তাকে শাদী করলে না কেন? অমন অমূল্য রতন হেলায় ঠেলে কি ভাল করলে?'

'আহ! ওর কথা আর বলো না সুফিয়া! মাগী বড় ঝাঁঝাল, কথায় কথায় জ্বলে উঠে দপ করে, ওড়না কোমরে জড়িয়ে তেড়েফুঁড়ে আসে। আর তোমার অতিথিনী! বল দেখি কেমন শান্ত-শিষ্ট মেয়েটি? যেমন রূপ, তেমনই গুণ!'

'থাক থাক, অত আর সিফত গাইতে হবে না, ফূর্তি কর, সময় হয়ে এল আর কি! আমি কনেকে গোসল করিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে আসি। তোমার সেই গর্দভটা কোথায়? ওটার কাঁধে চড়েই না বরযাত্রী হবে? কিন্তু কই, বাহনটিকে দেখছি না যে কোথাও!'

আবিদ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কাবিলের কথা বলছো? তাকে পাঠিয়েছি সেই বিলকিরিনির হাটে, কিছু মিষ্টি আনতে; এই এল বলে। কেন, নজরে পড়েছে নাকি? বল ত তাকেও সাজিয়ে নেই। আর বিলম্ব কেন? হাবিল কি এখনও বেঁচে আছে ভেবেছ?'

সুফিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হওয়ার ভান করিয়া বলিল, 'তোমার মরণ হয় না? আজরাঈল তোমায় দেখে না? গলায় দড়িও জুটে না?' এই বলিয়া সে সত্য সত্যই তাঁবুর খুঁট হইতে দড়ি খুলিয়া আনিয়া আবিদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'এই নাও!' বন্ধুদের মুখে হাসি আর ধরে না। সুফিয়াও হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া পড়িল।

সুফিয়া বুঝিয়া আসিল, শয়তানগুলো সুরার নেশায় মশ্‌গুল হইয়া রঙীন স্বপ্ন দেখিতেছে, পালাইবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। আপন তাঁবুর দিকে সে তাড়াতাড়ি পা বাড়াইল।

কিছুদূর যাইতে-না-যাইতেই পথিমধ্যে শিরিনার সঙ্গে দেখা। সুফিয়া কলহের ভয়ে তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শিরিনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'সুফিয়া! শেষকালে এমন সর্বনাশটাই করলি? আমার মাথায় কুড়াল মারলি? ধর্মে সইবে ভেবেছিস্? আমিও কি এর একটা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বো? চিনিস্ না আমাকে!'

সুফিয়া কোনক্রমে তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইলে বাঁচে। হাত নাড়িয়া সে বলিল, 'তুমি হাওয়ার সঙ্গে ঝগড়া কর শিরিনা, আমি চললাম।'

শিরিনা রাগে মুখ ভেংচাইয়া বলিল, 'কি-ই-ই, আমি ঝগড়া করি! তুই আমার সুখ-শান্তি সব ছিনিয়ে নিলি, আর সেই কথা বললাম বলে, আমি কিনা ঝগড়া করি! আমার সুখ-স্বপ্ন সব ভেঙ্গে দিলি, নইলে শুধু শুধুই আমি ঝগড়া করি! বলতে লজ্জা করে না?'

সুফিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বেশ, তুমি আবার স্বপন্ দেখ! আমি চললাম কনে সাজাতে।' এই বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

উত্তেজিতা শিরিনা সুফিয়ার পিছু পিছু কিছুটা পথ ছুটিতে ছুটিতে বলিল, 'ইস্, ঢং দেখ না! আমাকে বলে কিনা স্বপন্ দেখ। পোড়ারমুখীর কথা শোন! দুর্মুখী! শতেকখোয়ারী! আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে তোর বাধে না? আজরাঈল তোকে দেখে না?'

বকিতে বকিতে শিরিনা একেবারে সুফিয়ার তাঁবুর দুয়ারে আসিয়া হাযির। সুফিয়া দেখিল, আপদ বিদায় না হইলে মুস্কিল; এদিকে সুযোগ চলিয়া যাইতেছে, বেলাও প্রায় শেষ। সে তাহাকে দুই-চারিটি মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শিরিনা দুয়ার ছাড়িয়া নড়িবার নামও করিল না। অগত্যা নকল সায়ফুনকে সাথে লইয়া সুফিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল, বগলে লইল একটা কাপড়ের পুঁটুলি। অশ্বপৃষ্ঠে গেলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, সন্দেহের কারণ হইবে, এই ভয়ে তাহারা দ্রুত যাত্রা করিল পায়দল।

শিরিনা একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ মুখভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে জোড় বেঁধে?'

সুফিয়া উত্তর করিল, 'দুলহিনকে দরিয়ার পানিতে গোসল করিয়ে আনি। কনের বিশ্বাস–গভীর নোনা সায়রে ডুব দিয়ে উঠে নিকাহ করলে এশ্‌কও নাকি গভীর হয়।'

'এত বড় ঘোমটা দিয়ে সং সেজেছে কেন?'

'তার দেশের রেওয়াজ– তুমি আমি বলে কি করবো। চল না, দুলহিনকে গোসল করিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে আসি! যাবে?'

শিরিনা অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, মরণ আমার! কথার ছিরি দেখ! সতীনকে গোসল করিয়ে আনতে হবে, সাজিয়ে দিতে হবে। হে দেবতা! হে হোবাল! হে লাৎ! হে মনাৎ! মাগী যেন ফিরে আর না আসে, চান্দ–সুরুজের মুখ আর না দেখে! হে দরিয়ার ঠাকুর। তোমার বুকে মাগী যেন ফওৎ হয়, ডুবে যেন আর না ওঠে! লক্ষ কোটি সাগরের ঢেউ সতীনকে যেন অকুল সায়রে ভাসিয়ে নেয়!'

সুফিয়া ও সায়ফুন– বেশী ওৎবা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তথাপি শিরিনার বাক্যবাণ বন্ধ হয় না। দূর হইতে তাহার অভিশাপ–বাণী উভয়ের কানে যেন ছুচেঁর ন্যায় ফুটিতে লাগিল।

পথিমধ্যে সুফিয়া দুই একবার সহযাত্রীটির সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া নিরাশ হইয়াছে, তাহার সঙ্গিনী শুধুমাত্র 'হুঁ– হ্যাঁ করিয়া কয়েক পা পিছনে চলিতে লাগিল। সুফিয়া ভাবিল, ভবিষ্যতের নানাবিধ আশঙ্কা হৃদয়মধ্যে উদয় হওয়ায় সায়ফুন ভাবাবেগে তন্ময়; হয়ত–বা আবেগে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিতেছে। নিজের অদৃষ্টেই–বা কি ঘটিবে কে জানে। সাত–পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে ত্রস্তপদে পথ চলিতে লাগিল।

উভয়ে সমুদ্র–তটের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে নৌকায় সায়ফুনের লইবার কথা ছিল, তাহাও অদূরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এমন সময় পশ্চাতে বহু ধাবমান অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া দুইজনই চমকিয়া উঠিল। তাহারা ঘাড় ফিরাইয়া

দেখে, একদল অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তাহাদের দিকে যেন ছুটিয়া আসিতেছে। সুফিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'সায়ফুন। সর্বনাশ হয়েছে। পাপিষ্ঠ আবিদ বুঝি টের পেয়েছে! দলবলসহ যেন ছুটে আসছে! পালাও সায়ফুন, শিগ্‌গির ঐ নৌকায় পালাও। হায় হায়! কী হবে। কোথায় যাব! সায়ফুন! চল, আমিও তোমার সঙ্গে পালাবো! নতুবা দুশমনের হাত থেকে আজ রক্ষা পাব না!' ভয়ে তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, সর্বাঙ্গ থরথর কম্পমান।

ওৎবা নিরস্ত্র। ধরা পড়িলে অবস্থাটা কি হবে উহা কল্পনা করিতেই তাঁহার পদদ্বয় যেন ভাঙিয়া গেল। সুফিয়া তরণীর দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাঝিদিগকে চিৎকার করিয়া ডাকিল, 'মাঝি! শিগ্‌গির নৌকা কূলে ভিড়াও! ঐ দেখ দুশমন আসছে! শিগ্‌গির ভাসাও।'

মাঝিরা প্রস্তুত হইয়াই নৌকায় লুকাইয়া রহিয়াছিল। ডাক শুনিবামাত্র তাহারা তাকাইয়া দেখে– ধাবমানা সুফিয়া ও তাহার সঙ্গিনীর পশ্চাতে একদল অশ্বারোহী চারিদিকে ধূলিবালি উড়াইয়া জোরে ছুটিয়া আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা নৌকাখানি তীরে ভিড়াইল। তরণীমধ্যে যে দুইজন পরিচারিকা উপবিষ্টা ছিল, তাহারাও ছইয়ের বাহিরে আসিয়া যুবতীদের নৌকায় উঠাইয়া লইতে ব্যাগ্রভাবে হস্ত প্রসারণ করিল।

সুফিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক পরিচারিকার প্রসারিত হস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল। উঠিয়াই তাহার সঙ্গিনীকে টানিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্তভাবে নিম্নদিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। পশ্চাতে ধাবমান অশ্বারোহীগণ ততক্ষণে প্রায় নৌকার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ওৎবা নৌকার প্রান্তদেশে ভর করিয়া সুফিয়ার সাহায্য ছাড়াই উপরে উঠিয়া পড়িল, কিন্তু উঠিবার কালে মস্তক আন্দোলিত হওয়ায় বায়ুভরে খসিয়া পড়িল উষ্ণীষ বস্ত্র। সুফিয়া অবাক হইয়া দেখে তাহার সঙ্গিনী ত সায়ফুন নহে, স্ত্রীলোকও নহে– শ্মশ্রুধারী এক অপরিচিত যুবক! নিদারুণ ভয় ও নৈরাশ্যে সে চিৎকার করিয়া নৌকার পাটাতনের উপরে গড়াইয়া পড়িল।

ওৎবাকে দেখিবামাত্র নৌকাভ্যন্তর হইতে এক জীর্ণ বসনা শীর্ণা পরিচারিকা পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'আরে, কে ও? ওৎবা! ওৎবা! তুই কোথা থেকে এলি বাপ? বৃদ্ধা ওৎবাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে শুরু করিল।

ব্যাপার দেখিয়া মাঝিরা হতবাক। ততক্ষণে তরঙ্গোপরি দোদুল্যমান নৌকার বাঁধন তাহারা খুলিয়া দিয়াছে।

ওৎবার দুই চোখে ভুবন–ভরা বিস্ময়। চাহিয়া দেখে, পরিচারিকা আর কেহ নহে–তাহারই পিতৃ–তাড়িতা দুর্ভাগা জননী। ওৎবা 'আম্মা আম্মা' বলিয়া মাতার পদতলে লুটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আম্ম! তুমি এলে এখানে কোথা থেকে?'

মাতা দুই চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, তোর আব্বা অভাগীকে যে সওদাগরের নিকটে বিক্রি করে ফেলেছিলেন, সে আবার বেচে ফেলে আমাকে আল–সালেম গ্রামের বেদুঈন–সর্দার কায়েসের কাছে। সেই অবধি কত নির্যাতন যে সয়েছি বাপ?' আর কিছুই সে বলিতে পারিল না, ভাবাবেগে কন্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

মাঝিরা ততক্ষণে নৌকায় পাল উড়াইয়া দিয়াছে। মুহূর্তমধ্যে তরণী তরঙ্গে দুলিয়া ঘুরিয়া গেল। ওৎবা স্থির হইয়া বসিয়া মাঝিদিগকে নির্দেশ দিল জোরে নৌকা বাহিতে। ঠিক সেই সময় পশ্চাদ্দেশে এক অশ্বারোহী পুরুষ সাগর–সৈকতে নৌকার বরাবর আসিয়া পৌঁছিল, পশ্চাতে ঘোড়ার পিঠে আরও কয়েকজন ছুটিয়া আসিতেছে। নিমেষমধ্যে সেই অশ্বারোহী এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নৌকার দিকে ছুটিতে ছুটিতে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'সুফিয়া! সুফিয়া! যেয়ো না সুফিয়া! আমি এসেছি, এসেছি সুফিয়া!'

ডাক শোনামাত্র সুফিয়ার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে। চক্ষু মেলিয়া সে দেখে দ্রুত–চালিত নৌকামধ্যে তাহারই সম্মুখে বসিয়া সায়ফুনের বেশে এক শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষ! সে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'দস্যু! কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? সায়ফুনকে কোথায় লুকালি শয়তান? কোথায় সায়ফুন?' এমন সময় শুনিল, পশ্চাতে পরিচিত কন্ঠে কে যেন আবার ডাকিল, 'সুফিয়া! আমি এসেছি!'

সুফিয়ার আপাদমস্তক এইবার শিহরিয়া উঠিল। ত্বরিদ্বেগে উঠিয়া ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতেই যাহা কল্পনাতীত, যাহা স্বপ্নের অতীত, তাহা দেখিয়া সে যেন পাথরের ন্যায় অসাড় হইয়া গেল। দেখিল তটদেশে দণ্ডায়মান তাহারই প্রিয়তম হাবিল, হাবিলই যে তাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে। দেখিতে দেখিতে আবার কে একজন তাহার পার্শ্বে আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ

করিল; পশ্চাতে আর একজন, তারপর আরও একজন। সুফিয়ার চোখে এতখানি বিস্ময় আর কখনও নামিয়া আসে নাই। এতখানি হৃদয়াবেগ, এতখানি পুলকভার সে সহ্য করিবে কিরূপে! বলা বাহুল্য হাবিল, রায়হান, হারিস ও রাহেল সমভিব্যাহারে পল্লীতে পৌঁছিয়াই শুনিয়াছিল–সুফিয়া গোসল করিতে গিয়াছে দরিয়ায়। বহুদিন পর মিলনের প্রবল আগ্রহাতিশয্যে হাবিল তৎক্ষণাৎ সুফিয়ার সন্ধানে সমুদ্রতটে ছুটিয়া আসিয়াছে– পশ্চাতে মক্কা পাক হইতে আগত তাহারই সেই অশ্বারোহী সঙ্গীগণ।

তরণী তটভূমি হইতে সবেমাত্র ছাড়িয়াছে। ঢেউয়ের আঘাতে নৌকাখানি কতকটা পিছাইয়া আবার আগাইয়া আসিতেই সুফিয়া দেখে হাবিল 'সুফিয়া সুফিয়া' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তাহার সঙ্গীরাও একে একে দরিয়ায় লাফাইয়া পড়িতেছে। ভাবাতিশয্যের প্রবল আঘাতে তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে সবগুলো তার একসঙ্গে যেন ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম। হাবিলকে এইখানে এইভাবে দেখিতে পাইবে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই, কিন্তু এত কাছে পাইয়াও আবার তাহাকে যে হারাইতে বসিয়াছে। এক দস্যু তাহাকে হরণ করিয়া সমুদ্রে পালাইয়া যাইতেছে ঐ নৌকায়। একটু পরেই যে নৌকাখানি তরঙ্গাঘাতে আরও দূরে সরিয়া যাইবে। হাবিলও হয়তো ডুবিয়া মরিবে! দিশাহারা সুফিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'হাবিল! তুমি এসেছ? হাবিল!' এই বলিয়া সে নৌকার উপর হইতে এক লম্ফে হাবিলের দিকে সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সুফিয়া এক–একবার অদৃশ্য হয়, আবার ভাসিয়া উঠে, কিন্তু ঢেউ কাটাইয়া হাবিলের দিকে কিছুতেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তরঙ্গাঘাতে ডুবিয়া, ভাসিয়া, আবার ডুবিয়া, আবার ভাসিয়া, ক্রমেই সে তলাইতে লাগিল; হাবিলের চিহ্নমাত্রও আর দেখিতে পাইল না। তটদেশের বৃক্ষলতা, বালুকাময় বেলাভূমি, উপরে অনন্ত আকাশ, তাহার চোখে সব একাকার! লবণাম্বু বারবার নাকে মুখে প্রবেশ করিয়া প্রাণ যেন কণ্ঠাগত করিয়া তুলিয়াছে।

হাবিল সন্তরণে পটু নহে। তরঙ্গাঘাতে নির্জীব হইয়া ক্রমেই সে সমুদ্রতলে ডুবিয়া যাইতেছিল, এমন সময় রাহেল অতি কষ্টে ঢেউ কাটাইয়া নিকটে আসিয়া তাহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিল।

সন্তরণরত রায়হান মাথা তুলিয়া দেখেন, সুফিয়া হাবিলকে ধরিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বারবার ডুবিতেছে, ভাসিতেছে–হাবিলও তাহার নিকটে পৌঁছিতে পারিতেছে না। তিনি সুফিয়াকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণ সাঁতরাইতে লাগিলেন। সুফিয়া নৌকায় উঠিয়া কোথায় যাইতেছিল, কেনই বা নৌকার আরোহীগণ তাহার উদ্ধারের কোন চেষ্টা না করিয়া পলায়ন করিতেছে, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না!

লোনা পানি গিলিয়া সুফিয়া প্রায় অচেতন হইবার উপক্রম, এমন সময় রায়হান নিকটে পৌঁছিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; তরঙ্গাঘাতে হাবুডুবু খাইয়া নিজেও প্রায় যায় যায় অবস্থা।

সমুদ্রোপকূলেই হারিসের জন্মভূমি, সেইজন্য শৈশব হইতেই উদ্বেলিত সমুদ্রবক্ষে সন্তরণে অভ্যস্ত। সে চাহিয়া দেখে, রায়হান ও সুফিয়া একে অপরকে জড়াইয়া ধরিয়া একবার ডুবিতেছে, আবার ভাসিতেছে; অল্পক্ষণ মধ্যেই উভয়েরই সলিল–সমাধি যে সুনিশ্চিত। কোনক্রমে হারিস ঢেউয়ের উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া রায়হানের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। তারপর দুইজনকে টানিয়া পৃথক করিয়া দুই হাতে দুইজনের বাহুমূলে শক্ত করিয়া ধরিল। এইবার তিনজনই একবার ডুবে, আবার ভাসে। দেখিতে দেখিতে এক উত্তাল তরঙ্গ সকলকে প্রায় বেলাভূমির প্রান্তদেশে ঠেলিয়া দিয়া ভীষণ গর্জনে কূলে ভাঙ্গিয়া আবার সাগরবক্ষে ফিরিতে লাগিল।

হারিস তৎক্ষণাৎ দুইজনকে দুই হাতে আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া তরঙ্গতলে মস্তক ডুবাইয়া রাখিল। নিমেষমধ্যে ঢেউ সকলের মাথার উপর দিয়া গড়াইয়া আবার ফিরিয়া গেল গভীর সমুদ্রে। তিনজনই পড়িয়া রহিল সদ্য–সিক্ত বেলাভূমিতে সমতল বালিশয্যায়। হারিস প্রথমে লাফাইয়া উঠিয়া রায়হানকে টানিয়া তুলিল। তটদেশ হইতে হাবিল পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া 'সুফিয়া সুফিয়া' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাহার অবশ দেহ কোলে উঠাইয়া লইল। ঢেউ আবার ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হইয়া উপরে ছুটিল।

সুফিয়া উর্মিমালার সংঘাতে চেতনা হারাইয়াছে। হাবিল তাহার জ্ঞান সঞ্চার করিতে ব্যস্ত। পরিশ্রান্ত রায়হান হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুফিয়ার নিকটে আসিয়া সমুদ্রে পলায়মান নৌকার প্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বিমূঢ়ভাবে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

নৌকাভ্যন্তরে উপবিষ্ট ওৎবা ভাবিল, বেদুঈনগণ তাহাকেই ধরিতে ছুটিয়া আসিয়াছে! ভয়ে নৌকার বাহিরে আসিবার সাহস সে পাইল না। সন্তরণরত যুবকদের বেদুঈন ভাবিয়া তাহাদের নাগালের বাইরে পলায়ন করিবার জন্য নৌকার মাঝিদের সে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। মাঝিরা ওৎবার মাতা ছাহেরার আজ্ঞাবহ। ছাহেরার অনুজ্ঞাক্রমে তাহারা যথাশক্তি নৌকা বাহিতেছে। ওৎবা নিজেও প্রাণপণ দাঁড় টানিতে কসুর করিল না। অনুকূল বায়ুভরে ও ক্ষেপণীর আঘাতে তরণী তরঙ্গোপরি নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতে লাগিল সোজা উত্তর দিকে।

কিছুকাল শুশ্রুষার পর সুফিয়া চক্ষু মেলিয়া তাকাইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাবিলের কন্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল 'ওগো তুমি এসেছ? এসেছ প্রিয়ে?' তাহার দুই চোখে অশ্রু ফোঁটা জমিয়া উঠিয়াছে, হাবিল ছাড়া অন্য কোন দিকে আর লক্ষ্যই নাই।

ডান হস্তে সুফিয়ার অশ্রুধারা মুছাইতে মুছাইতে হাবিল বলিল, 'সুফিয়া! তোমার কাছে কি না এসে পারি? কিন্তু তোমাকে পেয়েও যে হারাতে বসেছিলাম। পাড়ায় পৌঁছেই শুনি, তুমি গেছ দরিয়ায়; ধাওয়া করলাম তখন তখনি; কিন্তু কোথায় যাচ্ছিলে সে নৌকায়?'

সুফিয়া আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সবই অদৃষ্টের লিখন। আজ তুমি ফিরে এসেছ, কত আমার আনন্দ; কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও অন্তর পুড়ে ছাই হচ্ছে।'

হাবিল ব্যথিত হইয়া বলিল, 'কেন, কি হয়েছে সুফিয়া?'

সুফিয়া দুই চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, 'রায়হান ভাইকে কি মনে পড়ে তোমার? তাঁরই প্রেয়সী সায়ফুনকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম দরিয়ায়, কিন্ত এক দস্যু তাকে হরণ করে পালাচ্ছে ঐ নৌকায়।' সে সমুদ্রের দিকে হাত উঠাইয়া দেখাইয়া দিল।

রায়হান তন্ময় হইয়া সায়ফুনের কথাই ভাবিতেছিল। সুফিয়ার সব কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু সায়ফুনের নাম শুনিতেই তাঁহার ধ্যান ভাঙিল। তিনি সুফিয়ার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বলছো সুফিয়া? কোথায় সায়ফুন? কে পালাচ্ছে?'

সুফিয়া হাবিলের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিল, সেইজন্য এতক্ষণ আর কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। এইবার চোখের সম্মুখে রায়হানকে দেখিবামাত্র আবেগাধিক্যে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'অ্যাঁ। কে! রায়হান ভাই!' সঙ্গে সঙ্গে সে আবার চেতনা হারাইয়া ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িল।

রাহেল সুফিয়ার কথাগুলো সব শুনিয়াছিল। সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখে, নৌকাখানি তটদেশ ঘেঁষিয়া ছুটিয়াছে সোজা উত্তর দিকে। তৎক্ষণাৎ তরবারি হস্তে অশ্বারোহণপূর্বক সেই দিকেই সে দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিল, নৌকার বরাবর পৌঁছিয়া দস্যুকে আক্রমণ করিতে সমুদ্রগর্ভেই লাফাইয়া পড়িবে।

শ্রমাধিক্যে রায়হানের হস্তপদ যেন শিথিল হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিলেও ত্বরিদ্বেগে উঠিয়া রাহেলের সাহায্যার্থে তাহার পশ্চাতে ছুটিবার জন্য তিনি অসিহস্তে অশ্বারোহণ করিলেন। সহসা দৃষ্টি পড়িতেই তিনি দেখিলেন, এক দল অশ্বারোহী ক্ষিপ্র গতিতে তাহাদের দিকেই যেন ছুটিয়া আসিতেছে– বেদুঈন বলিয়া মনে হইল। ইতিমধ্যে রাহেল অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। রায়হান ঘাড় ফিরাইয়া দেখেন, দূরে জলধিবক্ষে ক্ষুদ্র জলযানখানা উড়ন্ত পাখীর ন্যায় ক্রমেই যেন ছোট হইয়া আসিতেছে, নিকটে সমুদ্রতটে হাবিল ও হারিস সুফিয়ার জ্ঞান সঞ্চারে ব্যাপৃত। রায়হান চিন্তা করিয়া দেখিলেন হাবিল পরিশ্রান্ত, হারিসও যোদ্ধা নহে; ক্ষিপ্ত বেদুঈনদের আক্রমণ হইতে কে ইহাদিগকে রক্ষা করিবে? এদিকে আক্রমণকারী বেদুঈনদল প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি কোষমুক্ত তরবারি বজ্রমুষ্টিতে স্বহস্তে ধারণ করিয়া অশ্ববল্গা সংযত করিলেন। সুফিয়ার মুখে সায়ফুনের নাম শুনিবামাত্র তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইবার উপক্রম; তথাপি অন্তর্নিহিত শৌর্য–বীর্য মাথাচাড়া দিয়া উঠিল, দুই নয়নের অশ্রুধারা ভেদ করিয়া প্রবল হিংসানল তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে কঠোর কাঠিন্যের ছাপ ফুটাইয়া তুলিল।

সুফিয়া চেতনা ফিরিয়া পাইতেই চোখ মেলিয়া দেখে সম্মুখে হাবিল। অদূরে অশ্বপৃষ্ঠে রায়হান। সে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ভাইজান এসেছেন! আহ্ বড় দেরি হয়ে গেল! আরো কি সে বলিতে যাইতেছিল– এমন সময় অবাক হয়ে দেখে– তরবারিহস্তে একদল বেদুঈন সেই স্থানে পৌছিয়াছে, পুরোভাগে সর্দার আনসার। তাহাদের দেখিবামাত্র মনোমধ্যে কি কথা উদয় হইতেই সে নিজেকে সংযত করিয়া সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পিতাকে বলিল, 'আব্বা! ঐ দেখ তোমার বন্দিনীকে এক জলদস্যু হরণ করে আবিদের নৌকায় পালাচ্ছে! শিগ্‌গির তাদের বন্দী করে আন। আমি নিজে ওদের শাস্তির ব্যবস্থা করবো।'

তৎক্ষণাৎ সর্দার দলবলসহ সমুদ্রের কিনারে কিনারে নৌকার দিকে ছুটিল। রায়হানও তাদের সঙ্গে ছুটিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু, সুফিয়া হাত উঠাইয়া নিরস্ত করিল।

রায়হান কি যেন আশঙ্কায় মর্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন বারণ করছো সুফিয়া? দস্যুরা কাকে হরণ করছে?'

সুফিয়া অন্তরের আনন্দ যথাসম্ভব চাপিয়া বিমর্ষ বদনে বলিল, আব্বার এক বন্দিনীকে। আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ দস্যুটা যে–ই হোক মাঝিরা আব্বার পরিচিত। তাকে দেখলে মাঝিরা নিশ্চয়ই নৌকা কূলে ভিড়াবে।'

'কিন্তু সায়ফুনের কথা কি যেন বলছিলে শুনলাম?'

'সে–ই ত আমাদের বন্দিনী! কেন, জগতে আপনার প্রেয়সী ছাড়া আর কোন সায়ফুন থাকতে নেই বুঝি? এখন চলুন ত, পল্লীতে গিয়ে বিশ্রাম করবেন। কি হাবিল! এমনি করে শুধু হা করে তাকিয়েই থাকবে, না আমাকে নিয়ে পল্লীতে যাবে?'

হাবিল একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া একমনে কি যেন ভাবিতেছিল–জলদস্যুদের কথা, বন্দিনীর কথা। হঠাৎ সুফিয়ার ডাকে সে যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইল। বলিল, 'তুমি আমার ঘোড়ায় চড়ে চলে যাও পল্লীতে, আমি বরং যোদ্ধাদের ফেরার অপেক্ষায় এখানে থাকি, বন্দীদের নিয়ে আসবো তাদের সঙ্গে। কিন্তু কে বন্দিনী, কাকে হরণ করছে দস্যুরা, আমিও ত তা' বুঝতে পারছি না!'

সুফিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'তোমার অত শত বুঝে দরকার নেই। সে বোঝার দেমাগও তোমার নেই। ঘোড়ার বল্‌গা টেনে আগে চল। চলুন রায়হান ভাই!'

রায়হান বিষণ্ন বদনে বলিলেন, 'আমাকে আর টেনো না সুফিয়া। রাহেল ফিরে এলে উভয়ে রওয়ানা হব সায়ফুনের সন্ধানে।'

সুফিয়া হাসিয়া বলিল, 'বিশ্বাস করুন, কালই বেদুঈন পল্লীর সকলে মিলে আপনার সায়ফুনকে খুঁজে বের করবো। নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন পল্লীতে চলুন।'

সমুদ্র-গর্জন পশ্চাতে ফেলিয়া, দস্যু-ভয় দূরে ঠেলিয়া সকলে আর্দ্র দেহে অশ্বপৃষ্ঠে পল্লীর পথে যাত্রা করিল। হাবিল কেবল সুফিয়াকে অশ্বোপরি বসাইয়া নিজে লাগাম টানিতে ব্যস্ত। অপরাহ্নের নিষ্প্রভ প্রায় রবি-রশ্মি তাহাদের সর্বাঙ্গে লুটাইয়া বুঝি-বা হাসিয়া কুটপাট।

ষাট

বেলা প্রায় অবসান। মুক্তি পাইয়া সায়ফুন অশ্বপৃষ্ঠে বারংবার কশাঘাত করিতেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে এক একবার পশ্চাতে ঘাড় ফিরাইয়া সে দেখে কেহ অনুসরণ করে কিনা। সমুদ্রের তটদেশে পৌঁছিয়া সে সোজা উত্তরদিকে ভ্রাতার নির্দেশিত পথে ছুটিতে লাগিল। যে নৌকায় তাহার পালাইবার কথা ছিল, তাহা দরিয়ার কিনারে তরঙ্গাঘাতে দুলিতেছে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনিই ঠেলিয়া বাহির হইল।

বীচিবিক্ষুব্ধ অকুল পয়োধি সায়ফূনের চোখে বড় অপরূপ দেখাইতেছে। সমুদ্র এত সুন্দর আর কখনও সে দেখে নাই। শেষ রবিরশ্মি দিগন্ত–প্রসারী সাগরবক্ষে চঞ্চল তরঙ্গমালার উপরে সৃষ্টি করিয়াছে এক অপরূপ বিচিত্র শোভা। ঢেউগুলো একে অপরকে ঠেলিয়া দিয়া, কূলে ভাঙিয়া, বেলাভূমিতে লুটাইয়া, প্রাণের কত গোপন কথা, কত আকুলি–বিকুলি তাহার কানে যেন শোনাইতে লাগিল। সায়ফূন সে দৃশ্য আজ নয়ন ভরিয়া দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল। দরিয়ার স্নিগ্ধ হাওয়া ধীরে ধীরে তাহার সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া অন্তরের জ্বালা অনেকটা প্রশমিত করিয়াছে। দীর্ঘদিন কারাবাসের পর আজ প্রথম সে উপভোগ করিল স্বাধীনতার সুখ। সম্মুখে সমুদ্রমেখলা ধরণী, উপরে অনন্ত আকাশ, অপূর্ব শোভায় মহিমান্বিত হইয়া তাহার দুই চক্ষু আজ ধন্য করিয়াছে।

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও গুৎবার জন্য নিদারুণ দুর্ভাবনায় তাহার প্রাণে সর্বক্ষণ যেন কাঁটার ন্যায় খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধে। না জানি ভাইয়ের অবস্থা এতক্ষণে কি হইয়াছে! সুফিয়ার নিকটে ধরা পড়িয়া গেলে কি হইবে উপায়! কতখানি স্নেহ–মমতার বশে ভ্রাতা ভগ্নীর জন্য এতটা বিপদের ঝুঁকি স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া নিয়াছে, তাহা পরিমাপ করে কার সাধ্য। কিন্তু উপায় কি!

পাগলকে যে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। মহান আল্লাহ্ তাহাকে যেন রক্ষা করেন- এই শুধু তাহার আকুল প্রার্থনা।

বহু পথ অতিক্রম করিয়াও সমুদ্রতটে কোন পল্লীর সন্ধান সে পাইল না। এদিকে দিনমণি অস্তপ্রায়; আর কতদূরই বা যাইবে, সায়ফুন ভাবিয়া পায় না। এক টিলার উপরে উঠিয়া যতদূর চক্ষু যায় সে তাকাইয়া দেখিল; কিন্তু পল্লীর চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইল না। সমুদ্রবক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল বহু দূর হইতে একখানি ক্ষুদ্র জলযান পাল উড়াইয়া তাহারই দিকে যেন অগ্রসর হইতেছে। ভাবিল, সুফিয়া তাহার জন্য যে নৌকাখানি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, হয়তো বা ওৎবা সেই নৌকায়ই আসিতেছে। অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া সে ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হইবার আশায় হৃষ্টচিত্তে টিলার উপরেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নৌকা ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। মাঝি-মাল্লা ও আরোহীদের অস্পষ্ট অবয়ব সায়ফুনের দৃষ্টিগোচর হইল, কিন্তু কাহাকেও সে চিনিতে পারিল না। নিরাশ অন্তঃকরণে সেইদিক হইতে নয়ন ফিরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে দেখিল, বহুদূর হইতে কে একজন অশ্বারোহী যেন ধূলিবালি উড়াইয়া তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। এইবার সে ভাবিল, নিশ্চয়ই তাহার সন্ধানে ছুটিয়া আসিতেছে ভাই ওৎবা। আশায়, আনন্দে দুঃখিনীর অন্তর দুলিয়া উঠিল। এক হাতে অশ্ববল্গা ও অপর হাতে তরবারি ধারণ করিয়া সে ভ্রাতার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই সে দেখিল, অশ্বারোহী প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে নিকটে। তটদেশ ঘেঁষিয়া নৌকাখানিও অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সায়ফুনের কাছাকাছি পৌছিল সেই অশ্বারোহী। তাহাকে দেখিবামাত্র সায়ফুনের মাথার উপর দুর্ভাবনার পাহাড় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিল-অশ্বারোহী ওৎবা নহে, তাহারই চিরশত্রু রাহেল। তাহাকে দেখিবামাত্র সায়ফুনের নয়নদ্বয়ে জ্বলিয়া উঠিল প্রবল প্রতিহিংসানল। তরবারি বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল, " রে নির্মম পাষণ্ড! এখনো তোর শয়তানি শেষ হলো না. আবার পিছু পিছু ছুটে এসেছিস এতদূর? আয়, আজ আমার অন্তরের জ্বালা না মিটিয়ে ছাড়বো না।" এই বলিয়া সে অমিতবিক্রমে রাহেলকে আক্রমণ করিল।

ছদ্মবেশী সায়ফুনের ভর্ৎসনা–বাক্য ও আক্রমণ রাহেল গ্রাহ্য করিল না। সম্মুখে সমুদ্রপথে দ্রুত পলায়মান নৌকাটার দিকেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সুফিয়ার মুখে সে শুনিয়াছে, সেই নৌকায়ই জলদস্যু সায়ফুনকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দস্যুকে আক্রমণ করিয়া সায়ফুনকে ছিনাইয়া লইবার জন্য সে প্রাণপণ ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে এই উন্মত্ত যুবকের অপ্রত্যাশিত আক্রমণ তাহার কার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিল দেখিয়া তাহার বিরক্তির অবধি নাই। যুবকের প্রতি ভালভাবে একবার তাকাইয়া দেখিবার অবকাশও সে পাইল না। জলদস্যু হাতছাড়া হইয়া গভীর সমুদ্রে পালাইয়া যাইবে, সায়ফুনের উদ্ধারের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে– এই চিন্তাই তাঁহার অন্তর জুড়িয়া বসিয়াছে। কোনক্রমে যুবকের আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে সে অবাক হইয়া দেখে– সেই পলায়মান জলদস্যুর তরণী কিয়দ্দূরে কূলে আসিয়া ভিড়িয়াছে। হতভম্ব রাহেল তৎক্ষণাৎ অসিহস্তে নৌকার দিকে ছুটিল বেলাভূমির বালুকাময় ঢালু পথ বাহিয়া।

কিন্তু সায়ফুন এত সহজে রাহেলকে অব্যাহতি দিল না। যে নিষ্ঠুর লম্পট তাহার জীবন বিরহ–যাতনায় জর্জরিত করিয়াছে; অপমানে, লাঞ্ছনায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে আজ সমুচিত শিক্ষা না দিয়া সে ছাড়িবে না। উন্মত্তা নারী তৎক্ষণাৎ তরবারি হস্তে রাহেলকে তাড়া করিতে করিতে দানবীর ন্যায় ছুটিল।

ওৎবা সায়ফুনের সন্ধানে তটদেশে দৃষ্টি মেলিয়া নৌকা বাহিয়া আসিতেছিল। তাহার সন্ধান পাইবামাত্র তরণী কূলে ভিড়াইয়া সে অবাক হইয়া দেখে এক যুবক অসিহস্তে তাহার নৌকার দিকেই যেন ছুটিয়া আসিতেছে এবং তাহাকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে সায়ফুন। ব্যাপারটা তাহার বোধগম্য হইল না। আর কিছুটা কাছাকাছি হইতেই পশ্চাদ্ধাবিত যুবককে চিনিতে পারিয়া তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ সে তীরে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাদের দিকে ছুটিল।

নৌকা হইতে ভাই ওৎবা তাহার সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া সায়ফুনের বুকের বল বাড়িয়া উঠিল দ্বিগুণ। সে মহাপরাক্রমে রাহেলকে আক্রমণ

করিয়া তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাত করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় পশ্চাদ্দেশ হইতে ওৎবা চিৎকার করিয়া উঠিল, "সায়ফুন! এ কি করছিস! কাকে আঘাত হানছিস! থাম! থাম!"

রাহেল ওৎবাকে দেখিয়া বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ভাই ওৎবা! তুমি এখানে কোথা হতে এলে? কোথায় সায়ফুন?"

ওৎবা হাসিয়া উত্তর করিল, "সায়ফুনকে এখনও চিনতে পারনি? একবার চেয়ে দেখ না ভাল করে যুদ্ধ করছো কার সঙ্গে! কিন্তু এখানে কোথেকে এল রাহেল? কবে ফিরলে তুমি মুলুকে?"

রাহেল এইবার যুবক-বেশী সায়ফুনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল! সায়ফূনের ক্রোধাগ্নি তখনও নির্বাপিত হয় নাই। অদূরে দাঁড়াইয়া মনের খেদে শুধু সে ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছে।

হতভম্ব রাহেল ওৎবাকে কি যেন বলিতে চাহিল, এমন সময়ে উভয়ে অবাক হয়ে দেখে একদল অশ্বারোহী যুবক তাহাদের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। ওৎবা বুঝিল, বেদুঈনগণ টের পাইয়া তাহাকে ও সায়ফুনকেই ধরিতে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ সে সায়ফূনকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সেই নৌকায় পালাইতে নির্দেশ দিল; নিজে তাহার হাত হইতে তরবারি টানিয়া লইয়া তাহারই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। নিমেষমধ্যে রাহেলও ঘোটককে রাস্তার দিকে ফিরাইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। সায়ফুনের বুঝিতে বাকী রহিল না, বেদুঈন আবিদের দল তাহাকে ধরিবার জন্যই ছুটিয়া আসিতেছে। তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। দুর্ভাগ্যের বেড়াজাল হইতে শত চেষ্টা করিয়াও সে নিষ্কৃতি পায় নাই, পরন্তু ভ্রাতাকেও বিপজ্জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছে-ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার সর্বাঙ্গ ভয়ে ও অনুশোচনায় যেন অবশ হইয়া উঠিল।

রাহেল আগতপ্রায় মহাশত্রু বেদুঈনদের মুকাবিলা করিতে হইবে বলিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, সুতরাং ওৎবা ও সায়ফুনের কাহিনী শুনিবার বা তাহাদের কোন কিছু বলিবার অবকাশ তাহার আর ঘটিল না।

অশ্বারোহী ওৎবা নৌকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "সায়ফুন! আর বুঝি তোকে রক্ষা করতে পারব না, শিগগির ঐ নৌকায় পালা!"

সায়ফুন শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "ভাইজান! কোথায় আমাকে যেতে বলছো। নৌকায়? তোমাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে একা আমি পালাব! না, মরতে হয়তো একই সঙ্গে মরবো।"

ওৎবা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, " সায়ফুন! কুরাইশ যুবক মৃত্যুকে যে ভয় করে না, সে কথা কি তোর জানা নেই! কিন্তু তোর অপমান ত সহ্য করতে পারব না। যা, শিগ্‌গির পালা!"

ততক্ষণে বেদুঈনগণ প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। অস্ত্রহারা সায়ফুন অনন্যোপায় হইয়া দ্রুতপদে নৌকার দিকে ছুটিল। পালাইবার আর ঠাঁই-ই বা কোথায়!

নৌকায় উঠিবামাত্র সায়ফুন দেখিল, সম্মুখে পরিচারিকাবেশে তাহারই বিমাতা উপবিষ্টা। বাক্যহারা যুবতীর নয়নে সীমাহীন বিস্ময়। হতভম্ব বিমাতার চোখেও বিহবলতার অবধি নাই। সায়ফুন 'আম্মা আম্মা' বলিয়া চিৎকার করিয়া বিমাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বৃদ্ধা ছাহেরা তাহাকে বুকে জড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "আরে, এ যে সায়ফুন! আমার হারানিধি! বুকের মানিক! তুই বেঁচে আছিস আম্মি! কোথা থেকে এলি বেটি?" মাতার চোখে আর কন্যার চোখে একাধারে নামিয়া আসিয়াছে বিরামহীন অশ্রুধারা। সে অশ্রু দুঃখের , না সুখের –উচ্ছ্বসিত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ, না দুশমনের আক্রমণাশঙ্কায়– কে বলিবে।

মাঝিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক্ষণে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নৌকা কূলে রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ঠাঁয়।

হঠাৎ সায়ফুনের কানে আসিল–তটদেশে পরিচিত কণ্ঠে কে যেন চিৎকার করিয়া উঠিল, " রে দুরাচার জলদস্যু! কোন সাহসে আমার আশ্রিতা কন্যাকে হরণ করে নিয়ে এসেছিস? এত বড় আস্পর্ধা! আমার তাঁবুতে চুরি করার দুঃসাহস!"

সায়ফুন ঘাড় ফিরাইয়া দেখে তটদেশে যে প্রলয়কাণ্ড! প্রায় পঞ্চবিংশতি বেদুঈন যুবক চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাহেল ও ওৎবাকে আক্রমণ করিয়াছে–পুরোভাগে সর্দার আনসার। সায়ফুন সভয়ে চিৎকার করিয়া আবার বিমাতাকে জড়াইয়া ধরিল।

রাহেল নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করিতে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা দস্যু নই–হাবিলের বন্ধু! হাবিলকে ত আমরাই উদ্ধার করে এনেছি!" কিন্তু কে শুনে তাহার সেই কৈফিয়ত!

সর্দার আনসারের মনে কি যেন একটা সন্দেহ বারবার দোলা দিতে লাগিল। সঙ্গীদের আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া সে বলিল, 'মিথ্যা কথা! তোমরা যদি হাবিলের বন্ধু হও, তবে দস্যু কারা?" ওৎবার দিকে ফিরিয়া সে পুনরায় বলিল, 'নিশ্চয়ই তুমি দস্যু, নইলে তোমার গায়ে স্ত্রীলোকের সাজ-পোশাক কেন? নারীর বেশে পল্লীতে প্রবেশ করে আমার বন্দিনীকে তুমিই হরণ করে এনেছ!"

ওৎবা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পায় না। নিজের ও ভগ্নীর আসন্ন বিপদ চিন্তা করিয়া তাহার শক্তি-সাহস যেন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, দলবদ্ধ বেদুঈনদের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতাও দেহে আর অবশিষ্ট নাই।

অল্পক্ষণমধ্যেই বেদুঈনগণ পর্যুদস্ত রাহেল ও ওৎবাকে বন্দী করিয়া পল্লীর দিকে লইয়া ছুটিল। সায়ফুন মাথা তুলিয়া দেখে– সর্দার আনসার তরবারি উঠাইয়া নৌকার দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। এইবার নিদারুণ ভয় ও নৈরাশ্যে চিৎকার করিয়া নৌকাবক্ষে সে লুটাইয়া পড়িল।

সর্দার দেখিয়া অবাক–মাঝিরা সকলেই যে তাহার পরিচিত, কন্যার অনুরোধে নিজেই তাহাদিগকে আল-সালেম হইতে আনাইয়াছিল। দস্যুরা তাহাদেরই নৌকায় পলায়ন করিতেছিল দেখিয়া সর্দারের দুঃখ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নৌকার ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিল, –কিন্তু কোথায় দস্যু। নৌকাভ্যন্তরে মাঝিরা ছাড়া অন্য কোন পুরুষ মানুষও যে নাই! তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না– যে দুইজনকে বন্দী করা হইয়াছে, তাহারাই দস্যু! সর্দার মাঝিদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, তারপর পুনরায় তাহাদিগকে বেদুঈন-পল্লীর দিকে ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিয়া নিজে

অশ্বারোহণে পল্লীর পথ ধরিল। মাঝিরা সর্দারের ভয়ে নৌকা ফিরাইয়া যথা আজ্ঞা ক্ষেপণী সঞ্চালন করিতে লাগিয়া গেল।

তরণী তরঙ্গমালার মাথায় মাথায় সায়ফুনের অন্তরের অন্তহীন ব্যথার পাহাড় বহন করিয়া লইয়া চলিল। সূর্য পাহাড়ের তলায় নামিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ। তটভূমিস্থ জঙ্গলের কালো ছায়া পথঘাট ছাপাইয়া দরিয়ায় পানির উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে বহুদূর। কতক্ষণ পরেই সমুদ্রের বুকে একখানি সোনার থালা ঝলমল করিয়া ভাসিয়া উঠিল। আজ যে পূর্ণিমা! দেখিতে দেখিতে সীমাহীন সাগরবক্ষে অগণিত উর্মিমালা রজতমুকুট পরিধান করিয়া অপরূপ বেশে মহানন্দে যেন নাচিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে উপরের পার্বত্য-প্রদেশ ও মরুকান্তার অনুপম সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।

আগাইয়া গিয়াছে। রায়হান ঘাড় ফিরাইয়া দেখেন, দূরে জলধিবক্ষে ক্ষুদ্র জলযানখানা উড়ন্ত পাখীর ন্যায় ক্রমেই যেন ছোট হইয়া আসিতেছে, নিকটে সমুদ্রতটে হাবিল ও হারিস সুফিয়ার জ্ঞান সঞ্চারে ব্যাপৃত। রায়হান চিন্তা করিয়া দেখিলেন হাবিল পরিশ্রান্ত, হারিসও যোদ্ধা নহে; ক্ষিপ্ত বেদুঈনদের আক্রমণ হইতে কে ইহাদিগকে রক্ষা করিবে? এদিকে আক্রমণকারী বেদুঈনদল প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি কোষমুক্ত তরবারি বজ্রমুষ্টিতে স্বহস্তে ধারণ করিয়া অশ্ববল্গা সংযত করিলেন! সুফিয়ার মুখে সায়ফুনের নাম শুনিবামাত্র তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইবার উপক্রম; তথাপি অন্তর্নিহিত শৌর্য-বীর্য মাথাচাড়া দিয়া উঠিল, দুই নয়নের অশ্রুধারা ভেদ করিয়া প্রবল হিংসানল তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে কঠোর কাঠিন্যের ছাপ ফুটাইয়া তুলিল।

একষট্টি

বেদুঈন-- পল্লীতে পৌঁছিবামাত্রই হাবিলকে দেখিয়া পল্লীর আবাল বৃদ্ধ বণিতারা মহোল্লাসে মাতিয়া উঠিল। হাবিল ছিল যুবকদের প্রিয় নেতা। কাজেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া যুবকেরা ছুটিয়া আসিল সর্বাগ্রে তাহার নিকটে। দেখিতে দেখিতে আবিদের বিবাহের আসরটি অদৃশ্য হইয়া গেল ভোজবাজির মত। যুবকেরা হাবিলকে ঘিরিয়া লইয়া কত কি যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

এমন সময় সুফিয়া ছুটিয়া আসিয়া অদূরে একপাশে টানিয়া লইল হাবিলকে। তাহার কানে কানে কি কথা বলিতেই হাবিলের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অনুচরকে সাথে লইয়া হাবিল ছুটিয়া গেল কিয়দ্দূরে এক তাঁবুতে। সেখানে রায়হানের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁবুটিকে তাহারা ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইতে লাগিল। যুবকের নির্দেশে ছেলেমেয়েরা ছুটিল অদূরে বনমধ্যে পত্রপুষ্পের সন্ধানে। রায়হান অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই হাবিল! বহু দিন পরে ফিরে এসেছ, কোথায় একটু বিশ্রাম করবে, সুখ–দুঃখের আলাপ করবে, তা' না করে কিসের এত ছুটাছুটি? কেন এত সাজগোজ?"

হাবিল হাসিয়া বলিল,"কথা বলার সময় এখন কোথায়! কত কাজ!"

"ব্যাপার কি বল ত? রাহেলই বা ফিরে আসে না কেন?"

"ব্যাপার বড় গুরুতর! একটু পরেই সুফিয়া ফিরে আসবে, তখন সব কথাই জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। এখন চুপচাপ বসে থাকুন ত তাঁবুর ভেতরে শান্ত–শিষ্ট ছেলেটির মত। সাবধান! বাইরে যেন বেরুবেন না কোথাও!"

"কেন বল ত? বাইরে বেরুবো না কেন? আমি কি তোমাদের বন্দী নাকি?"

"কতকটা সেই রকমই প্রায়। কেন, জানেন না, কুরাইশদের সঙ্গে আমাদের দুশমনি চিরকালের?" এই আক্রমণাশঙ্কায় সে তাঁবুর খুঁটিতে ঝুলান রায়হানের তরবারিখানি লইয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল। কয়েকজন যুবক প্রহরায় নিযুক্ত রহিল তাঁবুর দ্বারদেশে।

রায়হান ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দড়ির চারপায়ায় বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। কি যেন বিপদাশঙ্কায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

✪ ✪ ✪ ✪

পল্লীতে পৌঁছিয়া সর্দার আনসার কন্যাকে ডাকিতে ডাকিতে বলিল, " আম্মা সুফিয়া! তোর হুকুম মাফিক ধরে এনেছি বন্দিনীকে, দস্যু দুটাও বন্দী হয়েছে। তোর ইচ্ছা পূরণ করেছি বেটি, এইবার এদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা কর।" সুফিয়া ছুটিয়া তাঁবুর বাহিরে গিয়া তাহার আব্বার কানে কানে কত কি যেন বলিল! সর্দার স্মিতহাস্যে তাঁবুতে ফিরিয়া গেল।

সুফিয়া এইবার সায়ফুন ও তাহার মাতাকে ঠেলিতে ঠেলিতে তাঁবুতে ঢুকাইয়া কৃত্রিম ক্রোধে গর্জন করিতে লাগিল, " নিমকহারাম বন্দিনী! এত বড় আস্পর্ধা! এতদিন কত কষ্টে লালন-পালন করেছি, শাদীর ইনতেজামও সব ঠিক করে রেখেছি- আর শেষে কিনা পলায়ন! বর কখন সেজেগুজে বসে রয়েছে, আর এদিকে কনে উধাও! এত বড় দুঃসাহস! আমার মুখ দেখাবার ঠাঁই নেই! এর একটা হক সাজা না দিয়ে কি ছাড়ব নাকি?" এই বলিয়া তাহাদিগকে আপন তাঁবুতে বন্দী করিয়া রাখিয়া অপর তাঁবুর দিকে সে ত্রস্তপদে ছুটিল।

সায়ফুনের সর্বাঙ্গ থরথর কম্পমান। সুফিয়ার বাক্যবাণে মর্মাহত হইয়া অভাগিনী অঝোরে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। পরিষ্কার সে বুঝিতে পারিল, সুফিয়া রাক্ষুসী। এতদিন তাহাকে যে মায়া-মমতা ও স্নেহ-সম্ভাষণে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, যে সহানুভূতি ও সমবেদনার বাণী সে শোনাইয়াছিল, তাহার অন্তরালে নিছক ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মুনাফিকির নগ্ন রূপ তাহার অন্তর দলিত-মথিত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিল। সে ভাবিয়া পায় না-- ভাই ওৎবার ভাগ্যে না জানি কি ঘটিয়াছে! সে যে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে বেদুঈনেরা তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভগ্নীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াই না আজ

ভ্রাতার এই দুরবস্থা। পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিমাতার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতার চোখেও অশ্রুবন্যার শেষ নাই। এ আবার কি নূতন বিপদ তাহাদের জন্য অবশিষ্ট ছিল। অদৃষ্ট বিমুখ হইলে কি আর করা যায়। কাঁদিতে কাঁদিতে উভয়ে অন্তর্নিহিত বহ্নিশিখায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল।

এমন সময় সুফিয়ার সঙ্গে একদল যুবতী হাসিতে হাসিতে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল। সুফিয়ার ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাহারা রাক্ষসীর ন্যায় আক্রমণ করিয়া সায়ফুনকে মাতার বক্ষ হইতে টানিয়া ছাড়াইয়া লইল।

বাতাস জোরে বহিতেছে। সায়ফুনের ক্রন্দনে জড় ধরণীও বুঝি হা হা করিয়া বিলাপ করে, কিন্তু পাষাণী রাক্ষসীদের মন টলিল কই।

বন্দিনীর দেহে বিন্দুমাত্র শক্তিও যেন অবশিষ্ট নাই। অপরিসীম দুঃখ–দুর্দশা ভোগ করিয়াও আশায় আশায় যে স্বপ্ন–সৌধ এতদিন সে আপন বক্ষে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা আজ নিষ্ঠুর সুফিয়ার নির্মম আঘাতে ধূলিসাৎ হইল দেখিয়া, হতভাগী পাগলিনীর ন্যায় আপন বসন–ভূষণ টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। মনে পড়ে, বিবাহের প্রস্তাব করায় আবিদকে সে একদিন প্রহার করিয়াছিল, আর আজ কিনা সুফিয়া কৌশলে তাহাকে সেই পাষণ্ড বেদুঈনের সঙ্গেই বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চায়। নিষ্ফল ক্রোধে সে হাত পা ছুড়িয়া, আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া, বেদুঈন–যুবতীদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহারা এই পাগলিনীর আচরণ কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না, জোর করিয়া তাহাকে গোসল করাইতে তাঁবুর পশ্চাতে লইয়া চলিল। যুবতীদের কলহাস্যে প্রান্তর মুখরিত। এমন সময় সুফিয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের তাগিদ দিল, "শিগ্‌গির সাজিয়ে গুজিয়ে নে, বর কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে!" সে হাসিতে হাসিতে পুনরায় বাহিরে দৌড়াইল।

শোকে, দুঃখে ও শ্রমাধিক্যে সায়ফুন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বেদুঈন যুবতীদের নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করিবার ক্ষমতা দেহে আর অবশিষ্ট ছিল না। শক্তি–সাহস সব হারাইয়া, অদৃষ্টকে বারবার ধিক্‌কার দিতে দিতে সে অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। যুবতিগণ কিন্তু একটুও টলিল না, সমস্বরে বিবাহের সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তাহারা সায়ফুনকে জোর করিয়া গোসল

করাইয়া যে যেমন পারিল সাজাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা সায়ফুনের পুরুষের বেশ জোর করিয়া ছাড়াইয়া তাহাকে অনুপম রূপ-লাবণ্যবতী কনের বেশে সাজাইল। বহুদিন যাবত অযত্নে রক্ষিত রুক্ষ কুন্তলদাম আজ সুগন্ধি তৈল ও পুষ্পসারে চর্চিত হইয়া কবরী, কুসুম-স্তবকে সুশোভিত হইল। বিচিত্র বসন-ভূষণে ও প্রসাধনে অর্ধমূর্ছিতা রমণীর দেহ অপূর্ব মাধুর্য ও সুষমায় ভরিয়া উঠিল। যুবতীরা তখন কোমর দোলাইয়া, কেশ এলাইয়া, অঙ্গভঙ্গি করিয়া, নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও রসালাপে কনেকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে।

অল্পক্ষণ পরেই সুফিয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "সর্বনাশ! তোদের যে শেষ হয়নি এখানো? এদিকে বর যে ক্ষেপে উঠেছে। বাঃ! বড় সুন্দর সাজিয়েছিস ত! আমিই যে মজে গেছি সুন্দরীর প্রেমে, পুরুষ আর কোন্ ছার!" এই বলিয়া সে সায়ফুনের গণ্ডদ্বয় টিপিয়া দিতেই যুবতীদের কেহ কেহ তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, কয়েকজন হাসিতে হাসিতে নাচিতে লাগিল উল্লাসে হাততালি দিয়া। দুঃখে সায়ফুনের অন্তর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। তখনো যুবতীদের হাত জোরে ঠেলিয়া তাহাদের বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে বারবার সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

নাচ-গানে সমগ্র বেদুঈন পল্লী আজ মুখরিত; দেখিতে দেখিতে পল্লীর বালক-বালিকা, যুবতী-পৌঢ়া ও বৃদ্ধারা দলে দলে সুফিয়ার তাঁবুতে ছুটিয়া আসিয়া সে নাচ-গানে যোগ দিল। তাঁবুর বাহিরে বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়াদের কয়েকজন গান গাহিতে গাহিতে রুটি সেঁকিতে শুরু করিয়াছে, আর একদল নানাবিধ সুস্বাদু আহার্য ও পানীয় প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। ভোজ্য-সামগ্রীর মনোলোভা গন্ধে পল্লীর আকাশ-বাতাস ভরপুর।

সহসা সুফিয়ার তাঁবুর দুয়ারে আবির্ভাব ঘটিল সর্দার আনসারের। সর্দারের প্রশান্ত বদনে অন্তরের নিঃসীম আনন্দ যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেটি সুফিয়া! এখনও তোদের হলো না? আর ত বিলম্ব করা চলে না আম্মা! ঐ দেখ চাঁদ কত উপরে উঠেছে। এখনই যে তোকেও হাবিলের হাতে সমর্পণ করতে চাই বেটি!"

সুফিয়া লজ্জায় অধোবদনা। অন্তরের অফুরন্ত আনন্দ সে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া পদাঙ্গুষ্ঠে ভূমিতল খুঁটিতে লাগিল।

তাঁবুর ভিতর হইতে কয়েকজন যুবতী একসঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া সর্দারকে জিজ্ঞাসা করিল, " হাঁ চাচা! আজই কি সুফিয়ারও শাদী?"

সর্দার হাসিতে হাসিতে বলিল, " হাঁ আম্মা! আজই। ভুলে গেছ বলেছিলমা, পূর্ণিমা রজনীতে শাদী দেব সুফিয়ার? এমন সুখের পূর্ণিমা আমাদের জীবনে আর ত কখনো আসেনি! সায়ফুনকে শাদী দিয়ে তোমরা সুফিয়াকেও সাজিয়ে নাও।"

সুফিয়ার বিবাহের কথা শুনিয়া যুবতীরা আবার নূতন আনন্দে, নুতন উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। কেহ কেহ সুফিয়াকে ঘিরিয়া লইয়া মহানন্দে নাচিতে গাহিতে শুরু করিল।

সুফিয়া কোনক্রমে ইহাদিগকে ঠেলিয়া পিতার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আব্বা! সায়ফুনের মুরুব্বী যে কেউ নেই এখানে! কে তাকে সমর্পণ করবে বরের হাতে?"

সর্দার কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, " কেন আম্মা! তোমার আব্বা ত বেঁচে রয়েছে এখনো! একের স্থলে দুই মেয়েই ত লাভ করেছি আমি। আজ দু'জনেরই নিকাহ্ দিয়ে তুলে দেব শওহরের হাতে।"

সুফিয়ার অন্তর আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পিতার হাত ধরিয়া সে বলিল, আব্বা! তুমি ত জান না, সায়ফুন যে মুসলমান!"

সর্দার কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, হোক না আম্মা মুসলমান, সে যে আমার কন্যা!"

আনন্দে সুফিয়ার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। হাসিতে হাসিতে ছোট শিশুর ন্যায় পিতার হাত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে সে গদগদ কণ্ঠে বলিল, " নিকাহ্ দেবে কিরূপে আব্বা? মুসলমানী শাদী তুমি জান নাকি?"

কন্যার উল্লাসে পিতার বক্ষও আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। বলিল, " না আম্মা, জানি না, আমি শুধু তাকে অন্তরের আশীর্বাদ জানিয়ে দেবতার দোয়া মাগবো, সুখ-শান্তি আরয করবো। শরীয়তী শাদী না হয় পরেই হবে। যাও বেটি, শিগগির

তাকে নিয়ে এস মাহফিলে।" এই বলিয়া সর্দার প্রসন্ন বদনে বিবাহের মজলিসে যাত্রা করিল।

সুফিয়া এক দৌড়ে তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দনশীলা সায়ফূনকে বিমাতার বক্ষ হইতে টানিয়া লইয়া চলিল। সায়ফুন যেন বাহ্যজ্ঞানহারা, শক্তিহারা। বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার প্রাক্কালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর মুখে যে বিভীষিকা ফুটিয়া উঠে, তাহার চোখে মুখে ঠিক সেই অবস্থা; শিথিল অবশ পদদ্বয় যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। সুফিয়া এতসব কিছুই গ্রাহ্য করিল না। সায়ফুনের মুখমণ্ডল শুভ্র বসনে আবৃত করিয়া সে মায়মুনা, জরিনা ও অন্যান্য যুবতীদের সাহায্যে তাহাকে চেংদোলা করিয়া দ্রুত লইয়া চলিল শাদীর মজলিসে। পশ্চাতে দফ বাজাইয়া আর হাততালি দিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে একদল যুবতী।

নিকটেই এক তাঁবুতে বিবাহের আসর। সেখানে বর যেন উন্মত্তপ্রায়। জনতার ব্যূহ ভেদ করিয়া সে ছুটিয়া পালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে প্রাণপণ। হাবিল ও তাহার বন্ধুগণ নওশার হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া বেদুঈনদের প্রথানুসারে তাঁহার মুখমণ্ডল একখণ্ড শুভ্র বস্ত্রে ঢাকিয়া দিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। বরবেশধারী যুবক বাহুযুগল মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বিষণ্ন বদনে চিৎকার করিয়া উঠিল, "হাবিল। এত বড় নিমকহারাম তুমি! বাড়ী পৌছেই ভুলে গেলে সব কিছু?"

হাবিল হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "কিছুই ত ভুলিনি ভাইজান, বরং উপকারের প্রতিদানস্বরূপ ভগিনীকে তোমার সঙ্গে শাদী দিতে প্রস্তত হয়েছি। একে তুমি নিমকহারামী বলছো?"

যুবক পুনরায় চিৎকার করিয়া উঠিল, "তোমার ন্যায় অকৃতজ্ঞও জগতে আর আছে? আমাকে কি জোর করেই শাদী করাবে?"

"তুমি স্বেচ্ছায় রাজী না হলে কি আর করি বল? স্থির করেছিলাম, বহিনকে কোন মুসলমানের সঙ্গে নিকাহ দেব। আজ সে সুযোগ পেয়েছি। এমন মওকা কি হেলায় হারাব?"

নিকটে ওৎবা ও রাহেল উপবিষ্ট ছিল। ব্যাপার দেখিয়া কিছুতেই তাহারা হাসি চাপিতে পারিতেছিল না। ইহাতে যুবক আরো ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জন করিয়া

উঠিল, আহত কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে বসে কেবল তামাশা দেখছো? বেলেল্লার মত খিল খিল করে হাসছো? কেন, আমার কাহিনী কি তোমাদের জানা নেই কিছুই?"

রাহেল কৃত্রিম দুঃখে মুখ ভার করিয়া বলিল, ' তা কি আর জানি না। জানি ত সবই, কিন্তু উপায় কি! আমরাও যে বন্দী। আল্লাহ্ মিয়া ত বড় বখিলি করে গর্দান দিয়েছেন মোটে একটা কিনা!"

এমন সয়ম সুফিয়া কনে লইয়া সেই তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হইল তুমুল হর্ষধ্বনি। নববধূ ও বর উভয়েই ধস্তাধস্তি করিয়া মুখের বসন ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে আপ্রাণ। কিন্তু পারে কই।

চারিদিকের আনন্দ-কোলাহল ও হর্ষধ্বনির মধ্যে সর্দার আনসার কন্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সুফিয়া জোর করিয়া বধুর ডান হস্ত পিতার দিকে বাড়াইয়া দিতেই হাবিলও বরের ডান হাতখানি সজোরে টানিয়া আনিয়া সর্দারের দিকে প্রসারিত করিল হাসিতে হাসিতে।

সর্দারের উৎফুল্ল বদনে অনাবিল শান্তির ছায়া, দুই চক্ষু বাষ্পাকুল। সায়ফুনের কম্পিত হস্ত বরের হাতে তুলিয়া দিয়া সে আবেগ ভরা কণ্ঠে বলিল, বেটা! আজ আমার বেটিকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হলাম। মেয়েটি আমার কুড়ান মানিক। একে কিন্তু সুখী করো বাপ।" ভাবাবেসে সর্দারের কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল। আর কিছুই সে বলিতে পারিল না।

বর-বধূ উভয়েই হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সর্দারের বজ্রমুষ্টির বন্ধন কেহই ছাড়াইতে পারিল না। সায়ফুন মূর্ছিতা হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। গতিক ভাল নয় দেখিয়া হাবিল ও সুফিয়া তাড়াতাড়ি উভয়ের মুখের আবরণ খুলিয়া দিল।

চারিদিকে হাসির রোল। সকলের মুখেই প্রচণ্ড উল্লাস-ধ্বনি। বরবেশধারী রায়হান অবাক হইয়া দেখিলেন-সম্মুখে বধূবেশে সায়ফুন। পলকে এক ঝলক তড়িৎপ্রবাহ তাহার আপাদমস্তক বেষ্টন করিয়া যেন ঘুরপাক খাইল। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "কে, সায়ফুন!"

রায়হানের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সায়ফুনের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সে দেখে- সম্মুখে তাহারই প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম রায়হান। "অ্যাঁ! তুমি।

তুমি এসেছ!" অস্ফুট স্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াই সে পুনরায় জ্ঞান হারাইয়া চক্ষু মুদিল।

রায়হান সায়ফুনের পার্শ্বে বসিয়া আপন জানুদেশে তাহার মস্তক উঠাইয়া লইলেন, ব্যাপার কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না; ভাবাবেগে কিছু বলিতেও পারিলেন না। রহমানুর রহীমের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষুকোণ বাহিয়া অবিরাম অশ্রুধারা কেবলই গড়াইতে লাগিল।

কনে চেতনা হারাইয়া নিঃসাড়ে মজলিসে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া আনন্দ-কোলাহল অকস্মাৎ যেন মন্দীভূত হইল। উৎকণ্ঠিত হৃদয়া সুফিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিয়া সায়ফুনের চোখে-মুখে ঠাণ্ডা পানি ছিটাইতে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পরে সায়ফুন চক্ষু মেলিয়া চাহিলে, যুবক-যুবতী ও বালক-বালিকাদের উল্লাস-ধ্বনি আবার চরমে উঠিল। রায়হানের নিকটে সমস্ত ব্যাপারটাই মনে হইল যেন একটা বিরাট ভোজবাজি। কোথা হইতে কিভাবে সায়ফুন এখানে আসিল, কিরূপেই বা মিলন ঘটিল, কিছুই তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগও ঘটিল না। সকলেই আজ মহানন্দে মত্ত। রায়হান মনে মনে শুধু আল্লাহ্‌র দরবারে কত শোকরগুজারি করিতে লাগিলেন। নিকটে বসিয়া রাহেল, ওৎবা ও হারিস সমস্বরে শুরু করিয়া দিয়াছে আল্লাহ্‌র যিকির-আযকার।

সায়ফুন চাহিয়া দেখিল, জীবনের যত আশা, যত আকাঙ্খা আজ সব মিটিয়াছে, জগতের যত সুখ, যত শান্তি, তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছে, রায়হানকে সে পাইয়াছে। আজ আর কিছুই চাহিবার নাই, পাইবার নাই। সীমাহীন পুলকে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, বিরামহীন আনন্দাশ্রু দুই নয়ন ছাপাইয়া, কর্ণমূল ঘেঁষিয়া রায়হানের জানুপরি গড়াইতে লাগিল।

রায়হান মাথা নত করিয়া ডাকিলেন, 'সায়ফুন! চেয়ে দেখ সারা জাহান যেন খুশিতে ডগমগ! জানি না আজ কিভাবে আল্লাহ্‌র শোকরগুজার করবো। দেখলে, রহমানুর রহীম কত দয়াময়! কত অসীম তাঁর কুদরত! কত অপার তাঁর মহিমা!'

সায়ফুন দুই হস্তে রায়হানের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে অবিচল কণ্ঠে বলিল, "আগে বল, দুঃখিনীর সন্ধান কিভাবে পেলে। বল, অভাগিনীকে ছেড়ে আর কোথাও পালাবে না!"

রায়হান প্রিয়তমার দুই চক্ষু করতলে মুছাইয়া আনন্দ-বিহবল কণ্ঠে বলিলেন, "সায়ফুন! আমাদের এই অভাব্য মিলন কিভাবে যে ঘটেছে, জানি না। আল্লাহ্‌র দরবারে শুধু আকুল মুনাজাত- ইহলোকে যেন দুর্যোগ আর না আসে, পরলোকেও যেন আমরা ছাড়াছাড়ি না হই।"

প্রেমিক- প্রেমিকার এই মিলন-দৃশ্য সুফিয়া ও অন্যান্য নরনারীর অন্তর বিপুল আনন্দে ভরিয়া দিয়াছে। সর্দার আনসারের দুই চোখ সজল, মুখে মৃদু হাসি। সে হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘন কৃষ্ণ গুম্ফগুচ্ছ ওষ্ঠোপরি অবিরাম নাচিতে লাগিল।

সুফিয়ার আনন্দের আর অবধি নাই। সায়ফুনের হাত ধরিয়া সে বলিল, "ভাবী উঠ, বর দেখে একেবারে যে মজে গেলে! কেমন মনের মত হয়েছে ত! বড় যে তেড়েফুঁড়ে আসছিলে! এখন?"

লজ্জায় সায়ফুনের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করত সুফিয়ার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া চুপি চুপি সে বলিল, "এত ছলও জান বহিন!" তারপর সুফিয়ার স্কন্ধদেশে সে মুখ লুকাইল।

সুফিয়া রায়হানের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ভাইজান! তুমি মুসলমান, ভাবীও মুসলমান। কাজেই তোমাদের শাদী মুবারক ইসলামী তরীকায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অমুসলমান বেদুঈন-পল্লীতে কিরূপে তা' সম্ভব হবে? কে তোমাদের শাদী পড়াবেন?'

রাহেল অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে ভার আমার। আমিই এঁদের পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করবো।"

বিস্ময়-বিহবল সায়ফুন ও রায়হান অনিমেষ নয়নে রাহেলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই রাহেল 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলিয়া আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করিতে শুরু করিল।

সেই সন্ধ্যায় সমগ্র বেদুঈন-পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকার দল সর্দারের তাঁবুতে আসিয়া ভিড় করিল। সকলেই মহানন্দে মত্ত; শুধু দলবলসহ আবিদের দেখা নাই। তাহার চেলারাও বেগতিক দেখিয়া এদিক-ওদিক সরিয়া পড়িয়াছে। কাবিলেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। লজ্জায় অনুশোচনায় সে

নাকি পল্লীর অদূরে এক জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছে।

হাবিলের ভর্ৎসনায় আবিদের ভুল ভাঙ্গিল, অন্তরে সুবুদ্ধির উদয় হইল। অগত্যা সে শিরিনার দ্বারস্থ না হইয়া আর উপায় দেখিল না। সুফিয়া লোক পাঠাইয়া নির্বোধ কাবিলকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনিলে কাঁদিতে কাঁদিতে সে হাবিল ও সুফিয়ার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

শিরিনার আনন্দ আজ দেখে কে! যে শিকার হাতছাড়া হইয়াছিল, আজ সে স্বেচ্ছায় তাহার দুয়ারে আসিয়া ধর্ণা দিতেছে। যুবতীর ন্যায় সাজিয়া-গুজিয়া তাঁবুর বাহিরে এক দোলনায় বসিয়া, ধীরে ধীরে দোল দিতে দিতে আপন মনে সে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে লাগিল। আজ তাহার অন্তরের অফুরন্ত আনন্দ চোখে-মুখে উপচাইয়া পড়িতেছে। সুফিয়া কোথায় যেন যাইতেছিল সেই পথে, শিরিনার কাণ্ড দেখিয়া হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। চুপি চুপি পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া তাহার দুই নয়ন কোমল করতল দ্বারা সে চাপিয়া ধরিল। শিরিনা চমকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখে পশ্চাতে সুফিয়া! তাহার মুখে হাসি আর ধরে না।

সুফিয়া হাসিতে হাসিতে শিরিনার গণ্ডদ্বয় টিপিয়া দিয়া বলিল, 'এই মুখে না বড় বিষ ঢেলেছিলে? এবার মধু বর্ষণ কর, ইনাম দাও। দেখলে ত, তোমার রাজ্য কিভাবে তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম? এবার দখল করে বস। সুখে রাজত্ব কর!' দোলনাটাকে একটা ধাক্কা দিল সে।

শিরিনা হাসিতে হাসিতে বলিল, 'দুর পাগ্‌লি। আমি আবার তোকে বকলাম কখন? হাবিলকে ত ফিরে পেয়েছিস, আর কি ইনাম চাস্ বল? বস্, কিছু মিষ্টিমুখ করে যা।'

'না বোন! আমি যাই, হাবিল হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে; তুমি দোল দিতে দিতে গান গাও আপন মনে।' এই বলিয়া দোলনাটাকে আবার জোরে একটা ধাক্ক দিয়া চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় সে ছুটিয়া পালাইল।

সেই রাত্রেই সুফিয়া ও হাবিলের বিবাহ। সেই রাত্রেই পল্লীর অপর প্রান্তে আবিদ ও শিরিনার শাদীর ইন্তেজামও হইল। সমগ্র পল্লী আবার মাতিয়া উঠি আনন্দোৎসবে।

যুবক-যুবতীর দল এইবার সায়ফুন ও রায়হানকে অব্যাহতি দিয়া হাবিল ও আবিদের শাদীর আয়োজনে লাগিয়া গেল। এই অবকাশে রায়হান সায়ফুনের হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন, 'চল, এই আনন্দ কোলাহলের বাইরে ঐ প্রান্তরে একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসি। চেয়ে দেখ, জ্যোৎস্নাধারায় জগৎ কেমন ভেসে গেছে; নিখিল বিশ্ব স্বপ্নাবেশে যেন আচ্ছন্ন। তোমার কোন কথাই যে শোনা হয়নি প্রিয়ে! আমার কাহিনীও ত বলা হয়নি। যাবে ওখানে?'

সায়ফুন দুই হাতে স্বামীর হস্ততালু চাপিয়া ধরিয়া, প্রস্ফুটিত কুসুম-সদৃশ কমনীয় মুখখানিতে হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল, 'তোমাকে দেখেই ত আশ মেটেনি, বাইরের রূপ কি আর দেখবো! আচ্ছা চল, ওখানটায় বসেই তোমার কাহিনী কিছু শোনবো, নইলে সুফিয়া এসে নিয়ে যাবে এখান থেকে ছো মেরে। তাকে যে সাজাতে হবে কনের বেশে!'

স্বামী-স্ত্রী হাত ধরাধরি করিয়া বাহিরে চলিল। সায়ফুন হাসিতে হাসিতে বলিল, 'হাঁ গা বীরপুরুষ! এতদিন কোথায় কোথায় পালিয়ে বেড়ালে বল ত? হাবশী দেশে কি পৌছতে পেরেছিলে?'

মূলকে হাবাশের নাম শুনিবামাত্র রায়হানের স্মৃতিপথে সে দেশের কত কথাই না উদয় হইল! সেইখানে রহিয়াছে প্রিয়বন্ধু জাফর, আবদুর রহমান ও আরো অনেকে। রাজকুমারী শামিনী হয়তো পরাবীনকে লইয়া সুখের সংসার পাতিয়াছে। দয়ালু নজ্জাসী উগাণ্ডির রাজ্য ও ধন-সম্পদ নিশ্চয়ই তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। সেই দেশের মুসলমানগণ এইবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। আহা! আলা হযরত (সঃ)-এর এই মক্কা-বিজয় কাহিনী তাঁহাদের কানে না জানি কি মধু বর্ষণ করিবে।

রায়হানের তন্ময় ভাব লক্ষ্য করিয়া সায়ফুন তাঁহার হস্ততালুতে ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, 'এত কি ভাবছো বল ত?"

রায়হান চমকিত হইয়া বলিলেন, 'ভাবছি জীবনের দুর্গম যাত্রাপথে এমনিভাবে আমরা হাতে হাত রেখে যেন চলতে পারি। তুমি পাশে থাকলে জীবন-যুদ্ধে আর ভয়টা কিসের? সকল বিপদ-আপদ, বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে মাথা তুলে চলবো। তুমিই ত আমার প্রাণের অফুরন্ত আশা-ভরসা ও

উৎসাহ–উদ্দীপনার উৎস–ধারা। মানুষের কল্যাণে দেশের সেবায় দু'জনেই জীবন উৎসর্গ করবো। প্রিয়তমে! পারবে না এ দরিদ্র দেশবাসীর ব্যথা–মলিন মুখে সুখের হাসি, শান্তির হাসি ফুটিয়ে তুলতে? মরুভূমির বুকে তুমি ফুটে উঠবে সুগন্ধি কুসুমের ন্যায়, সে পুষ্প–সুবাস চারদিক আমোদিত করবে। পারবে না আমার সে স্বপ্ন সফল করতে? অধঃপতিতা নারী জাতির দুর্দশার কথা কি ভেবে দেখেছ প্রিয়ে? আলা হযরত (সঃ) যে মুক্তির বাণী মানুষকে শুনিয়েছেন, পারবে না সেই মুক্তি মন্ত্র পদদলিতা, ঘৃণিতা ও উপেক্ষিতা নারীদের কানে কানে শুনিয়ে, অন্তরে সঞ্জীবনী–সুধা ঢেলে দিতে? সায়ফুন! বিরাট বিশ্বে কত কাজ! বল, তুমি এমনিভাবে আমার হাতে হাত রেখে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে?'

সায়ফুন স্মিতহাস্যে মাথা নাড়িয়া সায় দিল। অন্তরের অফুরন্ত আনন্দ তাহার মুখের ভাষা যেন কাড়িয়া নিয়াছে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, 'দোয়া কর, আমার জীবন তোমার জীবনে যেন মিশে যায় ওতপ্রোতভাবে, তোমার সাধনা, তোমার আদর্শ আমার চলার পথ যেন নির্দেশ করে। উভয়ের এক লক্ষ্য, এক সাধনা, একই যেন ব্রত হয় জীবনের।'

রায়হান আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'মারহাবা! মারহাবা! কী আনন্দ! কী গর্ব। এ মিলন–রজনী কত সুখের! সায়ফুন! আল্লাহ্‌র মরজি কালই আমরা যাত্রা করবো স্বদেশে, সেখানে আত্মীয়–স্বজনের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলিত হব। সে মিলন হবে কত সুখের, কত শান্তির! জান, আজ পবিত্র মক্কার ঘরে ঘরে কত মিলনোৎসব? কত আনন্দের ঢেউ? সেখানে সকলে অতীতের দুঃখ ভুলে মহানন্দে মেতেছে। ইচ্ছে হয়, এখনি স্বদেশে উড়ে গিয়ে শরীক হই সেই মহামিলনের আনন্দোৎসবে। আবার এখানেও দেখ কত উৎসবের হুল্লোড়! আচ্ছা, বল প্রিয়ে, এখানে এসে আশ্রয় নিলে কিভাবে?'

সায়ফুন রায়হানের উষ্ণীষ–বস্ত্র নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তোমার কাহিনীটাই আগে বল। কী আশ্চর্য! বড় ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলে। বল, কিরূপে তা' সম্ভব হল?"

রায়হান প্রেয়সীর কেশগুচ্ছে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, 'সবই আল্লাহর রহমত। বেদুঈন পল্লীতে পৌঁছেই হাবিল সুফিয়ার সন্ধান নিয়ে জানলো,

সে দরিয়ায় গেছে গোসল করতে এক বন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে। সর্দার আনসার আমাদের দেখে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সবাইকে শুরু করলেন ডাকাডাকি। অবিলম্বে আমরা হাবিলের সঙ্গে ছুটে আসি সাগরে। তখনো কিন্তু জানতে পারি নি– তুমিই সুফিয়ার সেই বন্দিনী।'

'কেন, হারিস কি কিছুই বলেনি?'

'না, তার সঙ্গে আলাপের আর সুযোগ ঘটলো কই! আমাকে ত সে চিনেই না, রাহেলকেও কেন জানি দেখতে পারতো না দু'চক্ষে; বেদুঈন বলে হাবিলকে সে ভয় করতো খুব। বড় একটা ভিড়তোই না আমাদের কাছে। পথে ত ঘোড়া ছুটিয়ে আসতেই পারতো না সমানে, সমানে; গতরাত্রে বিশ্রামকালেও ভয়ে ভয়ে দূরে দূরেই ছিল।'

'ভাগ্যক্রমেই আজ এসেছিলে, নইলে এ জীবনে মিলন হয়তো আর ঘটতই না। 'রাব্বেল আ'লামীন' কত দয়াময়! সেজন্যেই বুঝি তাঁর নাম 'রাহমানুর রহীম'। তারপর কোত্থেকে কিভাবে এদেশে এলে শুনি?'

মূলকে হাবাশের কাহিনী রায়হান বর্ণনা করিলেন সংক্ষেপে। সায়ফুন বিস্ময় বিমুগ্ধ–চিত্তে তাহা শ্রবণ করত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা মক্‌কা–বিজয়ে অংশ গ্রহণ করলে কিরূপে?'

'মদিনায় পৌঁছেই শুনি–রসুলে পাক (সঃ) দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে মক্‌কা অভিযানের আয়োজন করছেন। আমিও রাহেলকে সঙ্গে নিয়ে মেতে গেলাম ইসলামের খেদমতে। আল্লাহ্‌র মরজি একটা ক্ষুদ্র সৈন্যদল পরিচালনার ভারও দেওয়া হয়েছিল আমাকে।'

'হতভাগিনী শিমপী ও তার সঙ্গিনীদের কি হলো? কোথায় পাঠালে তাদের?'

'মদিনা মনোয়ারায় এক বিশ্বস্ত বন্ধুর আশ্রয়ে রেখে এসেছি, এবার তাদের মক্‌কা মোয়াজ্জমায় নিয়ে এসে নতুনভাবে জীবন গড়ার সুযোগ দেব। এ কাজের ভার তোমাকেই যে নিতে হবে। পারবে না প্রিয়ে?'

'কেন পারবো না, দুঃখিনীর দুঃখ দুঃখিনী ছাড়া আর কে বুঝবে? তোমাকেও কিন্তু আমার একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ সায়ফুন?'

'আমার আম্মার দুঃখের কথা কিছু শুনেছ?'

'না, কি করে শুনবো! কি হয়েছে? কোথায় তিনি?'

"এখানে আছেন।"

'এখানে! এই বেদুঈন-পল্লীতে?'

'হাঁ, দৈবক্রমে আজ সন্ধ্যায়ই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত।' সায়ফুন বিমাতার কাহিনী সজল নয়নে বর্ণনা করিয়া বলিল, 'আম্মার মুক্তির একটা ব্যবস্থা কর।'

সব শুনিয়া রায়হানের অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সায়ফুনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'আম্মার মুক্তির জন্য ভেবো না, আমি সুফিয়ার আব্বাকে বলে একটা ব্যবস্থা করবো। সর্দার আমাকে ঠিক পুত্রের মতই স্নেহ করেন। বেদুঈন হ'লে কি হয়, দেখলে ত বাপ-বেটির ব্যাভারটা।'

'এদের কথা ভোলা যাবে না। সুফিয়ার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না। এদের মক্কা মোয়াজ্জমায় নিয়ে চল। সুফিয়ার অন্তরে যে ভাল মানুষটি দেখেছি, একমাত্র কুলছুম ছাড়া আর কোন কুরাইশ-কন্যার অন্তরেও তা' দেখিনি। হায় হতভাগ্য কুলছুম!' একটা গভীর নিঃশ্বাস সায়ফুনের অন্তর আলোড়ন করিয়া বাহির হইল।

এমন সময় শোনা গেল, তাঁবুতে যেন রায়হানের খোঁজাখুজি পড়িয়া গিয়াছে, কে যেন তাঁহাকে বারবার ডাকিতেছে। রাহেলের কন্ঠস্বর বলিয়া মনে হইল।

রায়হান সায়ফুনের হাত ধরিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিকটে গিয়া সাড়া দিলেন, ' কে, রাহেলা নাকি? এদিকে এস।'

রাহেল হাসিতে হাসিতে কি বলিবার জন্য ছুটিয়া আসিল, কিন্তু সম্মুখে বধূ-বেশী সায়ফুনকে দেখিয়া একেবারে অপ্রস্তুত। তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল নিমেষে, গত জীবনের কলঙ্কময় কাহিনী স্মরণ করিয়া লজ্জায় সে লাল হইয়া উঠিল।

রায়হান তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভার্যাকে বলিলেন, 'প্রিয়ে! ভুলে যাও পুরাতন কথা। মন থেকে মুছে ফেল অতীতের স্মৃতি। বুঝতেই পারছো, রাহেল আর সেই রাহেল নাই।'

সায়ফুন হাসিয়া বলিল, 'শাদীর মজলিসেই আমি তা' বুঝেছি।'

রাহেল অবনত মস্তকে সায়ফুনের নিকটে দাঁড়াইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, 'ভগ্নী সায়ফুন! আমাকে মার্জনা কর। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তুমি আমাকে যে শাস্তি দেবে, তা-ই আজ মাথা পেতে নেব।'

সায়ফুন হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, 'তোমার বিচারের ভার কুলছুমের উপর। তাকে খুঁজে আন আগে। উভয়ে মিলে মিশে তোমার বিচারে বসবো তখন।' তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে গম্ভীরভাবে বলিল, 'আহা! হতভাগিনী কুলছুম আজ কোথায় কে জানে। বহুদিন তাকে ছেড়ে এসেছি আয়াযের বাড়ী। কোন্‌দিকে সে বাড়ী কে বলবে?'

রাহেল উত্তরে কিছুই বলিল না। শুধু রায়হানকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাহেল ভাই! কবে যাত্রা করবে স্বদেশে?'

রায়হান। আল্লাহ্‌র মরজি কালই রওয়ানা হব ফজরে।

রাহেল। তবে রাত্রিটুকু আমাকে ও ভাই ওৎবাকে ছুটি দাও।

রায়হান। বেশ, বিশ্রাম কর গিয়ে। ভাই ওৎবার সঙ্গে আলাপ করার ত সুযোগই হল না। যাক, কাল সকালেই না হয় দেখা হবে।

রাহেল মৃদু হাসিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। অল্পক্ষণ পরেই সে ওৎবাকে সঙ্গে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে রওয়ানা হইল পূর্বদিকে।

এমন সময় সর্দার আনসার রায়হানের নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বাবা রায়হান! ঠিক করেছি আজ রাত্রেই শাদী দেব সুফিয়ার। আয়োজন সব সম্পূর্ণ। কিন্তু হাবিল যে এতিম, কে তার মুরব্বী হয়ে সব দেখাশোনা করবে? আমার ইচ্ছে, তুমিই কে ভার গ্রহণ কর।'

সুফিয়াও তাহার আব্বার পিছনে পিছনে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে পিতার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বাঃ রে! রায়হান যে আমার ভাই! তিনি আবার ও-পক্ষের মুরুব্বী হবেন কেন?'

সকলে হাসিয়া উঠিল। রায়হান হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'হাঁ বোন! আমি তোমাদের উভয়ের। আচ্ছা, চলুন চাচা, শাদীর আয়োজন দেখি গে।' এই বলিয়া

রায়হান আনসারকে লইয়া তাঁবুর দিকে যাত্রা করিলেন। সায়ফুন যাইতে চাহিল বিমাতার নিকটে, কিন্তু সুফিয়া জোর করিয়া তাহাকে আপন তাঁবুতে লইয়া চলিল বিবাহের সব ইন্‌তেজাম করিতে।

সর্দারের তাঁবুতেই বিবাহের মজলিস। সেখানে হাসি– ঠাট্টার শেষ নাই, আমোদ–আহলাদের অন্ত নাই। আসরে রায়হানের নিষেধক্রমে বেদুঈনের চিরাচরিত প্রথামত শরাব বিতরণ ও অশ্লীল নৃত্যগীতের আয়োজন হইল না। রায়হান সকলকে মদ্যপানের অপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মিথ্যার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে, সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে, হযরতের অটল সাধনার কথা উল্লেখ করিলেন; মানুষের কল্যাণে বিশ্ব–ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে রসুলে আকরাম (সঃ)–এর বিরাট ত্যাগ স্বীকার ও অপরিসীম সহিষ্ণুতার কথা খুলিয়া বলিলেন। তারপর মুসলমানদের মক্‌কা বিজয় ও কুরাইশদের ইসলাম–গ্রহণ কাহিনী একে একে বর্ণনা করিয়া, অবশেষে সকলকে তিনি জানাইয়া দিলেন, হাবিলও পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়াছে।

সভায় তখন পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। পল্লী–সর্দার আনসার কতক্ষণ পরে রায়হানের নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল, 'বাবা রায়হান! তুমি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছ, অন্তর সত্যের আলোকে আলোকিত করেছ। পবিত্র ইসলামে আমাকেও দীক্ষিত কর।'

সর্দার পরম শ্রদ্ধাভরে ইসলাম কবুল করিল। ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া অধিকাংশ স্ত্রী–পুরুষই সেই নিশীথে সেই সভায় সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল। সভাস্থলে উচ্চকণ্ঠে বারবার উত্থিত হইল তওহীদের পাক কালাম ও পবিত্র তকবির–ধ্বনি।

রায়হান সুফিয়ার তাঁবুতে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বোন সুফিয়া! ইসলামের পরিচয় তোমার অজানা নেই। ঐ শোন, বাইরে তকবির ধ্বনি। এবার তোমার মতামত প্রকাশ কর; কেননা শাদী মুবারক ধর্মরতে সমাধা হওয়াই বিধেয়।'

সুফিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, 'আমি ত ওস্তাদজি বহুদিন আগেই আপনার চেলা সেজে বসে আছি। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা কেন?

মহাধুমধামে বিবাহানুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। আবিদ আর শিরিনাও মুসলমান হইয়াছিল। সেই সভাতে তাহাদের বিবাহও সুসম্পন্ন হইল।

বেদুঈনগণ বহু পুরাতন কুসংস্কার পরিত্যাগ করিল। অশ্লীল নৃত্যগীত ও কুৎসিত রঙ্গরসের আসর আর বসিল না। উচ্ছৃঙ্খল বেদুঈন জীবনেও পবিত্রতার সূত্রপাত হইল।

হারিসের আনন্দ আজ দেখে কে! হাবিলকে সে পাইয়াছে। মৃত ভাবিয়া যাহার আশা ত্যাগ করিয়াছিল, সেই রায়হানকেও ফিরিয়া পাইয়াছে; দুই বিরহিণীর মুখেই ফুটিয়া উঠিয়াছে অনাবিল হাসি। তাহার চেয়ে সুখী আর কয়জনই বা আছে। হারিস আজ প্রাণ খুলিয়া শাদীর আসরে গাহিল, হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আল্লাহ ও রসুলের মহিমা আবেগভরে কীর্তন করিল।

আনন্দোৎসবে রাত্রি প্রায় ভোর-ভোর। উৎসবের শেষে রায়হান সর্দার ও পল্লীর বয়োজ্যেষ্ঠদের ডাকিয়া বলিলেন, 'বন্ধুগণ! আপনারা কুরাইশদের অত্যাচার-ভয়ে এই দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ সে অন্যায়-অবিচারের অবসান হয়েছে। আল্লাহ্র অনুগ্রহে প্রিয় রসুল (সঃ) ন্যায়-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনারা সকলে মক্কা মোয়াজ্জমায় ফিরে চলুন। ধর্মপথে জীবন-যাপন করে সুখ-শান্তির অধিকারী হোন।'

সর্দার আনসার আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, 'বাবা রায়হান! আমরা ফিরে যেতে চাই আমাদের পূর্বস্থানে। সেই পাহাড়-ঘেরা প্রান্তরের বুকে ক্ষুদ্র পল্লীখানি, সে শস্য-শ্যামল দেশ আমাদের অন্তরে সর্বদা উঁকি মেরে উঠে। সে ঝর্ণার কল্‌কল্-ছল্‌ছল্ ধ্বনি এখনও আমাদের অন্তরে শোনায় কত সুমধুর বাণী। আমরা সেখানেই ফিরবো।'

রায়হান বলিলেন, 'বেশ, তবে সেস্থানেই চলুন। সেখানে আপনারা ন্যায়পথে ধর্মজীবন যাপন করার চেষ্টা করুন।

ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিলে সুমধুর আযান ধ্বনিত হইল রাহেলের কণ্ঠে। সকলে কাজ ফেলিয়া তখনই ছুটিল ওযু করিতে।

নামাযের পর সর্দার তাঁবু ভাঙ্গিবার আদেশ দিতেই মহোল্লাসে পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতারা মাতিয়া উঠিল যাত্রার আয়োজনে। স্ত্রীলোকেরা ঘুমন্ত শিশুদের

ডাকিয়া তুলিয়া আসবাবপত্র গুছাইতে লাগিল। পুরুষেরা তাঁবুগুলি খুলিয়া, ভাঙ্গিয়া একে একে সব বোঝাই করিতে শুরু করিল উট, ঘোড়া আর গর্দভের পিঠে।

হারিস রায়হানের নিকটে আসিয়া আরয করিল, 'অসভ্য পৌত্তলিকদের সঙ্গে আমি কিরূপে থাকবো একাকী। আমাকেও নিয়ে চলুন সঙ্গে!'

রায়হান হাসিমুখে বলিলেন, 'হারিস! তোমার উপকার জীবনে ভুলবো না। তোমাকে সঙ্গে নেবার লোভ কিরূপে ভাই সংবরণ করি বল? কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার অসভ্য গ্রামবাসীরা চিরকালই কি অসভ্য থাকবে? ধর্মের আলোকে তাদের অন্তর কি আলোকিত হবে না? সে ভার যে নিতে হবে তোমাকেই। বেশ, আপাততঃ আমাদের সঙ্গে পবিত্র মক্কায় চল। সেখানে যে নার্গিস তোমার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রয়েছে, তোমার বিরহী প্রাণও হয়তো ছটফট করে মরছে।' রায়হান হাসিলেন। হারিস তাঁহাকে সালাম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইয়া গেল। রায়হান চলিলেন হাবিলের খোঁজে।

সর্দার আনসার যাত্রার আয়োজন লক্ষ্য করিতে ব্যস্ত; এমন সময় আবিদ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'সর্দার! বড় অন্যায় করেছিলাম, ভুল বুঝেছিলাম। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।'

সর্দার আবিদের হাত ধরিয়া বলিল 'উঠ, সায়ফুনের নিকটে চল। তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাও।'

আবিদ সর্দারের আদেশে সায়ফুনের সম্মুখে আসিয়া নত শিরে দণ্ডায়মান হইল, সলজ্জে অপরাধ স্বীকার করিয়া কাতর স্বরে সে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। সর্দার কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ' বেটি! ভুল-ত্রুটি ত মানুষের হয়, কিন্তু আমরা যে মানুষ দূরে থাক, পশুরও অধম। তুমি একে ক্ষমা কর আম্মা।'

বেদুঈনদের বন্য স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখিয়া সায়ফুনের অন্তর বিস্ময়ে-পুলকে ভরিয়া উঠিল। সর্বান্তকরণে আবিদকে সে ক্ষমা করিয়া বলিল, 'আমার জন্য যে নৌকাখানা যাদের সাহায্যে তুমি তৈরী করেছিলে, তাতে তুমি তাদের নিয়ে শুরু কর তেজারতি। তওবা করে ছেড়ে দাও পাপের পথ।' আরো কি যে সে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখে, সেই ভগ্ন-পল্লীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এক উষ্ট্রযুথ- সর্বাগ্রে অশ্বারোহণে রাহেল, পশ্চাতে ভাই ওৎবা। বিস্ময়-বিহবল্যচিত্তে সে ভাবিতে লাগিল- কে

উহারা রাহেলই–বা ইহাদের কোথা হইতে লইয়া আসিল। আবিদকে সে পুনরায় বলিল, 'আচ্ছা, এস ভাই আবিদ! আমি একবার গিয়ে তোমার শিরিনার সঙ্গে ভাব করে আসবো।' সর্দারকে সে বলিল, 'চাচা! কে যেন এল একবার দেখে আসি? এই বলিয়া দলটির সন্ধান লইতে সে রাহেল ও ওৎবার দিকে ছুটিল।

সায়ফুন অবাক হইয়া দেখে–রাহেল ও ওৎবার পশ্চাতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে তাহারই ভ্রাতৃবধূগণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বিস্ময়াতিশয্যে অভিভূতা সায়ফুন ছুটিতে ছুটিতে চিৎকার করিতে লাগিল, 'কে? ভাবী। ভাবী! তোমরা এখানে কোথা হতে এলে ভাবী?"

ওৎবা সকলকে উটের পিঠ হইতে নামাইয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল।

সায়ফুন ভ্রাতৃবধূদের একে একে মহানন্দে জড়াইয়া ধরিয়া কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেমেয়েদের আদর করিয়া কোলে কাঁখে তুলিল।

ভ্রাতৃবধূ যোহরা লজ্জায় মাথা তুলিয়া সায়ফুনের প্রতি তাকাইতেই পারিল না। সায়ফুন যোহরার গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ভাবী, এখনও তুমি রাগ করে রয়েছো? বল, কথা বল! কোথা থেকে এলে ভাবী?'

যোহরা কিছুই বলিতে পারিল না–কণ্ঠস্বর রুদ্ধ; অনুতাপানলে জ্বলিয়া–পুড়িয়া আলিঙ্গানাবদ্ধ সায়ফুনের পৃষ্ঠদেশ শুধু সে নয়ন–জলে ভাসাইয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে দলের অন্যান্য উষ্ট্রগুলিও তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল! পার্শ্ববর্তী এক উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে কে যেন ডাকিল, 'সায়ফুন!'

সায়ফুন ভাবীর গলদেশ হইতে মাথা তুলিয়া পশ্চাতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখে–কুলছুম! এক নিমেষে তাহার সর্বাঙ্গে যেন তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া গেল।

চঞ্চলা কুলছুম ব্যস্তভাবে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমাদের কথা কি আর মনে আছে এখন? দূরের মানুষ আপন হলো, কাছের মানুষ পর।'

সায়ফুন ছুটিয়া গিয়া কুলছুমকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'কুলছুম! বোন কুলছুম! তুমি এখানে কোথেকে এলে বহিন? এ জীবনে কোন দিন কি তোমাকে ভুলতে পারবো? বল কিভাবে এখানে এলে! ছিলে কোথায় এত দিন?'

রাহেল নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমিই নিয়ে এসেছি। তুমিই না বলেছ– কুলছুমকে আনলে আমার বিচারে বসবে? সেজন্যই ত পল্লীর কুঁড়েঘরগুলি সব ভেঙ্গে দিয়ে নিয়ে এলাম এদের। এইবার অধমের প্রতি কি দণ্ডের হুকুম?"

সায়ফূনের দুই চোখে আনন্দাশ্রু। অক্ষিপল্লবে কম্পমান অশ্রুবিন্দুগুলি অরুণালোকে মুক্তার মত ঝলমল করিতেছে। আবেগভরে সে বলিল, 'রাহেল ভাই! তুমি পাগল হয়েছ? এখনও মনে রেখেছ সেই সব পুরাতন কাহিনী? আজকের এই আনন্দের দিনে আমার কোন খেদ নেই, কোন অভিযোগ নেই। তুমি আমার কোন অপকারই করনি, বরং যে উপকার করেছ, জীবনে তা ভুলবার নয়। বাড়ীতে থাকলে এতদিনে আমার দেহ কবে মিশে যেত মাটিতে। পালিয়ে এসেছিলাম, সেজন্যই না বেঁচে গেছি।"

রায়হান সেই সময় ওৎবার নিকটে আসিয়া দেখেন– দুঃখে, লজ্জায় ও অনুশোচনায় বেচারা একেবারে ম্রিয়মাণ। রায়হান তাহাকে পুরাতন কথা উল্লেখ করিবার আর কোন সুযোগই দিলেন না। 'ভাই' বলিয়া ওৎবাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হঠাৎ রায়হান শুনিতে পাইলেন, কে যেন পশ্চাদ্দেশ হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখেন– দলের শেষে এক উষ্ট্রের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া আবু আক্কাস ও আছিয়া হাসিতেছেন। রায়হান ছুটিয়া গিয়া আবু আক্কাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'ভাই আবু আক্কাস! আপনি কিরূপে এখানে? কোত্থেকে এলেন?'

আবু আক্কাস হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'সবই তোমার রাহেলের কীর্তি। তোমাদের অবাক করে দেবার জন্যই বোধ হয় কিছুই সে বলেনি। চল, ঐখানে বসে আগে তোমার কাহিনী শুনি।' এই বলিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নিকটে এক বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিলেন।

সায়ফুন কুলছুমকে লইয়া অন্যান্য যাত্রীদের খোঁজ লইতে বাহির হইল। অনেককেই সে চিনিল, অনেককেই চিনিল না। হঠাৎ সম্মুখে বৃদ্ধ আয়ায ও আয়ায–পত্নীকে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের মাত্রা একেবারে বাড়িয়া উঠিল শতগুণ।

সায়ফুন আয়ায–পত্নী উম্মে সালমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'আম্মা! আপনিও এসেছেন!'

পূর্বস্মৃতি স্মরণ হইতেই সায়ফুনের দুই চোখ আবার সজল হইয়া উঠিল। কুলছুমের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, 'কুলছুম! মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছি। আজ আমার কত আনন্দ! এ ধরণী কত সুন্দর! একদিন সব হারিয়েছিলাম, আজ আবার একে একে ফিরে পেলাম সবাইকে। আমার মত সুখী আর কে? কুলছুম! জানি না তোমরা কোথা থেকে এসেছ। মনে হয়, ফেরেশতারা দুঃখিনীদের দুঃখ দূর করতে একসঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছেন সকলকে। এস, আমার আম্মাকেও দেখবে চল।' আয়ায–পত্নীকে সে বলিল, 'আম্মা! আপনিও চলুন, সেখানেই গিয়ে বিশ্রাম করবেন। ওখানেই বসে সব কিছু শুনবো, সকল কথা বলবো।' এই বলিয়া সে কুলছুম ও উম্মে সালমার হাত ধরিল।

কুলছুম বিস্মিত হইয়া বলিল, 'তোমার আম্মা! কি বলছো!'

সায়ফুন বলিল, 'হাঁ, আম্মাও যে এখানে, সেজন্যই ত বললাম– সব হারিয়ে আজ সবকিছুই পেয়েছি। শিগ্‌গির চল আম্মার তাঁবুতে।'

আনন্দোচ্ছ্বাসে সায়ফুনের বক্ষদেশ বুঝি ফাটিয়াই যায়। সে কুলছুম, উম্মে সালমা এবং ভাবীদের সঙ্গে লইয়া আত্মীয়–পরিজনদের সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে তাহার আম্মার সন্ধানে ছুটিল।

রায়হান একে একে সকলের সঙ্গেই আলাপ–পরিচয় করিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ উপভোগ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই হারিসও উষ্ট্রপৃষ্ঠে সেই স্থানে পৌঁছিল তাহার ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া।

এমন সময় সর্দারের নিকট হইতে খবর আসিল সকলে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, আদেশ পাইলেই যাত্রা করিবে পূর্বস্থানে।

সেই প্রভাতেই রায়হানের নির্দেশে সকলে একসঙ্গে তকবির–ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে সারিবদ্ধভাবে অশ্ব ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্ব স্ব স্থানে যাত্রা করিল। সর্বাগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে বেদুঈন–সর্দার আনসার, পশ্চাতে রায়হান ও হাবিল।

প্রায় তিন শতাধিক নির্বাসিত যাত্রী সেই প্রান্তরে পরিত্যক্ত বেদুঈন পল্লীর ভগ্নাবশেষ পশ্চাতে ফেলিয়া, সাগর তরঙ্গের গর্জনধ্বনি পিছনে ঠেলিয়া, ধীরে

ধীরে মালভূমির উপরে উঠিতে লাগিল। দেশের ডাক যাত্রীদের কানে পৌঁছিয়া মুক্তির বাণী অন্তরে শোনাইয়া, সকলের মনপ্রাণ যে আজ আকুল করিয়া তুলিয়াছে!

সোনার রবি ভুবন ভরিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে সোনার আলো। সে আলোয় যাত্রীদের আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল অপরূপ সুষমায় আজ মহিমান্বিত।

উদাত্ত সুরে গান ধরিল হারিস। সুমধুর কণ্ঠে দেশের পাহাড়, মরু–বনানী, পার্বত্য ঝর্ণা আর দরিয়ার বিচিত্র শোভা একে একে সে গাহিতে লাগিল। উদ্দীপনাময় গানের সুর যাত্রীদের অন্তর ভরিয়া দিয়াছে অনুপম উত্তেজনায়, অপূর্ব প্রেরণায়; সকলকেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছে স্বদেশের গরিমায়, মাতৃভূমির মহিমায়। সকলে মিলিয়া সেই সঙ্গীতের কোরাস গাহিতে গাহিতে বন্ধুর পার্বত্য পথে ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপরে উঠিতে শুরু করিয়াছে। গানের সুর বায়ু তরঙ্গে ভাসিয়া দূরে– বহু দূরে অনন্ত শূন্যে মিশিতে লাগিল।

ইফাবা–৯০–৯১–প্র/২৪১৩(উ)–৫২৫০

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আলোর পরশ